১৯৭১

আমেরিকার গোপন দলিল

মিজানুর রহমান খান

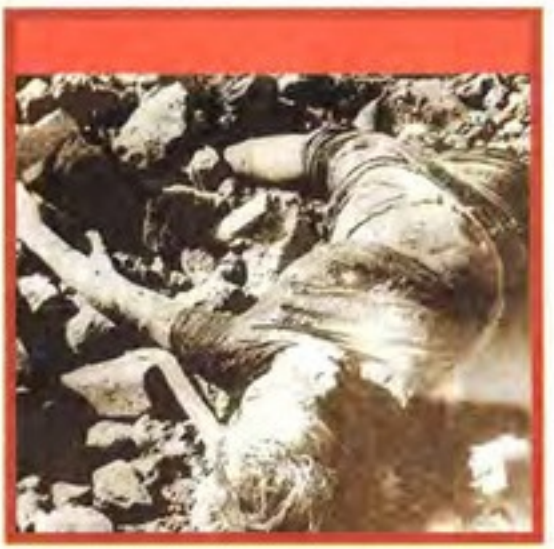

বইয়ের দলিলগুলো নিশ্চিত করেছে যে, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন– প্রত্যেকে নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষা দিতে গিয়ে বাংলাদেশ যুদ্ধে নিজেদের অবস্থান তৈরি করেছে। বাংলাদেশের পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান তৈরিতে উল্লেখযোগ্য কোনো নীতিগত বা আদর্শিক কারণ অনুপস্থিত ছিল। এতে তথ্য উদঘাটিত হয়েছে যে, ওয়াটার গেট-খ্যাত সিআই'র তৎকালীন পরিচালক রিচার্ড হেলমস ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সময় ২৬ মার্চ মধ্যরাতের একটু পরে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে তথ্য প্রকাশ করেন যে, শেখ মুজিব যদি তথাকথিত 'প্রো-আমেরিকান' হিসেবে গণ্য না হতেন বা অন্য কথায়, স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী শক্তি যদি চীনকেন্দ্রিক হতো, তাহলে সে ক্ষেত্রের সম্ভাব্য মুক্তিযুদ্ধে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা সম্ভবত অনিবার্য।

মিজানুর রহমান খানের জন্ম ১৯৬৭ সালের ৩১ অক্টোবর। সরকারি ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে হিসাব বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেন ১৯৮৮ সালে। টানা সিকি শতাব্দী কেবলমাত্র সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গেই যুক্ত। পেশাগত কারণে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীনসহ দক্ষিণ এশিয়া ও ইউরোপ ভ্রমণ করেছেন। বাংলাদেশের সংবিধান সংস্কারের সপক্ষে জনমত গঠনে তিনি একজন প্রবক্তা। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ *সংবিধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক* (১৯৯৫) ও *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটের স্বরূপ* (২০০৩)।

১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৪ পর্যন্ত যুগান্তরের বিশেষ সংবাদদাতা/সহকারি সম্পাদক হিসেবে যুক্ত থাকার পর কিছুদিন সমকালের উপ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রথম আলোতে সহযোগী সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন ১ নভেম্বর ২০০৫।

১৯৭১ : আমেরিকার গোপন দলিল
মিজানুর রহমান খান
স্বত্ব : লেখক

তৃতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০১০
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৮

সময়
সময় ৬০৪

প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
সময় কম্পিউটার্স
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ
অধুনা প্রিন্টার্স
৫০ সুকলাল দাস লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা মাত্র

1971 : AMERICAR GOPON DALIL (1971 : Secret Documents of USA) Collected, Edited & Translated by Mizanur Rahman Khan. First Published: February Book Fair 2008, 3rd Print: April 2016 by Farid Ahmed, Somoy Prakashan, 38/2ka Banglabazar, Dhaka 1100.
Web : www.somoy.com E-mail : f.ahmed@somoy.com

Price : Tk. 500.00 Only

ISBN 984-70114-0004-5 Code : 604

নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র : 'সময় . . .' প্লাজা এ. আর (৪র্থ তলা), সড়ক ১৪ (নতুন)
ধানমন্ডি (মিরপুর রোড, সোবহানবাগ মসজিদের পাশে), ঢাকা। ফোন: ৯১১ ৬৮৮৫

অন লাইনে পাওয়া যাবে : www.rokomari.com, www.boi-mela.com

ভূমিকা

২০০৫ সালে প্রকাশিত আমেরিকার গোপন দলিল বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের ইতিহাসের কিছু ধূসর অধ্যায়ে নতুন করে আলো ফেলেছে। যেসব বিষয় আমার কাছে কৌতূহলোদ্দীপক মনে হয়েছে, তা হলো যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূমিকা। একটা দীর্ঘ সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র সাধারণভাবে শত্রু হিসেবেই চিত্রিত হয়েছে। তবে এটাও সবসময় বলা হয়েছে, নিক্সন-কিসিঞ্জার তাদের ঐতিহাসিক পাকিস্তান ঘেঁষা নীতির আলোকে বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের বিরোধীতা করলেও সে দেশের জনগণ ও সংবাদ মাধ্যম সহানুভূতিশীল ছিল। কিন্তু এভাবে বেশ কিছু মূল দলিল ও নথিপত্র অবলোকন ও পাঠের মাধ্যমে একাত্তরের 'অফিসিয়াল ওয়াশিংটনের' অন্দর মহলের দৃশ্যপট ও ঘটনাপ্রবাহ উপলব্ধির চেষ্টা আমার কাছে এক বিরল ও গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা।

ইতিহাস সম্ভবত এমনই, নাড়া দিলেই নতুন হয়ে ওঠে। দ্যুতি ছড়ায় নতুন মাত্রায়। এসব মূল দলিল থেকে বাংলাদেশ ও বাঙালির অনেক কিছুই গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। সবচেয়ে বড় সত্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এ দেশের মাটি ও মানুষের আবেগ এবং অনুভূতির মধ্য দিয়ে নিবিড়ভাবে বিকশিত হয়েছে। এর শুরুটা কবে কোথায় কিভাবে হয়েছিল, তা হয়তো হলফ করে কারো পক্ষে বলা কঠিন।

বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় কোনো অর্থেই দুর্ঘটনা কিংবা কোনো নাটকীয় সিদ্ধান্তের পর্ব ছিল না। কারো মনে এমন ধারণা হয়তো এখনো প্রবল যে, ভারত তার জাতীয় স্বার্থে খণ্ডিত পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছে। কারো মতে ১৯৪৭এর আগ থেকেই, কেউ বলেন, ষাটের দশকে ভারতীয়রা নানা কূটকৌশলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের আন্দোলনকে শানিত করতে নেপথ্যে ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের আলোচ্য গোপন দলিলগুলো থেকে এর সপক্ষে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। বরং ১৯৬৯ থেকে একাত্তরের মার্চের আগ পর্যন্ত সিআইএ কিংবা স্টেট ডিপার্টমেন্টের মূল্যায়ন বা সমীক্ষাধর্মী রিপোর্টে অভিন্ন বক্তব্য এসেছে যে, অখণ্ড পাকিস্তানের অস্তিত্ব দিল্লি ও ওয়াশিংটনের স্বার্থের পরিপূরক বিবেচিত হয়েছে। আবার এ কথাও ঠিক যে, ভারত একাত্তরে ওয়াশিংটনের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তারা কোনো পর্যায়ে এমন ধারণা স্পষ্ট করেনি যে, পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করা ভারতীয় স্বার্থের জন্য জরুরি। ভারত পাকিস্তানের অখণ্ডতা কেন চেয়েছে, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিভিন্নভাবে এসেছে। তবে তা কখনো সিআইএ-র রিপোর্টে, কখনো কিসিঞ্জারের জবানিতে। আমেরিকার গোপন

দলিল থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও মূল্যায়ন, আমাকে যেসব কারণে আন্দোলিত করেছে তা সংক্ষেপে এ রকম :

১. যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন– প্রত্যেকে নিজ নিজ দেশের জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষা দিতে গিয়ে বাংলাদেশ যুদ্ধে নিজেদের অবস্থান তৈরি করেছে। বাংলাদেশের পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান তৈরিতে উল্লেখযোগ্য কোনো নীতিগত বা আদর্শিক কারণ অনুপস্থিত ছিল।

২. নিক্সন প্রশাসন বলতে যা বুঝায় ওইসময় তা ছিল দারুণভাবে বিভক্ত। বিশেষ করে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের একটি বড় অংশ পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বনে নারাজ ছিল। পাক সেনাদের বর্বরতার নিন্দা জানাতে নিক্সন-কিসিঞ্জার ব্যর্থ হলেও ঢাকার মার্কিন মিশন রীতিমতো বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ঢাকার তৎকালীন কনসাল জেনারেল অর্চার ব্লাড এপর্বের অনন্য রূপকার। সুতরাং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধী শক্তি হিসেবে 'যুক্তরাষ্ট্রকে' চিহ্নিত করা দুরূহ। বরং নিক্সন-কিসিঞ্জার জুটিকে দায়ী করাই অধিকতর সঙ্গত। তবে চমকপ্রদ এই তথ্য মনে রাখতে হবে যে, নিক্সন ও কিসিঞ্জারও কিন্তু কখনো কখনো দোদুল্যমান ছিলেন এবং তা গোড়া থেকেই। মুজিব যথাসম্ভব সাংবিধানিক চৌহদ্দির মধ্যে থাকবেন, একান্ত না পারলে স্বাধীনতার দিকে যাবেন, আর সে ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে না, এমন একটা বোঝাপড়ায় মুজিব, নিক্সন ও কিসিঞ্জারের আগাম আপস রফার ইঙ্গিত লক্ষণীয়।

৩. মুজিব যদি তথাকথিত 'প্রো-আমেরিকান' হিসেবে গণ্য না হতেন বা অন্য কথায়, স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী শক্তি যদি চীনকেন্দ্রিক হতো, তাহলে সে ক্ষেত্রের সম্ভাব্য মুক্তিযুদ্ধে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধীতা সম্ভবত ছিল অনিবার্য।

৪. বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধশালী ও স্থিতিশীল দেশে পরিণত হবে, এমন ভবিষ্যদ্বাণী তৎকালীন মার্কিন নীতি নির্ধারক মহল থেকে একেবারেই উচ্চারিত হয়নি বলা যায়। নিক্সন, কিসিঞ্জার, তৎকালীন অর্থমন্ত্রী কোনালি, পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড– এই চরিত্রগুলোর কাছ থেকে নেতিবাচক মন্তব্যই এসেছে।

৫. স্নায়ুযুদ্ধের পটভূমি এবং চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে ইয়াহিয়ার ভূমিকার প্রতি কৃতজ্ঞতাজনিত কারণেও যেন নিক্সন-কিসিঞ্জার অনেকটা ব্যক্তিগতভাবে পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করেছেন। তারা দু'জনেই গোড়া থেকে জানতেন, দক্ষিণ এশিয়া সংকটের পরিণতি যা-ই ঘটুক না কেন, যুক্তরাষ্ট্রকে সরকারিভাবে যুদ্ধে জড়ানো সম্ভব হবে না। কিন্তু তারা কেউ এই দুর্বলতা প্রকাশ করেননি। সত্যিকার অর্থেই, তাদের স্বীকৃতমতে পাকিস্তানের পক্ষে 'সাজানো যুদ্ধের মহড়া' দিয়েছেন।

৬. বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠানোর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য পশ্চিম পাকিস্তানকে বাঁচানো ছিল বলেই প্রতীয়মান হয়। নিক্সন ও কিসিঞ্জারের সন্দেহ ছিল, ভারত সুযোগ পেলে অন্তত পাক-অধিকৃত কাশ্মীর দখল করে নেবে। গোয়েন্দা সূত্রে ভারতের কোনো এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মন্তব্য ছিল, সুযোগ পেলে তারা পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধিতার

ইস্যুটি চিরকালের জন্য ফয়সালা করে নেবেন। সেকারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিশ্চিত হওয়ার পরে নিক্সন, কিসিঞ্জার কিংবা ভুট্টোর তরফে তেমন কোন হতাশাব্যঞ্জক মন্তব্য প্রকাশিত দলিলে অনুপস্থিত । পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষা পাওয়ায় তারা বরং পরস্পরকে মোবারকবাদ জানিয়েছেন। ভারতের যুদ্ধবিরতি ঘোষণার আগ পর্যন্ত নিক্সন ও কিসিঞ্জারের রুদ্ধশ্বাস সংলাপগুলো এই সাক্ষ্য বহন করে যে, ঢাকার পতন নিয়ে নয়, ডিসেম্বরের দিনগুলোতে পশ্চিম পাকিস্তানকে বাঁচানো ছিল তাদের পরম আকাঙ্ক্ষা।

৭. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বহুল আলোচিত মৈত্রী চুক্তির মডেল তৈরি হয় মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসেই । আগস্ট মাসে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি সইয়ের পর ভারত চেয়েছে বাংলাদেশও এমন একটি চুক্তি সই করুক। সম্ভবত সে কারণেই স্বাধীনতার স্বীকৃতিদানের শর্তে সোভিয়েতকে বাংলাদেশের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তির পরামর্শ দেয় ভারত।

৮. মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহ ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান সুরক্ষায় বিরাট ভূমিকা পালন করেছে– কমবেশি এমন ধারণার বিপরীতে বরং এই সত্য উদ্ভাসিত যে, তারা কার্যত কেউ যথাসময়ে পাকিস্তানকে সমরাস্ত্র সরবরাহের ঝুঁকি নেয়নি। যুক্তরাষ্ট্র নিজেও কিন্তু কংগ্রেসের আপত্তির দোহাই দিয়ে পাকিস্তানকে কার্যকর অর্থে অস্ত্র সরবরাহ দিতে পারেনি বা দেয়নি।

৯. পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রশ্নে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, নিক্সন-কিসিঞ্জারসহ তাদের প্রশাসনের সব মহল থেকে এই ইস্যুতে অভিন্ন উদ্বেগ ছিল। বিশ্ব জনমতের চাপ থাকার পাশাপাশি তার অন্যতম কারণ হয়তো এটা ছিল যে, নিক্সন ও ইয়াহিয়া শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশায় ছিলেন, একটা রাজনৈতিক আপস হবে। আর সেক্ষেত্রে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে মুজিবই তুরুপের তাস।

১০. বাংলাদেশ যাতে কোনোভাবেই বামপন্থিদের প্রভাব বাড়তে না পারে, সে লক্ষে দিল্লি-ওয়াশিংটনের সংবেদনশীলতা লক্ষণীয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রলম্বিত যাতে না হয়, সে ব্যাপারে ভারতের গরজ ও তাড়না ছিল সবচেয়ে বেশি। এমনটা বলা সম্ভবত অত্যুক্তি হবে না যে, মুক্তিযুদ্ধের কোনো এক পর্যায়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব কার্যকরভাবে আওয়ামী লীগের হাতছাড়া হয়ে গেলে, ভারতের অবস্থান নাটকীয়ভাবে বদলে যাওয়া সম্ভব ছিল। দিল্লি অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে সম্ভাব্য এ ধরনের পরিস্থিতিতে ওয়াশিংটনের সঙ্গে হাত মেলানোর পথ যেন খোলা রেখেছিল।

১১. খন্দকার মোশতাক আহমেদ ও মাহবুব আলম চাষীর কলকাতার মার্কিন মিশনের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ এবং তারা মুজিবকে বাদ দিয়ে কনফেডারেশন চেয়েছিলেন মর্মে যে ধারণা সাধারণভাবে কোন কোন মহলের রয়েছে, তা প্রকাশিত দলিল কিন্তু সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত করেনি। এছাড়া এই যোগাযোগ এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা পাকিস্তানি শাসকদের পরিচালিত ছিল বলেও প্রকাশিত দলিল সমর্থন করে না। স্বয়ং ইয়াহিয়াও এই প্রক্রিয়ার সাফল্য নিয়ে কখনও খুব বেশি উদগ্রীব ছিলেন

বলেও প্রমাণ মিলছে না। বরং বলা চলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মোশতাকই ছিলেন এর উদ্যোক্তা। তিনি তার এই গোপন মিশন প্রবাসী সরকারের মন্ত্রিসভায় অনুমোদন করে নেননি। তবে তিনি স্বশরীরে নন, দৃশ্যত কাজী আবদুল কাইউমকে এ প্রক্রিয়ায় যুক্ত রাখেন। আবার এও সত্য যে, গোপন সংলাপের প্রতিটি পর্বের অভিন্ন অবস্থান ছিল- রাজনৈতিক আপস হতে পারে তবে তা মুজিবের সম্মতিক্রমে।

১২. হিন্দুদের ওপর বাড়তি বর্বরতার অন্যতম কারণ শুধু যে পশ্চিম পাকিস্তানিদের একটা সাধারণ ভারতবিরোধী মনোভাবের ধারাবাহিকতা তাই নয়। সম্ভবত এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এই কারণ যে, পূর্ব পাকিস্তানে মোতায়েনকৃত সৈন্যদের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল পাঞ্জাবি। আর পাঞ্জাবিরা কিনা 'ঐতিহ্যগতভাবে হিন্দুবিদ্বেষী।'

এই বইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ইতিহাস বিভাগ কর্তৃক ডিক্লাসিফাইড বা অবমুক্তকৃত দলিল বাছাই করতে গিয়ে এর আগে প্রকাশিত দলিল ও নথিপত্রের যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেদিকে আমি যথাসম্ভব সতর্ক থাকার চেষ্টা করেছি। অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ দলিল এবারই প্রথম আলোর মুখ দেখল। ইতিহাসের পাঠ আমার কাছে ছোট গল্পের সুবিদিত সংজ্ঞার মতো। শেষ হয়েও হলো না শেষ। নির্বাচিত দলিলের ভিত্তিতে বাংলাদেশের জন্মলগ্নের যে চিত্র এই বইয়ে ফুটে উঠেছে তা অবশ্যই আংশিক, অসম্পূর্ণ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাঠকের কাছে পরম্পরাবিহীন মনে হতে পারে। বইটি সাধারণ পাঠক ও গবেষকদের আরো জানতে উৎসাহিত করলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করবো।

সমকাল-এ থাকাকালে এ বইয়ের প্রথম অধ্যায় প্রকাশিত হয়। ৬৪ পর্বে প্রকাশিত ধারাবাহিকটি ছিল মূলত আমার প্রতি যুগান্তর ও সমকালের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক গোলাম সারওয়ারের অকৃপণ স্নেহের দান। আমি তাঁর কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

২০০৫ সালের ডিসেম্বরে প্রথম আলো-তে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় অধ্যায়। ম্যাগসেসে বিজয়ী প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান তাঁর সংগৃহীত মূল্যবান গ্রন্থরাজি আমাকে ধার দিয়ে ১৬ পর্বের ধারাবাহিক রচনায় সহায়তা দিয়েছেন। তাঁকে অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

সময় প্রকাশন-এর বিদ্যোৎসাহী প্রকাশক ফরিদ আহমেদ বইটি প্রকাশে যে অনুপম আগ্রহ দেখিয়েছেন তার তুলনা নেই। তাঁকে ধন্যবাদ।

বইটি প্রকাশে আরো যাদের সহযোগিতা পেয়েছি তারা হলেন আজহার শাকিল ও জুলফিকার হোসেন। আর সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ঋণ আমার পরিবারের কাছে। আমার স্ত্রী আনজিনা খানম ও সন্তানদের বঞ্চনা-বরণ আমাকে যথারীতি এ কাজ সম্পাদনেও উৎসাহিত করেছে।

মিজানুর রহমান খান

সূচিপত্র

ক্রমিক	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়		
১	ভুট্টোর গোপন ইচ্ছা : বিলম্বিত মার্কিন স্বীকৃতি	১৭
২	মস্কো সফরের আগেই মুজিব বন্ধুত্ব চান ওয়াশিংটনের	২১
৩	মুজিব বাংলাদেশের জনক : সিআইএ	২৬
৪	বাংলাদেশ কারো তাঁবেদার হবে না : মুজিব	৩১
৫	বাংলাদেশের জন্ম আমেরিকাই দেখেছে সর্বাগ্রে	৩৬
৬	ডিসেম্বরেও অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে রাশিয়া!	৪১
৭	নিক্সন ও কিসিঞ্জারের 'সাজানো যুদ্ধের মহড়া'	৪৭
৮	ভারতীয় নিপীড়ন হবে নিকৃষ্ট : নিক্সন	৫২
৯	ফেব্রুয়ারিতেই স্বাধীনতা ঘোষণার সিদ্ধান্ত	৫৭
১০	সামরিক চুক্তি ও একটি ঝগড়ার কাহিনী	৬১
১১	ফেব্রুয়ারিতে মুজিব যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ১০০ কোটি ডলার চান	৬৫
১২	শয়তান চীনারাও চায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা : ইয়াহিয়া	৬৯
১৩	দ্রুত বাগে আনতে ২৫ মার্চ	৭৩
১৪	মুজিব স্বাধীনতার ঘোষক : সিআইএ পরিচালক	৭৮
১৫	মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকার নেপথ্যে	৮১
১৬	মুজিববিহীন কনফেডারেশনের স্বপ্নও দেখেছিলেন ভুট্টো?	৮৫
১৭	ভুট্টো এক ভয়ঙ্কর বেজন্মা : নিক্সন	৯০
১৮	আমেরিকা চায় ঢাকা-দিল্লি তিক্ততা : ইন্দিরা	৯৬
১৯	ইন্দিরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাননি	১০০
২০	মৃত মুজিব বেশি ভয়ঙ্কর	১০৪
২১	চীন বাংলাদেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে	১০৭
২২	পিকিং যুদ্ধে জড়ালে ওয়াশিংটনকে কাছে পেত দিল্লি	১১১

মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ট্রাস্ট
Liberation War eArchive Trust
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হোক উন্মুক্ত

ক্রমিক	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
২৩	ভারত ভাঙনের প্রথম পদক্ষেপ বাংলাদেশ	১১৫
২৪	ঢাকায় ভারতপন্থি সরকারই পশ্চিমা স্বার্থের রক্ষাকবচ	১২০
২৫	বাংলাদেশের বিজয়লগ্নে কাশ্মীর নিয়ে দরকষাকষি	১২৪
২৬	নিক্সনের জন্য কাশ্মীর পেল পাকিস্তান	১২৯
২৭	৭ মার্চের ভাষণ শুনতে ওয়াশিংটনের রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা	১৩৩
২৮	মুজিব নিয়েছিলেন গান্ধীর পথ : কিসিঞ্জার	১৩৮
২৯	মোশতাকের গোপন মিশনের চাঞ্চল্যকর বৃত্তান্ত	১৪২
৩০	মোশতাকের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান	১৪৫
৩১	ইয়াহিয়া-মোশতাক মধ্যস্থতায় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব	১৪৯
৩২	ভারতের সম্মতিতে সংলাপে রাজি ছিলেন নজরুল	১৫৩
৩৩	মুজিবকে বাদ দিয়ে সংলাপে পীড়াপীড়ি	১৫৬
৩৪	পাকিস্তানকে হতাশ করেছিল রিয়াদ-আম্মান-তেহরান	১৬০
৩৫	ইয়াহিয়ার আত্মসমর্পণ নিয়ে চৌ-কিসিঞ্জার সংলাপ	১৬৫
৩৬	বাংলাদেশ হবে ভারতের ক্যান্সার : চৌ-কিসিঞ্জার	১৬৯
৩৭	ভারতও বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায়নি : কিসিঞ্জার	১৭৪
৩৮	স্বাধীনতার নেতৃত্ব হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা	১৭৯
৩৯	ইয়াহিয়া আগেই জানতেন যুদ্ধে পরাজয় অনিবার্য	১৮৪
৪০	মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র দিতে কোসিগিনের আশ্বাস	১৮৮
৪১	ভারতের কোনো মাস্টার প্লান ছিল না : কিসিঞ্জার	১৯২
৪২	পাকিস্তানিরা গর্দভ, ভারতীয়রা ধূর্ত : নিক্সন	১৯৬
৪৩	৮৮ আওয়ামী লীগ সাংসদকে দায়মুক্ত করেন ইয়াহিয়া	২০১
৪৪	দক্ষিণাঞ্চলের মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ কৌশলের প্রশংসা	২০৫
৪৫	লিবারেশন ফ্রন্টে যেভাবে মস্কোপন্থি কমিউনিস্ট	২১০
৪৬	ভাবতেই পারি না মুজিব মৃত : কিসিঞ্জার	২১৬
৪৭	মুজিবের মুক্তিতে কিসিঞ্জারের হস্তক্ষেপ	২২২
৪৮	মুজিবকে চ্যালেঞ্জ করবে মুক্তিযোদ্ধারাই	২২৭
৪৯	কিউবার উদ্বাস্তুদের সঙ্গে তুলনা দেন ইন্দিরা	২৩১
৫০	ইন্দিরাকে নিক্সন : পাকিস্তান ভাঙায় লাভ নেই	২৩৩
৫১	মুজিব-ইয়াহিয়া সংলাপে ভারতের সম্মতি	২৩৬
৫২	আমার দেখা অন্যতম নিষ্ঠুর অপারেশন : কিসিঞ্জার	২৩৯
৫৩	ইয়াহিয়ার মুজিব বরণে ভুট্টোর বাগড়া	২৪২
৫৪	মুজিবের ভূমিকা নিয়ে বিবৃতি চান কিসিঞ্জার	২৪৯

ক্রমিক	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৫৫	মুজিব নয়, ইন্দিরার কাছেই তালা-চাবি : ইয়াহিয়া	২৫৩
৫৬	ভুট্টো নয় ইয়াহিয়ার সঙ্গেই আপোস চেয়েছে বাঙালি	২৫৭
৫৭	মুজিব বিচ্ছিন্নতাই বেছে নিতেন	২৬২
৫৮	ভারত চেয়েছে পূর্ব পাকিস্তান হবে ভুটান	২৬৬
৫৯	সেনা প্রত্যাহারে নভেম্বরে সম্মতি ইয়াহিয়ার	২৬৯
৬০	পাকসেনাদের পঙ্গুত্ব শুরু যশোরের পতনে	২৭২
৬১	ডিসেম্বরেও নিজ নিরাপত্তায় হুমকি দেখেনি চীন	২৭৬
৬২	সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রশ্নে ইয়াহিয়া	২৮০
৬৩	সিআইএ যে কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র দেয়নি	২৮৪
৬৪	ইতিহাসের ধূসর পর্বে আলো	২৮৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

৬৫	বাংলাদেশের বিজয় দরজায় কড়া নাড়ে	২৯৩
৬৬	চীনের ভূমিকায় কিসিঞ্জারের সংশয়	২৯৭
৬৭	পশ্চিম পাকিস্তান ফ্রন্টে হামলা নিয়ে বিভ্রান্তি	৩০০
৬৮	ইয়াহিয়া-ভুট্টোর মনোভাব রহস্যঘেরা	৩০৪
৬৯	সোভিয়েত দূতের বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী	৩০৭
৭০	বাংলাদেশের ক্ষতিপূরণ কাশ্মীর!	৩১১
৭১	চীনা হুমকি ছিল কল্পনা?	৩১৪
৭২	নিক্সন-কিসিঞ্জারের 'ড্রেস রিহার্সাল'	৩১৭
৭৩	পাক অখণ্ডতা রক্ষায় রাশিয়ার ৪ শর্ত	৩২০
৭৪	ব্রেজনেভের চিঠিতে অখণ্ড পাকিস্তানের ইঙ্গিত!	৩২৩
৭৫	মার্কিন ও সোভিয়েত নৌবহরের সমরসজ্জা	৩২৬
৭৬	বাংলাদেশ জবরদখলে চীনকে অনুরোধ	৩২৯
৭৭	মস্কোর জবাবের অপেক্ষায় ওয়াশিংটন	৩৩২
৭৮	'বাংলা দেশ' এড়াতে কিসিঞ্জারের কৌশল	৩৩৫
৭৯	পশতুন সীমান্তেও আক্রমণ!	৩৩৮
৮০	সোভিয়েতের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের কৃতজ্ঞতা	৩৪১

ডকুমেন্টস্ ও আলোকচিত্র **৩৪৫**

ভুট্টোর গোপন ইচ্ছা : বিলম্বিত মার্কিন স্বীকৃতি

মার্কিন জনগণের ইচ্ছার বিপরীতে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে নিক্সন প্রশাসনের বিলম্বের অন্যতম কারণ ছিল ভুট্টোর পরিকল্পনায় পশ্চিম পাকিস্তান ও স্বাধীন বাংলাদেশের মধ্যে শিথিলতম হলেও একটি কনফেডারেশন গঠনের চেষ্টা। সদ্য প্রকাশিত আমেরিকান পেপারে এই নতুন ইঙ্গিত মিলেছে। এতদিন জানা ছিল, যুক্তরাষ্ট্র শুধু মুক্তিযুদ্ধকালেই পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে কনফেডারেশন গঠনের চেষ্টায় সহায়তা দিয়েছে। এই দলিল স্পষ্ট করেছে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার মুক্তিলাভের জন্য ভুট্টোকে নির্দিষ্টভাবে কোনো বিষয়েই কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি বা ভুট্টোও কিছু দাবি করেননি।

ওয়াশিংটনে ২৮ জুন, ২০০৫ প্রকাশিত নথি অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে লেখা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের চিঠিতে আছে, শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক চান। কিন্তু ভুট্টোকে অবশ্যই পাকিস্তানের বিভক্তি মেনে নিতে হবে। মুজিব নতুন বিভক্তিকে 'দুই ভাইয়ের মধ্যে একটা বিভাজনের' সঙ্গে তুলনা করেছেন। ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের তিন দিন পরে ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি নিক্সনকে লেখা এই পত্রে লক্ষণীয়ভাবে দেখা যাচ্ছে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী শিথিলতম কনফেডারেশন পরিকল্পনা থেকে ভুট্টোকে নিবৃত্ত করার প্রয়াসে নিক্সনের সমর্থন কামনা করেছেন। হিথ লিখেছেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান বিলম্বিত হলে উপমহাদেশে পাশ্চাত্যের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর সুযোগ নিতে পারে কমিউনিস্ট ব্লক। হিথের কথায়, বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানে সমস্যা শুধু সময়ের। বেশি আগে স্বীকৃতি দিলে তা পশ্চিম পাকিস্তানকে ক্ষুব্ধ করবে এবং ভুট্টোর কাজ আরো জটিল হবে। অন্যদিকে আমরা যদি বেশি দেরি করি তাহলে পূর্বে (বাংলাদেশে) কমিউনিস্ট দেশগুলোর প্রভাব আমাদের চেয়ে প্রাধান্য পাবে এবং তাদের মিত্রদের অবস্থান শক্তিশালী হবে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের বাস্তবতা ভুট্টো যাতে মেনে নেন, সেজন্য আপনার যে কোনো সাহায্য বিরাট উপকারে আসবে। তাঁর (ভুট্টো) সঙ্গে আমার যোগাযোগ রয়েছে এবং আমি জানিয়ে দিয়েছি, মুজিবের সঙ্গে আমার আলোচনায় তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে কোনো আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক বজায় রাখার সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন। কিন্তু আমি জানি, আপনার (নিক্সন) মতামত ভুট্টো এবং তার সরকারের কাছে অত্যধিক গুরুত্ব বহন করে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এই চিঠিতে বঙ্গবন্ধুর লন্ডন সফর সম্পর্কে লিখেছেন, 'লন্ডনে মুজিবের আগমন ছিল অপ্রত্যাশিত। তাঁকে বহনকারী বিমানটি যখন লন্ডন থেকে মাত্র ১ ঘণ্টার দূরত্বে, তখন আমরা ইসলামাবাদ থেকে বার্তা পাই, তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। পরে তিনি (মুজিব) আমাকে বলেছেন, তিনি পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষকে বলেছেন, তাঁকে ঢাকায় পাঠাতে অথবা রেডক্রস বা জাতিসংঘের কাছে হস্তান্তর করতে। ভুট্টোর তা মনঃপূত হয়নি। তিনি নিজেই তেহরান যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং শেষ পর্যন্ত লন্ডনে আসতে রাজি হন। আমি ঢাকায় যেতে তাঁকে একটি বিমানের ব্যবস্থা করি। এটা ছিল তাঁরই পছন্দ যে, তাঁকে যেন ভারতীয় বিমানে দিল্লিতে অবতরণ করতে না হয়। মুজিব আমাকে আরো বলেন, বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের যে কোনোই সুযোগ নেই, তা আমি ভুট্টোকে মুক্তিলাভের আগেই বলেছি।

পাকিস্তানে নিযুক্ত তৎকালীন মার্কিন দূত ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে ৪ পৃষ্ঠার এক টেলিগ্রাম বার্তায় উল্লেখ করেন, ভুট্টো আমাকে কিছুক্ষণ আগেই জানিয়েছেন, আজ ৩ জানুয়ারি রাওয়ালপিন্ডি কারাগার থেকে শেখ মুজিবকে নিঃশর্ত মুক্তিদানের ঘোষণা দিতে যাচ্ছেন। তিনি আমাকে জানালেন, শেখ মুজিবের এই মুক্তি কোনো প্রতিশ্রুতি অথবা পূর্বশর্তসাপেক্ষ নয়। চীন ও রাশিয়া মুজিবের মুক্তির পক্ষে। প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর সঙ্গে আমি তাঁর করাচির বাসভবনে সাক্ষাৎ করি। ৪৫ মিনিটের এই আলোচনায় আমি মুজিবের মুক্তি সংশ্লিষ্ট কার্যধারা ও তার প্রভাব ইত্যাদি নিয়ে জানতে চাইলে বলেন, তিনি এ নিয়ে এখনো কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসেননি। কারণ বিষয়টি নির্ভর করছে তাঁর ও শেখ মুজিবুর রহমানের আলোচনার ওপর এবং সেক্ষেত্রে মুজিবের ইচ্ছাকেই তিনি প্রাধান্য দেবেন। ভুট্টো এ প্রসঙ্গে আমাকে বলেন, পরিহাস হচ্ছে আমিও একদা এই কারাগারে এবং একই কক্ষে অন্তরীণ ছিলাম। আমি ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই ওই সেল থেকে তাঁকে মুক্ত করে একটি গেস্ট হাউজে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করি এবং এই গেস্ট হাউজে আমিও এক রাত যাপন করেছিলাম। ভুট্টো মন্তব্য করেন যে, মুজিবকে তিনি বলেন, রাওয়ালপিন্ডিতে পৌঁছার পর থেকেই তিনি একজন 'মুক্ত মানুষ'। তিনি চাইলেই পিন্ডির গেস্ট হাউজ থেকে যখন খুশি তাঁর গন্তব্যে রওনা দিতে পারেন। কিন্তু তেমনটা করলে পাকিস্তানি জনগণের সামনে ভুট্টোর ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মুজিব সেটা সর্বান্তকরণে সমর্থন করলেন। স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাছে প্রেরিত এই টেলিগ্রামে আরো উল্লেখ করা হয়, মুজিবের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের বিবরণ বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ছিল; কিন্তু অপ্রত্যাশিত ছিল না। ভুট্টো বলেন, মুজিব কার্যত সব বহিস্থ তথ্যের উৎসের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিলেন। তিনি (মুজিব) ধারণা করেন যে, যুদ্ধের একটা উল্লেখযোগ্য পর্ব শেষ হয়েছে এবং 'সম্ভবত পূর্ব পাকিস্তানের একটি অংশ ভারত দখল করে নিয়েছে।' আসলে পাকিস্তান ইতোমধ্যেই যে 'শোচনীয় পরাজয়' বরণ করেছে এর আকার-প্রকৃতি

সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই ছিল না। ভুট্টো জানান, তিনি মুজিবকে যথাসম্ভব সব ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করেন এবং তাঁর জন্য সংবাদপত্র, রেডিও এবং টেলিভিশনের ব্যবস্থা করেন। প্রেসিডেন্ট আমাকে বলেন, মুজিবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সময় তিনি কোনোভাবেই তাঁর কাছে কোনো দাবি উত্থাপন করেননি। মুজিবের কাছে কোনো প্রতিশ্রুতিই আদায় করতে চাননি। অথবা রাজনৈতিক অঙ্গনে মুজিবের প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি কোনো পূর্বশর্তও আরোপ করেননি। ভুট্টো আরো উল্লেখ করেন যে, 'মুজিব তাঁর কাছে সব ঘটনার বিবরণ ও পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে তাঁর অবস্থানের কথা জেনে তাঁর মনে হয়েছে তিনি (মুজিব) বিস্ময়ে প্রায় বিমূঢ় (অলমোস্ট স্ট্যান্ড) হয়েছেন এবং সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর দখলদারিত্বের কথা জেনে তিনি খুবই হতাশ (হাইলি ডেসপন্ডেন্ট) হন বলেই তাঁর মনে হয়েছে। ভুট্টো আরো উল্লেখ করেন, 'শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর আলোচনায় ভারতীয় দখলদারী ও কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে মুজিব বারংবার মন্তব্য করেন যে, তিনি কিছুতেই ভিক্ষা গ্রহণকারীদের একজন হবেন না।' এই টেলিগ্রামটিতে আরো বলা হয়, ২৫ মার্চ, ১৯৭১ সঙ্কটের শুরু থেকে এ পর্যন্ত সময়ে মার্কিন নীতিতে ভুট্টো শুধু সন্তোষই প্রকাশ করেননি; এই অভিমত দেন যে, পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অব্যাহতভাবে শুভেচ্ছা ও সমর্থন আশা করে। যুক্তরাষ্ট্রের নীতি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ভুট্টোর মন্তব্য : 'এপ্রিলের আগ পর্যন্ত আমি নিজেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে সাংবিধানিক পন্থায় একটি রাজনৈতিক সরকার গঠন করে রাজনৈতিক সমাধানের একটা চেষ্টা করছিলাম। তবে এক্ষেত্রে ভারতের অস্ত্রশক্তির ব্যবহার ছিল অপ্রয়োজনীয় এবং অযৌক্তিক।' ইয়াহিয়াকে রাজনৈতিক সমঝোতার দিকে নিয়ে যেতে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগ শুধু প্রশংসনীয় নয়, এটা বহুকাল স্মরণযোগ্য থাকবে। ভুট্টো আরো বলেন, ২৭ ডিসেম্বর একটি বেসামরিক সরকার গঠনের পর থেকে মার্কিন প্রয়াস ফলপ্রসূ ও মুজিবের মুক্তির মধ্য দিয়ে সেই প্রক্রিয়া আরো কার্যকর এবং পরিণামে তা 'নেগোসিয়েশনের' পথ খুলে দিতে পারত। কিন্তু ভুট্টোর কথায়, 'এই প্রচেষ্টা এ কারণেই ভণ্ডুল হয়ে গেছে যে, ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের বিভক্তি ভারত কখনো মেনে নিতে পারেনি।'

স্টেট ডিপার্টমেন্টের একাধিক নথিপত্রে এটা স্পষ্ট যে, ১৬ ডিসেম্বরে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরেও ভুট্টো একটি তথাকথিত শিথিল কনফেডারেশন গঠনে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন। ১৮ ডিসেম্বর ভুট্টো মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্সকে বলেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে একটি 'শিথিলতম প্রকৃতির কনফেডারেল লিংক' প্রতিষ্ঠার সুযোগ এখনো রয়েছে এবং তিনি সেই লক্ষ্যে উদ্যোগ নেবেন। বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক শীর্ষক ১৩ পৃষ্ঠার এক গোপন নথিতে দেখা যায়, ভুট্টো এমনকি বাংলাদেশে মার্কিন সাহায্য ও স্বীকৃতিদান প্রশ্নে রজার্সকে এই মর্মে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন যে, বাংলাদেশে মানবিক সহায়তাদানে

প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন বটে; কিন্তু তা যেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সমতুল্য হিসেবে প্রতীয়মান না হয়। এ ধরনের প্রক্রিয়া যেন তাঁর সমঝোতার প্রয়াস বিঘ্নিত না করে। এই সারসংক্ষেপে স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের বিজয়ের পরেও 'শিথিলতম কনফেডারেশন' নিয়ে নিক্সন প্রশাসনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। কারণ এই নথিতে বলা হয়, 'যখন আমরা বিশ্বাস করি যে, একটি পৃথক বাংলাদেশ একটি বাস্তবতা, তখন আমাদের অন্যরূপ আর কিছুই করা ঠিক হবে না। আগামী আরো কয়েক মাস আমাদের সতর্কতার সঙ্গে মূল্যায়ন করতে হবে যে, সাবেক পূর্ব প্রদেশ সম্পর্কে ভুট্টো কী ধরনের কৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। একই সঙ্গে বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্কের প্রকৃতি এবং নিজ ভূখণ্ডের ওপর সার্বভৌমত্বের অর্থবহ অনুশীলনে বাংলাদেশের সামর্থ্য অথবা সামর্থ্যের অভাবকেও আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে। এই দলিলে আরো বলা হয়েছে, "ভুট্টোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের নিরিখেই জানিয়ে দেয়া উচিত যে, বাংলাদেশের প্রতি পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি যেন ক্রমেই যথাসম্ভব উদাররূপ পরিগ্রহ করে এবং ভুট্টো যাতে তাঁর 'হলস্টেন ডক্ট্রিন' পরিহার করেন।"

উল্লেখ্য, ওয়াল্টার হলস্টেনের নাম অনুসারে পরিচিত এই মতবাদ ১৯৫৫ ও ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী সময় পশ্চিম জার্মানির পররাষ্ট্রনীতির মুখ্য নিয়ামক ছিল। এই মতবাদ অনুসারে পশ্চিম জার্মানি (তৎকালীন নাম ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানি) মনে করত, তারই শুধু বিশেষ অধিকার সমগ্র জার্মান জাতির প্রতিনিধিত্বে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন বাদে পূর্ব জার্মানি যেসব দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে পশ্চিম জার্মানি তাদের এড়িয়ে চলবে। ১৯৫৭ সালে এই মতবাদ প্রথম প্রয়োগ করা হয় যুগোশ্লাভিয়ায়। এটা এক চীন নীতির সঙ্গেও তুলনীয়।

মস্কো সফরের আগেই মুজিব বন্ধুত্ব চান ওয়াশিংটনের

পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে রাশিয়া ও ভারতের ভূমিকায় কৃতজ্ঞ থেকেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে ভারসাম্য সৃষ্টির উদ্যোগ নেন। আর সে কারণেই তিনি তার মস্কো সফরকে সামনে রেখে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদকে ঢাকার মার্কিন কনসাল জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের নির্দেশ দেন। নতুন প্রকাশিত মার্কিন দলিলে মুজিবের বিদেশ নীতি সচেতনতার এই দিকটি ফুটে উঠেছে। হোয়াইট হাউসের এক আলোচনার বিবরণীতেও দেখা যাচ্ছে, নিক্সন প্রশাসন এটা নিশ্চিত ছিলেন যে, মুজিবের প্রশাসন ভারত ও রাশিয়া কোনোদিকেই অপ্রয়োজনীয়ভাবে ঝুঁকবে না। এদিকে বহুল আলোচিত 'তলাবিহীন ঝুড়ি' কথার প্রবর্তক কিসিঞ্জার কর্তৃক বাংলাদেশ সম্পর্কে আরো নিকৃষ্ট মন্তব্য করার প্রমাণ মিলেছে। একাত্তর সালের ৪ জুন নিক্সনের সঙ্গে আলোচনায় কিসিঞ্জার বলেন, পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হলেও এটি হবে একটি নোংরা স্থান। এই তথ্য জানা গেল এই প্রথম। ১৯৭২ সালের ১৯ জানুয়ারি তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে হোয়াইট হাউসের সিচুয়েশন কক্ষে এক উর্ধ্বতন রিভিউ গ্রুপের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের ক্রিস্টফার ভেন হোলেন বলেন, "প্রেসিডেন্টের চীন সফরের পরেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া হলে কিছুটা ইতিবাচক সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। আমরা মনে করি না বাংলাদেশ ভারত অথবা সোভিয়েতের সঙ্গে 'ওভার এক্সক্লুসিভ' সম্পর্ক চাইবে। আমরা যদি অবশিষ্ট বিশ্বের দিকে তাকাতে মুজিবের জন্য একটি জানালা খুলে দেই তাহলে দক্ষিণ এশিয়ায় বৃহত্তর স্থিতিশীলতা অর্জনে আমাদের স্বার্থের সহায়ক হতে পারে।"

বাংলাদেশের বিজয় লাভের একদিন পর ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১ মার্কিন ব্যুরো অব ইন্টেলিজেন্স অব রিসার্চ বাংলাদেশের নেতৃত্ব সম্পর্কে চার পৃষ্ঠার যে দলিলটি তৈরি করে তার সূচনাতেই বলা হয়– বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সরকারের গঠন কিরূপ হবে তা অনেকাংশে নির্ভর করছে শেখ মুজিবের উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতির ওপর। মুজিবকে যদি কারাগার থেকে মুক্তি এবং তাকে সরকার গঠনের সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্যই আসবে আওয়ামী লীগ থেকে। অন্যথায় নতুন সরকারটি হতে পারে আওয়ামী লীগ এবং চার মাস আগে সংগঠিত বাংলাদেশ কনসালটেটিভ কমিটির উদার বামপন্থী এবং খুব সম্ভব বিশিষ্ট মুক্তিবাহিনী

অধিনায়কদের সমন্বয়ে একটি কোয়ালিশন। রিপোর্ট মতে প্রবাসী সরকারের মন্ত্রিসভা সোভিয়েতপন্থী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নিয়ে গঠিত ঐ কমিটি আসলে একটি ভারতীয় উদ্যোগ। এই রিপোর্টে বলা হয়– মুজিব নিজেকে ব্রিটিশ স্টাইলের সমাজতন্ত্রী এবং পূর্ব বাংলা স্বায়ত্তশাসন ছাড়া আর সব কিছুতেই মডারেট হিসেবে গণ্য করেন। মুজিবের অনুপস্থিতিতে তাজউদ্দিন এবং মুশতাক আহমেদের নেতৃত্বে উপদলীয় কোন্দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে।

মস্কো সফরের প্রাক্কালে

ঢাকার মার্কিন কনসাল জেনারেল স্পিভাক ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ এক টেলিগ্রাম বার্তায় উল্লেখ করেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামাদ আজাদ জানালেন, মস্কো সফরের আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এটা জানার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন যে, বাংলাদেশ প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মনোভাবটি কী? যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের বন্ধুত্বের বাতাবরণে এখনো তারা বাংলাদেশের স্বার্থকে খাটো করে দেখার প্রয়াস পাচ্ছে কি না? যদি যুক্তরাষ্ট্র সরকার সে দেশের বিশিষ্ট কংগ্রেসম্যান সিনেটর সংবাদপত্র ও জনসাধারণের মনোভাব বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে উৎসাহিত হয় তাহলে তা গণ্য হতে পারে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য আরেকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। এই বিষয়ও প্রধানমন্ত্রী মুজিব জানতে আগ্রহী। সামাদ আরো বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো উল্লেখযোগ্য বিশ্বশক্তির সঙ্গে আলোচনা শুরুর আগ মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী মুজিব আপনাদের সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করতে চান। কারণ তিনি আসলে সচেতন রয়েছেন যে, এই ধরনের আলোচনা হয়তো অন্তত একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করতে পারে। আর সে কারণে বিশ্বের আরেক পরাশক্তির মনে যাতে কোনো অজ্ঞতাপ্রসূত বা ভ্রান্ত আশঙ্কায় ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়। সামাদ আরো নির্দিষ্ট করে বলেন, আমি একান্তভাবেই এটা আশা করি যে, ২৯ ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে মস্কোর উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার ঢাকা ত্যাগের আগেই ওয়াশিংটনের তরফে যেন ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়। তিনি আমাকে বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এই মনোভাব যেন অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ওয়াশিংটনে পৌঁছে দেওয়া হয়।

এই পর্যায়ে টেলিগ্রামটিতে স্পিভাক তার মন্তব্য জুড়ে দেন, 'আমি বিশ্বাস করি, সামাদ আমার কাছে যে ব্যাকুলতা উপস্থাপন করেছেন তা বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।' সোভিয়েতরা যদিও অব্যাহতভাবে বাংলাদেশের ওপরে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। ঢাকায় তাদের বহুমুখী তৎপরতা চলছে। এমনকি মস্কো সফরকালে কোনো নির্দিষ্ট দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তাব মেনে নিতে চাপও প্রয়োগ করা হতে পারে। আর দৃশ্যত সে কারণেই মুজিব জানতে চেয়েছেন, ভারসাম্যের অপরপ্রান্তে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে তিনি কতটা কী আশা

করতে পারেন। স্পিভাক এ পর্যায়ে নিক্সন প্রশাসনের পাকিস্তানপন্থি অবস্থানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে যেন তার নিজেরও চাপা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। 'বাংলাদেশের কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে যে, সে বাংলাদেশের সঙ্গে অবন্ধুসুলভ, আলোচনায় অনাগ্রহী, পাকিস্তানের প্রতি ভয়ানক পক্ষপাতদুষ্ট এবং ভারতের প্রতি বৈরী। অন্যদিকে এখানে এক বিশাল জনপ্রিয় মনোভাব কাজ করছে যে, আমেরিকার জনসাধারণ বাংলাদেশের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছে এবং দেশটি যে দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়েছে তার প্রতি সহানুভূতিশীল। আমি বিশ্বাস করি, সামাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আমাদের জাতীয় স্বার্থেই সম্পূর্ণ ও মুক্তভাবে সাড়া দেওয়া উচিত। প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স যদিও এখন চীনে অবস্থান করছেন, তবু আমি দৃঢ়তার সঙ্গে এই আবেদনই জানাতে চাই যে, 'মস্কোতে রওয়ানা দেওয়ার আগে মুজিব আমাদের কাছে যে আশ্বাস আশা করছেন তা যেন আমরা সর্বতোভাবে পূরণের চেষ্টা করি'। কিন্তু স্পিভাকের এই আর্জি কাজে আসেনি। ওয়াশিংটন থেকে ফিরতি বার্তায় তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এখনো পর্যন্ত মুজিবকে কিছুই বলার নেই।

মুজিবের মুক্তির জন্য আরজি

৩ জানুয়ারি, ১৯৭২ স্পিভাকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদের বৈঠকের মূল প্রতিপাদ্য ছিল মুজিবের মুক্তি। এই টেলিগ্রামে বলা হয়, বাঙালিদের স্বাধীনতা অর্জনে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের বর্তমান ভূমিকাকে সামাদ আজাদ বৈরিতাপূর্ণ এবং সে কারণেই বাংলাদেশ ব্যথিত বলে বর্ণনা করেন। সামাদ বলেন, এই মুহূর্তে শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকায় উপস্থিতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এ প্রসঙ্গে তিনি প্রশাসনিক জটিলতা ও রাজনৈতিক মতভিন্নতার সমস্যা ছাড়াও সুনির্দিষ্টভাবে বিভিন্ন বাহিনীর হাতে থাকা অস্ত্র উদ্ধার এবং তাদের কোনো কোনো অংশের রাজনৈতিক প্রভাব নিরসনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। সর্বোপরি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে পুনর্গঠন ও সরকার পরিচালনার মতো দুরূহ কাজ সম্পাদনে বাঙালিদের জাতীয় চেতনার পুনর্জীবনে শেখ মুজিবের উপস্থিতির অনিবার্যতা স্পষ্ট করেন। সামাদ বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে, এটা হবে খুবই কার্যকর যদি যুক্তরাষ্ট্র সরকার শেখ মুজিবকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে প্রেসিডেন্ট ভুট্টো ও পাকিস্তানের ওপর তাদের প্রভাব কাজে লাগায়। যুক্তরাষ্ট্র সরকার যদি এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে আবেদন জানায় তাহলে তা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতি বিরাজমান 'সন্দেহ ও বৈরিতার' অবসানে এক সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে। তিনি বলেন, আমরা মনে করি পাকিস্তানের সঙ্গে এক ধরনের সম্পর্ক রেখে আমাদের বজায় থাকবে। বহু বিষয় রয়েছে যা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। সর্বোপরি 'বাংলাদেশ উপমহাদেশের অংশ হিসেবে তার অবস্থানের ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব থেকে পালাতে পারে না।

'তিন মাসও টিকবে না'

২৩ মার্চ ঢাকার মার্কিন মিশন থেকে পাঠানো দুই পৃষ্ঠার এক টেলিগ্রাম বার্তায় যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে বাংলাদেশের সর্বশেষ মনোভাব ব্যাখ্যা করা হয়। এতে বলা হয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম বার্ষিকী সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্র-বিরোধী মনোভাব ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। এমনকি ঢাকার কনসাল জেনারেল পর্যায়ের মিশন রাখার বৈধতা প্রশ্নেও বাংলাদেশ সরকার কোনো ধরনের ব্যবস্থা নিয়ে ফেলতে পারে। ইন্দিরা ও মুজিবের যৌথ বিবৃতিতে 'উপমহাদেশের শান্তি-শৃঙ্খলা নস্যাতে অজ্ঞাত শক্তির' (প্রকারান্তরে যুক্তরাষ্ট্র) তৎপরতার কথা বলা হয়েছে। আওয়ামী লীগের শ্রমমন্ত্রী আব্দুল মান্নান যিনি সম্প্রতি মস্কো থেকে ফিরে এসেছেন, তিনি বাংলাদেশে সিআইএ ও মাওবাদী কার্যক্রমের নিন্দা করেছেন। তার আরো দাবি, মার্কিন সাংবাদিকরা তাকে বলেছেন, বাংলাদেশ তিন মাসের বেশি টিকবে না। এই মন্তব্যকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অশুভ তৎপরতার নমুনা হিসেবে চিত্রিত করেছেন। মার্কিন মিশনে কর্মরত সিনিয়র বাঙালি কর্মকর্তারা তাদের বন্ধুবান্ধব কর্তৃক ক্রমাগত এই প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছেন যে, যে সরকার তাদের দেশকে স্বীকার করে না, সেখানে তারা কিভাবে কাজ করবে? স্থানীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একটি প্রতিনিধিদল গোপনে আমাদের জানিয়েছে যে, যদি চাপ অব্যাহত থাকে তাহলে মার্চের পরে মার্কিন মিশনে কাজ করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে। মার্কিন নাগরিক ও সাংবাদিকরা জানিয়েছেন, তাদের পক্ষে এন্ট্রি ভিসা ও অবস্থানের মেয়াদ বাড়ানো ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে। সত্যি বলতে কী অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, ঢাকায় সময় খুব দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে সরকার যদি আমাদের মিশনের মর্যাদা ও কার্যক্রম হ্রাসের ঘোষণা দেয় তা হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

'বাংলাদেশ হবে আঁস্তাকুড়'

৪ জুন, ১৯৭১। সময় সকাল ৯ : ৪২-৯:৫১

নিক্সন ও কিসিঞ্জারের কথোপকথন।

কিসিঞ্জার : মি. প্রেসিডেন্ট, ইয়াহিয়াকে আমাদের রক্ষা করতে হবে।

নিক্সন : দেখুন চীনা ফ্যাক্টর ব্যতিরেকেও আমি ভারতীয়দের সাহায্য করব না। ভারতীয়রা মোটেই ভালো লোক নয়। কিটিং (দিল্লিতে নিযুক্ত তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত) তাদেরই একজন যারা ঐ দেশটিতে রাষ্ট্রদূত হিসেবে গিয়ে নিজেদের শুষে নিতে দিয়েছে। আর তিনিও এখন ভাবছেন–

কিসিঞ্জার : ওরা বেজন্মার বাচ্চা। ওরা কখনো আমাদের জন্য একটি আঙুলও তোলেনি। তাহলে আমরা কেন পূর্ব পাকিস্তানের ঝামেলায় জড়াতে যাব? আর তা ছাড়া আমি সম্পূর্ণভাবে এই পয়েন্টের সঙ্গে একমত যে, পূর্ব পাকিস্তান যদি কখনো স্বাধীন হয় তাহলে এটা পরিণত হবে এক আঁস্তাকুড়ে (সেসপুল)। এরা সংখ্যায় উন্নীত

হবে ১০০ মিলিয়নে। আর এশিয়ায় তাদের জীবন-যাপনের মান হবে নিম্নতম।

নিক্সন : ইয়াহ্

কিসিঞ্জার : সম্পদ নেই। তারা পরিণত হবে কমিউনিস্ট অনুপ্রবেশের জন্য এক উর্বর ভূমি। এবং তখন পশ্চিমবঙ্গের কারণে ভারতের ওপরই তারা চাপ সৃষ্টি করবে। ভারত এখন যা করছে তা হয়তো তাদের স্বভাবসুলভ ইডিয়োটিক আচরণ। অবশ্য তাদের মনের মধ্যে যদি এটা থাকে পূর্ব-পাকিস্তান আসলে পরিণত হবে তাদের এক ধরনের প্রটেক্টরেটে, তাহলে ভিন্ন কথা। এমন কিছু একটা তাদের মনের মধ্যে থাকতেই পারে।

নিক্সন : ওহ, তাদের মনের গহীনে যা আছে তা হলো পাকিস্তানকে ধ্বংস করা।

৮২ বছর বয়সী কিসিঞ্জার ২০০৫ সালে এক বিবৃতিতে নিক্সনের সঙ্গে আলোচনায় ভারতকে বেজম্মা ও ইন্দিরা গান্ধীকে ডাইনী বুড়ি হিসেবে মন্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, এসব মন্তব্যকে স্নায়ুযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে।

মুজিব বাংলাদেশের জনক : সিআইএ

বাংলাদেশ সম্পর্কে সিআইএ তার এক প্রতিবেদনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের জনক ও অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে বর্ণনা করেছে। তাঁর মৃত্যুর ৩১ মাস আগে তৈরি এই রিপোর্টে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে মুজিবের সম্ভাব্য বিদায় এক 'বড় দুঃখজনক ও অবিস্মরণীয় ঘটনা' হিসেবে চিহ্নিত হবে এ মর্মেও উল্লেখ করা হয়। আমেরিকার সদ্য প্রকাশিত দলিলে দেখা যাচ্ছে, ১৯৭২ সালের ২১ ডিসেম্বর প্রণীত এই গবেষণাধর্মী প্রতিবেদনে বলা হয় যে, বাঙালিরা কখনোই কারো 'তাঁবেদার বা পুতুল' হবে না। মুজিব নিশ্চিত করেছেন যে, বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরগুলো ব্যবহারে কোনো বিদেশী শক্তিকেই তিনি বিশেষ অধিকার দেবেন না।

সিআইএ রিপোর্টে বলা হয়, 'মুজিব ক্ষমতায় থাকতেও বাঙালি রাজনীতি একটা র‍্যাডিকালাইজেশনের প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করতে পারে। তবে তা সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের মতো অতটা প্রকট হবে না। বাংলাদেশের কিছু শক্তির কাছে নিখিল বাঙালির ধারণায় 'প্যান-বাঙ্গালিজম' কখনো স্লোগান হতে পারে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের ইউনিয়ন হিসেবে আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা থাকবে একেবারেই ক্ষীণ। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে স্বাধীন বাংলাদেশ বিশ্বসভায় সাধারণ ভূমিকা রাখবে এবং বাইরের কাউকেই আহত না করতে সচেষ্ট থাকবে। সোভিয়েতরা সম্ভবত আশা করছে যে, বাঙালিরা তাদের সঙ্গে সখ্য বজায় রাখবে। আর ভারত মনে করছে, চীনের সঙ্গে ওয়ার্কিং রিলেশন গড়ার চেষ্টায় বাংলাদেশের কাছে সে অগ্রাধিকার পাবে।

ভারত মহাসাগরে নয়া দিল্লি তার নৌ উপস্থিতির নিরিখে আশা করতে পারে যে, বাংলাদেশের কাছ থেকে তার বন্দরগুলো সংস্কার বা সরবরাহের সুবিধাদি লাভ করতে পারে। কিন্তু এমন কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই যে, ভারত বাংলাদেশের কাছে প্রবেশাধিকারের এমন ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে। বরং মুজিব পুনঃপুন বলেছেন যে, কোনো বিদেশী শক্তিকেই ঐ ধরনের বিশেষ সুবিধা দিতে তার আদৌ কোনো ইচ্ছা নেই।

ভারত সম্ভবত বাংলাদেশের কাছে সবচেয়ে প্রভাবশালী বিদেশী শক্তির মর্যাদা পাবে এবং উভয় দেশই একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখাকেই লাভজনক হিসেবে গণ্য করবে। কিন্তু বাংলাদেশ তাই বলে তাঁবেদার নয়। ভারতের স্বার্থ সে বিবেচনায় নেবে বটে তবে নয়া দিল্লির নিজের উল্লেখযোগ্য বিরোধপূর্ণ ইস্যু সে এড়িয়ে চলতে চাইবে

এবং এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই বাংলাদেশ স্বাধীনভাবে কাজ করবে।

বাংলাদেশের সেনাবাহিনী তার নিজস্ব অধিকারবলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মতো একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয় কিনা সেজন্য আপেক্ষা করতে হবে।

বাংলাদেশের পিতা

২০০ পৃষ্ঠার এই রিপোর্টে সিআইয়ের চোখে মুজিবের উত্থান ও মূল্যায়নটি মূর্ত হয়েছে এভাবে : যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভায় শেখ মুজিবুর রহমান নামে একজন আইনপ্রণেতা ছিলেন। মুজিব নামেই তিনি ছিলেন সমধিক পরিচিত। মুসলিম লীগের বাঙালিবিরোধী নীতির বিরোধিতায় জেল খাটলেন দুবছর। ফ্রন্ট সরকার অচিরেই ভেঙে পড়ল। কিন্তু মুজিব পার্টিতে বিকশিত হলেন। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠাতা সোহরাওয়ার্দী ও মুজিব '৫৮ এর সামরিক শাসনকালে বন্দি হন। '৬৫-তে মুজিব দলকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এই বছরে মুজিব যদিও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আইয়ুববিরোধী এক ব্যর্থ প্রচারণায় নিজকে শামিল করেন।

সিআইএর মতে, ১৯৬৬ এর ঘটনাপ্রবাহে মুজিব শুধুই একজন পূর্ব পাকিস্তানি রাজনীতিক থেকে রূপান্তরিত হলেন বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতায় এবং আওয়ামী লীগ হলো প্রভাবশালী রাজনৈতিক সংগঠন। এসব ঘটনাবলির মধ্যে রয়েছে ছয়দফা কর্মসূচি, পাকিস্তানের দুর্বল কনফেডারেশনের মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবি, কারাবরণ এবং রাষ্ট্রদ্রোহী মামলায় অভিযুক্তকরণ, '৬৯ এর গোড়ায় সংঘটিত দাঙ্গায় আইয়ুবের পতন এবং মুজিবের মুক্তি। এলো সত্তরের নির্বাচন, যাতে আওয়ামী লীগ পেল ৭৪% ভোট। এরপর একাত্তরের মার্চ থেকে ডিসেম্বরের গৃহযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধের মধ্যে মুজিব আটক হলেন। মুজিবকে প্রায় ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল। অতঃপর আসে তার মুক্তি এবং এ পর্বেই তিনি বিজয়ীর বেশে তার দেশের জনক এবং অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে ফিরে আসেন। ('Triumphantly returned, as father of his country ... its unchallenged leader.')

১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে প্রণীত এই রিপোর্টে শেখ মুজিব সরকারের একটি ক্ষয়িষ্ণু চিত্র কিছুটা হলেও অঙ্কিত হয়। বলা হয়, সহিংস অপরাধ, ক্রমবর্ধমান ছাত্র ও শ্রমিক অসন্তোষ, সরকারির ঔদাসীন্য, শক্তিধর ভারতের প্রতি সংশয় এবং আরো অনেক সমস্যা এই নতুন রাষ্ট্রকে গ্রাস করছে। আর সঙ্গতকারণেই মুজিব এর সব কিছুর জন্যই খুব বেশি অভিযুক্ত হচ্ছেন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুজিবকে সাধারণভাবে 'মডারেট' মনে করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বস্ত মুজিব ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের ঘোর বিরোধী। তিনি সাধারণভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছেন।

বাংলাদেশ সংবিধানের ফ্লোর ক্রসিং-সংক্রান্ত বিতর্কিত ৭০ অনুচ্ছেদের সংযোজনীর নেপথ্য সূত্রও পাওয়া গেল এই রিপোর্টে। বলা হয়, একটি নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মধ্যে দিয়ে তিনি আইনের শাসনের পুনরুজ্জীবনে ব্রতী হন। নতুন সংবিধান

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে একটি বিল অব রাইটস, একটি সংসদ ও মন্ত্রিসভা পদ্ধতি, একজন শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী, ন্যায়পাল এবং একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ নিশ্চিত করে। পূর্ব পাকিস্তানের সরকারগুলো দল বদলের কারণেই ছিল অস্থিতিশীলতার রোগে আক্রান্ত। এর পুনরাবৃত্তি রোধকল্পেই বাহাত্তরের সংবিধানে দলের বিরুদ্ধে ভোট দিলে স্বয়ংক্রিভাবে সংসদ সদস্যপদ খারিজ হয়ে যাওয়ার বিধান করা হয়।

বিরোধী শিবিরের অবস্থান

সিআইএ বলেছে, ১৯৭৩ সালের মার্চে সাধারণ নির্বাচন হবে। কিন্তু কোন দলটি আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে তা বলা মুশকিল। মুসলিম লীগ ও প্রতিক্রিয়াশীল ইসলামি দলগুলোর বেশিরভাগকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই বিষয়টির বর্ণনা এমনভাবে এসেছে যাতে মনে হতেই পারে সিআইএ মুজিবের এই উদ্যোগের নৈতিক সমর্থক বটে। 'কারণ তারা ধর্মীয়ভাবে পক্ষপাতদুষ্ট এবং পাকিস্তানিদের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে।' সিআইএ লিখেছে, মওলানা ভাসানীর উগ্রপন্থি ন্যাপ/বামের তেমন জোর নেই। বাঙালি কমিউনিস্টরা সংখ্যায় অল্প। সুতরাং আওয়ামী লীগের জন্য শক্ত চ্যালেঞ্জ আসতে পারে আবদুর রব ও এমএ জলিলের নেতৃত্বাধীন নয়া বাম সংগঠনগুলোর কাছ থেকে। তারা আইন-শৃঙ্খলার অব্যাহত অবনতি, দুর্নীতি, দারিদ্র্য ও ভারতের সঙ্গে অধিক ঘনিষ্ঠতাকে ইস্যুতে পরিণত করছে। মুজিবের ব্যক্তিত্ব অটল থাকলেও তিনি ও তার দল সত্তরের মতো নিরঙ্কুশ বিজয় হয়তো পাবেন না। তিনি দেশে ফিরে যে জনপ্রিয়তা প্রত্যক্ষ করেছেন, নির্বাচনে তেমন উত্তাপের অনুভব তার জন্য হবে এক কঠিন প্রত্যাশা। আওয়ামী লীগের সমর্থনে ভাটির টান এ নির্বাচনে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই প্রমাণিত হতে পারে।

মুজিবের মৃত্যু ঘটলে ...

সিআইএ লিখেছে, জাতীয় জীবনে মুজিবের গুরুত্ব এতটাই প্রবল যে, তিনি যদি অবসর, পরাজয় অথবা মৃত্যুজনিত কারণে বাংলাদেশ রাজনীতির দৃশ্যপট থেকে হারিয়ে যান, তাহলে তা হবে এক বিরাট দুঃখজনক ও অবিস্মরণীয় ঘটনা। তবে সেজন্য বিশৃঙ্খলা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটনার জের ধরে হবে না। প্রধানমন্ত্রী মুজিবের উত্তরাধিকার হিসেবে তাজউদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, আবু সাঈদ চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। সিআইএ এ পর্যায়ে মন্তব্য করেছে, যদি মুজিব-পরবর্তী বাংলাদেশ সরকার (অথবা তার নেতৃত্বাধীন) জনসমর্থন ধরে রাখতে এবং ব্যাপকভিত্তিক কোনো গুরুতর বিপর্যয় রোধে সক্ষম না হয়, তাহলে নবগঠিত সেনাবাহিনীকেই সম্ভবত আহ্বান (অথবা তারাই এগিয়ে আসবে) জানানো হবে। সামরিক বাহিনী মুজিবের প্রতি অনুগত রয়েছে এবং হয়তো তারাই তার উত্তরাধিকার হবে। আমাদের কাছে এমন কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই যাতে মনে করা যেতে পারে

সে অফিসারদের মধ্যে ভয়ানক কোনো বিরোধী মনোভাব রয়েছে। যদিও সেনাবাহিনীতে সরকারের বিরুদ্ধে কথিত ভারতপন্থি পক্ষপাতের জন্য একটা অভিযোগ রয়েছে। এমন অভিযোগ অবশ্য তারা চাকরিচ্যুতির পরেই করে থাকেন।

পাক যুদ্ধবন্দিদের বিচার

সিআইএ বলেছে, 'ভারত ছাড়া অন্য কোনো দেশের কাছে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র স্বাভাবিক কৌশলগত তাৎপর্য রয়েছে। পাকিস্তানিদের বাধ্য করতে পারে এমন কিছুই তার হাতে নেই। এমনকি যে যুদ্ধবন্দিদের বিচার তারা দেখতে চায়, তারাও এখন ভারতের নিরাপত্তা হেফাজতে। আসলে উচ্চ মার্গের তাসগুলোর বেশিরভাগই ভারতের হাতে, বাদবাকি পাকিস্তানের কাছে। বর্তমানের অচলাবস্থা কার্যকরভাবে এই দুটি দেশের মধ্যেই।' বাংলাদেশের ইচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধ অপরাধের বিচার যে মূলত পাক-ভারতের আঁতাতের কারণেই হয়নি– সিআইএর এই রিপোর্ট সেই সত্যের প্রতি আলো ফেলেছে। সিআইএ বলেছে, 'এ প্রশ্নে ভারত দৃশ্যত ঠাণ্ডা মনোভাব নিয়েছে এবং তারা ইতোমধ্যে বিচার-পরিকল্পনা পরিত্যাগে মুজিবকে পরামর্শ দিয়েছে বলেও শোনা যাচ্ছে। যদিও ভারত এখনো পর্যন্ত প্রকাশ্যে এই দাবির প্রতি মুজিবের অধিকারকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। ভারত যদি পাকিস্তানের সঙ্গে উত্তেজনা প্রশমনের স্বার্থে এই ইস্যুতে পুরোপুরি বা আংশিকভাবেও সরে দাঁড়ায়, তাহলে বাংলাদেশের পক্ষে এ নিয়ে আর তেমন কিছুই করার থাকবে না।

ভারতের তাঁবেদার নয়

সিআইএ এ পর্যায়ে উল্লেখ করে যে, ভারতের সামরিক তৎপরতার কারণেই বাংলাদেশ টিকে আছে এটা যেমন সত্য নয়, তেমনি তার কাছ থেকে বিরাট কোনো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহায়তাও কিন্তু সে পাচ্ছে না। অবশ্য নয়া দিল্লির তরফে এরকম কিছু নিশ্চিত করার মানে দাঁড়াবে বাংলাদেশ ভারতের তাঁবেদার বা পুতুল। বাঙালি তার সদ্য অর্জিত স্বাধীনতার মূল্য দেয় এবং তারা তা পুনর্বার হারাতে চায় না। তারা তাদের বিশাল হিন্দু প্রতিবেশী সম্পর্কে সন্দিগ্ধ থেকেই যাবে। (ভারতবিরোধী মনোভাব ইতোমধ্যেই চাঙ্গা হতে শুরু করেছে) দৃষ্টান্তস্বরূপ, তারা নেপালের মতো বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ভারতের ওপর নির্ভরশীল নয়। অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার হুমকিতেও তারা নিজেদের অসহায় মনে করবে না। বাঙালি এমনকি কোনো ক্রুদ্ধ বা অবন্ধুসুলভ ভারতের কাছ থেকে চাপ বা হুমকি বরদাশত করতে নারাজ। ভারত যে বাংলাদেশের সঙ্গে মৈত্রী চায় তা ১৯৭২ সালের সম্পাদিত মৈত্রী চুক্তির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত রয়েছে।

স্বাধীন বিদেশনীতি

সিআইএর আলোচ্য রিপোর্ট শুধু নয়, সদ্য প্রকাশিত মার্কিন নথিপত্রে বারংবার এ কথা

এসেছে যে, বাংলাদেশ অবশ্যই কোনো দিকে ঝুঁকে পড়তে চাইবে না। সিআইএ ঐ সময়ের অবস্থার মূল্যায়ন করেছে এভাবে : 'যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে ভারতে যে উদ্বেগ ও ঔদাসীন্য তেমনটি কিন্তু বাংলাদেশে মোটেই চোখে পড়ে না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সাহায্যের উৎস এবং মুখ্য রফতানি বাজার হিসেবে দেশটি যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপ ও জাপানের দিকে তাকিয়েছে। বাঙালিরা এটা ভবিষ্যতেও ধরে রাখতে চাইবে। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিছুটা জনঅসন্তোষ এখনো রয়ে গেছে এবং এই ভাবাবেগকে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে ব্যবহার করতে রাজনীতিকদের অনেকে আগ্রহী হতে পারেন। তবে সরকারের সঙ্গে নিজকে শামিল করবে না বলেই মনে হয়। সরকার যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমা দেশগুলোর অসন্তোষের উদ্রেক ঘটিয়ে যেমন সোভিয়েত ও ভারতের বলয়ে যাবে না, তেমনি সে সোভিয়েত বা ভারতবিরোধী কোনো ব্লকেও যাবে না। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম মুসলিম দেশ হলেও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে তার সম্পর্ক খারাপ কিংবা একেবারেই না থাকার পর্যায়ে রয়েছে। তুরস্ক ও ইরানসহ অধিকাংশ আরব দেশের সঙ্গে পাকিস্তানের দীর্ঘ ঘনিষ্ঠ ও ঐতিহ্যবাহী সম্পর্ক রয়েছে। '৭১ সালের যুদ্ধে তারা পাকিস্তানের পক্ষ নেয় ঐ বিবেচনায় যে, বাংলাদেশ হিন্দু রাষ্ট্রের সৃষ্টি। পরিস্থিতি অবশ্য ইতোমধ্যে অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। তবে মধ্যপ্রাচ্যের উল্লেখযোগ্য শক্তিগুলোর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রশ্নই ওঠে না।

বাংলাদেশ কারো তাঁবেদার হবে না : মুজিব

নিক্সনের অর্থমন্ত্রী জন বি. কোনালিকে শেখ মুজিবুর রহমান তথ্য দেন যে, পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকাকালে একাত্তরের ডিসেম্বর ও বাহাত্তরের জানুয়ারিতে 'সমঝোতার' জন্য ভুট্টো এসেছিলেন তার কাছে। দুবারই তিনি ভুট্টোকে সাফ জানিয়ে দেন, তিনি নিজেই যেখানে বন্দি, সেখানে তিনি তার জনগণের পক্ষে কথা বলার অধিকার রাখেন না। তিনি যুক্তি দেন, ভারতের ভূমিকায় তার মুক্তির পথ সুগম হয়েছে। কিন্তু বাঙালিই ছিনিয়ে নিয়েছে তাদের স্বাধীনতা। এক প্রশ্নের জবাবে কোনালিকে তিনি বলেন, বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ভারতসহ অনেকের কাছেই কৃতজ্ঞ থাকবে। কিন্তু চাইলেও কখনো কোনো শক্তি তাকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

নিক্সনের নির্দেশে ১৯৭২ সালের ৩ জুলাই মার্কিন অর্থমন্ত্রী কোনালি প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের সঙ্গে ঢাকায় সাক্ষাৎ করেন। ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রভাবশালী রাজনীতিক কোনালি প্রথম মন্ত্রী হন প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসনের। টেক্সাসের সফল গভর্নর হিসেবে খ্যাত জন কোনালি নিক্সন মন্ত্রিসভার প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। ১৯৬৩ সালে কেনেডি হত্যার সময় তিনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একই গাড়িতে ছিলেন। টেক্সাসের গভর্নর কোনালি এ সময় মারাত্মকভাবে আহত হন। ১৯৯৩ সালের ১৫ জুন তিনি মারা যান।

কোনালি ঢাকায় তার সফরের বিবরণ তেহরান থেকে এক গোপন টেলিগ্রামে প্রেরণ করেছিলেন স্টেট ডিপার্টমেন্টে। তার নিজের বয়ানে সেই আলোচনার বৃত্তান্ত এসেছে এভাবে : শেখ মুজিব তার বক্তব্যের শুরু থেকেই গত ১৮ মাসে বাঙালিদের ওপর বয়ে যাওয়া ঘটনার দীর্ঘ বিবরণ দেন। আমার কাছে এ প্রসঙ্গ উপস্থাপনের জন্য তিনি অন্তত চারবার দুঃখ প্রকাশ করেন। মুজিব বলেন, তিনি কারাগার থেকে বেরিয়ে দেশে ফিরে দেখেন সমস্যার পাহাড়। তিনি তাঁর জীবনের জন্য প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানান। বলেন, আমি জানি আমাকে বাঁচানোর জন্য আপনারা অনুযাচনা করেছেন এবং আমি সেজন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। (I know that you interceded to save me and I am very grateful.) তিনি বলেন, যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। অসংখ্য মানুষ হয়েছে গৃহহীন। তাদের খাদ্য ছিল না। এমন কোনো পরিবার নেই যারা কোনো না কোনোভাবে নৃশংসতার

শিকার হয়েছে। এরপর তিনি নিজের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার বিবরণ দেন এবং বলেন, সত্যি বলতে কী বাঙালিদের স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম সূচনা ঘটে ১৮৮৫ সালে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। মি. কোনালি উল্লেখ করেন, আমি তাকে এ পর্যায়ে বললাম আপনার আবেগ ও অনুভূতি আমাকেও গভীরভাবে আলোড়িত করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু সমস্যার সমাধানে তিনি এই মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর সঙ্গে কোনো যৌক্তিক আলোচনায় যেতে প্রস্তুত আছেন কি না। তিনি বললেন, তিনি রাজি আছেন বটে, তবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেয়া পর্যন্ত ভুট্টোর সঙ্গে তিনি আলোচনায় যেতে পারেন না। 'আমরা মুক্ত। আমরা কোনোভাবেই আর পাকিস্তানের অংশ নই। এটাই বাস্তবতা। তাকে অবশ্যই এটা মানতে হবে। বিশ্ব এটা মেনে নিয়েছে এবং তাকে তা স্বীকার করতে হবে।' আমি বললাম, বিরাজমান সমস্যা ও ইস্যুগুলোর মধ্যে আমরা নিজেদের জড়াতে চাই না। তবে সুনির্দিষ্টভাবে আপনি এই মুহূর্তে পাকিস্তানের সঙ্গে কোন সমস্যার সমাধান চান। আমাকে অবাক করে দিয়ে তিনি ইঙ্গিত দিলেন যে, এটা একেবারে চরম গুরুত্বপূর্ণ না হলেও বর্তমানে তিনি পাকিস্তান থেকে বাঙালিদের ফিরে আসা দেখতে আগ্রহী। তিনি বলেন, পাকিস্তানে প্রায় ২০ হাজার বাঙালি সৈন্য রয়েছে। সব মিলিয়ে তাদের দেশে পাঁচ লাখ বাঙালি রয়েছে, যাদের অনেকেই সিভিল সার্ভেন্ট ও ব্যবসায়ী। তারা এমন সব শিবিরে অবস্থান করছে যেখানে খাদ্য ও যত্নের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। অনেকে আবার নির্যাতনের শিকার। আমি বললাম, এই বাঙালিরা কি দেশে ফিরতে আগ্রহী বলে নিশ্চিত হতে পেরেছেন? তিনি জবাব দিলেন, ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কেড়ে নেয়া হয়েছে। জীবনধারণের কোনো ব্যবস্থা নেই। সৈন্যরা কারাবন্দি। আমলাদের চাকরি নেই। তারা বাঙালি, ফিরে আসার সুযোগ দিলে তারা অবশ্যই ফিরে আসবে। আমি বললাম, যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে তার কী পরিকল্পনা। প্রেস রিপোর্ট অনুযায়ী তিনি বিচার চাইছেন। মুজিব বলেন, 'আমরা অবশ্যই তাদের বিচার করব। তাদের অবশ্যই অপরাধের জন্য মূল্য দিতে হবে। হয়তো পুরো ১৫০০ জনকে নয়, সংখ্যাটি হতে পারে ৩০০, ২০০ অথবা ১০০। কিন্তু আমরা অবশ্যই কিছু বিচার দেখতে চাই। 'তারা যেহেতু এই মাটিতেই অপরাধ সংঘটিত করেছে, তাই তাদের বিচার অবশ্যই এই মাটিতে হতে হবে।' আমি তাকে বললাম, তিনি প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর সঙ্গে কথা বলতে চান কি না। তার জবাব, কারাগারে থাকাকালে ভুট্টোর সঙ্গে তিনি দুদফা কথা বলেছেন। ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে ভুট্টোকে তার কাছে পাঠানো হয় এবং যুদ্ধবন্দিদের মতো উদ্ভূত কিছু সমস্যা নিয়ে ভুট্টো তার সঙ্গে আপোস রফার উদ্যোগ নেন। জবাবে মুজিব ভুট্টোকে জানিয়ে দেন, তিনি নেগোশিয়েট করতে পারবেন না। কারণ তার সেই অবস্থানগত ক্ষমতা নেই। আর তিনি নিজেই যেখানে একজন যুদ্ধবন্দি। কোনালির বর্ণনায়, ভুট্টোকে যখন মুজিবের কাছে প্রথম পাঠানো হয় তখনও তিনি এ কথাই বলেছিলেন। দ্বিতীয়বার যখন ভুট্টোকে তার কাছে পাঠানো

[illegible] ঠিক একই কথার পুনারবৃত্তি করেন। তিনি ভুট্টোকে বলেন, আমি 'আমার [illegible]' পক্ষে কথা বলতে পারি না। কারণ তিনি নিজেই যেখানে কারাগারে এবং [illegible] বন্দি। কোনালি লিখেছেন মুজিবের সাথে আমার আলোচনা ছিল খুবই [illegible] ও প্রাণবন্ত। তার অনুভূতিও আমি বেশ অনুভব করতে পেরেছি। আমি [illegible] তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী যার সঙ্গে আমি কথা বলেছি তিনিসহ অনেকেই বিশ্বাস [illegible] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে পাকিস্তানিদের পক্ষ নিয়েছে। [illegible] মুজিবও এমনটাই ভেবে থাকবেন। তিনি বললেন, তিনিও তা-ই মনে করেন [illegible] যা হওয়ার হয়ে গেছে। অতীত অতীতই। আমি জবাবে বললাম, বিশ্বাস করুন যুক্তরাষ্ট্রে বসে আমরা কিন্তু অনুভব করতে পারিনি যে যুক্তরাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে পাকিস্তানিদের পক্ষ নিয়েছে। আমি আরও বললাম, আমি তার অনুভূতি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমি আশা করব, তিনি এই সত্য গ্রহণ করবেন যে, আমরা সত্যিই ধারণা করতে পারিনি আমরা তার বিরুদ্ধাচরণ করেছি। আমরা একটি দ্রুত অবনতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির শান্তিপূর্ণ সমাধানে আমাদের সাধ্যমতো সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। আমরা মনে করেছিলাম, আমরা যুদ্ধ এড়াতে পারব। আমরা ভেবেছিলাম যুদ্ধের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। কিন্তু আমরা ব্যর্থ হয়েছি। এটা অবশ্য ঠিক যে, আমরা একটা পারস্পরিক সমঝোতার চেষ্টায় মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলাম। পাকিস্তানিরাও কিন্তু মনে করছেন, আমরা তাদের সমর্থন দিতে সফল হয়নি। একজন মধ্যস্থতাকারীর চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়, যুদ্ধ বাধে, তখন তার অবস্থা এমন দুর্ভাগ্যজনকই হয়।

মি. কোনালি আলোচনার এ পর্যায়ে মুজিবকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আপনার কাছে বন্ধুত্ব ছাড়া আর কিছুই আশা করে না এবং আমরা আপনার মঙ্গল চাই। আমি তাকে বললাম, উপমহাদেশে তার জাতি ও অন্য কোনো দেশের উপর যুক্তরাষ্ট্র কোনোভাবেই প্রভাব বিস্তার করতে চায় না। আমরা আশা করি, এ ধরনের প্রভাব অন্য কোনো শক্তিও বিস্তার করতে চাইবে না। জবাবে তিনি বললেন, কেউ এমন কিছুর আশা করুক বা নাই করুক তারা এতে সফল হবে না। মুজিব এ পর্যায়ে বলেন, তার নিজের মুক্তিলাভে ভারত ছিল পরিত্রাণকারী। কিন্তু বাঙালিরা তাদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে এবং তারা সেই স্বাধীনতা রক্ষা করতে যাচ্ছে। তাদের কৃতজ্ঞতাবোধ থাকবে। কিন্তু তা নিশ্চয় তাদের ভারত কিংবা অন্য কারো তাঁবেদারে পরিণত করবে না। আবেগাপ্লুত মুজিব বলেন, এই বাংলার বাতাস তাদের পায়ের নিচের মাটি, পরিবেষ্টিত সমুদ্র তাদেরই ছিল। এই বাতাস, মাটি এবং সমুদ্র নিয়েই হলো বাংলাদেশ এবং তাকে রক্ষা করতে তাদের সংগ্রাম চলবে। কিন্তু তারা নিরপেক্ষ এবং নন-এলাইন্ড বা জোটনিরপেক্ষ থাকতেই বদ্ধপরিকর। তেহরান থেকে ৮ জুলাই ১৯৭২, সকাল ৭টা ৩২ মিনিটে স্টেট ডিপার্টমেন্টে প্রেরিত এই টেলিগ্রাম বার্তায় কোনালি লিখেছেন, এই পর্যায়ে আমি তাকে থামিয়ে দিলাম। বললাম, আমরা তার নিরপেক্ষ ও জোটনিরপেক্ষ

থাকার এই অভিলাসকে স্বাগত জানাই। মুজিব বললেন, আমরা বাঙালিরা কোনো মেজর পাওয়ারের কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবে সম্পৃক্ত হতে চাই না। আমাদের দেশ গঠনে আমরা আমাদের সামর্থ্যের চেয়ে বেশি কিছু করতেই প্রস্তুত। আমরা কারো সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই না। আমরা দরিদ্র। আমরা দুর্বল। মুজিব বলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে যেসব কারণে সমস্যা হয়েছে তার অন্যতম কারণ হলো পাকিস্তান তার বাজেটের ৬০ শতাংশ ব্যয় করেছে প্রতিরক্ষা খাতে। এটা এক অবিশ্বাস্য অপচয়। বাংলাদেশ ছিল এক দরিদ্র জাতি এবং নিশ্চয়ই এই বিপুল ব্যয়ভার তার পক্ষে বহন করা সম্ভব ছিল না। এটা ছিল পাকিস্তানিদের 'ক্রিমিনাল' তৎপরতা। মানুষ যেখানে গৃহহীন, ক্ষুধার্ত সেখানে সামরিক লক্ষ্যে এই অর্থ ব্যয়ের কোনো মানেই ছিল না। পাকিস্তান থেকে বাঙালিদের ফিরে আসা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তার অনেক লোক ছিল, যারা স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি অনুগত ছিল না, তারা চেয়েছিল বাড়িতে যেতে এবং পাকিস্তানের প্রতি যাদের আনুগত্য ছিল। তাদের চলে যেতে অনুমতি দেয়াই উচিত। আমি জানতে চাইলাম তিনি বিহারিদের কথা বলছেন কি না? জবাবে তিনি বলেন, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক তার দেশের প্রতি অনুগত ছিল না। তিনি আশা করেন, প্রেসিডেন্ট ভুট্টো তাদের ফিরিয়ে নেবেন। তারা যদি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি আনুগত্যহীনতা না দেখায় এবং তারা যদি আমাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে, তাহলে আমরা কিন্তু তাদের এখানে রেখে দিতেই সন্তুষ্ট থাকব। কারণ আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদে রয়েছে আমাদের বিশ্বাস।

কোনালি মন্তব্য করেন, মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় এটা স্পষ্টভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে যে, তিনি তার প্রশাসনিক সমস্যা নিয়ে সবচেয়ে বেশি সচেতন। পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙালিদের প্রত্যাবর্তনে তার প্রবল আগ্রহ থেকে আমার মনে হয়েছে তিনি ২০ হাজার সৈন্যের ফিরে আসা দেখতে চান। কারণ তারাই হবে তার সেনাবাহিনী ও পুলিশ বিভাগের নিউক্লিয়াস। তার প্রশাসনের জন্যও চাই দক্ষ সিভিল সার্ভেন্ট। আর অন্যান্য ক্ষেত্রে পেশাজীবীদের। তিনি এটা অবশ্য শক্ত ভাষায় বলেননি। তবে এর তাৎপর্য বুঝতে আমার অসুবিধা হয়নি। তিনি মেধাবী ও দক্ষ লোকবল পেতে দারুণভাবেই উদগ্রীব। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সম্পদ ও দায়-দেনা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে মুজিব বলেন, ট্রেজারিতে 'তাদের' বলে যা কিছুই থাকুক না কেন, তা এখন আমাদের। কারণ আমরাই সরকার নিয়ন্ত্রণ করছি। আমরা নির্বাচন করেছি এবং আমরাই তাতে জয়ী হয়েছি। আমরাই সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ন্ত্রণ করছি। তাই সরকারের সম্পদ আমাদের এবং এটা আমাদেরই থাকত, যদি সামরিক শাসন এবং নির্বাচনী ফলাফলকে শক্তি দিয়ে বানচাল না করার চেষ্টা চালানো হতো। মুজিব নির্দিষ্টভাবে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্য পদ লাভে মার্কিন উদ্যোগ কামনা করেন। আমি বললাম, আমরা অন্যান্য অনেক দেশের জন্য যেভাবে করেছি সেভাবে

থাকলেন। মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের একটি বৃহত্তম অংশকে বিভিন্ন সময় পর্যায়ক্রমে সেনাবাহিনী থেকে বের করে দেওয়া হলো। যখন অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেছে বিরোধী গ্রুপকে বাধ্যতামূলক চাকরি থেকে বিদায় দেওয়া হয়েছে– এই প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল দীর্ঘদিন। অভ্যুত্থান প্রথম যে করল সে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ভঙ্গ করল, না পাল্টা যারা করল তারা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করল এই প্রশ্ন আমাদের অনেকের রয়েছে। সেনাবাহিনীতে একটি Chain of Command সব সময় থাকে তাই যে জেনারেলের নের্তৃত্বে অভ্যুত্থান হয় তার প্রত্যক্ষ সহযোগীরা ছাড়া অংশগ্রহণকারী সবাই কেন দোষী হবে? যদিও সেনাবাহিনীর নিয়ম অনুযায়ী সবাই দোষী হওয়ার কথা, কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই ঘটনাগুলোর সাথে পরে যেহেতু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের সম্পর্ক রয়েছে তাই এগুলো জাতীয় পর্যায়ে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন হয়নি। যেমন– আমাদের মধ্য থেকে যাদেরকে বাধ্যতামূলক অবসর বা বহিষ্কার করা হলো এবং যিনি বা যাঁরা তা করলেন (জিয়ার আমলে) তিনি বা তাঁরা একতরফা আদৌ কতটুকু সঠিক ন্যায় বিচার করলেন এই বিষয়টি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের প্রেক্ষাপটে দেখা হয়নি।

বাংলাদেশের জন্ম আমেরিকাই দেখেছে সর্বাগ্রে

বিস্ময়করভাবে আমেরিকার গোপন দলিল আরেক নতুন ধারণা হাজির করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের আগে বাংলাদেশের জন্মই শুধু দেখেনি, নতুন রাষ্ট্রের সম্ভাব্য অভ্যুদয়ে সর্বাগ্রে স্বীকৃতি দান ও শেখ মুজিবকে কি ভাষায় অভিনন্দন জানানো হবে তারও খসড়া তারা চূড়ান্ত করেছিল।

সতের পৃষ্ঠার এই ঐতিহাসিক স্মারকটি যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রতিরক্ষা উপমন্ত্রী ডেভিড প্যাকার্ড, পররাষ্ট্র দফতরের আন্ডার সেক্রেটারি জন এন. ইরোইন, জয়েন্ট চিফ অব স্টাফের চেয়ারম্যান এডমিরাল থমাস এইচ. মুরার, সিআইএ'র পরিচালক রিচার্ড হেলমসের জন্য প্রস্তুত করা হয়। (হেলমস ১৯৬৬-৭৩ পর্বে সিআইএ-এর পরিচালক ছিলেন। ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ২০০২ সালে তিনি মারা যান। এডমিরাল মুরার '৭০-৭৪ পর্বে ঐ পদে ছিলেন। তিনি মারা যান ২০০৪ সালে।)

ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের স্টাফ সেক্রেটারি জিয়ান ডেভিস স্বাক্ষরিত আলোচ্য দলিলটিতে বলা হয়েছে, এতে বর্ণিত কনটিনজেন্সি স্টাডি এনএসএসএম ১১৮ এর জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। ৩ মার্চ বিকেল তিনটায় অনুষ্ঠেয় সিনিয়র রিভিউ গ্রুপের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই দলিলটি ১৯৬৯ সালে সিআইএ প্রণীত মার্কিন অবস্থানকেই নিশ্চিত করে যে, যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকরা ভেবেছিলেন দুটি রাষ্ট্র নয়, অবিভক্ত পাকিস্তানই দক্ষিণ এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের রক্ষাকবচ। আর ভারতও তার জাতীয় স্বার্থেই পাকিস্তানকে অবিভক্তই দেখতে চাইবে। ৩ মার্চ, ১৯৭১। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের ৪ দিন আগে তৈরি এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল, 'কনটিনজেন্সি স্টাডি অন পাকিস্তান : পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা'। এর সূচনাতে বলা হয়, '৭০ এর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দুটি মেরুকরণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আওয়ামী লীগ ভারতের সঙ্গে রিকন্সিলিয়েশনের নীতি গ্রহণ করেছে। আর বামপন্থী পিপলস পার্টি ভারতের সঙ্গে অব্যাহতভাবে বিরোধিতা চালিয়ে যাবে বলেই সংকল্পবদ্ধ। এই অবস্থায় মুজিব যেহেতু নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেছেন, তাই তার পক্ষে নমনীয় হওয়ার সম্ভাবনা কম। যদিও এখনও পর্যন্ত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বলছেন, বিচ্ছিন্নতার চেয়ে সর্বোচ্চ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনের মধ্য দিয়েই ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানে থাকা সম্ভব। কিন্তু ভুট্টো ও তার অনুসারীরা সম্ভবত কৌশলগত কারণেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন

এবং আওয়ামী লীগের কর্মসূচির ভিত্তিতে একটি দুর্বল ফেডারেল পদ্ধতি গ্রহণের চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন হতে দেয়াই উত্তম। এটা মনে করার কারণ আছে যে, ইয়াহিয়া দুই বিবদমান পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতায় আন্তরিক এবং তিনি আপোসের জন্যই এসেম্বলি স্থগিত করেছেন। পরিবর্তিত অবস্থায় মার্কিন স্বার্থ ও মার্কিন নীতির সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করে বলা হয়, আমাদের অব্যাহত অবস্থান হচ্ছে দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের চেয়ে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানই মার্কিন স্বার্থের জন্য সবচেয়ে অনুকূল। একটি স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান হবে অধিকতর নাজুক। তার অভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক স্থবিরতা ও বহিঃস্থ নাশকতা পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে অনেক প্রকট হবে। চূড়ান্তভাবে আমরা অবশ্য এটা স্বীকার করছি যে, আমাদের সামনে বাস্তবসম্মত কোনো বিকল্প নেই। ঘটনা প্রবাহের প্রতি আমাদের প্রভাবও খুবই সীমিত হতে বাধ্য। পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা যে বিশেষ সম্পর্ক রক্ষা করে আসছিলাম তা ষাটের দশকের শেষ পর্যায়ে একটা পরিণতি লাভ করেছে। বর্তমান পেক্ষাপটে আমরা শেখ মুজিব ও তার অনুসারীদের সঙ্গে আমাদের যেটুকু সম্পর্ক রয়েছে তা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার একটা সম্ভাব্য সময়সীমা ও রূপরেখাকে প্রভাবিত করতে পারি। অথবা তার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের আগ্রহের বিষয়টিকেও আমরা যাচাই করতে পারি। কিন্তু এটা ঠিক যে পূর্ব পাকিস্তানিরা যদি সত্যই তাদের দেশ স্বাধীনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে আমরা তা প্রতিহত করতে পারি না। একইভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতি বিশেষ করে ভুট্টো ও তার অনুসারীরা যদি বিচ্ছিন্নতার পথই কবুল করে নেয় তাহলেও আমরা তাদের ফেরাতে অক্ষম। দলিলে বলা হয়, আমাদের এই যোগ্যতা থাকতে হবে যে, আমাদের স্বার্থ যাতে গুরুতরভাবে বিপন্ন না হয় তা বিবেচনায় রেখে দুই স্বাধীন দেশের সঙ্গেই সন্তোষজনক সম্পর্ক বজায় রাখা। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বর্তমানে যে পররাষ্ট্রনীতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি তা নিকট ভবিষ্যতে বদলে যাবে বলে মনে হয় না। উভয় দেশই যুক্তরাষ্ট্রসহ ভারত, রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে একটা ভায়াবেল সম্পর্ক বজায় রাখতে চাইবে। তারা কার্যত যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্ব চাইবে।

এ পর্যায়ে দলিলটিতে মুজিবের নেতৃত্বাধীন স্বাধীন বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা হয়, এই দেশ গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে এবং জনগণের নিরঙ্কুশ স্বাস্থ্য ভোগ করতে পারবে। তার বড় প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক রাখবে। একই সময় দেশটি কোনো একটি শক্তির ওপর নির্ভরশীল না থেকে অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে সচেষ্ট হবে। তবে এটা ঠিক যে, ভবিষ্যতে বাংলাদেশ নামে নতুন রাষ্ট্র ক্রমবর্ধমানহারে রাজনীতির ক্ষেত্রে রেডিকালাইজেশন ও অস্থিতিশীলতা প্রত্যক্ষ করবে। দলিলটির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পূর্ব পাকিস্তানের পৃথক হওয়া অনিশ্চয়তার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য নীতির বর্ণনা করা হয়। 'এটাই হলো বর্তমান বাস্তবতা। আমরা এক্ষেত্রে তিনটি বিকল্প বিবেচনায় রাখতে পারি। প্রথমত, আমরা পাকিস্তানকে বলতে পারি আমাদের নীতি হলো পাকিস্তানের

স্বাধীনতা, ঐক্য ও অখণ্ডতাকে সমর্থন করা। আর বলা এটা, তোমার দেশ, তুমি কিভাবে তোমার সমস্যা মোকাবেলা করবে তা তোমার বিষয়। দ্বিতীয়ত, আমরা বাঙালিদের ঘনিষ্ঠ হতে পারি। তাদের এই ইঙ্গিত দিতে পারি, আমরা যখন পাকিস্তানি ঐক্যের কথা বলব তখন তোমরা মনে রাখবে আমরা স্বীকার করি যে, পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয়তাবাদীর ধারা বেগবান হচ্ছে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের নীতি ঠিক করে নিতে পারব। নতুন সরকার এলে তাকে আমরা স্বাগত জানাব। তৃতীয়ত, আমরা যখন আমাদের বর্তমান প্রকাশ্য অবস্থান রক্ষা করব তখন ঘরোয়াভাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে বলব, এক পাকিস্তান রক্ষায় মুজিবুর রহমানের সঙ্গে যথাসাধ্য আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাও। দলিলটিতে বলা হয়, সিআইএ এই তৃতীয় বিকল্প অনুসরণে নির্দিষ্টভাবে আপত্তি তুলেছে। তাই সম্ভাব্য মার্কিন অবস্থান হতে পারে প্রথম বিকল্পের ভিত্তিতে। এটা করা হলে পশ্চিম পাকিস্তান বুঝবে আমরা তাদের সঙ্গে আছি। আর বাঙালিরাও ভাববে আমরা হয়তো তাদের সঙ্গেও আছি। যদিও আমরা দৃশ্যত মুজিবের এই অবস্থানের অর্থাৎ ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের দিকেই আমাদের ঝোঁক থাকবে।

এ পর্যায়ে সিআইএ কেন তৃতীয় বিকল্পের বিরোধিতা করছে তার একটি ব্যাখ্যা দেয়া হয়। এতে বলা হয়, নির্বাচনের ফলাফল এটা নিশ্চিত করে যে, (ক) পাকিস্তান অবশ্যই দ্রুততার সঙ্গে যেদিকে যেতে পারে। ১. দমনমূলক সামরিক শাসন ২. দুই জাতির মধ্যে ভাঙন, যার মধ্যে কট্টর পশ্চিমাবিরোধী ক্ষুদ্র গোষ্ঠী থাকবে। ৩. আওয়ামী লীগের শিথিল কনফেডারেশনের প্লাটফরম থেকে একটি সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠা। দলিলে বলা হয়, এই তৃতীয় বিকল্পও দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের স্বার্থের জন্য অধিকতর স্পষ্টভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আমাদের তা সমর্থন করা উচিত। (খ) কনফেডারেশনে বিদেশনীতি ও প্রতিরক্ষা নীতি থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। ভুট্টোর কট্টোর চীনাপন্থি ও ভারতবিরোধী নীতি নিয়ন্ত্রিত হবে এবং তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। অথচ যদি দেশ দুটুকরো হয় তাহলে তার জন্য এসব সুযোগ চমৎকারভাবেই ধরা দেবে। (গ) এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কতিপয় নেতৃবৃন্দ ক্রমেই এই আশংকা করছেন যে, একটি পৃথক পশ্চিম পাকিস্তানের বামপন্থী শাসনের পরিণতি কি হবে এবং তারা একটি ঐক্যবদ্ধ দেশেই তাদের স্বার্থ নতুন করে খুঁজে পাচ্ছেন। এমনকি তারা সর্বোচ্চ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনও দিতে প্রস্তুত, বাঙালি নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যেই যেজন্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পুনর্নিশ্চয়তা চাইছেন। এই পরিস্থিতিতে আমাদের সহযোগিতা ও আশ্বাস উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সেক্ষেত্রে উদার বিদেশনীতি সংবলিত একটি সাংবিধানিক সরকারই আমরা কামনা করতে পারি। দলিলটিতে বলা হয়, যদি পূর্ব পাকিস্তানের পৃথক হওয়া আসন্ন হয়, সেক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র এই তিনটি বিকল্প ভাবতে পারে। ১. আমরা ক. ১ এ বর্ণিত ধারণার

দেওয়াতে অগ্রসর হতে পারি। ২. আমরা পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দকে জানিয়ে দিতে পারি যে, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়কে স্বাগত জানাতে আমরা প্রস্তুত। সেক্ষেত্রে আমরা তার সরকারের সঙ্গে স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখব। একই সাথে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও আমাদের যোগাযোগ থাকবে ঘনিষ্ঠ এবং যখন যেমন দরকার পড়ে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে যে, আমরা পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ করছি এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ৩. পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এটা স্বীকার করতে পারি যে, পূর্ব পাকিস্তানে নতুন সরকারের কাছ থেকে অর্থনৈতিক সহযোগিতার অনুরোধ আমরা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করব। দলিলে এ পর্যায়ে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয় : যদি পৃথক হওয়া আসন্ন হয় তাহলে তা ঘোষণার আগে আমরা উক্ত ২ নং বিকল্প অনুসরণ করতে পারি। ঘরোয়াভাবে পূর্ব পাকিস্তানি নেতাদের জানিয়ে দিতে পারি যে, আপনারা যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তাহলে আমরা আপনাদের নতুন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেব এবং সেই সরকারের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে এখন থেকেই প্রস্তুতি নেব। তবে আমরা যদি ঐ ১ নং বিকল্প অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি তাহলে বর্তমান অবস্থায় নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়ভাবে বাঙালি নেতৃবৃন্দকে আমরা ক্ষুব্ধ করে তুলব। অথচ পরিণামে আমরা তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে চাই। তার চেয়ে বরং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখাই উত্তম। তবে পূর্ব পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণার আগেই যদি মার্কিন হস্তক্ষেপ আশা করে তাহলে আমরা তাতে সাড়া দেব না। তখন তাদের বলব, পশ্চিম পাকিস্তানিরা আপনাদের ওপর মিলিটারি ক্র্যাকডাউন চালাতে পারে তা আমরা মনে করছি না। (ধরে নিতে হবে তাদের এই আশংকাই সত্যে পরিণত হবে।) আমরা অবশ্যই দৃঢ়তার সঙ্গে মার্কিন সামরিক সম্পৃক্ততা সুপারিশ নাকচ করে দেব। পূর্ব পাকিস্তান যদি প্রকাশ্যে তার স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং আমাদের স্বীকৃতি চায় সেক্ষেত্রে তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত উপায়ে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে। এই পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, বিভক্তির ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান 'সাকসেসর স্টেট'-এর মর্যাদা পাবে বলে মনে হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াই সেক্ষেত্রে সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বহাল থাকবেন। নামটাও তারা ধরে রাখতে পারবে পূর্ব পাকিস্তান হবে বাংলাদেশ।

দলিলে এ পর্যায়ে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের বিষয়টি এমন সাবলীলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যার সঙ্গে পরবর্তীকালে নিক্সন কিসিঞ্জারের ভয়ানক বৈরিতা ও বিরোধিতার কোনোই মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। দলিলটিতে প্রস্তাবিত মার্কিন পদক্ষেপ সম্পর্কে চারটি সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া গ্রন্থিত করা হয়। বলা হয়, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান কিভাবে পৃথক হয় তার ওপর আমাদের করণীয় নির্ভর করছে। বিকল্প এক : বাংলাদেশ একতরফাভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেবে এবং পাকিস্তান তা মেনে নেবে। পাকিস্তান নিজেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে তার নতুন

সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ঘোষণা দেবে। প্রস্তাবিত মার্কিন পদক্ষেপ হবে : আমরা দ্রুততার সঙ্গে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেব। পাকিস্তানের নতুন করে স্বীকৃতির প্রয়োজন হবে না। কূটনৈতিক সম্পর্ক আগের মতো বজায় থাকবে। বিকল্প দুই : পাকিস্তান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণায় প্রত্যাখ্যান করবে, কিন্তু শক্তি দ্বারা তা প্রতিহত করতে উদ্যোগী হবে না। সেক্ষেত্রে আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে কিছুটা শ্রদ্ধাশীল মনোভাব দেখাব। তবে যেসব দেশ সর্বাগ্রে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে যুক্তরাষ্ট্র হবে তার অন্যতম। আমরা এটা করতে গিয়ে দিনক্ষণ ও প্রকৃতি নির্ধারণে ব্রিটেনের সঙ্গে সলাপরামর্শ করে নেব। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে ভারত ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আমরা সেক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে একযোগে কিছু না করে বরং স্বীকৃতিদানের আগে তাদের একটু জানিয়ে দিতে পারি। বিকল্প তিন : পাকিস্তান স্বাধীনতার ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে শক্তি দ্বারা তাকে পর্যুদস্ত করবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাধর ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে এই নির্দিষ্ট বিকল্প ভাবনার সন্নিবেশ করতে গিয়ে তারা বাঙালিদের জীবনে মাত্র ২২ দিন পরেই ভয়াল কালো রাত নেমে আসার সম্ভাবনা অনুমান করতে পারেনি। তারা বলেছে, আমরা মনে করি না যে এমনটা ঘটতে পারে। আর যদি ঘটেও আমরা মনে করি না যে, পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরে সামরিক হস্তক্ষেপ বজায় রাখতে পারবে। সেক্ষেত্রে আমরা যখনই বুঝতে পারব যে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখনই আমরা তাদের স্বীকৃতি দেব। বিকল্প চার : পাকিস্তান ও বাংলাদেশ পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে পৃথক হবে। এক্ষেত্রে আমরা ত্বরিত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেব। দুপক্ষের সমঝোতায় বাংলাদেশ জন্ম নিলে প্রেসিডেন্ট দুই রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে শুভেচ্ছা জানিয়ে বার্তা প্রেরণ করবেন।

ডিসেম্বরেও অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে রাশিয়া!

বাংলাদেশের বিজয়ের মাত্র এক সপ্তাহ আগের এক দুপুর। ৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১। ১২টা ৪৪ মিনিট থেকে ১টা ২৭ মিনিট পর্যন্ত কথা বলেন প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও তার জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক সহকারী কিসিঞ্জার। এই আলোচনার ট্রান্সক্রিপশন থেকে দৃশ্যত তিনটি নতুন দিক উন্মোচিত হলো। সম্ভবত এই প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া গেল যে, পাকিস্তানকে বাঁচিয়ে রেখেই আওয়ামী লীগের সঙ্গে ইয়াহিয়ার একটি সমঝোতা প্রস্তাবে সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভ সম্মত হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান গ্রহণের নেপথ্যে ছিল একটি 'গোপন চুক্তি'। আর তার অনুঘটক ছিলেন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি। ভারত কর্তৃক পাকিস্তান আগ্রাসনের শিকার হলে যুক্তরাষ্ট্র তার পাশে দাঁড়াল এই ছিল চুক্তির মূল কথা। তৃতীয় দিকটি হলো বঙ্গোপসাগরে বহুল আলোচিত মার্কিন সপ্তম নৌবহর প্রেরণের নেপথ্যে সত্যই কৌশলগত কারণ ছিল। অথচ যুক্তরাষ্ট্র এতকাল বলে এসেছে ঐ নৌবহর এসেছিল আটকে পড়া মার্কিন নাগরিকদের উদ্ধারে। মজার ব্যাপার হলো, তথাকথিত উদ্ধার তৎপরতায় নৌবহর প্রেরণের যুক্তি যে, কেউ বিশ্বাস করবে না তা কিসিঞ্জার কথার পিঠে নিক্সন স্পষ্ট করেই বলেছিলেন। সপ্তম নৌবহর প্রেরণ নিয়ে ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ দিল্লিতে নিযুক্ত তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ কিটিং ভারতের পররাষ্ট্র সচিব টি.এন. কাউলকে যে কথা বলেছিলেন তাও বেশ এক মজার গল্পই বটে। কিটিং কাউলের সঙ্গে আলোচনার বিবরণ জানিয়ে যে টেলিগ্রাম পাঠান তাতে বিষয়টি এসেছে এভাবে : 'আমি বললাম, যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে আপনাদের পত্রপত্রিকায় কয়েকটি 'ফ্যান্টাস্টিক গল্প ছাপা হয়েছে। যদিও আমি জানি ভারতীয় সংবাদপত্র স্বাধীন। কিন্তু আমি উদ্বিগ্ন এ কারণে যে, এই গল্পগুলো সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে দেওয়াই হতো আপনাদের সরকারের উপযুক্ত কাজ।'

কাউল বললেন, তিনি কোন গল্পগুলোর কথা বলছেন? তখন আমি বললাম, ক. ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ আইএনএস খুকরি ডুবিয়ে দিয়েছে একটি মার্কিন সাবমেরিন। খ. প্রেসিডেন্ট নিক্সন বিশাখাপট্টমকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন। গ. সপ্তম নৌবহর পাঠানো হয়েছিল সৈন্য অবতরণের মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সহায়তা দিতে অথবা পূর্ব থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাকিস্তানি সৈন্যদের সরিয়ে নিতে। কিটিং বলেন, আমি কাউলকে বললাম,

ভেবেছিলাম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যে মুখপাত্রটি প্রতিদিন ব্রিফিং দেন তিনি এসব বলে ফ্যান্টাসি নাকচ করে দেবেন। কাউল সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিরক্ষা সচিব ও নৌবাহিনী প্রধানের সঙ্গে কথা বললেন। জানতে চাইলেন, আমেরিকান সাবমেরিন বিষয়ে তাদের তরফে প্রেসকে কিছু বলা হয়েছে কি না? তিনি জানালেন, ভারত কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। তবে মার্কিন দূতাবাসের প্রত্যাখ্যানের খবর তারা জানেন। কাউল বলেন, খুকরি কিভাবে ডুবে গিয়েছিল সে সম্পর্কে ভারত সরকার নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছে না। তিনি বলেন, মার্কিন সাবমেরিনই যে দায়ী সে কথা কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়নি। আশ্বাস দিলেন, পরে কোনো ব্রিফিংয়ে বিষয়টি উত্থাপিত হলেই উপযুক্ত জবাব তিনি দেবেন।

স্থান ওয়াশিংটন । কথা বলছেন নিক্সন ও কিসিঞ্জার।

কিসিঞ্জার : ব্রেজনেভের কাছ থেকে চিঠি পেলাম। এটা আমাদের পক্ষে ডিল করা সত্যিই কঠিন। তিনি ইয়াহিয়া ও আওয়ামী লীগের মধ্যে সমঝোতার বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছেন।

নিক্সন : তার মানে?

কিসিঞ্জার : যদিও তারা স্পষ্ট করেনি। কিন্তু আমাদের সমস্যা হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর ভারতীয়দের হামলা প্রতিহত করা।

নিক্সন : তারা ইতোমধ্যেই আক্রমণ করছে।

কিসিঞ্জার : এখনো পূর্ণ শক্তিতে নয়, বিপদ হলো এখনই যদি কিছু না ঘটে কিন্তু যুদ্ধ যদি অব্যাহত থাকে ভারত তাহলে পূর্বে একটি ভুটান এবং পশ্চিমে নেপাল নিয়ে যুদ্ধের যবনিকাপাত ঘটাবে। এর পরিণাম দাঁড়াবে এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জোট রয়েছে এমন একটি দেশের সার্বভৌমত্ব ধর্ষিত হবে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যেখানে রয়েছে একটি গোপন অঙ্গীকার (সিক্রেট কমিটমেন্ট)। যা কি না এ ধরনের পরিস্থিতিতে প্রয়োগযোগ্য। আমি মনে করি এটা অন্তত ইরান, ইন্দোনেশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে দারুণ প্রভাব ফেলবে। ডিক হেলমসও আমার সঙ্গে একমত। এখন যদি রুশরা একটা নিষ্ঠুর পরিণতি চায় তাহলে আমরা হটতে যাচ্ছি। অন্যদিকে ব্রেজনেভের চিঠিতে বেশকিছু বিকল্প সমন্বয়ের সুযোগ রয়েছে। এবং আমাদের কাছে একাধিক জবাবও রয়েছে।

নিক্সন : রুশ কৃষিমন্ত্রী যিনি এখন ওয়াশিংটনে তিনি কি চিঠিটি নিয়ে এসেছেন?

কিসিঞ্জার : না। গত সোমবার আমরা যে চিঠি দেই তার জবাবে এটা লেখা, যা ছিল বেশ কঠিন। প্রথমত, তারা মধ্যপ্রাচ্যের নিষ্পত্তি চায়।

নিক্সন : এ বিষয়টি কি চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে?

কিসিঞ্জার : না। কিন্তু আমরা এটা জানি। দ্বিতীয়ত, তারা একটি ইউরোপীয় নিরাপত্তা সম্মেলন চায়।

নিক্সন : ইয়াহ।

কিসিঞ্জার : তৃতীয়ত–

নিক্সন : তৃতীয়ত তারা বাণিজ্য চায়।

কিসিঞ্জার : ঠিক তাই এবং চতুর্থত, তারা আপনাকে সেখানে চায় এবং তারা ভীত। তারা আপনাকে পিকিং পর্যন্ত ধাওয়া করবে। সুতরাং আমাদের আছে, আমরা সম্পদবিহীন নই। কিন্তু স্টেট ডিপার্টমেন্টের অবস্থান হচ্ছে অন্যরূপ। তারা এই মুহূর্তে চায় আমরা যাতে না জড়িয়ে পড়ি এবং এই মুহূর্তে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে কাশ্মীরের যে অংশ পশ্চিম পাকিস্তান দখল করেছে তা ছেড়ে দিতে ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানানো এবং পূর্ব পাকিস্তানকে ভুলে যেতে। সুতরাং এর চেয়ে রাশানদের বর্তমান প্রস্তাবই অধিকতর উত্তম মনে হচ্ছে।

নিক্সন : অবশ্যই। রাশানরা ইঙ্গিত দিয়েছে যে, তারা সমঝোতায় আগ্রহী।

কিসিঞ্জার : পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে–

নিক্সন : কিন্তু কখন রাশানরা বিশ্বাস (অস্পষ্ট) করবে?

কিসিঞ্জার : বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে রাশানদের এর কোনটা বিরত রাখবে?

নিক্সন : অস্পষ্ট।

কিসিঞ্জার : হ্যাঁ। কিন্তু তারা তা করতে পারে। আমার সুপারিশ থাকবে প্রথমত, রাশান ও ভারতীয়দের হুঁশিয়ার করে দেওয়া যে, আমরা নিজেরাই ফাঁস করে দিয়ে অথবা অন্য কোনোভাবে স্পষ্ট করে দিতে পারি যে, ভারতের তরফে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কেনেডি পাকিস্তানকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিছু উদারপন্থির মুখ বন্ধ করতেও এটা কাজে আসবে। ... দ্বিতীয়ত, আমাদের উচিত হবে হেলিকপ্টারশিপ পরিচালনা। আমি অবশ্য কেরিয়ার মুভ করার পক্ষে খুব একটা নই। কিছু এসকর্ট দিয়ে একটি হেলিকপ্টারশিপ বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত পৌছানো নিশ্চিত করা জরুরি। এবং সেক্ষেত্রে আমরা দাবি করব যে, এটা ইভাকুয়েশন বা সৈন্য অপসারণের জন্য।

নিক্সন : কেরিয়ার দিয়ে কি হবে?

কিসিঞ্জার : কারণ এটা যদি আমরা করি তা হলে খবর মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়বে এবং বহু লোক ধরে নেবে আমরা সেখানে হস্তক্ষেপের জন্য গিয়েছি। তখন আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে যে, তা আমরা কখনো করব না।

নিক্সন : আমেরিকানদের সরিয়ে নিতে তুরস্কে আমরা এটা করেছিলাম। তোমার স্মরণে আছে? কিন্তু সেই খেলা এখানে চলবে না। আমি কি ঠিক বললাম?

কিসিঞ্জার : আমি এক্ষেত্রে শিথিল মনোভাব দেখাব। আপনি জানেন, আপনার সামনে উভয় পথ খোলা আছে। চীনা দৃষ্টিকোণ থেকে আমি কেরিয়ার মুভ করানোর পক্ষে। আর জনমতের দিক থেকে– প্রেস ও টেলিভিশন কি প্রতিক্রিয়া দেখাবে একটি আমেরিকান কেরিয়ার যদি সেখানে যায়।

নিক্সন : কি বললে? কেন আমরা কি ইভাকুয়েশনের উদ্দেশ্যে সেখানে কেরিয়ার পাঠাতে পারি না?

কিসিঞ্জার : ইয়াহ। কিন্তু কাদের বিরুদ্ধে আমরা এই প্লেন ব্যবহার করতে যাচ্ছি?

নিক্সন : সুতরাং আমরা সেখানে কি পাঠাতে পারি। সেখানে কি তবে একটা ছোট্ট হেলিকপ্টারশিপ পাঠাব? সেটা কি ভালো ফল বয়ে আনবে?

কিসিঞ্জার : এটা হবে আসলে প্রতীকী। সবাই ভাববে আরো কিছু এগিয়ে আসবে। আগে সেখানে আমাদের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠিত হোক। ... আমি জর্ডানকে জানিয়ে দিচ্ছি তারা যেন তাদের কিছু প্লেন পাঠায়। একই সঙ্গে আমি ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে বলব, আমরা এই নিশ্চয়তা চাচ্ছি যে, ভারত ভূখণ্ড করতলগত করতে চায় না। ... কিন্তু স্টেটকে (মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর) নিয়ে হয়েছে যত ঝামেলা। তারা সম্পৃক্ত হতেই নারাজ।

নিক্সন : সম্পৃক্ত না হওয়া? তার মানে?

কিসিঞ্জার : রেপ অব পাকিস্তান। পাকিস্তানের ধর্ষণ এবং তারা বাংলাদেশের স্বীকৃতির বিনিময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেবে। এটা হবে এক সম্পূর্ণ বিপর্যয়। এটা চীনাদের সঙ্গে আমাদেরকে আহত করবে।

নিক্সন : এখন আসলে বাস্তবতার দিকে তাকানো উচিত।

কিসিঞ্জার : বাস্তবতা হলো–

নিক্সন : পাকিস্তানের বিভক্তি এক সত্য।

কিসিঞ্জার : ওহ, ইয়াহ। ... আমরা এই মর্মবেদনা সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে পুরোপুরি ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে চাই। দ্বিতীয়ত, আমরা আমাদের চীনা বাহুটি লালনে আগ্রহী। তৃতীয়ত, বিশ্বের 'সাইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স অব পাওয়ার'কে সম্পূর্ণরূপে ধসে পড়ার কবল থেকে রক্ষা করা। যদি নির্দ্বিধায় সবকিছু ঘটে যায়, তাহলে বিশ্ববাসী দেখবে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তার একটি ক্লায়েন্ট স্টেট (ভারত) খুব অনুল্লেখযোগ্য নয়, এমন একটি দেশকে কোনো বাধা ছাড়াই কবজা করতে পারছে।

নিক্সন : আমরা রাশানদের কি বলতে যাচ্ছি?

কিসিঞ্জার : যুদ্ধবিরতি, সমঝোতা এবং পরবর্তী সময়ে প্রত্যাহার। কিন্তু তা করার আগে ইয়াহিয়ার কাছে তা পরিষ্কার করে নিতে হবে।

নিক্সন : যুদ্ধবিরতি ও সমঝোতা হবে কিসের ভিত্তিতে?

কিসিঞ্জার : বিটুইন ইস্ট, বিটুইন–

নিক্সন : বাংলাদেশ?

কিসিঞ্জার : না। আওয়ামী লীগের মধ্যে। বাংলাদেশ শব্দটি উল্লেখ করা হবে না। ১৯৭০ এর ডিসেম্বরের নির্বাচনের ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ ও ইসলামাবাদের মধ্যে। এখানে তারা তো তেমনটাই প্রস্তাব করেছে। যা কি না ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানকে রেখেই। সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানিরা আওয়ামী লীগকে স্বীকৃতি দেবে এবং আওয়ামী লীগ বাংলাদেশ প্রশ্নে কোনো পূর্ব শর্তের জন্য চাপ দেবে না। রাশানরা বাংলাদেশ প্রশ্নে

ভারত থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেবে।

নিক্সন : এবং তখন আমরা যুদ্ধবিরতিতে পৌছাব। কিন্তু তারপরেও কি প্রত্যাহার ঘটবে না?

কিসিঞ্জার : প্রত্যাহারের ঘটনা ঘটবে কিন্তু সেটা সেই নিষ্পত্তির পরে।

নিক্সন : ইয়াহ। সেই নিষ্পত্তির পরে? কিন্তু নইলে কোনো নিষ্পত্তি ঘটবে না?

কিসিঞ্জার : সেটাই ঠিক।

নিক্সন : তা হলে তখন কি ঘটবে? সেক্ষেত্রে কোনো প্রত্যাহার নয়? ঠিক?

কিসিঞ্জার : কিন্তু তখন পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষা পাবে।

নিক্সন : কেন? তখনো পর্যন্ত যথেষ্ট ভারতীয় প্রত্যাহারের জন্য অবশিষ্ট থাকবে না?

কিসিঞ্জার : ঠিক তাই। ... এই মুহূর্তে ভারতীয়রা পশ্চিম পাকিস্তানের তেমন উল্লেখযোগ্য এলাকা দখল করে নেয়নি এবং পশ্চিম পাকিস্তানিরা ভারতীয় ভূখণ্ড দখল করেছে সামান্যই। বড় সমস্যা হচ্ছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এখনো পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে পরাজিত হয়নি।

...

নিক্সন : রাশানদের আমাদের কি বলা উচিত?

কিসিঞ্জার : আমি রাশানদের বলব যদি তোমরা ভালো সম্পর্ক রাখো তাহলে সব সময় এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, শান্তির মূলমন্ত্র হচ্ছে কোনো পক্ষ একতরফাভাবে পরিস্থিতির ফায়দা তুলবে না। এখন যখন আমরা একটা সমঝোতায় পৌছতে চাচ্ছি, চোখ রাখছি মধ্যপ্রাচ্যের দিকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিস্থিতির এক সম্পূর্ণ পরিবর্তনকে উৎসাহিত করছে এবং ভারতীয়রা তা গুণছে। আপনাকে তাদের বলতে হবে যে, এটা আমাদের সম্পর্কের প্রভাব ফেলবে। তারা (ভারত) যদি সহযোগিতা না করে তাহলে আমাদের সম্পর্কে তা অবশ্যই প্রভাব ফেলতে বাধ্য।

নিক্সন : একটি চিঠির মাধ্যমে ইতোমধ্যেই আমরা তা বলেছি। এখন কারো শারীরিক উপস্থিতিতে কাউকে বলার ধারণাটি উত্তম।

...

নিক্সন : ঐ এলাকার কতসংখ্যক আমেরিকান রয়েছে?

কিসিঞ্জার : পশ্চিম পাকিস্তানে ৩০০ ও পূর্ব পাকিস্তানে ২০০ এর মতো হবে।

নিক্সন : তাহলে আমরা এই যুক্তি দাঁড় করতে পারি যে, বঙ্গোপসাগরে কেরিয়ার যাবে আমাদের নাগরিকদের নিয়ে আসতে। মার্কিন নাগরিকদের জীবন রক্ষায় আমার তো দায়িত্ব রয়েছে। কংগ্রেসকেও আমি একই কথা বলব। সুতরাং আমি এটা করতে যাচ্ছি... একটু নরম সুরে মিথ্যাটা বলতে হবে।

কিসিঞ্জার : হুম। ভারত কিন্তু ভাববে আমরা তাদের হুমকি দিচ্ছি। ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে ডেকে ভূখণ্ড গ্রাসের বিরুদ্ধে নিশ্চয়তা চাইব। সেই মুহূর্তে আমরা খবরের

ভারত থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেবে।

নিক্সন : এবং তখন আমরা যুদ্ধবিরতিতে পৌছাব। কিন্তু তারপরেও কি প্রত্যাহার ঘটবে না?

কিসিঞ্জার : প্রত্যাহারের ঘটনা ঘটবে কিন্তু সেটা সেই নিষ্পত্তির পরে।

নিক্সন : ইয়াহ। সেই নিষ্পত্তির পরে? কিন্তু নইলে কোনো নিষ্পত্তি ঘটবে না?

কিসিঞ্জার : সেটাই ঠিক।

নিক্সন : তা হলে তখন কি ঘটবে? সেক্ষেত্রে কোনো প্রত্যাহার নয়? ঠিক?

কিসিঞ্জার : কিন্তু তখন পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষা পাবে।

নিক্সন : কেন? তখনো পর্যন্ত যথেষ্ট ভারতীয় প্রত্যাহারের জন্য অবশিষ্ট থাকবে না?

কিসিঞ্জার : ঠিক তাই। ... এই মুহূর্তে ভারতীয়রা পশ্চিম পাকিস্তানের তেমন উল্লেখযোগ্য এলাকা দখল করে নেয়নি এবং পশ্চিম পাকিস্তানিরা ভারতীয় ভূখণ্ড দখল করেছে সামান্যই। বড় সমস্যা হচ্ছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এখনো পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে পরাজিত হয়নি।

...

নিক্সন : রাশানদের আমাদের কি বলা উচিত?

কিসিঞ্জার : আমি রাশানদের বলব যদি তোমরা ভালো সম্পর্ক রাখো তাহলে সব সময় এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, শান্তির মূলমন্ত্র হচ্ছে কোনো পক্ষ একতরফাভাবে পরিস্থিতির ফায়দা তুলবে না। এখন যখন আমরা একটা সমঝোতায় পৌছতে চাচ্ছি, চোখ রাখছি মধ্যপ্রাচ্যের দিকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিস্থিতির এক সম্পূর্ণ পরিবর্তনকে উৎসাহিত করছে এবং ভারতীয়রা তা গুণছে। আপনাকে তাদের বলতে হবে যে, এটা আমাদের সম্পর্কের প্রভাব ফেলবে। তারা (ভারত) যদি সহযোগিতা না করে তাহলে আমাদের সম্পর্কে তা অবশ্যই প্রভাব ফেলতে বাধ্য।

নিক্সন : একটি চিঠির মাধ্যমে ইতোমধ্যেই আমরা তা বলেছি। এখন কারো শারীরিক উপস্থিতিতে কাউকে বলার ধারণাটি উত্তম।

...

নিক্সন : ঐ এলাকার কতসংখ্যক আমেরিকান রয়েছে?

কিসিঞ্জার : পশ্চিম পাকিস্তানে ৩০০ ও পূর্ব পাকিস্তানে ২০০ এর মতো হবে।

নিক্সন : তাহলে আমরা এই যুক্তি দাঁড় করতে পারি যে, বঙ্গোপসাগরে কেরিয়ার যাবে আমাদের নাগরিকদের নিয়ে আসতে। মার্কিন নাগরিকদের জীবন রক্ষায় আমার তো দায়িত্ব রয়েছে। কংগ্রেসকেও আমি একই কথা বলব। সুতরাং আমি এটা করতে যাচ্ছি... একটু নরম সুরে মিথ্যাটা বলতে হবে।

কিসিঞ্জার : হুম। ভারত কিন্তু ভাববে আমরা তাদের হুমকি দিচ্ছি। ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে ডেকে ভূখণ্ড গ্রাসের বিরুদ্ধে নিশ্চয়তা চাইব। সেই মুহূর্তে আমরা খবরের

কাগজে এটা লিক করে দিতে পারি যে, ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানিদের রক্ষায় আমাদের গোপন সমঝোতা রয়েছে। ... জর্ডানের রাজাকে বলুন তার প্লেন পাঠাতে (এখানে দুই সেকেন্ড আলোচনা ডিক্লাসিফাই করা হয়নি) এবং আমাদের তা অবহিত করতে।

এই দলিলটিতে বলা হয়, ওয়াশিংটন সফররত সোভিয়েত কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের সময় ঘনিয়ে আসায় তাদের সংলাপ শেষ হয়।

সোভিয়েত কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার শুরুতেই কিসিঞ্জার বিশ্বের দুই মহান পরাশক্তির বন্দনায় এক আবেগঘন নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। এতে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের বিরাজমান সংকট সহযোগিতা ও বন্ধুত্বমূলক মনোভাবের মধ্য দিয়ে সম্পন্নের গভীর আশাবাদ ব্যক্ত করেন। কিন্তু চমকপ্রদ সত্য হচ্ছে, নিক্সন ও কিসিঞ্জার যখন দুজনই ব্যগ্রতার সঙ্গে এ ব্যাপারে তার মতামত জানতে স্পষ্ট ইঙ্গিত করেন তখন সোভিয়েত মন্ত্রী তাদের কিছুটা হতাশ করেন। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে কোনো মতামত প্রকাশের জন্য তিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি প্রাপ্ত নন। তিনি এসেছেন কৃষি নিয়ে কথা বলতে।

নিক্সন ও কিসিঞ্জারের 'সাজানো যুদ্ধের মহড়া'

গোপন দলিল স্পষ্ট করছে যে মার্কিন কংগ্রেস ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের ইচ্ছার বিপরীতে নিক্সন ও কিসিঞ্জার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দৃশ্যত যুদ্ধের যে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তা ছিল সাজানো। শোনা যাক তাদের জবানীতেই–

৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বিকেল ৪টা ২০ মিনিট থেকে ৫টা ১ মিনিট। প্রেসিডেন্ট নিক্সন তার জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক সহকারী কিসিঞ্জার ও এটর্নি জেনারেল মিশেলের কথোপকথন।

কিসিঞ্জার : মি. প্রেসিডেন্ট। আপনি টেড কেনেডির (প্রেসিডেন্ট কেনেডির ছেলে, যিনি '৭১ এ বাংলাদেশের পক্ষ নিয়েছিলেন) বিরুদ্ধে একটা জিনিস ব্যবহার করতে পারেন। আমি জানি পাকিস্তানের সঙ্গে কেনেডি একটি গোপন চুক্তি করেছিলেন। স্টেট ডিপার্টমেন্ট তা অবশ্য নাকচ করেছে।

নিক্সন : আইয়ুব আমাকে বলেছিলেন এমন একটি চুক্তি আছে।

কিসিঞ্জার : আমিও তা জানতাম।

নিক্সন : অবশ্য রাষ্ট্রদূত (সম্ভবত পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত) আমার কাছে তা অস্বীকার করেন। আমি বললাম, কথাটা আমাকে আইয়ুব বলেছে। রাষ্ট্রদূত বললেন, না এমন কিছু নেই। আসলে সে এ বিষয়ে কিছুই জানত না।

কিসিঞ্জার : (এখানে কথোপকথনের ৩ সেকেন্ড ডিক্লাসিফাই করা হয়নি) আমি বললাম, এটা অবশ্যই ব্যাক চ্যানেলে চলে গেছে। ... মি. প্রেসিডেন্ট শাহের কাছ থেকে আপনার জন্য একটি বার্তা পেয়েছি। তিনি সেখানে বলেছেন, তিনি গোলাবারুদ পাঠাতে পারেন এবং এখনই তা করতে রাজি আছেন। কিন্তু তিনি বিমান পাঠাতে অপারগ। এর প্রথম কারণ পাকিস্তানিরা এখন আর কোনোভাবেই প্লেন চালাতে পারে না। কারণ–

নিক্সন : তারা পড়তে পারে না।

কিসিঞ্জার : সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত যে চুক্তি করেছে তা ইরানের অবস্থানকে নাজুক করেছে। তাই তিনি প্রস্তাব করেছেন, জর্ডান তাদের বিমান পাঠাবে পাকিস্তানে। কারণ পাকিস্তানিরা জর্ডানের বিমান চালাতে পারে। আর তখন তিনি তার বিমান পাঠাবেন জর্ডানে। সঙ্গে থাকবে ইরানীয়

পাইলটরা। এর ফলে পাকিস্তানে তারা (জর্ডান) ব্যস্ত থাকার সময় জর্ডানকে কাভার করা সম্ভব হবে।

নিক্সন : আমার অবশ্যই ভাবা উচিত– আমি ভাবতে পারি আমরা জর্ডানীয়দের বিষয়ে ইসরাইলের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেতে পারি।

কিসিঞ্জার : ওহ! কোনো সমস্যা নেই।

নিক্সন : এই ইস্যুতে নিশ্চয়ই ইসরাইল আমাদের পক্ষে থাকবে। তারা কি থাকবে না?

কিসিঞ্জার : আগামীকাল শুক্রবার গোল্ডামায়ারের (ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী) সঙ্গে দেখা হবে।

নিক্সন : ভালো কথা। যখন তার সঙ্গে কথা হবে, তুমি তাকে বলবে– দেখুন এটা একটা রাশান কূটকৌশল। তাহলেই তিনি বুঝবেন।

কিসিঞ্জার : তা তো বুঝলাম মি. প্রেসিডেন্ট। এখন আমাদের বাজিটা কি হবে? ভারতীয় পরিকল্পনা তো পরিষ্কার। তদের সৈন্যবাহিনী পূর্ব পাকিস্তান থেকে সরিয়ে নিচ্ছে পশ্চিমে। এরপর তারা পাকিস্তানের স্থল ও বিমানবাহিনী ধ্বংস করে দেবে। দখল করে নেবে কাশ্মীরের পাকিস্তানি অংশ। আর তখন শাহের কাছ থেকে আপনি আরেকটি বার্তা পাবেন। তাতে তিনি বলবেন, পশ্চিম পাকিস্তানের এই অংশটি ইরানের নিরাপত্তার জন্য ভয়ঙ্কর হুমকি। এটা যখন ঘটবে পশ্চিম পাকিস্তানের বিকেন্দ্রীভূত শক্তিগুলো স্বাধীনতা পেতে চাইবে। বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ স্বাধীন হবে। পশ্চিম পাকিস্তান হবে আফগানিস্তানের মতোই বহু খণ্ডে বিভক্ত। [অস্পষ্ট ৫টি দেশ?]

নিক্সন : ইয়াহ, ইয়াহ, ইয়াহ।

কিসিঞ্জার : পূর্ব পাকিস্তান হবে একটি ভুটান। এসবই অর্জিত হবে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং সোভিয়েত অস্ত্র ও সমর্থনে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার তাঁবেদার দেশের কারণে এভাবে বহু দেশ হুমকিগ্রস্ত হবে। আমি হেলমসের সঙ্গে আজ সকালে কথা বলেছি। আমি আমার এসব ধারণা তার সঙ্গে ঝালাই করে নিলাম, আমি কিন্তু একজন উপদেষ্টাও পেলাম না। তিনি মনে করেন, এসব ঘটনার ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়বে মধ্যপ্রাচ্যে। আরবরা ভাবতে বসবেন, ভারতীয়দের মতো তারাও যদি সোভিয়েতের কাছ থেকে একই ধরনের (মৈত্রী চুক্তি) রক্ষাকবচ লাভ করে তাহলে তারাও অনুরূপ এক দফা কিংবা তার চেয়ে বেশিসংখ্যকবার চেষ্টায় অবতীর্ণ হবেন। চীনাদের ক্ষেত্রে আমার বর্তমান মূল্যায়ন হচ্ছে, তারা হয়তো একটা পর্যায় পর্যন্ত বেপরোয়া থাকতে পারে। কিন্তু তারা যদি বুঝতে পারে যে, আমরা পাকিস্তানের বিভক্তি মেনে নিয়েছি তখন তারা বলবে, 'আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা যথাসাধ্য সুন্দরভাবেই খেলেছি। কিন্তু এখন আমরা বড্ড দুর্বল' এবং তখন তারা আমাদের সঙ্গে কথা না বলেই ঘুরপথে তাদের তৈরি বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে আসবে। অথবা পুরো পরিকল্পনাই

পরিত্যাগ করবে। সুতরাং আমি মনে করি এখন এক মস্ত ওয়াটার শেড তৈরি হয়েছে।

... মিসেস গান্ধী সফরে আসছেন। তার কোনো বন্ধু নেই (অস্পষ্ট)।

নিক্সন : হ্যাঁ, সেটা একটা ভুল।

কিসিঞ্জার : ভুলটা হলো আমাদের বোঝা উচিত ছিল– তিনি (গান্ধী) কোনো অঞ্জুহাত খুঁজছেন না। কারণ তিনি এগিয়ে যেতেই প্রস্তুত ছিলেন। দ্বিতীয়ত, রাশানদের সঙ্গে আমাদের আরো কঠোর হওয়া উচিত ছিল।

নিক্সন : এখন আমরা কি করতে পারি? কিভাবে?

কিসিঞ্জার : আমাদের বলা উচিত গত রোববারে যেভাবে চূড়ান্তভাবে বলেছি। এটা ঘটতে দেওয়া হলে তা আমাদের সম্পর্কের একটা পরিবর্তন সূচিত করবে। সেক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যে কোনো সমঝোতা হতে পারে না। আমরা খেলাটা কঠিন করে তুলব। তৃতীয়ত, ২২ নভেম্বরে তারা যখন তৎপরতা শুরু করল, তখন আপনি যেভাবে চেয়েছিলেন সেভাবে ছিন্ন করা উচিত ছিল। কিন্তু আমলাতন্ত্রকে আমরা রাজি করাতে পারিনি। আমরা প্রথম বা দ্বিতীয় দিনে অর্থনৈতিক সাহায্য এবং দশ দিন দেরি না করে সব ধরনের অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দিতে পারতাম।

মিশেল : অস্পষ্ট।

কিসিঞ্জার : না আমরা রাশানদের স্পষ্ট করতে পারতাম না।

নিক্সন : আমি বিস্মিত! আমি বিস্মিত!

কিসিঞ্জার : আমি শুধু এটুকুই বলব, আমলাতন্ত্র আমাদের কোথায় নিয়ে গেছে। আপনি আপনার প্রথম সফরকালে ইয়াহিয়াকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেখানে কিছু অস্ত্র পাঠাতে।

নিক্সন : হ্যাঁ, দিয়েছি।

কিসিঞ্জার : আমলাতন্ত্রের সেই প্রতিশ্রুতি পূরণে এক বছর লেগে গেছে। বাঙালিরা যখন আক্রমণ করল, তখন সেই অস্ত্র গন্তব্যে পৌঁছাতে শুরু করল।

নিক্সন : আমি জানি।

কিসিঞ্জার : আমরা দোষারোপ করছি না। আমরা তো জানতাম না '৭১-এ যুদ্ধ হতে যাচ্ছে। কিন্তু এটা ঠিক যে আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতেই এক বছর কেটে গেল।

নিক্সন : এখন ওসব কথা থাক। প্লেন কিভাবে পাঠানো যায় তাই বলুন।

কিসিঞ্জার : কিন্তু এই প্লেনের উদ্দেশ্য কি হবে? আমরা যেখানে নিজেরাই ঝামেলায়।

নিক্সন : অস্পষ্ট।

কিসিঞ্জার : আমরা খেলাটা কঠিন করে তুলতে পারি।

নিক্সন : আমি একমত।

কিসিঞ্জার : যদি আমরা তা চাই। তাহলে চীনাদের কাছে একটা বার্তা পাঠাতে

পারি, 'তোমরা যদি সত্যই অগ্রসর হতে চাও তাহলে এখনই সময়।'

নিক্সন : ঠিক আছে। আমরা তা করব।

মিশেল : সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে তাদেরকে সবকিছু করতে হবে।

কিসিঞ্জার : কিন্তু রাশানদের ব্যাপারে আমি ভীত। কিন্তু আমি অবশ্য সতর্ক করে দিতে চাই যে, মি. প্রেসিডেন্ট, আমাদের ফাঁকি যদি ধরা পড়ে তাহলে কিন্তু আমরা বিপদে পড়ব।

নিক্সন : কিভাবে?

কিসিঞ্জার : আমরা হারব।

মিশেল : আপনার কি ধারণা রাশানদের সঙ্গে আমরা হেরে যাব?

নিক্সন : কি আমাদের করা উচিত হেনরি? একটা উপায় বের করো, ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

কিসিঞ্জার : কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আমাদের হাতে ৩৬ ঘণ্টা সময় আছে।

নিক্সন : আমি তা জানি কিন্তু আমি আর এ নিয়ে কোনো বৈঠক করতে চাই না।

কিসিঞ্জার : তারা (স্টেট ডিপার্টমেন্ট) মনে করে এটা আমাদের যুদ্ধ নয়।

নিক্সন : এটা আমাদের যুদ্ধ নয়, এটা আসলে রাষ্ট্রের অবস্থান।

কিসিঞ্জার : ইয়াহ্।

মিশেল : শাহ্ কি বলছেন?

নিক্সন : না, ইয়াহিয়া আমাদের সাহায্য চেয়েছেন। ... ইয়াহিয়া চীনকে বিভ্রান্ত করতে চান না। হেনরি আমাদেরকে এখানে বিকল্প খুঁজে বের করতে হবে। আমরা যদি এখন কিছু না করি তাহলে তোমার আশঙ্কা এটা দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাব ফেলবে। আমরা যদি কিছু করি তাহলে চীন কিছু করার কথা ভাববে। তারা ভারত অথবা রাশিয়া বা উভয়ের বিরুদ্ধে অগ্রসর হবে এবং তখন একই রূপ পদক্ষেপ নিতে রাশানদের উৎসাহিত করবে। এটা হলো বিপদের একদিক।

কিসিঞ্জার : আর মধ্যপ্রাচ্যে? ইরান ও ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলোর মধ্যে প্রভাব ফেলবে। তারা হয় সোভিয়েত অথবা তার কোনো তাঁবেদার রাষ্ট্রের কাছ থেকে হুমকির সম্মুখীন হবে। ইরান যদি এমন অবস্থার মুখে পড়ে তখন তারা ভাবতে পারে আমরা ঠিক সহজে নড়ার পাত্র নই। ...

সম্ভাব্য দৃশ্যটা আমি এভাবে দেখি। চীন যদি এই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে চীনাদের সঙ্গে মিলে আমরা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে পারি।

নিক্সন : কিভাবে?

কিসিঞ্জার : আমরা জাতির সঙ্গে কঠিনভাবে খেলব।

নিক্সন : তুমি কি ভাবো জাতিসংঘ উপযুক্ত স্থান?

কিসিঞ্জার : না, না। কিন্তু রাশান ও ভারতীয়রা ভাবতে পারে যে, আমরা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারি।

নিক্সন : তারা এটা ভাবতে পারে?

কিসিঞ্জার : আমার তাই মনে হয়। ...

নিক্সন : আমি ভাবছিলাম কি? চীনকে সাফ কথাটা বলে দিতে। কথাটা হলো– এটা হবে একটা ড্রেস রিহার্সাল এবং তারা যদি সীমান্তের দিকে কিছুটা অগ্রসর হয়, তাহলে তা ভারতকে সংযত করবে। আর সে ক্ষেত্রে চীনারা নিরাপদেই থাকবে। রাশানরা নিশ্চয় চীনাদের ডাম্প করতে যাচ্ছে না। অন্তত এখন নয়।

কিসিঞ্জার : মি. প্রেসিডেন্ট। আমার তো মনে হয় রাশানরা বাণিজ্য সুবিধা, মধ্যপ্রাচ্যের সমঝোতা ও সঙ্কট নেগোশিয়েশন পরিত্যাগ করবেন। ...আমি এ অনুমান করতে পারি যে, চীনারা তেমন কিছু করবে না। তবে তারা যদি একটুও অগ্রসর হয়, তাহলে পশ্চিম সীমান্তে বেশি সৈন্য সমাবেশ ঘটানো থেকে ভারতকে তা বিরত রাখবে।

ভারতীয় নিপীড়ন হবে নিকৃষ্ট : নিক্সন

প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও কিসিঞ্জার মনে করতেন স্টেট ডিপার্টমেন্টের একটি অংশ ভারতপন্থি। যদিও বলা হয়ে থাকে মাউন্টব্যাটেন বাংলাদেশের জন্ম দেখেছিলেন। কিন্তু কিসিঞ্জার স্পষ্ট বলেছেন, পাঁচ বছর আগেও রাশিয়ার সহযোগিতায় এবং কারো কাছ থেকে বাধা না পেয়েই বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে যদি কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করত তা হলে তা উদ্ভট মস্তিষ্কের বলেই গণ্য হতো। কিসিঞ্জারের একটি উক্তিতে স্পষ্ট যে, তিনি মনে করতেন যারা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পক্ষে তাদের অবস্থান ভুল। কারণ তার কথায়, 'স্বাধীনতা লাভের ছয় মাসের মধ্যে বাঙালিরা বুঝতে পারবে পাকিস্তানিদের নিপীড়নের চেয়ে ভারতীয়দের নিপীড়ন হবে অধিক নিকৃষ্ট।'

৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১। স্থান ওয়াশিংটন।
উপমহাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছেন নিক্সন, কিসিঞ্জার ও এর্টনি জেনারেল মিশেল।

...

নিক্সন : ওহ যিশু!

মিশেল : চীনারা কিন্তু তাদের সামরিক বাহিনীতে বিরাট অভ্যন্তরীণ ঝামেলার মুখে আছে। সে কারণেই তারা ভীত।

নিক্সন : কিন্তু চীনাদের সাহায্য ছাড়া তো আমরা এটা করতে পারি না। আমার তো মনে হয়, চীনারা যদি সীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে আসে তাহলে ভারতীয়রা একটু হলেও ভয় পাবে। তুমি কি চীনের কাছ থেকে কোনো বার্তা পেয়েছ?

কিসিঞ্জার : তারা আমাদের আগাম কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে চায় না। সমস্যা হলো জর্ডানের প্লেন নিয়ে। তবে কেন যেন আমার মনে হচ্ছে যেভাবেই হোক না কেন তারা প্লেন পাঠাতে যাচ্ছে। (অস্পষ্ট)

নিক্সন : শাহের কাছ থেকে কোনো আগাম প্রতিশ্রুতি?

কিসিঞ্জার : না। ... আমরা মার্কিন নাগরিকদের অপসারণের অজুহাত দেখিয়ে ভিয়েতনাম থেকে বঙ্গোপসাগরে একটি এয়ারক্রাফট নিয়ে যেতে হবে।

নিক্সন : আমাদের হাতে সময় নেই। আমি এটা অনতিবিলম্বে দেখতে চাই। এজন্য চব্বিশ ঘণ্টা বিলম্ব আমার সইবে না।

কিসিঞ্জার : আমরা ইতোমধ্যেই ঢাকায় এয়ারপ্লেন নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। ... কিন্তু কিটিংয়ের (ভারতে নিযুক্ত তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত) অবস্থান ভিন্ন। তার কথা হচ্ছে, বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতিদানের মধ্য দিয়েই এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে, তার কোনো ভূখণ্ড দখলের অভিপ্রায় নেই। কিটিং বলেছেন, তিনি এই মতের সঙ্গে একমত। আমি বুঝতে পারি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাকে এ কথাটা গিলিয়েছে।

মিশেল : বাংলাদেশ সম্পর্কে রাশিয়া কি করতে যাচ্ছে?

কিসিঞ্জার : তাহলে এখনো মনস্থির করতে পারেনি।... মি. প্রেসিডেন্ট। আমাদের হাতে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আরো চব্বিশ ঘণ্টা সময় রয়েছে। এখন আর আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই না। সব কাজ একসঙ্গে গুছিয়ে ফেলতে চাই। ... চীনাদের একটা নোট দেব। বঙ্গোপসাগরে আমরা কেরিয়ার নিয়ে যাচ্ছি। আপনি চীনাদের বলতে পারেন কিছু সৈন্য সীমান্তে নিয়ে যেতে। জর্ডান যেভাবেই হোক তাদের দুই স্কোয়াড্রন বিমান পাঠাচ্ছে। পাকিস্তানি পাইলটরা ইতোমধ্যেই সেখানে পৌঁছে গেছে। সুতরাং ইরানের মতো দেশগুলো তাকে অনুসরণ করতে ভুলবে না। ... আমরা যদি পাকিস্তানে সরাসরি অস্ত্র না পাঠাতে পারি তাহলে আইনগতভাবে জর্ডান অস্ত্র পাঠাতে পারে। কারণ আইন বলছে যে দেশ মার্কিন অস্ত্র সহায়তা পাওয়ার অধিকারী, তারা অন্য দেশ থেকেও মার্কিন অস্ত্র গ্রহণ করতে পারে। ... এখন পাকিস্তান যেভাবে জর্ডানের প্লেন পাচ্ছে সেক্ষেত্রে রাজাকে কিন্তু বলতে হবে আমরা কিন্তু আপনাকে আইনি অনুমতি দিতে পারব না। কিন্তু একই সঙ্গে তাকে এটা বলব, আপনি চালিয়ে যান, আমরা চোখ বন্ধ করে রাখব।

নিক্সন : জর্ডানকে আশ্বস্ত করতে হবে যে, ইসরাইল যাতে তার কোনো ক্ষতির কারণ হতে না পারে, তা আমরা দেখব।

কিসিঞ্জার : কিন্তু আমাদের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি না পেলে ইরানের শাহ কিন্তু কাজ করতে রাজি হবে না। সেটা কংগ্রেসের জন্য নয়, রাশিয়ানদের ভয়ে। ... সবচেয়ে ভালো হয়, ইরানের প্লেন যদি জর্ডানে যায়।

নিক্সন : আমি ভাবছিলাম কি? চীনকে সাচ্চা কথাটা বলে দিতে। কথাটা হলো– এটা হবে একটা ড্রেস রিহার্সাল এবং তারা যদি সীমান্তের দিকে কিছুটা অগ্রসর হয়, তাহলে তা ভারতকে সংযত করবে। আর সে ক্ষেত্রে চীনারা নিরাপদেই থাকবে। রাশানরা নিশ্চয় চীনাদের ডাম্প করতে যাচ্ছে না। অন্তত এখন নয়।

কিসিঞ্জার : মি. প্রেসিডেন্ট। আমার তো মনে হয় রাশানরা বাণিজ্য সুবিধা, মধ্যপ্রাচ্যের সমঝোতা ও সঙ্কট নেগোসিয়েশন পরিত্যাগ করবেন। ...আমি এ অনুমান করতে পারি যে, চীনারা তেমন কিছু করবে না। তবে তারা যদি একটুও অগ্রসর হয়, তাহলে পশ্চিম সীমান্তে বেশি সৈন্য সমাবেশ ঘটানো থেকে ভারতকে তা বিরত রাখবে।

...

কিসিঞ্জার : মি. প্রেসিডেন্ট আজ থেকে পাঁচ বছর আগে কেউ যদি অনুমান করত

যে, রাশিয়ার সহায়তায় পাকিস্তান ভেঙে যাবে এবং কেউ সেজন্য কিছু বলবে না তাহলে তাকে সবাই পাগল ভাবত।

নিক্সন : আমি আসলে টেড কেনেডিকে নিয়ে চিন্তিত নই।

কিসিঞ্জার : আমি আসলে মনে করি তারা সবাই এই ইস্যুটির ভুল দিকে দাঁড়িয়ে আছে। এর কারণ হলো– ছয় মাসের মধ্যে বাঙালিদের কাছে এটা স্পষ্ট হবে যে, পাকিস্তানিদের নিপীড়নের চেয়ে ভারতীয়দের নিপীড়ন অনেক বেশি নিকৃষ্ট হবে।

...

২৮ জুলাই, ১৯৭১

স্থান ওয়াশিংটন

সময় বিকেল ৪ : ২১ থেকে ৪:৫৪

কথা বলছেন নিক্সন, কিসিঞ্জার ও পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড।

নিক্সন : তুমি তো সবই জান আমাদের বিরুদ্ধে কি অপপ্রচারই না চলছে! আচ্ছা তোমার কি ধারণা, এই যে কিটিং (ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত) এখানে ঘুরঘুর করেছিল তা কি ভারতের পক্ষে লবি করার জন্য? সে যখন এখানে ছিল তাকে কি পাকিস্তান সম্পর্কে ভালো কিছু বলতে শুনেছ?

ফারল্যান্ড : আমি আসলে–

নিক্সন : এটা জানা কি দরকারি?

কিসিঞ্জার : এটা মনে হয় প্রয়োজন পড়বে– (অস্পষ্ট)

ফারল্যান্ড : আমি একমত। যদিও আমি চেষ্টা করেছিলাম, একটু লোপ্রোফাইল বজায় রাখতে আমি চীন সফরের বিশদ জানতে আগ্রহী হইনি।

নিক্সন : ও, তুমি ঠিকই করেছ। তুমি বলবে আমি কিছুই বলিনি।

ফারল্যান্ড : দুপুরে খাবার সময় চাক পার্সিকে দেখলাম স্টেট ডিপার্টমেন্টে ফদ্ধাঞ্চক কেলোগ তার জন্য ভোজের আয়োজন করে। সেখানে বেশ কয়েকজন কংগ্রেসম্যানও ছিলেন? এবং তারা সবাই বিস্ময় প্রকাশ করলেন। কেন আমার এখানে আসাটা আগে জানতে পারেনি? কেন আমি একটি কমিটির সামনে হাজির হচ্ছি? আমি কিছুই বলিনি। বলেছি, আমি জানি না। তবে চার্লস ব্রে'র সঙ্গে আমি একমত হয়েছি শুক্রবার দুপুরে প্রেস ব্রিফিংয়ে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে।

নিক্সন : উত্তম।

কিসিঞ্জার : সেটা জবানবন্দির চেয়ে ভালো।

নিক্সন : ভালো। প্রেস ব্যাকগ্রাউন্ড পেতে খুব পছন্দ করে। কংগ্রেসকে জাহান্নামে যেতে দাও।

ফারল্যান্ড : এই দৃশ্যের আরেকটি বিপরীত চিত্র রয়েছে। আমি এটা জোর দিয়ে বলতে পারি ইয়াহিয়াকে আমরা যদি এই দিকটি পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যাই তাহলে তার প্রতিক্রিয়া হবে এমনই যে, সমগ্র উপমহাদেশ তখন (অস্পষ্ট) আমি বলতে চাইছি

তিনি যুদ্ধ করবেন। এমনকি তিনি (অস্পষ্ট)। তিনি যদি যান তাহলে (অস্পষ্ট) আমাদের জীবনকালে মানব জাতি এমনটা আর কখনো দেখেনি। চীনারা সোজা আসাম থেকে চলে আসবে। অন্যদিক থেকে চীনারা মিন্টোকা পাস দিয়ে চলে আসবে এবং কাশ্মীরে শুরু করবে গেরিলা যুদ্ধ। তারা সবকিছু ঘিরে ফেলবে। তখন ভারতীয় সেনারা শোরগোল তুলে (অস্পষ্ট)...

নিক্সন : আমাদের অবস্থান তখন কি হবে বলে মনে করো?

ফারল্যান্ড : আমার মনে হয় আমরা তাই করছি যা আমাদের করা উচিত? এটা এমন এক নীতি যাকে আমি সমর্থন করি। আমি মনে করি না যে, আমরা বাড়াবাড়ি করতে পারি এবং আমি মনে করি না যে, আমরা কোনো ইতিবাচক অ্যাকশনের অবস্থায় আছি। মি. প্রেসিডেন্ট আমি আজ সকালে যেমনটা বলেছি এই সমস্যার মূলে যেতে হলে আমাদেরকে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে ফিরে যেতে হবে। যখন মুসলমানরা প্রথম সিন্ধে আগ্রাসন চালিয়েছিল। সেই থেকে উপমহাদেশে কোনো শান্তি নেই। কারণ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে অভিন্ন বলে কিছুই নেই। তাদের জীবনের প্রত্যেকটা দিক বিপরীতে পূর্ণ। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, আবেগ যাই বলুন না কেন, কোনো কিছুতেই মিল নেই। একজন দেব-দেবীর পূজা করে, অন্যের এক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী। একদল গরু পূজা করে, অন্য দল খায়। এটাই হলো সহজ কথা এবং গত বছরে ভারতে ৫২১টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে।

নিক্সন : এক চরম দুরবস্থার ঠিকানা।

কিসিঞ্জার : আমার সফরের পরে একটা বিষয় স্পষ্ট যে ভারতীয়রা পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে ভাবছে। কারণ তারা মনে করে পশ্চিম পাকিস্তান (অস্পষ্ট) তারা জানে, তারা যদি পূর্ব পাকিস্তানকে খাটো করতে পারে তা হলে পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক শক্তিকে উৎসাহিত করতে পারবে। পুরো পাকিস্তান হয়ে পড়বে ঢিলেঢালা। আর তখন গোটা পাকিস্তানই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ভারতীয়রা এবং পাশ্চিম পাকিস্তানিরা পরস্পরকে ঘৃণা করে।

নিক্সন : নিশ্চয়। সেটাই তাদের ভয়। এখন খারাপ দিকটাই তোমরা আমাকে বলো, ইয়াহিয়া কি যুদ্ধ করবে?

ফারল্যান্ড : হ্যাঁ, নিশ্চয় করবে।

নিক্সন : এটা হবে তার জন্য আত্মহত্যা।

কিসিঞ্জার : আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। তিনি যুদ্ধ করবেন। লিংকন যেভাবে যুদ্ধ করতেন। তার কাছে পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের অংশ (অস্পষ্ট)।

কিসিঞ্জার : কারণ তাদের পরাজয়ের ভীতি। তাদের জাতীয় ঐক্যের অনুভূতির বিপরীতে পরাজয়ের আশঙ্কা ক্ষুদ্র বিবেচনার বিষয়। স্মরণ করুন, প্রায় প্রত্যেকেই দেশ ভাগের কথা মনে রেখেছে। যখন তারা–

নিক্সন : ভয়ঙ্কর নিধনযজ্ঞ?

ফারল্যান্ড : স্বীকৃত পরিসংখ্যান হচ্ছে ৫ লাখের বেশি। পনের লাখ উদ্বাস্তু ছিল রাস্তায়।... আরেকটা কথা বলি, ভারতীয়রা কিন্তু অতীতেও ছিল 'মাস্টার্স অব প্রোপাগান্ডা'। কিন্তু পাকিস্তানিরা তা নয়- (অস্পষ্ট কথোপকথন)

ফারল্যান্ড : এটা হলো পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ।

নিক্সন : ও আচ্ছা।

ফারল্যান্ড : ২৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত আমরা পয়েন্ট ২২ অ্যামুনেশন পাঠিয়েছি ২২শ' রাউন্ডের বেশি। ... ইয়াহিয়া আমাকে বলেছেন, তারা ভারতে গেরিলাদের (মুক্তিযোদ্ধা) ২৯টি ক্যাম্প চিহ্নিত করেছে। কিন্তু আজ আপনাকে এটা বলতে ঘৃণা বোধ হচ্ছে যে, মি. প্রেসিডেন্ট গেরিলা তৎপরতা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে শুধু বাড়ছে। তারা এখন প্রতিদিন গড়ে ১৮ পাকিস্তানি নিধন করছে। আর দিনে দুটো ব্রিজ উড়িয়ে দিচ্ছে। ... আর বুঝতেই পারছেন রাজনৈতিক সমাধান বলতে তার (ইন্দ্রিরা গান্ধী) গ্রন্থে বাংলাদেশকেই বোঝায়। এটা খারাপ।

নিক্সন : আমি ভাবছি, আমরা আমাদের পথেই এগিয়ে যাব। আমরা যেমনটা তুমি জান। স্টেট ডিপার্টমেন্টের আমলাদের সঙ্গে এসব বিষয় নিয়ে আমাদের বড় টানাপড়েন যাচ্ছে। তারা প্রকৃতপক্ষে ভারতপন্থি। আমি যখন বলি 'তারা' তখন কিন্তু সবাইকে বোঝায় না এবং তারা আমেরিকান প্রেস যা লিখে তাই বিশ্বাস করতে চায়। এবং সত্যি বলতে কি, আমেরিকান প্রেস সেকথাই লিখে যা ভারতীয় প্রেসে ছাপা হয়। অবিকল একই কথা।

ফারল্যান্ড : ভালো কথা, আমাদের ঢাকার কন্সাল জেনারেলের খবর কি?

নিক্সন : সে মোটেই ভালো লোক নয়।

ফারল্যান্ড : সব কিছুতেই সর্বাগ্রে বাঁশি বাজায়।

নিক্সন : বড় খারাপ। নয় কি?

ফারল্যান্ড : যাক সে চলে গেছে। এখন মনে হয় স্টেট ডিপার্টমেন্টে আছে এবং ঢাকার ইউএসআইএস প্রধান তার রিপোর্টগুলো পড়লে মনে হয় চাতুর্যপূর্ণ। তাকে বিদায় দেওয়া উচিত।

নিক্সন : ভালো কথা।

ফারল্যান্ড : আর একটা কথা। তার ভূমিকা খুবই কঠিন। তার নাম এরিক গ্রাফেল। তিনি এইড দেখেন [ঢাকার এইডের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহযোগী পরিচালক ছিলেন গ্রাফেল]। তিনি সেপ্টেম্বরে যাবেন। আমি চাই তাকে এখনই বিদায় দিতে। তবে আমি মনে করি না যে, তাকে আপনার পক্ষে সরানো–

নিক্সন : প্রতিক্রিয়া?

ফারল্যান্ড : হিলের (ক্যাপিটাল হিল) দিক থেকে প্রতিক্রিয়া এবং আমার অনুমান কিছু তথ্য ফাঁস করার নেপথ্যে হয়তো তিনি অনুঘটক।

নিক্সন : বেজন্মার বাচ্চা। (এদিনের সংলাপ এখানেই শেষ)

ফেব্রুয়ারিতেই স্বাধীনতা ঘোষণার সিদ্ধান্ত

ইতিহাসের পর্দা উন্মোচিত হচ্ছে। সদ্য প্রকাশিত মার্কিন গোপন দলিল এই বিষয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারিতেই শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট বার্তা পায় যে, তার দাবি পূরণ না হলে তিনি একতরফাভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন এবং সেই ক্ষেত্রে গৃহযুদ্ধ এড়াতে তিনি যুক্তরাষ্ট্রসহ বিদেশী কূটনীতিকদের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। অন্যদিকে আরেক চমকপ্রদ তথ্য হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও তার সহকারী কিসিঞ্জার দু'জনেই ফেব্রুয়ারিতে একমত হয়ে মুজিবকে জানিয়ে দেন যে, একান্তই যদি তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সামরিক হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবে।

২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১

পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে ড. হেনরি কিসিঞ্জার দুই পৃষ্ঠায় টাইপকৃত এক স্মারক পেশ করেন প্রেসিডেন্টের কাছে। ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই চিঠির অবিকল মর্মবাণী নিম্নরূপ :

"এমন সম্ভাবনা দৃশ্যত বেড়েই চলেছে যে, আমরা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সংকটের মুখোমুখি হতে পারি, যা কি না দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের স্বার্থের জন্য সুদূরপ্রসারী প্রভাব বয়ে আনতে পারে। আমি কিছু আকস্মিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য নির্দেশ দিয়েছি এবং বর্তমান পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তার একটা বিবরণ দিচ্ছি।

পাকিস্তানের জন্য একটি নতুন সংবিধান লেখার কাজ শুরু করা নিয়ে কঠিন সমঝোতা থেকে সংকট ঘনীভূত হচ্ছে। আপনি জানেন মুখ্য ইস্যু হচ্ছে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্ক।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ এবং পশ্চিম পাকিস্তান এ পর্যন্ত নতুন সংবিধান নিয়ে এমনকি প্রাথমিক সমঝোতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বেসামরিক রাজনীতিকদের ওপর তার সামরিক সরকারকে বজায় রাখতেই সংকল্পবদ্ধ। কিন্তু তিনি বলেছেন যে, তিনি পাকিস্তান বিভক্তির প্রক্রিয়ায় সভাপতিত্ব করবেন না।

গণপরিষদের অধিবেশন ৩ মার্চ আহ্বান করা হয়েছে। প্রেসিডেন্টের অনুমোদনসাপেক্ষে সংবিধানের খসড়া তৈরি করতে ১২০ দিন সময়ের দরকার হবে। এই অনিশ্চয়তা ক্রমেই দানা বাঁধছে যে, উল্লেখযোগ্য পক্ষগুলোর নেতা– রহমান (মুজিব), ভুট্টো ইয়াহিয়ার কাছে গ্রহণযোগ্য সংবিধান প্রণয়নে গণপরিষদ সক্ষম হবে কি না? রহমান এখন পরিকল্পনা করছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে অটল থাকতে এবং যদি তিনি তা না অর্জন করতে পারেন, সেক্ষেত্রে প্রবল সম্ভবনা হচ্ছে– পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা। তার পক্ষ থেকে এটা হতে পারে সমঝোতার জন্য কোনো কৌশল; কিন্তু এটাও ঠিক যে, শক্তিশালী এবং ক্রমবর্ধমান প্রাদেশিক জাতীয়তাবাদ রহমানের নমনীয় হওয়ার সুযোগকে সীমিত রাখবে এবং সর্বোচ্চ দাবি আদায়ে তার সে উল্লেখযোগ্য সাংগঠনিক দক্ষতা রয়েছে। মুজিবের মনোভাব যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য কূটনীতিকদের কাছে তার সাম্প্রতিক আবেদন দ্বারাও মূল্যায়ন করা চলে। তিনি জানিয়েছেন যে, যদি তিনি তার পথ খুঁজে না পান এবং একতরফাভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন তাহলে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে একটি গৃহযুদ্ধ এড়াতে আমরা যেন শান্তি রক্ষায় ভূমিকা পালন করি।

পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সত্যিই বড় অনিশ্চিত, যা আমাদেরকে খুব সংকীর্ণ রশির ওপর দিয়ে হাঁটতে বাধ্য করছে। যে কোনো অর্থেই আমরা নিয়ন্ত্রণকারী ফ্যাক্টর নই। কিন্তু উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আমাদের প্রভাব ও সমর্থন চেয়েছেন। আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ নিশ্চয়ই রয়েছে এবং এই সন্ধিক্ষণে আমাদের মনোভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেখতে হবে যে, ভবিষ্যতে আমাদের স্বার্থ কিভাবে রক্ষিত হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান হচ্ছে আমরা পাকিস্তানের ঐক্য সমর্থন করি। কিন্তু এটা অকারণে নয়। কতিপয় পাকিস্তানি রাজনীতিক অভিযোগ করেছেন, যা তাদের নিজ উদ্দেশ্যে– যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতায় মদদ দিচ্ছে এবং আমরা এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে আমাদের অবস্থানে স্থির রয়েছি। সে কারণে ঢাকায় আমাদের কনসাল জেনারেল রহমানের কাছে এই আরজি রাখেন যে, তিনি যেন একটি সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং রহমান যদি পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে যেতেও মনস্থির করেন, যুক্তরাষ্ট্র সেক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকবে (প্রেসিডেন্ট নিক্সন মুজিবের সঙ্গে কনসাল জেনারেলের যোগাযোগের এই বাক্যটি কলম দিয়ে দাগ কাটেন এবং মন্তব্য জুড়ে দেন : ভালো [গুড]।) [দেখুন পরিশিষ্ট-১]

তবে শেষ পর্যন্ত আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রত্যক্ষ করতে হবে। যদিও বর্তমানের বিচ্ছিন্নতার হুমকি সংশ্লিষ্টদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা সমঝোতা চান। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা ঐ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারি। আর সে কারণে এটা চিন্তা করার সময় এসেছে যে, আমরা রহমানের প্রতি একটি অধিকতর

নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করব কী করব না। রহমান প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন (নিক্সন এই অংশটির নিচে কলম দিয়ে দাগ কাটেন এবং নোটের নিচে লেখেন : এখনো নয়– সঠিক, কিন্তু বিচ্ছিন্নতাকে উৎসাহিত করে এমন কোনো অবস্থান গ্রহণ নয়)। তাছাড়া ভবিষ্যতের স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতার জন্য এটা রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করতে পারে। একটি বাস্তবসম্মত মূল্যায়ন নির্ধারণ করতে হলে এটা স্বীকার করতে হবে যে, অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে আর অতি সামান্য সম্ভাবনাই হয়তো অবশিষ্ট থাকতে পারে। এই বিবেচনায় আমাদের অবস্থানকে সমন্বয় করে নিতে হবে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, পাকিস্তানের বিভক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের অনুকূল হবে না।

অন্ততপক্ষে এটা দৃশ্যত নিশ্চিত করে বলা যাবে যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভক্তির সম্ভাবনা যেখানে ক্রমবর্ধমান সেক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ কিভাবে উৎকৃষ্ট উপায়ে রক্ষা পেতে পারে সেজন্য আমাদেরকে একত্রে আকস্মিক অবস্থা মোকাবেলায় উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সে কারণে দক্ষিণ এশীয় নীতির ব্যাপকভিত্তিক সমীক্ষার বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন। আমি একটি বিশেষ কন্টিনজেন্সি প্ল্যান প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিয়েছি, যাতে প্রয়োজনের সময় আমরা ঠিক সিদ্ধান্তটি নিতে পারি।"

এ পর্যন্ত খতিয়ে দেখা বিভিন্ন মার্কিন দলিল এই ধারণা দিচ্ছে যে, নিক্সন ও কিসিঞ্জার বাংলাদেশ, ভারত ও রাশিয়া সম্পর্কে সময় সময় নানাভাবে বিদ্বেষ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ইঙ্গিত তাতে নেই। এমনকি বহুল আলোচিত সপ্তম নৌবহরের বিষয়টি সামরিক কৌশলগত ছিল। কিন্তু তা বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিল বলে ধারণা করা যায় না। এর সপক্ষে আরেকটি দলিল নিম্নরূপ :

ডিসেম্বর, ১৯৭১

নতুন দিল্লিতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ কিটিং এই টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও হোয়াইট হাউসে। এতে বলা হয়, 'গত কয়েকদিন ধরে আমি আমার এখানকার কূটনৈতিক সহকর্মীদের কাছ থেকে এই ধারণাই পাচ্ছি যে, বঙ্গোপসাগরে কেরিয়ার টাস্কফোর্সের মোতায়েন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সামরিক শক্তি প্রদর্শনের শামিল। এখানকার কানাডীয় হাইকমিশনার জর্জ আমাকে বলেছেন যে, তিনি বিশ্বাস করেন এই মুহূর্তে নৌবহরের এই মোতায়েন পাকিস্তানি সামরিক প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে উৎসাহিত করবে। এ প্রসঙ্গে জর্জ মনে করেন, ফরমান আলী ও গভর্নর মালিকের সর্বশেষ বার্তার ভাষায় তেমন ইঙ্গিতই মিলছে। তার কথায় এই মোতায়েনের ফলে প্রকৃতপক্ষে পরাশক্তির প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা নিশ্চিত হয়েছে, আর এর ফলে সোভিয়েত শুধু নয়, চীনারাও একই সঙ্গে বিচলিত হতে বাধ্য। এটা বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির পর্দা হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। জর্জ ইঙ্গিত

দিয়েছেন যে, তিনিও এসব সম্ভাবনা উল্লেখ করে তার প্রধানমন্ত্রীর কাছে বার্তা প্রেরণ করতে যাচ্ছেন, যাতে তিনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলতে পারেন।'

কেনেথ কিটিংয়ের এই বার্তা থেকে স্পষ্ট ধারণা করা চলে যে, সপ্তম নৌবহর প্রেরণকে তিনি সুনজরে দেখেননি। অবশ্য নিক্সন ও কিসিঞ্জার যাদেরকে ভারতপন্থি মনে করতেন কিটিং ছিলো তাদের অন্যতম।

সামরিক চুক্তি ও একটি ঝগড়ার কাহিনী

১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর বিজয়ের লগ্নে ভারত সরকার রাশিয়ার কাছে এ প্রস্তাব দিয়েছিল যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে মস্কো যেন ঢাকার সঙ্গে একটি সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করে। ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা-সংক্রান্ত মৈত্রী চুক্তি সই করেছিল ১৯৭১ সালের আগস্টে। বিভিন্ন মার্কিন গোপন দলিল থেকে একটি বিষয় প্রতীয়মান হয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের ঐ চুক্তির নেপথ্যে নিক্সন-কিসিঞ্জারের গোপন চুক্তির দোহাই হয়তো অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। কারণ সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভের কাছে নিক্সন ও কিসিঞ্জার ক্রমাগতভাবে এই বার্তা পৌঁছে দিচ্ছিলেন যে, কেনেডির সঙ্গে পাকিস্তানের একটি গোপন চুক্তি থাকার কারণেই তাদের পাকিস্তানের পাশে দাঁড়াতে হচ্ছে। মজার ব্যাপার হলো, কথিত ঐ চুক্তি যে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কোনো বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে না, তা নিক্সন ও কিসিঞ্জার ভালো করেই জানতেন। কিন্তু তারা তাদের স্বীকৃত 'সাজানো যুদ্ধের মহড়া' সম্পন্ন করতে ঐ চুক্তিকেই ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেন। এই প্রশ্নে কিসিঞ্জারের সঙ্গে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্সের মধ্যে মৃদু ঝগড়ার ঘটনাও ঘটে।

১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

সিআইএর একটি ৪ পৃষ্ঠার নথি। এর কয়েকটি অংশ মোটা কালিতে লেপটে দেওয়া হয়েছে। এই অংশ হয়তো আর কখনো আলোর মুখ দেখবে না। এতে বলা হয়েছে, ১২ ডিসেম্বর দিল্লি সফরে এসেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের ফার্স্ট ডেপুটি ফরেন মিনিস্টার ভজিলি কুজনেৎসোভ। তার সফরের লক্ষ্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বীকৃতি নিয়ে আলোচনা করা। ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তারা বলেছেন, ভারত সোভিয়েতের কাছ থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বীকৃতি আশা করে এবং তার অব্যবহিত পরই নতুন সরকারের সঙ্গে মস্কোর একটি ডিফেন্স ট্রিটি দেখতে চায়। সোভিয়েত মন্ত্রী ভারতীয় কর্মকর্তাদের বলেছেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কাছ থেকে সাফল্যের সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর স্বাধীনতা নিশ্চিত করা অর্থাৎ ঢাকার পতন না ঘটা পর্যন্ত তারা স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নন। সোভিয়েত মন্ত্রীর কথায়, পাকিস্তানের প্রতি তাদের যতটুকু প্রভাব এখনো অবশিষ্ট রয়েছে তা তারা ধরে রাখতে চাইলে তারা এই শর্ত পূরণ না হলে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে অপারগ।

এই দলিলটি সিআইএর, কিন্তু এর উৎস মুছে ফেলা হয়েছে। শুধু এটুকু রাখা হয়েছে : 'তার তথ্য বিশ্বাসযোগ্য ও যথার্থ'। দলিলটির ভাষ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে স্বাধীন হিসেবে দেখতে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে ১০ দিনের সময় বেঁধে দিয়েছিল। দলিলে বলা হয়, 'ভারতীয় কর্মকর্তাদের মতে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর অক্ষমতায় সোভিয়েত ইউনিয়ন অধৈর্য হয়ে পড়েছে। কারণ তারা আক্রমণ শুরু হওয়ার আগেই বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে ১০ দিনের সময় ঠিক করে দিয়েছিল। কুজনেটসভ ভারতীয়দের বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ প্রলম্বিত হওয়ার কারণে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের বিরোধিতা করা সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য অধিকতর অসম্ভব ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন যে, যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের বিপক্ষে তারা তাদের ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করেই যাবে, কিন্তু সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রশ্নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। দলিলের তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়, কুজনেটসভ তার নির্ধারিত মস্কো প্রত্যাবর্তনের তারিখ পিছিয়ে দিয়েছেন। কারণ তিনি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি লিওনাদ ব্রেজনেভের বিশেষ নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছেন। এই বিশেষ নির্দেশনা ভারতের অনুরোধ-সংক্রান্ত। ভারত অনুরোধ করেছে যে, সোভিয়েত স্বীকৃতির পর সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বাধীন বাংলাদেশের সঙ্গে একটি সামরিক চুক্তি করবে। কুজনেটসভ জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা চেয়ে তিনি যখন বার্তা পাঠান ব্রেজনেভ তখন মস্কোতে ছিলেন না। কুজনেটসভ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে চীনা হস্তক্ষেপের হুমকি নিয়েও আলোচনা করেন। ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তারা বলেন, ভারতীয় কর্মকর্তা ও কুজনেটসভ উভয়ে একমত যে, চীনারা সিকিম দিয়ে আক্রমণ রচনার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তাদের অনুমান, শিলিগুড়ি এলাকায় ভারতের ব্যাপক আক্রমণাত্মক অবস্থান লক্ষ্য করে তারা তাদের অভিযান চালিয়ে সীমিত লক্ষ্য অর্জন শেষে আবার নিজেদের প্রত্যাহার করে নেবে। ভারত সরকারকে বিব্রত করতে যেমনটা তারা ১৯৬২ সালে করেছিল।'

উল্লেখ্য, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বাংলাদেশের সামরিক চুক্তি সম্পাদনের ভারতীয় প্রস্তাবের কথা জানা গেল এই প্রথম। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সামরিক সহযোগিতা রক্ষাকবচ সংবলিত বহুল আলোচিত মৈত্রী চুক্তি সম্পন্ন হয় ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ঢাকা সফরের সময়। এই চুক্তি সই হয় প্রায় অবিকল সোভিয়েত ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত মৈত্রী চুক্তির মতোই।

২৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

রাত ৮টা, টেলিফোনে কথোপকথন

প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সহকারী কিসিঞ্জার এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স :

কিসিঞ্জার : আমি এইমাত্র আপনার সংবাদ সম্মেলনের বৃত্তান্ত পড়লাম। আপনার

জানা উচিত যে, প্রেসিডেন্ট মাটসকেভিচকে বলেছিলেন পাকিস্তানের প্রতি আমাদের একটি অঙ্গীকার রয়েছে। সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর যদি কোনো হামলা হয়, তাহলে সংঘাত বাধবে। আমি ভরনস্তবকে পরদিনই তা দেখিয়েছি। আমি এলেক্স জনসনকেও বলেছিলাম।...

রজার্স : প্রেসিডেন্ট কি বলেছেন– একটা অঙ্গীকার ছিল।

কিসিঞ্জার : উদ্ধৃতিটি ছিল এরকম, পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর যদি কোনো হামলা হয়, তাহলে একটি সংঘাত সৃষ্টি হবে। তিনি কেনেডির এইড মেমোয়ার (কূটনৈতিক স্মারক) দেখিয়েছেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের আগ্রাসনের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পাশে দাঁড়াবে।

রজার্স : এটা সামরিক দিক নিশ্চিত করে না। আমি মনে করি না, এখানে কোনো সমস্যা আছে। কেনেডির এইড মেমোয়ার ভারত কর্তৃক পাকিস্তান আক্রান্ত হলে যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে যাওয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করেনি। সুতরাং আমাদের সে রকমভাবে কিছু বলা উচিত নয়, অন্যদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের আলোচনায় এই ইঙ্গিতই মিলেছে– আমরা যেভাবেই চাই, সেভাবে তাদের সহায়তা দেব। আপনি নিশ্চয়ই এটা বলতে পারেন না, কেনেডির এইড মেমোয়ার যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছে। আপনি সংবিধানকে পাশ কাটাতে পারেন না...

কিসিঞ্জার : আমি সংবিধান পাশ কাটাতে চাইছি না। আমি একটা ন্যূনতম গ্রহণযোগ্যতা রক্ষা করার চেষ্টা করছি। কিন্তু এমন খুঁতখুঁতে অবস্থার আলোকে সেটা তো প্রায় অসম্ভব।

রজার্স : ওহ কাম অন। এখানে কোনো তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের বিষয় নেই। আমি শুধু বলতে চেয়েছি, যুদ্ধে যাওয়ার প্রশ্নে আমাদের কোনো চুক্তিগত অঙ্গীকার (ট্রিটি কমিটমেন্ট) নেই। এমনকি পাকিস্তানের ওপর যদি কোনো আক্রমণ আসে, তাহলেও নয়। আমাদের কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। এরকম আমরা যদি কিছু সুপারিশ করি তাহলে তা বিপর্যয় ডেকে আনবে। আমাদের এমন কোনো চুক্তি নেই যাতে সামরিক ব্যবস্থা নিতে আমাদের প্রতিশ্রুতি সৃষ্টি হয়।

কিসিঞ্জার : সেটা কোনো বিষয় নয়। ঐ ডকুমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে আমাদের কিছু পদক্ষেপের যৌক্তিকতা দিতে।

রজার্স : কোন ডকুমেন্ট?

কিসিঞ্জার : এইড মেমোয়ার।

রজার্স : কেউ কিন্তু এটা বলেনি কোনো ডকুমেন্ট নেই।

কিসিঞ্জার : কিন্তু এটা বলা হয়েছে, ১৯৬৫ সালে ওসব ধুয়ে-মুছে গেছে।...

রজার্স : (কিছুটা অংশ কালি দিয়ে লেপটে দেওয়া হয়েছে) আমি আসলে ওসব মূল্যহীন জিনিসের কোনো খবরই জানি না। আমি এ মর্মে সন্তুষ্ট যে, যুদ্ধে যেতে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। যদি প্রেসিডেন্ট জনসাধারণের উদ্দেশ্যে

বলে থাকেন এটা আমাদের সংঘাতে জড়াতে পারে– তাহলে ভালো কথা। আমি মনে করি না, আমি এমন কিছু বলেছি যা স্ববিরোধী।

কিসিঞ্জার : আমরা বলেছিলাম...

রজার্স : শুনুন, আমরা যদি চাই তাহলে সব সময়ই যুদ্ধে যেতে পারি।

কিসিঞ্জার : এটা তো কোনো কথা হলো না।

রজার্স : আমি এমন কিছুই বলিনি যা প্রেসিডেন্টকে কোনোভাবে ক্ষুণ্ন বা খাটো করে।

কিসিঞ্জার : কিন্তু এই ডকুমেন্ট প্রেসিডেন্টের কিছু পদক্ষেপের যথার্থতা দিতে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি তা ব্যবহার করেছেন এবং তিনি অনেককে এটা দেখাতে বলেছেন, যাতে এটা পরিষ্কার হয় যে, তিনি একটা গুরুত্ব দিয়েছেন।

রজার্স : সেটা ঠিক। তবে আমি এমন কিছু বলিনি যা প্রেসিডেন্টের অবস্থানকে বিচ্যুত করে। আমি বলতে চেয়েছিলাম কোনো সামরিক আক্রমণের সময় পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য আমাদের কোনো অঙ্গীকার সৃষ্টি হয় কি না। এর জবাব হলো না। এটা আমরা করতে পারি, আমাদের 'ডিসক্রিশান' বা মর্জিমাফিক হিসেবে। আমরা নিশ্চয়ই আমেরিকান জনগণকে বলতে চাই না, আমরা যুদ্ধে যেতে অঙ্গীকারবদ্ধ। দেখুন সকালের সংবাদপত্রে কী লেখা হয়। তখন না হয় এ নিয়ে আবার কথা বলা যাবে।

কিসিঞ্জার : আমি সংবাদপত্র নিয়ে উদ্বিগ্ন নই।

ফেব্রুয়ারিতে মুজিব যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ১০০ কোটি ডলার চান

শেখ মুজিব তার ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশের উন্নয়নে ১০০ কোটি ডলারের সহায়তা চেয়েছিলেন। পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে মুজিব বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র যদি আমাকে এক বিলিয়ন ডলার দেয় তাহলে আমি বাংলাদেশকে গণতন্ত্রের জন্য একটি দুর্গে পরিণত করব।'

২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১

সকাল ৯টা। ঢাকার কনসাল জেনারেল অরচার্ড ব্লাড মুজিব-ফারল্যান্ড বৈঠকের বিবরণ জানিয়ে স্টেট ডিপার্টমেন্টে একটি টেলিগ্রাম বার্তা পাঠান। এতে ফারল্যান্ডের জবানিতে মুজিবের সঙ্গে তার বৈঠকের চিত্রটি ফুটিয়ে তোলা হয়।

'আমি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তার ঢাকার বাসভবনে দেখা করি। তিনি আমাকে আন্তরিক উষ্ণতার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানান। এ সময় তাকে অবশ্য কিছুটা নার্ভাস মনে হচ্ছিল। আমার সঙ্গে আলোচনার মোড় কোনদিকে যায় তা নিয়েও তিনি হয়তো কিছুটা উদ্বেগ অনুভব করে থাকবেন।'

দু-চারটা সাধারণ কথাবার্তার পরেই মুজিব শুরু করেন এভাবে : 'আমাদের এই বৈঠক প্রত্যক্ষ করছেন পাকিস্তানের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ।' প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন আমাকে, 'পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি কি ভাবছি, বললাম, একজন কৌতূহলী পর্যবেক্ষক হিসেবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক অচল অবস্থায় আমি উদ্বিগ্ন। আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে তিনি এ বিষয়ে উত্তম পর্যবেক্ষণ দিতে সক্ষম।' মুজিব তখন বলেন, 'পাকিস্তানে আজ যে সংকট উপস্থিত তা শুধু ভুট্টোর সৃষ্ট নয়, এটা এমন এক পরিস্থিতি যা 'আইয়ুবের সমর্থনকারী গোষ্ঠী' ডেকে এনেছে।' তিনি বলেন, ভুট্টো সম্ভবত নিজের বিবেচনায় চালিত হচ্ছেন না। কারণ, তার তেমন কোনো সংগঠিত রাজনৈতিক দল নেই। পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তাদের একাংশের সমর্থন ও সহায়তা ছাড়া ভুট্টোর অবস্থান নড়বড়ে হয়ে পড়বে। ভুট্টোর অবস্থান সামরিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অত্যধিক ব্যয়ের অনুকূলে। আমি

তাকে প্রশ্ন করলাম, ভুট্টো কি ন্যাশনাল এসেম্বতে যোগ দেবে বলে আপনি মনে করেন? জবাবে তিনি বলেন, তিনি এখন তেমনটা মনে করেন। কারণ, আওয়ামী লীগ তাকে ভেতরে আসতে বাধ্য করছে। সুতরাং ভুট্টোর দেখা মিলতে পারে বৈ কি। তিনি রসিকতা করে বলেন, হাবা গরু শেষ পর্যন্ত তার এমএনএদের নিয়ে প্রবেশ করবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের দিকেই যাত্রা করবে। আর এরকম একটি মুহূর্তে বাংলাদেশের জীবন সংগ্রাম শুরু হবে।

আমি তখন তাকে জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা বলুন তো পিপিপি এবং আওয়ামী লীগ যে অবস্থান নিয়েছে তা কতটা কাছাকাছি? তিনি বলেন, এই অবস্থানে এতটাই ব্যবধান যে, তিনি অনুমান করেন, কোনো সমঝোতায় পৌঁছানোর সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ অথবা শূন্যের কোঠায় বললেও চলে। নির্দিষ্টভাবে তিনি বললেন, আওয়ামী লীগ এবং তিনি দলের 'পছন্দের নেতা' হিসেবে ছয় দফার সঙ্গে কোনো আপোসে যেতেও পারেন না এবং তিনি তা করবেনও না। তার কথায় 'তিনি ছয় দফাকে পূর্ব পাকিস্তানের জীবনের অংশে পরিণত করেছেন। তিনি বলেন, ভুট্টোই চেয়েছিলেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী হতে। মুজিব ভুট্টোর পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে বলেন, আমি তা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করি। দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি বলেন, কমিউনিস্ট চীনের প্রতি তার ভালোবাসা আবার ভারতের প্রতি তার আচরণ ভীষণরকম একপেশে। শেখ এক পর্যায় তার কমিউনিস্টবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির এবং এই অঞ্চলে চীনের ভূমিকার বিপদ সম্পর্কে বর্ণনা দেন। ভারত সম্পর্কে তিনি বলেন, বাংলাদেশ তার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং এই এলাকার ঐতিহাসিক বাণিজ্য রুটগুলো পুনরায় চালু করবে। তিনি অভিমত দেন যে, এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে ভুট্টোর যে মতভিন্নতা তা কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব।

ব্লাডের টেলিগ্রাম থেকে দেখা যাচ্ছে, এই পর্যায়ে মুজিব কিছুটা আকস্মিকভাবেই রাজনৈতিক সুরে ঝাড়া দশ মিনিট বক্তব্য রাখেন। এ সময় তিনি 'তার দেশ' ও তার জনগণ তারই পেছনে রয়েছে এবং কট্টরপন্থী কমিউনিস্টদের একটি ছোট্ট দল তার বিরোধিতা করছে বলে উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, কমিউনিস্টরা তার দলের তিন নেতাকে হত্যা করেছে। এসময় তিনি এমনকি ইতোমধ্যেই কয়েকজন কমিউনিস্টকে আওয়ামী লীগ কর্তৃক পাল্টা হত্যা করার প্রতিও ইঙ্গিত দেন। পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে তিনি কিভাবে কারাবরণ করেছেন, তার একটা বৃত্তান্ত দিয়ে বললেন, যদি ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব না হয়, তাহলে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় তিনি 'বুলেটের মুখোমুখি' হতে ভীত হবেন না। তিনি এ সময় নাটকীয়ভাবে দীপ্ত কণ্ঠে বলেন, তাকে কারাগারেই পাঠানো হোক কিংবা 'কেটে খণ্ড খণ্ড করা হোক'– কিছুতেই তার যায় আসে না। এবং অবশ্যই তিনি কোনো অবস্থাতেই তার জনগণের কাছ থেকে যে ম্যান্ডেট তিনি পেয়েছেন তা থেকে বিচ্যুত হবেন না। মুজিব এ সময় ধরা গলায় স্বগতোক্তি করেন, তিনি বিচ্ছিন্নতার

পাকিস্তানে একটি কনফেডারেশন চান। যার আওতায় বাংলাদেশের জনগণ বৈদেশিক সাহায্যের ন্যায্য ও উপযুক্ত হিস্যা লাভ করবেন। তারা তখন আর বিশ শতাংশের ভাগীদার থাকবে না। তিনি বলেন, বৈদেশিক মুদ্রার ষাট শতাংশের যোগানদাতা হচ্ছে 'আমার দেশ'। ইসলামাবাদ তাহলে কোন যুক্তিতে আমাদের দিকে পাটকেল ছুড়ে মারে? বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেন, পাকিস্তান বর্তমানে এক ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলা করছে। তার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কার্যত প্রায় নিঃশেষিত। তিনি এ সময় বলেন, সত্যি বলতে কি, এই যে সংকট তা বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ বয়ে এনেছে। তার দলকে বশংবদ বানাতে পশ্চিম পাকিস্তানের আর আর্থিক ক্ষমতা নেই। তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তান এই মুহূর্তে জাপানের কাছ থেকে বিরাট সাহায্যের আশায় হাত পেতেছে এবং যদি তারা এটা বাগাতে পারে তখন 'আমাদের পর্যুদস্ত করবে'। মুজিব এ পর্যায়ে নির্দিষ্টভাবে আমার দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কনসোর্টিয়াম কি বাংলাদেশের পুনর্গঠনে সমর্থন দেবে? আমি তাকে বললাম, একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তার এই সত্য উপলব্ধি করা উচিত যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপমহাদেশের অর্থনৈতিক কল্যাণ কামনায় অতীতের মতোই তার সহায়তা অব্যাহত রাখতে উন্মুখ থাকবে। আমি নির্দিষ্টভাবে তাকে বললাম, কনসোর্টিয়াম ও আমাদের অর্থনৈতিক সাহায্যের ক্ষেত্রে দুটো সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রথমত, আগের চেয়ে বর্তমানে অর্থনৈতিক সহায়তার সহজপ্রাপ্য নয়। দ্বিতীয়ত, সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প গ্রহণে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়ে থাকে। প্রকল্প কিভাবে বাস্তবায়ন হবে সেজন্য পর্যাপ্ত জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ লোকবল দরকার। আমি আমার উদ্বেগ প্রকাশ করে বললাম, পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামীণ উন্নয়নে যে সম্পদ এখন সহজলভ্য তারও সঠিক ব্যবহার কিন্তু অনিশ্চিত। দক্ষ জনশক্তির ঘাটতির কথাও আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

শেখ তখন কেন তার দেশ একটি ভায়াবেল এলাকায় পরিণত হবে তার রূপরেখা দেন। তিনি বলেন, আমাদের রয়েছে গ্যাস সম্পদের বিপুল রিজার্ভ। এটা শুধু স্থানীয় চাহিদাই পূরণ করবে না, এটা ভারতে রফতানিও করা সম্ভব হবে। তার নেতৃত্বে দুই বছরের মধ্যে বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বনির্ভর হবে। বোরো শস্যের প্রতি তাই তার বিশেষ আগ্রহ। আমি তখন তাকে পূর্ব পাকিস্তানের অভাবনীয় জন্মহারের কথা স্মরণ করিয়ে দেই। শেখ বলেন, জন্মনিয়ন্ত্রণে তিনি সফল হবেন। জনগণকে তিনি বুঝিয়ে-শুনিয়ে ছোট পরিবারে মনোযোগী করবেন।

মুজিব এ সময় ব্লাডের বর্ণনায় একটা 'সিরিয়াস মুড' নিয়ে বললেন, আমি আপনাকে এ কথাটা বলতে যদিও একটু দ্বিধান্বিত, তবু বলতে চাই, যুক্তরাষ্ট্রের কিন্তু এমন সুনাম রয়েছে যে, যখন একমত হওয়া যায় না এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, তখন সে তার বন্ধু পরিত্যাগেও কুণ্ঠিত হয় না। তিনি বলেন, ঠিক তেমনই বিশ্বের এই ভূখণ্ডে 'একমত হওয়া যায় না'– বিভিন্ন ধরনের সমস্যার উদ্ভব ঘটতে চলেছে। সুতরাং

যুক্তরাষ্ট্রকে এটা আবারো এক পরীক্ষার সম্মুখীন করবে। আমি বললাম, আমেরিকার বন্ধুদের প্রতি তার ভূমিকার বিষয় নিয়ে অন্য সময়ে কথা বলতে তিনি আগ্রহী। আমি আরো যোগ করি, এটা কিন্তু সত্য যে, যুক্তরাষ্ট্র সাড়ে চার বিলিয়ন ডলারের সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। শেখ মুজিব তখন বললেন, 'যুক্তরাষ্ট্র যদি আমাকে এক বিলিয়ন ডলার দেয় আমি সেক্ষেত্রে এমন এক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলব যা হবে গণতন্ত্রের জন্য এক দুর্গ।

এসব কথাবার্তার পরে মুজিব আমাকে মৌলিক প্রশ্নটি করলেন, পাকিস্তানের প্রতি মার্কিন নীতি কি? আমি সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে আমাদের উদ্বেগ চেপে যাই। বললাম, বৈদেশিক সাহায্য বিশ্বের সব ক্ষত নিরাময়ের জন্য কিন্তু উপযুক্ত দাওয়াই নয়। ঠিক প্রশ্নের ঢঙে নয়, মুজিব আমাকে বললেন, আমি বাংলাদেশের বন্ধুদের কাছে এই আবেদন রাখব যে, 'ঔপনিবেশিক মর্যাদায় যারা আমার জনগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রের শক্তি প্রয়োগ করবে', তাদের ব্যাপারে তারা যেন তাদের সর্বোচ্চ প্রভাব বিস্তার করেন। মুজিব বলেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একজন ছাত্র হিসেবে তিনি বহু আগেই জেনেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য দাতা দেশগুলো যদি চায় তা হলে তারা এমন পরিস্থিতিতে তাদের বিরাট প্রভাব কাজে লাগাতে পারে। ব্লাড লিখেছেন, প্রশ্নটি যদিও করা হয়নি কিন্তু তার একটি উত্তর অবশ্যই প্রস্তুত করা উচিত। আমরা যা ভাবছি তার চেয়ে দ্রুততম সময়ে এটা দরকার হবে। আমি অবশ্য অনুমান করেছিলাম যে, মুজিব যখন এই বিষয়টি নিয়ে আদ্যোপান্ত এত কথাই বললেন, তখন তিনি হয়তো স্বীকৃতির বিষয়টিও তুলতে পারেন। যাই হোক তিনি তা করলেন না।

আমাদের এই আলোচনা এক ঘণ্টার বেশি সময় স্থায়ী হয়। বিদায় নেয়ার আগে মুজিব বললেন, আমি শুধু নিজের তরফ থেকেই আপনাকে আশ্বস্ত করছি না, একই সঙ্গে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের জন্য বাংলাদেশের জনগণের তরফ থেকে বাড়িয়ে দিলাম বন্ধুত্বের হাত।

শয়তান চীনারাও চায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা : ইয়াহিয়া

'শয়তান চীনারাও স্বপ্ন দেখে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হোক। তাহলে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও স্বাধীন বাংলাদেশ মিলে গোটা এলাকাই তার বলয়ে চলে যাবে। ভাসানীর দলের মনেও একই আশা। তাছাড়া বাংলাদেশ স্বাধীন হলে চীন বঙ্গোপসাগরে একটি বন্দর পাবে ভারত মহাসাগরে প্রবেশের পথ পেয়ে যাবে।' বিস্ময়করভাবে, ১৯৭১ সালের ২ জানুয়ারি জেনারেল ইয়াহিয়া ঠিক এই ভাষাতেই ভয় দেখিয়েছিলেন আমেরিকাকে। ইসলামাবাদে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত যোসেফ ফারল্যান্ড ২ জানুয়ারি ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে যে টেলিগ্রামটি প্রেরণ করেন তার শিরোনাম ছিল– 'পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের সম্ভাব্য ভাঙন– চীনের ভূমিকা'। টেলিগ্রামটির তরজমা অবিকল তুলে ধরা হলো :

"১. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনায় তিনি পাকিস্তানের দুই অংশের সম্ভাব্য ভেঙে যাওয়া সম্পর্কে দারুণ উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে সংবিধান প্রণয়নের যে প্রক্রিয়া চলছে সেক্ষেত্রে তার জন্য এটাই হলো সবচেয়ে ঝামেলার বিষয়। রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে এটা একটা বিরাট নেতিবাচক দিকে নিয়ে যেতে পারে। তার কথায় সংবিধান কিরূপ হবে সে ব্যাপারে তিনি তার মত চাপিয়ে দিতে চাননি। কারণ এটা এমনই এক প্রক্রিয়া যা পাকিস্তানকে প্রায় বিলুপ্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে। অথচ একটি অখণ্ড পাকিস্তানই জাতীয় লক্ষ্য এবং তিনি তাই আশা করেন। আইয়ুব খানের উক্তির প্রতিধ্বনি তুলে তিনি বলেন, পাকিস্তান ভাঙনের পথে তিনি পৌরোহিত্য করতে চান না।

২. তার সঙ্গে অনুষ্ঠিত আমার প্রথম বৈঠকের কথা আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দেই। বললাম, পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি এবং আমি প্রত্যেক সময়ে এ কথা প্রকাশ্যে পুনর্ব্যক্ত করেছি। তারপরেও এর বিপরীতে একটি বিরুদ্ধ অপপ্রচার রয়েছে। এর সঙ্গে তারাই জড়িত যাদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিরোধ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র তলে তলে পাকিস্তানের দুই অংশের বিভক্তি নিশ্চিত করতে চেষ্টা চালাচ্ছে বলে রটনাকারীদের দাবি বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। এটা এমনকি যারা রাজনীতি ও সামরিক বিষয়াদির প্রাথমিক পাঠও

জানেন তারাও বুঝবেন যে এটা কতটা অসার। আসলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র আরেকটি অনুন্নত দেশের উত্থান দেখতে চাওয়ার বিষয়টি কতই না উদ্ভট। কিন্তু তা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের এ ধরনের একটি কথিত অবস্থানের কথা প্রেসে এবং দুর্ভাগ্যবশত উচ্চ রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে এমন বহু স্থানেও তা পাত্তা পাচ্ছে।

৩. ইয়াহিয়া বলেন, পাকিস্তান সরকার এ ধরনের খবরাখবরে যে মুহূর্তে কিছুটা উদ্বেগ অনুভব করছে তখন এ বিষয়ে মার্কিন সরকারের পুনঃআশ্বস্ত করার বিষয়টি জানতে পেরে তিনি বড়ই স্বস্তিবোধ করছেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানের দুই অংশকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে তার পক্ষে সম্ভব সবকিছুই তিনি করে যেতে সংকল্পবদ্ধ। কারণ অন্যথায়, তার কথায় তখন বিভক্ত পশ্চিম পাকিস্তান, ভারত এবং সাধারণভাবে গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভয়ঙ্কর বিপদ আরো বেশি প্রকট হয়ে উঠবে।

৪. আমার অনুরোধের জবাবে তিনি কী ধরনের ভয়ঙ্কর বিপদ আশঙ্কা করছেন তা ব্যাখ্যা করেন। ইয়াহিয়া বলেন, উল্লেখযোগ্য বিপদ তাদের কাছেই মনে হবে, যারা মানচিত্র অথবা সামরিক কৌশল অথবা চীনা নেতৃবৃন্দের আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে যাদের সামান্যও ধারণা রয়েছে। তাদের অনুধাবন করা উচিত যে, সামরিকভাবে অনিরাপদ, স্বাধীন এবং ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন পূর্ব পাকিস্তান সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের সঙ্গে একটি টার্গেটে পরিণত হবে। স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান হবে একটি নিউক্লিয়াসের সূচনা। ইয়াহিয়া মত দেন, অনুমান করা চলে যে, সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক অবস্থাটি হবে এমনই সহজতর যে, চীন পূর্ব পাকিস্তানের এবং তার সন্নিহিত বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম পর্যন্ত তার প্রভাব বলয় বিস্তার করবে। এমনকি এখন ভাসানীর অনুসারীরা এ ধরনের সুযোগ সৃষ্টি দেখতেই উদগ্রীব।

৫. ইয়াহিয়া এ সময় তার মন্তব্য উচ্চকিত করতে বলেন, 'শয়তান চীনারা বহু বছর ধরে চেয়ে আসছে যে, বঙ্গোপসাগরের বুকে একটি বন্দর এবং ভারত মহাসাগরে একটি প্রবেশদ্বার'। ইয়াহিয়া তখন আরো বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীনতা পেলে চীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তৃত ভূখণ্ডে অবাধে ডানা মেলবে। সেক্ষেত্রে বার্মা (মিয়ানমার) 'বেশি পেকে যাওয়া আমের মতোই' টুপ করে তার ঝুড়িতে ঝরে পড়বে। থাইল্যান্ডেরও হবে একই দশা। ইয়াহিয়া তার বক্তব্যের উপসংহারে বলেন, 'আপনারা যদি ভেবে থাকেন ভিয়েতনামে আপনাদের সত্যিই বিজয় নেমে এসেছে তাহলে ভেবে দেখুন তো এ সমস্ত এলাকা যদি চীনের কর্তৃত্বে চলে যায় তখন কী হবে?'

৬. আমি ইয়াহিয়াকে পাকিস্তানের সম্ভাব্য ভাঙন থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে খোলাখুলি মত প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমি নিজেও মত দিলাম একটি 'স্বাধীন' নতুন জাতি চীনের পক্ষেই যাবে। যদিও আমি এ কথা উল্লেখ করি যে, পিকিংয়ে কি ঘটতে চলেছে সে সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে আমার কোনো ধারণা নেই।"

লক্ষণীয় যে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে তৈরি সিআইএ'র ২৪ পৃষ্ঠার একটি দলিলে ভারত মহাসাগরে প্রবেশ নিয়ে চীনা আগ্রহের বিষয়টি নির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত

হয়। এতে বলা হয়েছে, 'ভারত চীনের প্রতি ভীত ও বৈরী থাকবে। চীনের পারমাণবিক সমার্থ, ভারতের দাবিকৃত ভূখণ্ড দখলে রাখা এবং সর্বোপরি পাকিস্তানের সঙ্গে তার সম্ভাব্য আঁতাত নয়াদিল্লিকে ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন রাখবে। বর্তমান পাকিস্তানি শাসকরা মনে করছেন, চীন ভবিষ্যতে ভারতীয় হুমকির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সমর্থন ও অস্ত্রের মূল্যবান উৎস। ভারত ও পাকিস্তান ক্রমবর্ধমান হারে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি করছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন উপমহাদেশে যে স্বার্থ রক্ষা করতে চাইছে তা কিন্তু তেমন আদর্শিক নয়। সিআইএ'র কথায়, 'আমরা বিশ্বাস করি দক্ষিণের প্রতিবেশীদের সঙ্গে সোভিয়েতের সম্পর্ক ভালো রাখার ইচ্ছা, চীনকে সামলানোর উদ্বেগ এবং ভারত মহাসাগরে নৌ-উপস্থিতির ক্রমপ্রসারের তাগিদ থেকেই তারা এটা চাইছে। পঞ্চাশের দশক থেকে সোভিয়েতরা ভারতকে বিরাট অর্থনৈতিক সহায়তা দিতে শুরু করে। ষাটের দশকের গোড়ায় তারা মনোযোগ দেয় সামরিক সরবরাহে। গত দুই অথবা তিন বছর ধরে পাকিস্তানের ওপর চীনা প্রভাব হ্রাস করতে এবং একই সঙ্গে সোভিয়েতের প্রভাব বৃদ্ধি করতে বেশ তোড়জোড় চালিয়েছে। অন্তত ১৯৬৫ সাল থেকে পাক-ভারতের উত্তেজনা প্রশমনে মস্কো সক্রিয় ছিল। তাদের মনে ছিল একটাই উদ্দেশ্য, পিকিং (বেইজিং) যাতে পরিস্থিতির সুযোগ না নিতে পারে। মস্কো এক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্যের মুখ দেখেছে। ভারত চীনের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করেছে রাশিয়ার সঙ্গে। এ সম্পর্ক এক বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। একই সঙ্গে নয়াদিল্লি সব সময় তার স্বাধীনতা ও বাধাহীন কার্যক্রমে স্বকীয়তা দেখিয়েছে। সে কারণেই ভারত মহাসাগরে সোভিয়েতসহ যে কোনো 'বিদেশী' শক্তির উপস্থিতির বিরোধিতা করেছে। যাতে কেউ ঘাঁটি না করতে পারে সে ব্যাপারেও তার সংবেদনশীলতা সে স্পষ্ট করেছে।

১৯৬৯ সালে নিক্সনের পাকিস্তান সফরকালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উপদেষ্টারা কিসিঞ্জারের নেতৃত্বাধীন মার্কিন প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। ১ আগস্ট বেলা আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বৈঠকের শেষ পনের মিনিটে নিক্সন ও কিসিঞ্জার যোগ দেন। পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন পররাষ্ট্র সচিব এসএম ইউসুফ, প্রেসিডেন্টের পিএসও ছিলেন মেজর জেনারেল পীরজাদা, জি ডব্লিউ চৌধুরী ও যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আগা হিলারি। কিসিঞ্জারের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র সচিব ইউসুফ বলেন, একটি বৃহৎ শক্তি হিসেবে চীন সম্ভবত উত্তেজনা বৃদ্ধির কারণ হবে না। আমরা চীনকে খুব ভালো প্রতিবেশী হিসেবে দেখছি। আমাদের অভিজ্ঞতা হতে পারে অনন্য– দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মতো কোনো চীনা সংখ্যালঘু নেই। পাকিস্তান ধ্বংসে চীনের কোনো উদ্যোগ নেই। আমরা মনে করি আমাদের সহাবস্থান সম্ভব। চীন পাকিস্তানকে এই মর্মে আশ্বস্ত করেছে যে, তারা অখণ্ড পাকিস্তান দেখতে চায়। ভারতকে মোকাবেলার দিক থেকে পাকিস্তানে চীনের স্বার্থ শক্তিশালী। চীন অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্যের দিক থেকে ভালো বন্ধু। তারা কখনো বলেনি

পাকিস্তানের শুধু চীন থেকে সাহায্য নেয়া উচিত। পাকিস্তান বেশি প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে না। কারণ, টিকে থাকার প্রশ্নটি নির্ভর করে ব্যাপকভিত্তিক সম্পর্কে। সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকেও আমাদের কিছু নীতি রয়েছে। আমাদের আশঙ্কা সীমান্ত উত্তেজনা চীন ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধের কারণ হতে পারে। চীনের যুক্তি সোভিয়েতরা সিজারীয় বিজয়ের ফায়দা বজায় রাখতে চায়। আমরা বিশ্বাস করি শক্তিশালী চায়না উত্তেজনা বাড়ানোর কারণ হবে না। ...

নিক্সন : ১৯৫৩ সাল থেকে পরিস্থিতি বিশেষ করে সেন্টো ও সিয়াটোর কার্যকারিতা কতটা বদলে গেছে। আমাদের অঙ্গীকার অটুট, কিন্তু হুমকি আজ ভিন্ন চেহারায় রূপ নিয়েছে।

ইয়াহিয়া : আমরা আমাদের আলোচনা নিয়ে বিশ্বময় ঘুরে বেড়িয়েছি। বিশ্বের এই অংশের অনেক জাতিকেই সম্পর্কের নতুন মাত্রা খুঁজতে হচ্ছে। আমি সবাইকে দুঃখের সঙ্গে একটি কথা বলেছি, দক্ষিণ এশিয়ার দুই প্রধান শক্তি একসঙ্গে কাজ করতে পারে না। আমরা ভুলে যাইনি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা। আমরা বুঝতে পারি, কেন আজ আমরা সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্রদের কাতারে নেই। কিন্তু আমরা আজো মিত্র।

নিক্সন : আমি এটা বেশ ভালোই বুঝতে পারছি যে, এই শতাব্দীর তৃতীয়ভাগে বিশ্বের এই অংশ প্রত্যক্ষ করতে পারে বিরাট প্রবৃদ্ধি অথবা ধ্বংস। এটা ধরে নিয়েই আমাদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে। আমি এই অঞ্চলকে এই শতাব্দীর যে কোনো প্রেসিডেন্টের চেয়ে ভালো জানি।

দ্রুত বাগে আনতে ২৫ মার্চ

কয়েক ঘণ্টায় না হলেও, কয়েকদিনের মধ্যেই অন্তত আওয়ামী লীগকে ধ্বংস এবং পূর্ব বাংলার ওপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই '২৫ মার্চে নেমে আসে লকডাউন'। বাঙালিদের জীবনে ২৫ মার্চের কালরাতটি নেমে আসার কারণ যেভাবেই বর্ণনা করেছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা 'সিআইএ'। আর ২৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকায়ামাবাদে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডের কাছে এই মর্মে হতাশা ব্যক্ত করেন যে, আলোচনা যদি ভেঙে যায় তাহলে 'রক্তপাত ও বিশৃঙ্খলা'র সূচনা ঘটতে পারে।

১৯৭১ সালের ১২ এপ্রিল সিআইএ'র রিপোর্টে বলা হয়, '২৫ মার্চে যখন তারা অভিযান শুরু করে, পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক নেতৃবৃন্দ সম্ভবত ধরে নিয়েছিলেন অথবা অন্তত আশা করেছিলেন আওয়ামী লীগকে ধ্বংস এবং যদি কয়েক ঘণ্টায় নাও সম্ভব হয়, তাহলে কয়েকদিনের মধ্যেই পূর্ব বাংলার নিয়ন্ত্রণ পুনরায় কার্যকরভাবে ফিরে পাওয়া সম্ভব হবে। তাদের হিসাব স্পষ্টতই ভুল ছিল। আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হয়েছেন; কিন্তু তৃণমূল পর্যায়ের দলীয় নেতৃবৃন্দ দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে সক্রিয় রয়েছেন।' ১৫ পৃষ্ঠার এই রিপোর্ট থেকে মনে হয়, সিআইএ এই সময়ে শেখ মুজিবের ভাগ্য সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল না। রিপোর্ট বলেছে– একটি স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্পর্কে এখনোই ভবিষ্যদ্বাণী করা খুব কঠিন। মুজিব এবং আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ যদি এখনো বেঁচে থাকেন এবং তারা পালাবর্তনের সুযোগ পান তাহলে তারা দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনবেন।'

ঢাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে সদ্য প্রকাশিত মার্কিন দলিলে প্রথম বিবরণ পাওয়া যায় ২৮ মার্চ, ১৯৭১ এ তৎকালীন কনসাল জেনারেল ব্লাডের টেলিগ্রামে (পরিশিষ্ট-২)। ব্লাড লিখেছেন– 'পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রত্যক্ষ করে আমরা ভয়ানকভাবে আতঙ্কগ্রস্ত, বাকশক্তিহীন। প্রাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণাদি থেকে দেখা যাচ্ছে– সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের একটি তালিকা রয়েছে। যাদেরকে তারা পদ্ধতিগতভাবে নির্মূল করবে। এজন্য তারা বাড়ির বাইরে ডেকে এনে গুলি চালিয়ে হত্যা করছে। তাদের নিধনযজ্ঞের টার্গেটে আরো রয়েছে ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি। বিপুলসংখ্যক এমএনএ এবং এমপিএ রয়েছেন। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সমর্থনে অবাঙালি মুসলমানরা পদ্ধতিগতভাবে দরিদ্র

বাঙালি ও হিন্দুদের বাসাবাড়িতে হামলা চালাচ্ছে। বহু বাঙালি আমেরিকানদের বাসায় আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন এবং বেশিরভাগই আশ্রয়ের সুযোগ পেয়েছেন। আজ জারিকৃত সান্ধ্য আইন কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে, পাক সামরিক বাহিনী তল্লাশি ও ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠবে। ঢাকায় তারা এখনো পর্যন্ত প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি। আগে কিংবা পরে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর পরিচালিত নৃশংসতার পূর্ণ বৃত্তান্ত আলোর মুখ দেখবে। তাই বোধগম্য কারণেই পাকিস্তান সরকার অব্যাহতভাবে সব ঠিক আছে মর্মে যে ভুয়া ধারণা যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে দিচ্ছে সে সম্পর্কে আমি প্রশ্ন তুলছি। ঘরোয়াভাবে হলেও পাকিস্তান সরকারকে আমাদের জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, নিজ দেশবাসীর বিরুদ্ধে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর নৃশংসতায় আমরা বেদনাহত। আমি তথ্যের সূত্র হিসেবে অবশ্যই চিহ্নিত হতে পারি এবং ধারণা করি, পাকিস্তান সরকার আমাকে চলে যেতে বলতে পারে। আমি বিশ্বাস করি না যে, ঘটনাবলির পরিণামে মার্কিন কমিউনিটির নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হবে। কিন্তু আমাদের যোগাযোগের সামর্থ্য হ্রাস পাবে।

২৯ মার্চ, ১৯৭১

কনসাল জেনারেল অরচার্ড ব্লাড এদিনের টেলিগ্রামে লিখেছেন, পুরানো ঢাকার আমেরিকান পাদ্রিরা জানালেন, কোনো উস্কানি ছাড়াই সেনাবাহিনী অভিযান চালিয়েছে। বাঙালিরা শুধু রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়েছিল। সেনাবাহিনী সব গুলিবর্ষণের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। কৌশলটা ছিল প্রথমে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া এবং তারপর পলায়নরত মানুষদের গুলি করে হত্যা করা। বিশ্বাস করা হয়ে থাকে হিন্দুরাই এই অভিযানের মূল টার্গেট। অবশ্য হিন্দুবিহীন এলাকার বাড়িঘরেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর্মি যদিও বেছে বেছে আওয়ামী লীগারদের হত্যার ভাব দেখাচ্ছে, আসলে হত্যা করছে নির্বিচারে। আর্মির ধ্বংসযজ্ঞ বেশিরভাগই ঘটে ২৫-২৬ মার্চের রাতে। ২৭ ও ২৮ মার্চে তুলনামূলক কম। ১১ সদস্যের একটি পরিবারের সবাইকে ২৫ মার্চের রাতে হত্যা করা হয়। ভুয়া অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয় বহু শিক্ষককে হত্যা করা হয়েছে। অনেকে বলছেন, সম্ভাবনাময় সব বুদ্ধিজীবীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পাঁয়তারা চলছে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, সরকার কিংবা সেনাবাহিনীর সঙ্গে কোনোভাবেই সংশ্লিষ্ট নয়, এমন একটি পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করেছে আর্মি। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে নিশ্চিত খবর পাচ্ছি যে, সেনাবাহিনী বাড়িতে বাড়িতে লুটতরাজ শুরু করেছে। যারা বাধা দিচ্ছে তাদেরকে তারা প্রহার করছে। বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা ভীত কিন্তু বিস্ময়করভাবে পরিশীলিত মনোভাব বজায় রেখেছেন। সেনাবাহিনী সাবেক বাঙালি চাকরিজীবীদের বাড়িতে বিশেষভাবে হানা দিচ্ছে। রাজারবাগ পুলিশলাইন গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ঢাকার কোথাও কোনো পুলিশ চোখে পড়ছে না। ব্লাড মন্তব্য করেছেন যে, সেনাবাহিনী সাধারণভাবে জনসাধারণকে আতঙ্কগ্রস্ত করতে চাইছে এবং

প্রতিরোধ এলেই তারা তা স্তব্ধ করে দিচ্ছে। সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের প্রতি হুমকি হিসেবে বিবেচিত সমাজের সম্ভাবনাময় সবাইকেই নিশ্চিহ্ন করা তাদের লক্ষ্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

৩০ মার্চ, ১৯৭১

ব্লাড এই টেলিগ্রামটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হত্যাকাণ্ডের বিবরণ দেন। এতে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানের এফএও'তে কর্মরত আমেরিকানরা ২৭ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। তাদের রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, ইকবাল হলের সশস্ত্র ছাত্রদের উপস্থিতি সেনাবাহিনীকে ক্রোধে অন্ধ করে দেয়। তাদেরকে হয় কক্ষে অথবা তারা যখন দলে দলে বেরিয়ে আসছিল তখন পাইকারি হত্যা করা হয়। তারা প্রায় ২৫টি লাশের একটি স্তূপ দেখতে পান। অন্যদের মরদেহ সেনাবাহিনী সরিয়ে নিয়েছে। সবচেয়ে নৃশংসতা চলে রোকেয়া হলে। এই হলে অগ্নিসংযোগের পর ছাত্রীরা যখন পালাচ্ছিল তখন তাদের ওপর চলে মেশিনগানের গুলি। ছাত্রীরা ছিল নিরস্ত্র। ৪০ জন নিহত হয়। এই হামলার লক্ষ্য ছিল নারী ছাত্র নেতৃত্ব নির্মূল করে দেওয়া। কারণ সেনাবাহিনীর কাছে খবর ছিল, নারী ছাত্র কর্মীরা এই হলেই থাকে। আনুমানিক ১০০০ লোক, যাদের বেশিরভাগই ছাত্র তাদের হত্যা করা হয়। উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ফাইল ও নথিপত্র পুড়িয়ে দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিক কত জন মারা গেছে তার সংখ্যা নিরূপণ কঠিন। সরকারিভাবে স্কুল ছিল বন্ধ এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধিকাংশ না হলেও অনেক ছাত্রই চলে গিয়েছিল। সেই হিসেবে নিহতের সংখ্যা কম হওয়ার কথা। কিন্তু অন্যদিকে আওয়ামী লীগের 'আন্দোলনের' সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের কার্যক্রমের মূল ঘাঁটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়। সুতরাং অনুমান করা চলে, ২৫ ও ২৬ মার্চের রাতে গোলযোগ শুরুর পর তরুণরা সেখানে সমবেত হয়েছিল। ক্যাম্পাসে অন্তত দুটো গণকবরের সন্ধান মিলেছে– একটি ইকবাল হলের, অন্যটি রোকেয়া হলের কাছে। ২৯ মার্চের রাতে গুলিবর্ষণের ফলে কিছু মৃতদেহ স্পষ্ট চোখে পড়ে, তা ভয়ানক গন্ধ ছড়ায়। অনেকে বলেছেন, সেনাবাহিনী কাউকে বন্দি করেনি, সবাইকে হত্যা করেছে। আর্মি রেডিও থেকে বলা হয়েছে, কিছু ছাত্র পালাতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০০০ ছাত্র নিহত হওয়ার তথ্য আমাদের কাছে অতিরঞ্জিত মনে হয়েছে। তবে এখন যে সময় ঢাকায় চলছে তাতে এর সত্যতা উড়িয়ে দেওয়াও যায় না।

৩১ মার্চ, ১৯৭১

পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলির প্রতিক্রিয়া শীর্ষক এই টেলিগ্রামটি ইসলামাবাদ থেকে ওয়াশিংটনে পাঠান ফারল্যান্ড। চার পৃষ্ঠার এই বার্তায় তিনি লিখেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পুনর্নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ২৫-২৬ মার্চের রাত থেকে পাকিস্তানি সামরিক

বাহিনী যে অভিযান শুরু করেছে তা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ উভয় মেয়াদের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ সমস্যা বয়ে এনেছে। এখন আমাদের জন্য আশু ভাবনা হচ্ছে, আমাদের লোকদের সরিয়ে আনা, ঢাকার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের নিরাপত্তা এবং পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র কি করে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হবেন।... দীর্ঘমেয়াদি ইস্যুগুলোর মধ্যে রয়েছে পাকিস্তানি সরকারের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক সম্পর্কের ভবিষ্যৎ এবং আমাদের বিভিন্ন অপারেশনাল কর্মসূচি রিভিউ করতে হবে, এই বার্তার লক্ষ্য হচ্ছে কিছু প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া অবহিত করা। বর্তমানে যে সামরিক অভিযান চলছে তার নেপথ্যের কারণ খতিয়ে দেখতে আমাদেরকে অন্তত ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির দিকে তাকাতে হবে। পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে স্বার্থের বৈচিত্র্য এবং সামাজিক প্যাটার্নের ইতিহাস সবারই জানা। সম্পদের অসম বণ্টন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্যের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের দুঃখবোধ ছিলই। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানিরা তাদের জনসংখ্যার গরিষ্ঠতার আলোকে ন্যায্য পাওনা বুঝে নেয়ার যথার্থতা নিশ্চয় রয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং তাকে ন্যায্য ভাগ দেওয়ার বিষয়টি পশ্চিম পাকিস্তানে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এমনকি কট্টর সামরিক নেতৃবৃন্দ যারা পাকিস্তানের 'অখণ্ডতায়' জানবাজ তাদের মধ্যেও এমন উপলব্ধি এসেছিল। ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক ভিত্তি অর্জনে ইয়াহিয়ার দীর্ঘ কর্মপ্রয়াসের মধ্যেও এর প্রতিফলন ঘটে। ফারল্যান্ড এ পর্যায়ে মন্তব্য করেন, মার্কিন দূতাবাস দৃঢ়তার সঙ্গেই এই অভিমত রাখছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে স্বীকার করে নিয়েই তিনি একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌছাতে আন্তরিক ছিলেন। তবে তিনি অবশ্যই দুটি (বা তার চেয়ে বেশি) পাকিস্তান নয়, এক পাকিস্তানের ভিত্তিতেই সেই রাজনৈতিক ফর্মূলাকে বাস্তবে রূপ দিতে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। ইয়াহিয়া এবং সামরিক বাহিনী ঢাকায় মার্চের রাজনৈতিক সমঝোতার প্রক্রিয়ায় ছাড় দিতে সত্যি কতটা আন্তরিক ছিল কিংবা তারা কার্যত আলোচনার নামে সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য কালক্ষেপণ করছিল– তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা বিরোধপূর্ণ হতে বাধ্য। সত্যটা হতে পারে দুটোরই এক মিশ্রিত রূপ। আমরা বিশ্বাস করি, সব উল্লেখযোগ্য দলগুলোর কাছে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধানে পৌছাতে ইয়াহিয়া অব্যাহতভাবে কাজ করে গেছেন। অন্যদিকে এটা সন্দেহাতীতভাবে ধারণা করাই সঙ্গত যে, পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধি করা ছিল একটি কন্টিনজেন্সি ব্যবস্থা। ২৫-২৬ মার্চে পূর্ব পাকিস্তানে ইয়াহিয়ার সামরিক শক্তির ব্যবহার তার পূর্বসূরি প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের স্থলাভিষিক্তের ঠিক দুবছর পরে এলো। যার পটভূমি ছিল মুজিব ও তার আওয়ামী লীগ কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে কয়েক সপ্তাহ ধরে একটি সামন্তরাল সরকার পরিচালনা। আওয়ামী লীগ প্রদত্ত আদেশ ও তা কার্যকর হওয়ার মধ্য দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে ঘোষিত হয়েছিল এক বিদ্রোহ।

পাকিস্তানের পতাকা ধ্বংস করে দিয়ে উত্তোলিত হয়েছিল বাংলার পতাকা। এবং পূর্ব পাকিস্তানের কর্মরত বেসামরিক ও সামরিক কার্যক্রমে সৃষ্টি হয়েছিল বাধা। আর এসবই ছিল সশস্ত্র বিদ্রোহের আলামত। তবে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শক্তির মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগের যে চিত্র আমাদের ঢাকার মিশন ও প্রত্যক্ষদর্শীরা দিয়েছেন তা সত্যিই ভয়াল। কিন্তু আমরা শুধুই মানবিক অনুভূতিসম্পন্ন নই, সরকারি চাকুরেও। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানে এখন যা ঘটে চলেছে তার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুধুই নৈতিক দৃষ্টিকোণ বিচার করলে চলবে না। সাংবিধানিক সরকার তার কর্তৃত্ব অমান্যকারী নাগরিকদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করছে। যুদ্ধটা চলছে পাকিস্তানি এবং পাকিস্তানিদের মধ্যে (সৌভাগ্যবশত কোনো আমেরিকান আহত হয়নি। কারো বাসস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি)। ফারল্যান্ড লিখেছেন, বর্তমান সংকটের প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ ২৫-২৬ মার্চের আগে যুক্তরাষ্ট্র সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পাক সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় তার হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। কারণ বিষয়টি একান্তভাবেই তার অভ্যন্তরীণ। সেই থেকে সংকট ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে, তা আরো ঘনীভূত হয়েছে। কিন্তু সমস্যাটি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ হিসেবেই রয়ে গেছে। এই দূতাবাস মনে করছে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলি নিন্দনীয়, কিন্তু এটা অনভিপ্রেত যে, তারা একটি বিরোধপূর্ণ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে এটিকে উত্থাপন করবে (এ পর্যন্ত আমরা যতটা জানি কেবল ভারতই পাকিস্তানের বর্তমান সমস্যা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিয়ে যেতে উদ্যোগী হয়েছে)। আমাদের সরকারসহ বিভিন্ন সরকারকে পাকিস্তানের নতুন ঘটনাবলি ও তার তাৎপর্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ফারল্যান্ড পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন ১৯৬৯ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ছিলেন এফবিআই'র এজেন্ট। চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক তৈরির দৃতিয়ালিতে তিনি ছিলেন অন্যতম অনুঘটক।

মুজিব স্বাধীনতার ঘোষক : সিআইএ পরিচালক

একাত্তরের মার্চে অবিলম্বে সামরিক আইন তুলে নেওয়ার চাপ দিতেই ইয়াহিয়ার সঙ্গে মুজিবের আলোচনা ভেঙে যায়। গোপন বেতার বলেছে, 'মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন এবং রাত ১ টায় তাকে গ্রেফতারের সময় পাকিস্তানি সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ তার দুই সমর্থককে হত্যা করেছে।' ওয়াটারগেট খ্যাত সিআইর পরিচালক রিচার্ড হেলমস ড. হেনরি কিসিঞ্জারসহ উচ্চপর্যায়ের নীতিনির্ধারকদের কাছে এই তথ্য প্রকাশ করেন।

সদ্যপ্রকাশিত আমেরিকার গোপন দলিল থেকে সম্ভবত এই প্রথমবারের মতো আরো দুটি নতুন তথ্য উদ্ঘাটিত হলো। প্রথমত, মুজিব ৪ মার্চেই একাধিক বিদেশী সংবাদদাতাকে 'অব দ্য রেকর্ড' বলেন, ৭ মার্চে তিনি যা ঘোষণা করতে যাচ্ছেন, তা স্বাধীনতার নামান্তর। দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি আহ্বান করা হয় পশ্চিম বার্লিন থেকে ডাকযোগে প্রেরিত এক চিঠিতে।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ওয়াশিংটন সময় বিকেল ৩টা ৩ মিনিট থেকে ৩টা ৩২ মিনিট পর্যন্ত ড. হেনরি কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। নথিগুলো পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে, একাত্তরের মার্চের দিনগুলোতে শেখ মুজিবুর রহমান ও ঢাকায় তার কার্যক্রম সম্পর্কে ঘণ্টায় ঘণ্টায় নজরদারি নিশ্চিত করা হয়। কিসিঞ্জার নির্দেশ দেন পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী দৈনন্দিন ভিত্তিতে পর্যালোচনার। ২৭ মার্চের ওই বৈঠকে অন্যদের মধ্যে রাজনীতি বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি ইউ এলেক্স জনসন, প্রতিরক্ষা উপমন্ত্রী ডেভিড প্যাকার্ড, জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ অফিসের লেফটেন্যান্ট জেনারেল মেলবিন জয়েস, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল থেকে কর্নেল রিচার্ড টি কেনেডি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় সিআইএ পরিচালক রিচার্ড হেলমস বলেন, [সোর্স প্রদত্ত একটি বাক্য ডিক্লাসিফাই করা হলো না] মুজিবুর রহমানকে রাত ১টায় সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ কাস্টডিতে নিয়ে যায়। গ্রেফতারের সময় তার দুজন সমর্থককে হত্যা করা হয়েছে। সোর্স প্রদত্ত দুটি বাক্য ডিক্লাসিফাই করা হলো না। এর পরবর্তী অনুচ্ছেদটির শুরু এভাবে: [সোর্স প্রদত্ত দেড়খানা বাক্য ডিক্লাসিফাই করা হলো না।] তারা বলেন, শুক্রবার রাতে ইয়াহিয়া যে ভাষণ দিয়েছেন, সেটা কেউ নিজ কানে না শুনলে বিশ্বাস

বলতে কষ্ট হবে যে– মুজিবুর রহমান সম্পর্কে তিনি কিভাবে গরল উগরে দিয়েছেন। যা ঘটে গেছে তাতে খুব ঝামেলা পোহাতে হবে। ইসলামাবাদ নিশ্চিত করেছে যে, মুজিবুর রহমানকে সাফল্যের সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কিসিঞ্জার: গতকাল মনে হয়েছিল একটা চুক্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

হেলমস: হ্যাঁ। ২৪ মার্চের কাছাকাছি সময় একটা চুক্তির সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সম্ভবত তা ভেঙে গেল এ কারণে যে, মুজিবুর রহমান অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার দাবি করেছিলেন। একটি গোপন বেতার প্রচার করছে যে, মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানে ২০ হাজার অনুগত পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য রয়েছে। এছাড়া পূর্ব পাকিস্তানি ৫ হাজার নিয়মিত এবং ১৩ হাজার আধা সামরিক বাহিনী রয়েছে। কিন্তু তাদের আনুগত্য সন্দেহপূর্ণ। আমরা ভারতীয় সংবাদপত্রের এই রিপোর্ট সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারিনি যে, জাহাজযোগে বিপুলসংখ্যক পাকিস্তানি সৈন্য পূর্ব পাকিস্তানে পৌছেছে। তবে ৬টি সি-১৩০ বিমানযোগে সৈন্যরা আজ করাচি থেকে ঢাকায় যাবে। এ জন্য তাদের অবশ্য বেশ সময় লাগবে। কারণ তাদের সিলন (শ্রীলংকা) হয়ে যেতে হবে। ঢাকায় ৭শ' এবং চট্টগ্রামে ৬০-৭০ জন মার্কিন নাগরিক রয়েছে। কিন্তু তাদের সরিয়ে আনার অনুরোধ এখনো পাইনি। [একটি অনুচ্ছেদসহ সোর্স প্রদত্ত দেড়টি বাক্য ডিক্লাসিফাই করা হলো না...।

স্বাধীনতার সমতুল্য ঘোষণা

১৯৭১ সালের ৪ মার্চ। ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের স্টাফ হেরাল্ড সেন্ডার্স ও স্যামুয়েল হসকিনসন কিসিঞ্জারকে দেওয়া এক স্মারকে লিখেছেন, পাকিস্তান থেকে প্রাপ্ত সর্বশেষ সংবাদে দেখা যাচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা অবনতিশীল। ১০ মার্চে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব মুজিবুর রহমান প্রত্যাখ্যান করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি কার্যত সুনির্দিষ্টভাবেই পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে সমন্বয়ের সম্ভাবনার দরজা দড়াম করে বন্ধ করে দিয়েছেন। মুজিব একাধিক বিদেশী সংবাদদাতাদের কাছে একাধিক বিদেশী সংবাদদাতাদের কাছে 'অব দ্য রেকর্ড' স্বীকার করেছেন, তিনি রোববার (৭ মার্চ) পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যা ঘোষণা করবেন, তা স্বাধীনতার সমান। তিনি অবশ্য এ কথাও বলেছেন, পূর্ব ও পশ্চিম অংশের উচিত হবে নিজেদের জন্য পৃথক সংবিধান প্রণয়ন করা। আর তার পরই কেবল দুই অংশের মধ্যে কিভাবে সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়, তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। মুজিবের এই মনোভাব থেকে মনে হতে পারে তিনি এক ধরনের কনফেডারেল সম্পর্কে রক্ষা করতে চাইছেন। আর সে কারণেই আমলা এই বিকল্প রাখতে চাইছি যে, আমরা যেন পূর্ব পাকিস্তানি স্বাধীনতায় স্বীকৃতি দিতে চাওয়া মাত্র ঝাঁপিয়ে না পড়ি। এ দলিলে আরো উল্লেখ করা হয়, ওয়াশিংটনে

পাকিস্তানি দূতাবাসের কর্মরত পূর্ব পাকিস্তানিরা স্বাধীনতার ঘোষণা' এলে সম্ভাব্য পরিস্থিতি নিয়ে স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাদের আশঙ্কা চ্যান্সারি থেকে তারা বহিস্কৃত হবেন। বর্তমান ডেপুটি চিফ অব মিশন একজন পূর্ব পাকিস্তানি। তিনি তখন হবেন নতুন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স।

পশ্চিম বার্লিন থেকে ডাকযোগে

১৯৭১ সালের ২২ জুন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স পাকিস্তান দূতাবাসে একটি টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন। এতে তিনি প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশের স্বীকৃতির বিষয়টি উল্লেখ করেন। বলা হয়, স্টেট ডিপার্টমেন্ট ২৪ এপ্রিল ১৯৭১, মুজিবনগর ডেট লাইনে প্রেসিডেন্টের বরাবরে প্রেরিত একটি ডকুমেন্ট পেয়েছে। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে 'সার্বভৌম স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' অভিলম্বে স্বীকৃতি চেয়েছে। এই ডকুমেন্ট 'ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট' সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং 'পররাষ্ট্রমন্ত্রী' খন্দকার মোশতাক আহমেদ স্বাক্ষরিত। এই ডকুমেন্টের সঙ্গে ১০ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' সংযোজিত রয়েছে। এটি পশ্চিম বার্লিন থেকে নিয়মিত আন্তর্জাতিক মেইলে এসেছে। কিন্তু খামের ওপরে ফিরতি ঠিকানা দেওয়া নেই। টেলিগ্রামে মন্তব্য করা হয়, ডাক যোগাযোগের এই ধরনটি প্রশ্নসাপেক্ষ কিন্তু এটি যদি প্রকৃত হয় (এবং আমাদের এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, এটি ঠিক নয়) তাহলে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে বাংলাদেশের পক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি চেয়ে এটাই কিন্তু প্রথম যোগাযোগ। যুক্তরাষ্ট্র অবশ্যই পূর্ব পাকিস্তানকে আগের মতোই পশ্চিম পাকিস্তানের অংশ হিসেবে গণ্য করবে। কিন্তু এই ডকুমেন্ট আমাদের একটা বিপাকে ফেলেছে। আর তা হলো জনসম্মুখে আমাদের পক্ষে এখন থেকে এটা বলা কঠিন হবে যে, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে স্বীকৃতির অনুরোধ কখনোই আমরা পাইনি। আমরা যেসব ব্যবস্থা নিচ্ছি তা হলো: আমরা এই ডকুমেন্টের প্রাপ্তি স্বীকার করব না, তবে এটি আমাদের রেকর্ড সার্ভিস ডিভিশন অন্যান্য নথির মতোই সংরক্ষণ করবে। এবং আমরা এটা বলা অব্যাহত রাখব যে, পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানেরই অংশ। যদিও আমাদের কখনো জিজ্ঞেস করা হয় বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের কোনো অনুরোধ কখনো আমরা পেয়েছি কিনা, তা হলে আমরা উত্তর দেব, 'আমরা আন্তর্জাতিক ডাকযোগে পশ্চিম বার্লিন থেকে প্রেরিত একটি চিঠি পেয়েছি। কিন্তু তার কোনো ফিরতি ঠিকানা নেই। কিন্তু তাতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বীকৃতি চাওয়া হয়েছে।

লক্ষণীয়, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অফিস অব দ্য হিস্টোরিয়ান, যারা সম্প্রতি এসব ডকুমেন্ট ডিক্লাসিফাই করেছে তারা নিশ্চিত করেছে ওই ডকুমেন্টের হদিস তারা পায়নি।

মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকার নেপথ্যে

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা সিআইএ'র অন্তত দুটো রিপোর্টে বিশেষভাবে মূল্যায়িত হয়েছে। দুটো রিপোর্টই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে দুর্বল করার দিকটি ছাড়াও আওয়ামী লীগের পরিবর্তে চীন ঘেঁষা কোনো চরমপন্থি গোষ্ঠীর উত্থানের সম্ভাবনাকেও তাদের সমর্থনদানের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ১৯৭১ সালের ১২ এপ্রিল সিআইএ'র ১৫ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্টে বলা হয়, বহু বছরের অর্থনৈতিক বৈষম্য ও রাজনৈতিক নিপীড়নের শিকার বাঙালিরা '৭০ এর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে চূড়ান্ত রায় দিয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক নেতৃবৃন্দ এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরিবর্তে সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে, আর সে কারণে অখণ্ড পাকিস্তান দেখার স্বাদ বাঙালিদের মন থেকে ইতিমধ্যে প্রায় মুছে গেছে। এখন কথা হলো– পাকিস্তানি আর্মি অসহযোগ কিংবা অব্যাহত সক্রিয় প্রতিরোধ কতটা ব্যাপকতার সঙ্গে মোকাবেলা করবে তা নির্ভর করবে ভারত তাদের কতটা সাহায্য করে তার ওপর। মাত্র কয়েক মাইল বাদে পূর্ব বাংলার স্থল সীমান্ত ভারতের সঙ্গে। এই সীমান্ত দিয়ে অস্ত্র ও গেরিলাদের চলাচল প্রতিরোধযোগ্য নয়। ইতোমধ্যেই এমন প্রমাণ মিলেছে যে, কিছু অস্ত্রের চালান ভারত সীমান্ত দিয়ে পূর্ব বাংলায় পৌছে গেছে (রিপোর্টের এই অংশের একটি স্থান কালি দিয়ে লেপটে দেওয়া হয়েছে)। বাঙালিদের জন্য ভারত সরকারের সমর্থনের কারণ মিশ্র হতে বাধ্য। প্রথমত, অভ্যন্তরীণ জনপ্রিয় চাপ– যা খুবই শক্তিশালী এবং ভারতের নিজস্ব জাতীয় স্বার্থের মূল্যায়ন থেকে। ভারতীয় পার্লামেন্ট ও সংবাদপত্রের সমর্থনও ইতোমধ্যেই জোরালো। পশ্চিম পাকিস্তান ও তার সামরিক বাহিনী দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের মুখ্য শত্রু। একটি সফল বাঙালি বিদ্রোহ পশ্চিম পাকিস্তানকে দুর্বল ও অপদস্থ করবে। পূর্বাংশ প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীর বিরোধ প্রশ্নে অনাগ্রহী। তারা কখনোই উল্লেখযোগ্য পাক-ভারত যুদ্ধে সম্পৃক্ত হতে চায়নি। তারা নয়াদিল্লির কাছে হুমকি হিসেবেও বিবেচ্য নয়। বরং পূর্ববাংলার নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে আওয়ামী লীগের মুজিবুর রহমান ভারতের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের প্রবক্তা। সুতরাং আমাদের অনুমান, ভারত বাঙালিদের ক্রমবর্ধমান ও অব্যাহতভাবে অস্ত্র সহায়তা দেবে, যা দ্বারা বাঙালিরা বিদ্রোহের ন্যূনতম শক্তি সঞ্চার করতে পারবে এবং তা পাক আর্মি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করতে পারবে না। এটা করতে গিয়ে অবশ্য ভারত এই ঝুঁকি মেনে নিচ্ছে যে, তার প্রদত্ত

কিছু অস্ত্র চরমপন্থিদের হাতে চলে যেতে পারে। ইতিমধ্যে বাঙালিরা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সমান্তরাল শক্তি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। অবশ্য সেনা উপস্থিতি যেখানে শক্তিশালী সেখানকার কথা আলাদা।

রিপোর্টে এ পর্যায়ে বলা হয়, নয়াদিল্লি বিলম্বের চেয়ে কেন অপেক্ষাকৃত আগেই বাঙালিদের পাশে দাঁড়াবে তার অন্য কারণও বিদ্যমান রয়েছে। আর তা হলো ভারত সম্ভবত এটা ভেবে উদ্বিগ্ন হবে যে, একটা দীর্ঘ সময় যদি বিদ্রোহ চলতে থাকে তাহলে তুলনামূলক উদারপন্থি আওয়ামী লীগের বিপরীতে কোনো নতুন চরমপন্থি নেতৃত্বের উত্থান ঘটতে পারে, যারা তখন নতুন দেশটির নেতৃত্ব দেবে। পূর্ব বাংলায় কোনো উগ্র রাজনৈতিক শক্তির অবস্থান ভারতের জন্য বহুমুখী সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। এটা বিশেষ করে পূর্ব বাংলার প্রতিবেশী ভারতীয় প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গের জন্য বেশি সত্য। পশ্চিমবঙ্গ খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্র এবং তাকে নিয়ে ঝামেলাও কম নয়। একাধিক চরমপন্থি কমিউনিস্ট গ্রুপ সেখানে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল। রাজধানী কলকাতার সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা ব্যতিক্রমীরূপে ভালো নয়। এখানকার নাগরিকরা সেক্ষেত্রে পূর্ববাংলার রেডিক্যাল রাজনৈতিক শক্তির দ্বারা প্রভাবিত এবং এমনকি বিচ্ছিন্ন হওয়ার মন্ত্রেও দীক্ষিত হতে পারেন। সুতরাং এই পটভূমিতে ভারতীয়রা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যই কাজ করবে না; তারা এটাও নিশ্চিত হতে চাইবে যে, সেখানে যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, সেটি হবে তার কাছে সন্তোষজনক। রিপোর্টের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে বলা হয়– ভারত বাঙালিদের কমবেশি গোপনীয়তার সঙ্গেই সহায়তাদানে অগ্রাধিকার দেবে, পরামর্শ, অস্ত্র ও আশ্রয় সবটারই একটা আড়াল থাকবে। দিল্লি অবশ্য পাকিস্তানের সীমান্ত অভিমুখে সৈন্য চলাচল করে নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করতে পারে, যদি বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে কিংবা ভারত যদি দেখে কোনো রেডিক্যাল নেতৃত্বের উত্থান সম্ভাবনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ তাহলে সে সম্ভবত তখন আরো প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন দেবে। এসব পদক্ষেপের ফলে ভারতীয় সম্পৃক্ততা গভীর থেকে গভীরতর হতে পারে এবং তারা পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষেও রূপ নিতে পারে। এমনকি প্রকাশ্য সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভারতের অন্য সীমান্ত থেকে সৈন্য সমাবেশ না ঘটিয়েও পূর্ব বাংলায় তাদের যে সৈন্য রয়েছে তা দিয়েই তারা পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাস্ত করতে সক্ষম।

সিআইএ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরুর ছয় মাস পর ১৯৭১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর ৩৩ পৃষ্ঠার আরেকটি রিপোর্ট প্রস্তুত করে। এতে নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি শীর্ষক পরিচ্ছেদে বলা হয়, ভারতীয়রা বলছেন পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব বাংলায় সামরিক শক্তি দিয়ে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ম্যান্ডেটকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে; কিন্তু তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। তারা সম্ভবত দেখছে ইসলামাবাদের বিরুদ্ধে বাঙালিদের প্রতিরোধের মাত্রা এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে যে, যা আর উপেক্ষা করা

পায় না। যে কোনো বিচারেই হোক তারা মনে করছে বিরাট ঝুঁকি সত্ত্বেও বাঙালিদের সমর্থন দেওয়াটা তাদের তরফে একধরনের নৈতিক বাধ্যবাধকতা। তারা হিসাব করছে, ভারত সমর্থিত মুক্তিবাহিনীর কার্যক্রম– পাকিস্তানিদের খরচ ও অব্যাহত ব্যর্থতা দুটোই এতটা বৃদ্ধি করছে যে, যার পরিণামে তারা হয় পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন মেনে নেবে অথবা পুরোপুরি মায়া ত্যাগে বাধ্য হবে। ভারতীয়রা ধরে নিয়েছেন তাদের উদ্দেশ্য শিগগিরই অর্জিত হতে পারে এবং তা একটি পূর্ণাঙ্গ পাক-ভারত যুদ্ধ ছাড়াই। বিদ্রোহে সহায়তাদান ছাড়াও ভারত বহু বেসামরিক আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে আশ্রয় দিয়েছে। বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারকেও তারা যথেষ্ট সহায়তা দিয়ে চলেছে। তবে এসব নেতৃবৃন্দের অনেকেরই ব্যক্তিগত ইমেজ বা জনপ্রিয়তা বলতে তেমন কিছুই নেই। সত্যি বলতে কী, মুজিবুর রহমান ছাড়া বাঙালিদের পক্ষে কথা বলার দাবি অন্য আর কেউ করতে পারেন না। মিসেস গান্ধী এ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারকে স্বীকৃতিদানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চাপ প্রতিহত করে আসছেন।

৭ জুলাই, ১৯৭১

স্থান : নয়াদিল্লিতে ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রামের কক্ষ।

[কিসিঞ্জার এসেছেন ভারত সফরে। তাদের আলোচনার বিবরণ থেকেও ভারতের অবস্থানটি অনুমান করা চলে।]

কিসিঞ্জার : আপনি কিভাবে চীনের কমিউনিস্ট মিলিটারির হুমকির মূল্যায়ন করেন?

জগজীবন : আমি দুদেশের সামরিক ভারসাম্যে কোনো পরিবর্তন দেখি না। কিছু স্থানে তারা সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছে। ভারতও একইভাবে প্রস্তুতি অব্যাহত রেখেছে। চীনা কমিউনিস্টরা উত্তর-পূর্ব সীমান্তে জঙ্গি তৎপরতার জন্য পূর্ব বাংলায় মিজদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল। সংখ্যায় সম্ভবত এরা হবে ১ হাজার থেকে ১২শ'। তবে চীনাদের দিক থেকে বর্তমানে যে, হুমকি তা সাধারণ পর্যায়ের। পূর্ব পাকিস্তানের সংঘাতকে কেন্দ্র করে তার সৈন্য বৃদ্ধি করেনি। এ সময় ভারতের প্রতিরক্ষা সচিব যোগ করেন যে, চীনারা ধীরে ধীরে সক্রিয় হতে শুরু করেছে। ভারতের উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্তে এখন প্রায় ১ লাখ সৈন্য রয়েছে। ...

কিসিঞ্জার : পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনা তিনি জানেন। পশ্চিম পাকিস্তানে কী ঘটছে তা-ই বলুন।

জগজীবন : পশ্চিম সীমান্তে উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে। যে কোনো নতুন অস্ত্র সরবরাহ ভারতের জন্য জটিলতা সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশকে দেখা উচিত শান্তি ও স্থিতিশীলতার এক ব্যাপকতর ভিত্তিতে। যুক্তরাষ্ট্রের বিচার করা উচিত যে, পাকিস্তান বাংলাদেশকে ধরে রাখতে পারবে কি না। পাকিস্তানের সঙ্গে তারা একত্রে থাকলেই

কি তা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের অনুকূল হবে?

কিসিঞ্জার : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই প্রশ্ন খতিয়ে দেখছে, যুক্তরাষ্ট্র কী করতে পারে।

জগজীবন : যুক্তরাষ্ট্র অনেক কিছুই করতে পারে। গোটা পাকিস্তানটাই টিকে আছে যুক্তরাষ্ট্রের অনুকম্পায়। আপনি কি একমত নন?

কিসিঞ্জার : অংশত।

জগজীবন : ভেবে দেখুন পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বৃদ্ধিতে আপনাদের সমর্থন কতটুকু? উদ্বাস্তু সমস্যা একটি অব্যবহিত সমস্যা সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট। মানুষ যদি ভাবে তারা ভারতে থাকার জন্য আসছে, তাহলে তা একটা বিরাট সামাজিক উদ্বেগের জন্ম দিতে পারে। কিন্তু সেটা যদি উপেক্ষাও করা হয়, তাহলেও কিন্তু বাংলাদেশ সমস্যার একটা সমাধান খুঁজে পেতেই হবে। পাকিস্তানের আর একটি নির্বাচন দরকার হবে। আমি সে ক্ষেত্রে কিছুই মনে করব না। কারণ দেশভাগের দিনগুলো থেকেই বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দকে আমার জানা আছে। পাকিস্তান যদি বাইরে থেকে বিপুল সাহায্য না পায় তাহলে তাদের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়।

কিসিঞ্জার : পাকিস্তান বর্তমানে বিপুল সাহায্য পাচ্ছে না।

জগজীবন : পাকিস্তান কিন্তু সে ধরনের সাহায্য লাভের আশায় দিন গুনছে। ...

কিসিঞ্জার : যুক্তরাষ্ট্র বিচ্ছিন্নতার পক্ষে নয়। আমরা একটি রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষে। আমরা ভারতকে মিসলিড করতে চাই না। আমরা এমন একটা পরিস্থিতি চাই যাতে উদ্বাস্তুরা ফিরে যেতে পারে। কিন্তু এটাও ঠিক যে, এই সমস্যা সমাধানে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো স্থির দৃষ্টিভঙ্গি নেই।

জগজীবন : তিনি পূর্ববাংলার পরিস্থিতি বুঝতে পারেন। পাঞ্জাবিরা বাঙালিদের সমান গুরুত্ব দিতে নারাজ। পাঞ্জাবি শাসকরা বাঙালিদের বিশ্বাস করে না। এখন পূর্ব পাকিস্তানে এমনকি তাদের পুলিশি শক্তিও নেই। মুজিবুর রহমান কখনো বিচ্ছিন্নতা চাননি। তাদের ছিল উদারনৈতিক প্রভাব। ভারতের সমস্যা হলো বর্তমানে প্রায় ৭০ লাখ উদ্বাস্তু আশ্রয় নিয়েছে। একটা সমাধান ছাড়া আমাদের আশঙ্কা হলো ভারত যে মৌলিক নীতির ওপর দাঁড়িয়ে আছে তা-ই হুমকিগ্রস্ত হবে।

কিসিঞ্জার : সমাধান কিভাবে আসতে পারে? মন্ত্রী হয়তো ভাবছেন, যুক্তরাষ্ট্রের একটি ফর্মূলা দেওয়া উচিত। যেন যুক্তরাষ্ট্রের নিজের আর কোনো সমস্যা নেই!

জগজীবন : যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে বলতে পারে, তাকে এমন একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে।

মুজিববিহীন কনফেডারেশনের স্বপ্নও দেখেছিলেন ভুট্টো?

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পরেও পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে একটি কনফেডারেশন গঠনের চেষ্টা চালিয়েছে। খন্দকার মুশতাক আহমেদ প্রমুখ এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কিন্তু আমেরিকার সদ্যপ্রকাশিত দলিল এই সত্যকে সামনে এনেছে যে, কনফেডারেশনের চিন্তা ১৬ ডিসেম্বরের পরেও সক্রিয় ছিল। আর সবচেয়ে নাটকীয় হচ্ছে এই ইঙ্গিত যে, ভুট্টো ভেবেছিলেন মুজিব বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে রাজনীতিতে দ্রুত ফুরিয়ে যাবেন। তাহলে কি তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন, মুজিবকে ছাড়াই এমন কিছু একটা করা সম্ভব হবে?

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় ভুট্টো কিন্তু একটুও আক্ষেপ করেননি। বরং ১৮ ডিসেম্বরে ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। স্পষ্টতই এটা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার স্বীকৃতি। কিসিঞ্জারও এ সময় নিক্সনকে পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ বন্ধের খবর দিয়ে বলেন, মি. প্রেসিডেন্ট অভিনন্দন, আপনি পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষা করতে পেরেছেন।

বাংলাদেশের বিজয় লাভের দুদিন পর অর্থাৎ ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ ভুট্টো পাকিস্তানের ডেসিগনেটেড উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সাক্ষাৎ করেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে। ভুট্টোর সঙ্গে ছিলেন পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত রাজা।

ভুট্টো বললেন, ২৫ মার্চের ঘটনা যদিও অবশ্যম্ভাবী ছিল। কিন্তু এর পরে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যা করেছে তা সমর্থনযোগ্য নয়। তবে ২৫ মার্চের পরেও একটা রাজনৈতিক সমঝোতা সম্ভব ছিল। এখনো আমি মনে করি ঢিলেঢালা হলেও একটা কনফেডারেশন বাস্তবায়নের চেষ্টা তিনি করবেন। তিনি বলেন, যদিও তাকে মাঝে মধ্যে ইয়াংকি বিরোধী সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু তিনি পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটাতে চান। তার কথায়– পাকিস্তানের প্রতিরক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও সভ্য সমাজের মৌলিক নীতি অনুসরণ করেছে পাকিস্তান তাতে মুগ্ধ। ভুট্টো এ মর্মে উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে, সোভিয়েতরা চেয়েছিল পাকিস্তানের বিনিময়ে কিউবার বিপরীত রূপ দিতে। ভুট্টো অবশ্য এ সময় ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করতে

অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। বলেন, এখন যা দরকার তা হলো দ্রুত পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতীয় সৈন্যদের চলে যাওয়া নিশ্চিত করা। আর সে ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্বল এক কনফেডারেশনের মাধ্যমে হলেও পাকিস্তানের ঐক্য ধরে রাখা সম্ভব। তিনি বলেন, আমি দুটো বিষয় স্পষ্ট করতে চাই। প্রথমত, দক্ষিণ এশীয় সংকটে আন্তর্জাতিক আইনে গোটা দৃশ্যপট সোভিয়েত আচরণ দ্বারা বিপর্যস্ত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভুট্টো ভারতের সঙ্গে রিকন্সিলিয়েশনের জন্য প্রস্তুত। ভুট্টো উল্লেখ করেন যে, আমরা শুনেছি– ভারতীয় যুদ্ধ জাহাজে সোভিয়েতরা এমনকি তাদের সৈন্য দিয়েও সহায়তা দিয়েছে। ওই জাহাজগুলো ছিল সর্বাধুনিক মিসাইল সজ্জিত। ভুট্টো বলেন, আমি জানি না এটা কতটুকু ঠিক। তবে এটা সত্য যে, পাকিস্তান এর আগে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু সোভিয়েতের সঙ্গে কখনো নয়। এবারে সোভিয়েতরা আমাদের পরাজিত করেছে এবং কিউবায় তাদের পরাজয়ের মাসুল নিয়েছে পাকিস্তানের মূল্যে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল চীনকে এটা দেখানো যে, তারা নয়, তৃতীয় বিশ্বের নেতা হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। দ্বিতীয় মৌলিক দিক হচ্ছে, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়নে পাকিস্তানি জনগণের প্রস্তুতি। ভারতের সামনে এখন সুযোগ এসেছে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন। অথবা সব সময়ের জন্য বিরোধিতা বজায় রাখা। ভারত যদি বর্তমানের সুযোগ হাতছাড়া করে তাহলে অনাগত ভবিষ্যতের জন্য ঘৃণা, বিশৃঙ্খলা ও ভয়ানক হত্যাযজ্ঞ বহাল থাকবে। এই ঘৃণা বাংলার মুসলমানদের যেমন তেমনি গোটা উপমহাদেশেই তরঙ্গায়িত হবে। ভারতের অবশ্য উচিত হবে দুদেশের মধ্যে একটা সম্মানজনক আপোসরফায় পৌছাতে বিচক্ষণতা প্রদর্শন করা। এটা বর্তমানের শূন্যতার মধ্যে হবে না। এজন্য সময় লাগবে। ভুট্টো বলেন, ইয়াহিয়া আমাকে দেশে যেতে বলেছেন আর সেজন্য আগামীকাল রোমে তার জন্য বিশেষ বিমান প্রস্তুত থাকবে। 'আমার দেশের মাটি কিভাবে তাকিয়ে আছে তা প্রত্যক্ষ করতে আমি উদগ্রীব।'

তিনি প্রেসিডেন্টকে বলবেন, হয় রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর এখনই হোক না হলে তাকে সমস্যা মোকাবেলায় কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। আর এটা সম্ভব না হলে তাকে ফিরে যেতে দেয়া হোক, সিন্ধে তার ছোট্ট র‍্যাঞ্চে। তিনি দেশে ফিরে নৌকার গতি ফেরাতে অথবা কারো কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জ করতে চান না। (এদিনের আলোচনার বিবরণ জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স বিভিন্ন দূতাবাসে যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন, তাতে এই পর্যায়ে একটি টীকা রয়েছে। (এতে বলা হয়েছে, ভুট্টোর এই মন্তব্যে এক ধরনের স্ববিরোধিতা রয়েছে। কারণ অন্যত্র তিনি বলেছেন তিনি আশা করেন যে, পাকিস্তানের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য নিশ্চয় আরেকটি যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করবে না।) ভুট্টো বলেন, মার্চ থেকে ঘটে যাওয়া অনেক বিয়োগান্তক অধ্যায় এড়ানো যেত, যদি না ক্ষমতা হস্তান্তরে মাত্রাতিরিক্ত বিলম্ব না ঘটানো হতো। ২৫ মার্চের সামরিক অভিযান ছিল অনিবার্য। কিন্তু তার পরের

ঘটনাবলি অমার্জনীয় এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমেই তা এড়ানো যেত। সরকার যদি জনগণকে তার সঙ্গে না নিতে চায় তাহলে সরকারের সবাই পরিণত হবে পিগমিতে এবং পাকিস্তান এক কঠিন অবস্থা থেকে আরেক অবস্থার মুখোমুখি হবে।

ভুট্টো বলেন, ভারতীয় এবং অন্যদের এখন যা বুঝতে হবে তা হলো, সব কিছু গুছিয়ে জনমত প্রস্তুত করতে তার এক মাস অথবা তার চেয়ে বেশি কিছু সময় দরকার হবে। তিনি বুঝতে পারছেন যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে ইতোমধ্যেই বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। পাকিস্তানের কাছে ভারতের যদি কিছু চাওয়ার থাকে তাহলে তাকে তা কূটনৈতিক চ্যানেলে বলতে হবে। তার কাছে মানবিকতাই কাম্য। কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে ভারতীয়দের ভীষণ সংকট রয়েছে এবং সে কারণেই ভারতের সাড়ায় তিনি আস্থাশীল থাকতে পারছেন না। ভুট্টো বলেন, যুক্তরাষ্ট্রকে তার অবশ্যই বলা উচিত, দয়া করে তথাকথিত বাংলাদেশকে দ্রুত সমর্থন দেবেন না। তিনি বেশ বুঝতে পারছেন যে, পাকিস্তানের দুই অংশেই এখনো পাকিস্তানপন্থি ভাবাবেগ তীব্র। ভারত যেভাবে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তার লক্ষ্য অর্জন করেছে তা থেকে বিষয়টি পরিষ্কার। স্বীকৃতির বিষয়টি নিয়ে অপেক্ষা করাই সঙ্গত। কারণ এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে হলে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী কিছু পূর্বশর্ত পূরণ করতে হবে। পাকিস্তান আশা করে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখবে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ পর্যায়ে ভারতের বিচক্ষণতার কথাটির ওপর গুরুত্ব দেন এবং বলেন যে, ভারতীয়রা জনসম্মুখে বেশ একটা বিচক্ষণতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। কিন্তু ঘরোয়াভাবে কার্যসাধন করেন একেবারেই ভিন্নভাবে। ভুট্টো এ কথার সঙ্গে একমত হন এবং বলেন যে, এ কারণেই এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে যে রাজনৈতিক উদ্যোগ নিয়েছে তার যেন হাল না ছেড়ে দেয়। ভারতের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের এটা স্পষ্ট করা উচিত যে, পাকিস্তানের সঙ্গে তার চুক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে এবং 'সে এখনই তার কার্পেট গুছিয়ে স্থান ত্যাগ করছে না'। ভারতকে এটাও স্পষ্ট করে বলা উচিত যে, দক্ষিণ এশিয়ায় কৌশলগত ভারসাম্যের পুনর্জীবনে পাকিস্তানকে ব্যাপক অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা দিতে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের তরফে ভারতকে এটাও জানিয়ে দেয়া উচিত যে, যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব জুড়েই উল্লেখযোগ্য স্বার্থ রয়েছে। আর তা দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্প্রতিক তৎপরতায় যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী নিষ্পত্তি চাইতে হলে ভারতকে এটা মনে রাখতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে তার এটাও শ্রবণ করা উচিত যে, তারা পূর্ব পাকিস্তানে এক রকম আর কাশ্মিরে অন্যরকম কিছু করতে পারে না। ভারতীয়রা পূর্ব পাকিস্তানি শক্তি প্রয়োগ করেছে। এখন প্রশ্ন হলো, কাশ্মিরে কী হবে? এসবই এই মুহূর্তের জরুরি বিষয়, যা যুক্তরাষ্ট্রের উচিত হবে ভারতকে সাফ জানিয়ে দেয়া। কিন্তু বাস্তবে পাকিস্তানকে কতটা সামরিক এবং অর্থনৈতিক সাহায্য দেয়া সম্ভব হবে তা এখন গুরুত্বপূর্ণ নয় (যুক্তরাষ্ট্রের জনমত

সম্পর্কে তিনি সচেতন)। যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান সরকার এসব বিষয় নিয়ে পরে আলোচনা করতে পারবে। কিন্তু এ মুহূর্তের জরুরি করণীয় হলো ভারতের মনে এই উপলব্ধি স্পষ্ট করা যে, যুক্তরাষ্ট্র এখন এরকমই ভাবছে। এ সময় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মন্তব্য করেন যে, ভারতকে এটাও বুঝতে হবে যে, শক্তি প্রয়োগ করে এভাবে এক প্রতিবেশীর বিচ্ছিন্নতা নিশ্চিত করার নীতি ভয়ঙ্কর এবং তা ব্যাপকভিত্তিক প্রভাব রয়েছে। ভুট্টো এতে সায় দিয়ে বলেন, সত্যি এটা এক ভয়ঙ্কর প্যান্ডোরার বাক্স।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তিনি আশা করেন যে, ভুট্টো এটা বুঝতে পেরেছেন যে, বাংলাদেশে মানবিক সাহায্য নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার জনমতের এক বিরাট চাপের মুখে থাকবে। ভুট্টো বলেন, তিনি তা বুঝতে পারেন কিন্তু তিনি এই আশাটুকু করেন যে, এটা এমনভাবে করা হবে যা কোনোভাবেই যেন স্বীকৃতির জন্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান না হয় এবং তা যেন পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে পাকিস্তানের পরিকল্পনাকে জটিল না করে। এ পর্যায়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ব-পশ্চিম সম্পর্কের ব্যাপারে প্রশ্ন করেন। ভুট্টো বলেন, পাকিস্তান নতুন একটা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আগ্রহী এবং সেজন্য তার প্রস্তুতি রয়েছে। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, এটা পাকিস্তানের জনগণকেই করতে হবে এবং সেজন্য ভারতীয় সৈন্যদের প্রত্যাহার নিশ্চিত করতে হবে। ভুট্টো বলেন, মুজিব গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন, কিন্তু দৃশ্যপটে তার পুনর্সম্পৃক্ততার জন্য জনমত গঠনের প্রয়োজন রয়েছে সর্বাগ্রে এবং তিনি মনে করেন না যে, যে কোনো পরিস্থিতি হোক না কেন, মুজিব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে কোনোক্রমেই তিন মাসের বেশি প্রভাবশালী হিসেবে গণ্য হবেন না। তার কথায়, মুজিব ভালো বক্তা ছিলেন, কিন্তু তার মাথায় কিছুই নেই। তিনি মার্চে যা চেয়েছিলেন সব কিছুই পেতে পারতেন। একমাত্র ইতিহাস একদিন বলতে পারবে যে, কে ছিল সত্যিকারের দোষী (রিয়াল কালপ্রিট) : 'মুজিব, ইয়াহিয়া না আমি।' ভুট্টোকে এ সময় প্রশ্ন করা হয়, আচ্ছা বলুন তো, মুজিবের পরে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের শীর্ষে কে আসতে পারে? ভুট্টো তা এড়িয়ে যান। শুধু বলেন, আরো অনেকে আছেন। কিন্তু তাদের কারো ভিশন নেই। দুর্ভাগ্যবশত পূর্ব পাকিস্তান ১৩ বছর ধরে সামরিক শাসনের আওতায় রাজনৈতিক দুর্ভোগ সহ্য করেছে এবং কেবল সোহরাওয়ার্দী ছাড়া অন্য কেউ নাম ভূমিকায় আসতে পারেননি। ভুট্টো বলেন, সোভিয়েতরা এখন সন্দেহাতীতভাবে বাংলাদেশের নেতৃত্বের পুরোভাগে তাদের নিজেদের লোক আনতে চাইবে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আচ্ছা তবে বলুন পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা এখন কী হওয়া উচিত। জবাবে ভুট্টো বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চয় সাত কোটি মানুষের সঙ্গে অবন্ধুসুলভ আচরণ করতে পারে না। ভারত তাদের সাহায্য কমিয়ে আনতে পারে। সে কারণে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ওপর তারা দারুণভাবে নির্ভরশীল থাকবে। তারাই শুধু দিতে পারে আশা। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ সময় সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চান কনফেডারেশনের রূপটি কী হবে? ভুট্টো বলেন, একটি

দুর্বল ভিত্তির কনফেডারেশন অতীতেই দুই অংশের মধ্যে হওয়া সম্ভব ছিল। তবে এখন তিনি নিশ্চিত করে বলতে পারেন না, এটা এখন কতটা সম্ভব? কিন্তু এটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, এ ধরনের একটা ব্যবস্থা ধরে রাখতে পাকিস্তানের জনগণ উদ্‌গ্রীব। ভুট্টো বলেন, মিসেস গান্ধী এখন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি। তিনি উপমহাদেশের উপরে বাংলাদেশকে স্থাপন করে দিয়েছেন (অন্যত্র তিনি 'বিচ্ছিন্নতাবাদের জীবাণু' শব্দটি ব্যবহার করেন। তার কথায়, যদি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আগের ভারসাম্য বজায় না থাকে তাহলে গোটা পাকিস্তানেই তা ছড়িয়ে পড়তে পারে)। তিনি বলেন, মিসেস গান্ধী 'সোভিয়েত মদ নিয়ে শয্যাগ্রহণের জন্য' একদিন অনুশোচনা করবেন। সোভিয়েতদের মধ্যে মানবিক গুণাবলির বিন্দুমাত্র নেই।

আলোচনা শেষ পর্যায়ে ভুট্টো বলেন, তারা আসলেই 'ভূগোলের ক্রীতদাস' এবং সে কারণেই তিনি তার পররাষ্ট্রনীতিতে ভারসাম্য বজায় রাখবেন। সাম্প্রতিক অতীতের ঘটনাবলি প্রমাণ করে যে, এই ভারসাম্য বজায় রাখাটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোনো ভারসাম্য না থাকত, চীনকে পালন করতে হতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আর সে ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে সামরিক সহায়তা দিতে যুক্তরাষ্ট্রকে 'ভয়ানক দায়' বহন করতে হতো। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার বক্তব্যের উপসংহারে বলেন, আমরা বুঝতে পারি পাকিস্তানি নেতৃত্বের জন্য চ্যালেঞ্জপূর্ণ দিন অপেক্ষা করছে। তিনি আশ্বাস দেন যে, বাংলাদেশেকে যুক্তরাষ্ট্র মানবিক সহায়তা দিয়ে যাবে। কিন্তু পাকিস্তানকে না জানিয়ে, কিংবা তাদের কোনো উদ্যোগে জটিলতা সৃষ্টি করে তারা কিছু করবেন না।

মার্কিন রাজনীতিবিদ উইলিয়াম পিয়ার্স রজার্স ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত নিক্সনের মন্ত্রিসভায় ছিলেন। ২০০১ সালের ২ জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ভুট্টো এক ভয়ঙ্কর বেজন্মা : নিক্সন

৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

স্থান : ওয়াশিংটন

সন্ধ্যা ৫ : ৫৭ থেকে ৬ : ৩৪

কিসিঞ্জার : মি. প্রেসিডেন্ট, এ বিষয়টা একটা রূপ (৫ সেকেন্ড ডিক্লাসিফাই করা হয়নি) পেতে চলেছে। ভুট্টো এখানে আসছেন, জাতিসংঘে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতও থাকবেন তার সঙ্গে।

নিক্সন : ভুট্টো?

কিসিঞ্জার : জি।

নিক্সন : সেই বেজন্মার বাচ্চাটা?

কিসিঞ্জার : জি। আমরা বুঝতে পারছি, তিনি যে নিষ্পত্তির ফর্মুলা দিয়েছেন তা আমরা যেভাবে চাইছি তার কাছাকাছি।...

নিক্সন : আমি জানি। ইয়াহিয়া সম্ভবত তাকে পাঠিয়েছেন (অস্পষ্ট)। সে একজন খারাপ মানুষ। ভুট্টো এক ভয়ঙ্কর বেজন্মা।

কিসিঞ্জার : কিন্তু কথা হলো, আমরা যদি এই ফর্মূলায় ইয়াহিয়ার সমর্থন পাই, তাহলে বিষয়টি নিয়ে রাশানদের কাছে যেতে পারি এবং একটা সুরাহাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা চীনাদের সুনজরেও থাকব। কারণ, আমরা ইয়াহিয়ার সমর্থনেই শীর্ষ সম্মেলন করতে পেরেছি। ... এটা ঠিক যে, তারা পূর্ব পাকিস্তান হারাবে। এ নিয়ে আর কিছুই করার থাকবে না।

নিক্সন : আমরা সবাই তা জানি।

কিসিঞ্জার : কিন্তু প্রশ্ন হলো তারা এটা কিভাবে হারাতে যাচ্ছে?

নিক্সন : এবং পশ্চিম পাকিস্তান, তারা মনে করছেন, যে কোনোভাবেই হোক তারা এটাও হারাতে বসেছে। আপনি কি তা মনে করেন না?

কিসিঞ্জার : ঠিকই বলেছেন, তাদের এখন যেমন মাথা খারাপের অবস্থা, তখন তারা অবশ্যই এমনটা ভাববেন।

নিক্সন : যিশুর দোহাই দিয়ে বলছি– এমনটা ঘটলে তখন কী হবে? তারা পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে একটি রাজনৈতিক সমঝোতার প্রস্তাব দেবে? কিন্তু এটা এখন তাদের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। ভারতীয়রা এটা কখনোই মানবে না। এমনকি

রাশানরাও নয়।

কিসিঞ্জার : না, সেটা কিন্তু নয়, রাশানরা কিন্তু মানবে। ব্রেজনেভের চিঠিতে সেই মজার কথাটাই কিন্তু লেখা হয়েছে। ব্রেজনেভ তার চিঠিতে লিখেছেন, '২৫ মার্চ, ১৯৭০ (১৯৭১?) যেখানে তাদের আলোচনা বিঘ্নিত হয়েছিল সেই পয়েন্ট থেকে সমঝোতার প্রক্রিয়া শুরু হওয়া উচিত। তাহলে তো তখন পূর্ব পাকিস্তান ছিল পাকিস্তানের অংশ এবং এখন যদি সোভিয়েতের নিষ্পত্তির পরিকল্পনা হিসেবে আমরা যদি এই ফর্মূলা পেয়ে যাই আর যদি আমরা বিকল্প বেছে নিই– অবশ্য তারা যদি ঘোষণা দেয়।

নিক্সন : তারা তো দিয়েছে। তারা তো সে কথাই বলেছে।

কিসিঞ্জার : না।

নিক্সন : কেন, চিঠিতে?

কিসিঞ্জার : চিঠিতে বটে। এখন আমরা যদি, মানে যদি আপনি এবং ব্রেজনেভ একটা যৌথ ঘোষণা দিতে পারেন। আমি যেভাবে ভাবি সেভাবে যদি বিষয়টি দাঁড়িয়ে যায়, আমরা যদি ইয়াহিয়াকে আগামীকাল সকালের মধ্যে এখানে পেয়ে যাই এবং সময়ের ফ্যাক্টর আমাদের জন্য কাজ করে–

নিক্সন : ইয়াহ।

কিসিঞ্জার : এই তিনটি বাক্যে আপনার এবং ব্রেজনেভের একটা যৌথ আবেদন হতে পারে। ভারতীয়রা যদি তা প্রত্যাখ্যান করে তখন আমরা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যেতে পারি। আর এই সময়ে নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েতরা আমাদের সমর্থন দেবে। কারণ তখন যৌথ–

নিক্সন : (অস্পষ্ট)।

কিসিঞ্জার : আর তখন আমরা ভারতীয়দের বেকায়দায় ফেলতে পারব। তখন আমরা ভারতীয়দের কাছ থেকে একটা মাত্রায় সোভিয়েতদের বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হব।

নিক্সন : উম, হুম।

কিসিঞ্জার : আর যদি ভারতীয়রা গ্রহণ করে নেয়, তখন কী ঘটবে? সর্বাগ্রে পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষা পাবে।

নিক্সন : ইয়াহ।

কিসিঞ্জার : অবশ্য একটা সময় পর্যন্ত এবং ভারতীয়রা যদি–

নিক্সন : ভারতীয়রা থামবে এবং তখন যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবে। কিন্তু ভারতীয়রা পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান করবে।

কিসিঞ্জার : তখন কী ঘটবে? পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটা সমঝোতা হবে এবং তার পরে পরিস্থিতি সম্ভবত বাংলাদেশের স্বাধীনতার দিকেই গড়াবে। তখন অবশ্য আর আমাদের কাঁধে দায় চাপবে না। বিষয়টি

ইয়াহিয়ার সম্মতিতেই পরিণতি লাভ করবে।

নিক্সন : ঠিক আছে, এখন–

কিসিঞ্জার : আপনি জানেন এটা একটা বেদনাদায়ক ফলাফল। কিন্তু এখন আমরা বলছি মি. প্রেসিডেন্ট–

নিক্সন : তবে কথা হলো এটা ছিল অবশ্যম্ভাবী। আমার বিবেচনায় পূর্ব পাকিস্তানকে কখনোই রক্ষা করা যেত না এবং এখনো আমি মনে করি পরিস্থিতি যেদিকে গড়িয়ে চলেছিল তাতে একে রক্ষা করা যেত না।

কিসিঞ্জার : আমি বলতে চাইছি, যখন এটা সব শেষ হয়েছে তখন–

নিক্সন : তারা আসলে বড্ড ঝামেলার, অভিশপ্ত পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষা করা।

কিসিঞ্জার : আমরা যদি সেইভাবে বেরিয়ে আসতে পারি মি. প্রেসিডেন্ট–

নিক্সন : আমরা যদি একটি শক্তিশালী পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষা করতে পারি, তাহলে আমাদের অনেক কাজই করা হবে।

কিসিঞ্জার : আমরা ইতোমধ্যেই যথেষ্ট করেছি। যারা ভারত সম্পর্কে রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে তারা আবারো ভ্রান্ত প্রমাণিত হবে। কারণ তারপর যদি–

নিক্সন : আসলে আমরা যদি বিষয়টি নিয়ে এগিয়ে যেতে সত্যি রাশানদের পাই তাহলে তা দুদেশের সম্পর্কের ওপর বিরাট ছায়া ফেলবে। সেই কারণেই আমি ডবরিনিনকে (সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত) এখানে চাইছি, যাতে আপনি তার কথাটা যথাযথভাবে বলতে পারেন।

কিসিঞ্জার : আমি জানি। ডবরিনিন আপনার সঙ্গে যুক্তিতর্ক করবে এবং তারপর এগিয়ে যেতে চাইবে।

নিক্সন : আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে, আমরা তাকে থামিয়ে দিয়েছি? আমাদের যুক্তি ছিল না।

কিসিঞ্জার : জি। ... তবে আসলে আমাদের কোনো সুযোগ নেই। এটা একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া। কেন আপনি শীর্ষ সম্মেলনকে ব্যাহত করবেন? এবং আমি মনে করি এসব যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আপনি শীর্ষ সম্মেলনে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারবেন।

নিক্সন : রাশানরা একটা বাস্তবসম্মত প্রস্তাব নিয়ে আসতে পারে।

কিসিঞ্জার : না।

নিক্সন : আমি তো না দেওয়ার কারণ দেখি না।

কিসিঞ্জার : না।

নিক্সন : আপনিই ভালো জানেন। এ ধরনের একটা সস্তা ছোট্ট খেলায় তারা কতদূর অগ্রসর হবে? আমি তো মনে করি না যে, তারা আমাদের কথাটা ফেলতে পারবে।

কিসিঞ্জার : প্রতিটি অনুভূতি দিয়ে আমি নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, তারা

এটা ছুড়ে ফেলে দেবে না। কারণ প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের ফ্রেমওয়ার্ককেই কবুল করেছে। আমাদের তরফে আপনি যা বলছেন, তা জানিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি পত্র দেওয়া উচিত। এটা হবে তাদের চিঠির আনুষ্ঠানিক জবাব।

নিক্সন : আমিও তা-ই মনে করি, চিঠিটি অবিলম্বে ব্রেজনেভের কাছে হস্তান্তর করা উচিত।

কিসিঞ্জার : আগামীকাল সকালে। কারণ এখন–

নিক্সন : আপনি জানেন এটা খুবই মজার বিষয় যে, কিভাবে এই লোকগুলোর সবাই সমান। ...

কিসিঞ্জার : এই বৈঠকে ব্রেজনেভের অনেক স্টেক রয়েছে মি. প্রেসিডেন্ট।

নিক্সন : তিনি এখানে সাফল্য পেতে চান, তাই তো?

কিসিঞ্জার : ইয়াহ। এ দেশের বেজন্মার বাচ্চারা আপনার ওপর যত খুশি প্রস্রাব করতে উদগ্রীব।

নিক্সন : তারা কিন্তু বসে নেই।

কিসিঞ্জার : কিন্তু এ দেশের বাইরে এই মুহূর্তে আপনিই বিশ্ব নেতা, আর ট্রুডোর (সম্ভবত কানাডার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী) কথা ছাড়ুন। আপনার সব কিছুতেই তার অপছন্দ। কোনো কিছুতেই আপনার সঙ্গে তার মেলে না।

নিক্সন : সেটা ঠিকই বলেছেন।

কিসিঞ্জার : বলুন তো, কোন আক্কেলে তিনি বললেন, এটা একটা দারুণ বৈপ্লবিক মতবাদ। এর কারণ হলো, তিনি নিজেকে অন্তত অ-কমিউনিস্ট বিশ্বের নেতা হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইছেন।

নিক্সন : কোসিগিনের (সোভিয়েতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী) সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছেন। আবার আমেরিকান হিসেবেও চিত্রিত হতে চেয়েছেন।

কিসিঞ্জার : কিন্তু কোসিগিন সম্পর্কে তিনি কিন্তু এটা বলেননি এবং এটা বলতেও পারেন না। কারণ তার অভ্যন্তরীণ মতামত এতে সায় দেবে না।

নিক্সন : সেটা ঠিক।

কিসিঞ্জার : যদি তিনি বলতেন যে, কোসিগিন একটি বিপ্লবী প্রস্তাব।

নিক্সন : জাতিসংঘে সেই ভোট কিন্তু যথেষ্ট খারাপ ছিল না। এর প্রতি একটা প্রতিফলন ছিল।

কিসিঞ্জার : ঠিকই বলেছেন। আসলে আমাদের লিবারেল স্টাবলিশমেন্ট বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে এবং নৈতিকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত ষোলআনাই। তারা আসলেই যা বলতে চাইছেন, তা হলো যে দেশটির (পাকিস্তান) সঙ্গে কেনেডির একটি অঙ্গীকার রয়েছে তাকে ধর্ষণ করার অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করতে। তবে এখন আপনি যেটা নিশ্চিতভাবেই অর্জন করতে যাচ্ছেন তা হলো পশ্চিম পাকিস্তানকে। এটা একটা বিয়োগান্তক অধ্যায়। কিন্তু–

নিক্সন : এমনটা আগেও ঘটেছে।

কিসিঞ্জার : কিন্তু তিনি যেভাবে চেয়েছেন সেভাবে আমরা কিন্তু তাকে পূর্ব পাকিস্তান ইস্যুতে জড়াতে বলিনি।

নিক্সন : আমি জানি। ...

একটা কথা আমি আপনাকে জানাতে চাই। কোনালি (সাবেক মার্কিন অর্থমন্ত্রী যিনি ঢাকা সফর করেছেন) যা উল্লেখ করেছেন, আমার এ কথাটা আদেশ হিসেবেই আপনাকে নিতে হবে। ভারতীয় অর্থ থেকে ২৫ মিলিয়ন ডলার তুলে নিন এবং সেটা পৌঁছে দিন ইন্দোনেশিয়াকে। আমি ইন্দোনেশিয়ার মতো একটি মুসলিম দেশকে জানাতে চাই আমরা তাদের বন্ধু। আমার মনে হয় বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করবে।

কিসিঞ্জার : জি।

নিক্সন : রাজি?

কিসিঞ্জার : বিলক্ষণ।

নিক্সন : ঠিক আছে। আপনি কি আদেশটি জারি করতে পারেন?

কিসিঞ্জার : মিনিটের মধ্যেই আমি এটা করতে পারি।

নিক্সন : এক্ষুণি করুন। আমি কি বোঝাতে চাইছি হেনরি? যদি দরকার পড়ে আমার নামেই এটা করুন।

কিসিঞ্জার : ওহ, না, না, না। ...

নিক্সন : বঙ্গোপসাগরে আমাদের নৌবহর পাঠানোই ঠিক হবে। হেনরি আপনি যদি সত্যিই কিছু করতে চান, তাহলে যিশুখ্রিস্টের দোহাই সেখানে নৌবহর পাঠান।

কিসিঞ্জার : সত্যি বলতে কী, যদি একটা সমঝোতাও হয়ে যায়, সেখানে আমাদের এরকম শক্তি প্রদর্শন করতে হবে, যাতে তারা দেখতে পায় যে আমরা এটা করতে পারি এবং সরেও আসতে পারি।

নিক্সন : ঠিকই বলেছেন।

কিসিঞ্জার : তখন আমাদের কেউ দায়ী করতে পারবে না।

নিক্সন : সেটাই ভালো। আমাদের উচিত হবে নৌবহর প্রেরণ করা। প্লেনও পাঠিয়ে দিন। আর ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে ডেকে এ খবর জানিয়ে দিন। আমি মনে করি, এই গ্রুপের কাছে বিষয়টি জানিয়ে রাখাই ভালো, যেমনটা আমি রুশমন্ত্রীকে এইমাত্র জানিয়েছি এবং আপনি তাকে যেভাবেই হোক এখনই জানিয়ে দিন।

কিসিঞ্জার : না। এভাবে জানানোটা আমার পক্ষে ঠিক হবে না।

নিক্সন : উত্তম।

কিসিঞ্জার : এটাই বরং ভালো। কিন্তু এভাবে নয়–

নিক্সন : অস্পষ্ট। রাশানদের বলুন।

কিসিঞ্জার : এভাবে কিন্তু ঠিক হবে না।

নিক্সন : আমাদের সম্পর্ককে বিষময় না করে। অবশ্য আমি ভেবেছিলাম ...

নিক্সন : আমাদের সম্পর্ককে বিষময় না করে। অবশ্য আমি ভেবেছিলাম...

কিসিঞ্জার : আমার মতে আপনার বিবৃতিটি শক্তিশালী। হেগ বলেছেন, আপনার কাছ থেকে এ পর্যন্ত এ সংক্রান্ত যত বিবৃতি এসেছে তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে শক্তিশালী। সত্যিই খুব শক্ত। আপনি জানেন, এটা যদি কাজ হয় তাহলে এটা স্মরণীয় বলেই প্রতীয়মান হবে।

নিক্সন : আমি বাজি ধরে বলতে পারি। যে বার্তা মস্কোতে গেছে তা ইতোমধ্যেই সেখানে গুঞ্জরন তুলেছে।

কিসিঞ্জার : আগামীকালের মধ্যে আমরা একটা জবাব পেতে পারি। শনিবারের সকালের মধ্যে তো বটেই।

নিক্সন : দেখুন হেনরি, আমি কিন্তু আপোস চাই। আমি বলেছি, এ বিষয়ে ভারতীয়দের সংযত করতে। একটা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মেনে নিতে যা রাজনৈতিক নিষ্পত্তির পথ সুগম করবে। সত্যি বলতে কী? এটা হলো তারই ডিল, যা নিয়ে আমরা কথা বলছি।

কিসিঞ্জার : যাক, সেখানে কতগুলো বদমায়েশ ছিল। আপনি না কি বলেছেন, 'টক টু দ্য আওয়ামী লীগ'।

নিক্সন : ইয়াহ।

কিসিঞ্জার : আর সে কথাটাকেই এখন তারা এমনভাবে বলছে যে ২৫ মার্চে যেখানে আলোচনা স্থগিত হয়েছিল, সেখান থেকে শুরু করতে। এ কথার প্রকৃত মানে হচ্ছে মুজিবের মুক্তি।

নিক্সন : ও তাই নাকি।

কিসিঞ্জার : অন্যদিকে কিন্তু–

নিক্সন : সেটাও সুরাহার যোগ্য।

কিসিঞ্জার : কিন্তু আমি পরিসংখ্যান দিয়ে বলতে চাই, মি. প্রেসিডেন্ট প্রথম পর্যায়ে আমরা কতিপয় সাধারণ নীতির বৃত্তান্ত দিতে চাই। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো– এখন ভারতীয়দের ক্ষমতা খর্ব করা। পাকিস্তানিরা তাদের ৮০ ভাগ 'পিওএল' হারিয়েছে। তারা করাচিকে পুরোপুরি ধ্বংস করেছে। পাকিস্তানিরা আর দুই সপ্তাহের মধ্যে ভেঙে পড়তে যাচ্ছে। আমরা যদি পশ্চিম পাকিস্তানকে বাঁচাতে পারি তাহলে তা হবে–

নিক্সন : ৩০ শতাংশ?

কিসিঞ্জার : এটা হবে এক অসাধারণ সাফল্য অর্জন। পরিস্থিতি কিন্তু এর অনুকূলে মোটেই নয়।

নিক্সন : কারণ ভারতীয়রা এটা গিলে খাওয়ার জন্য প্রস্তুত?

আমেরিকা চায় ঢাকা-দিল্লি তিক্ততা : ইন্দিরা

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সঙ্গে নিক্সন প্রশাসনের সম্পর্ক নিয়ে ভারতের মনে সন্দেহের একটা দোলাচল ছিলই। বিষয়টি সম্পর্কে ইঙ্গিত মেলে সাহায্য দেওয়া নিয়ে। বিজয়লগ্নেই তাই মার্কিন কর্মকর্তারা স্টেট ডিপার্টমেন্টকে এমন তথ্য দিয়েছিলেন যে, বাংলাদেশকে সাহায্য করার বিষয়টি ভারত তার সঙ্গে নতুন রাষ্ট্রের সম্পর্কে চিড় ধরানোর চেষ্টা হিসেবেই সন্দেহ করছে। কিন্তু এ ব্যাপারে ভারতের মনে যে সত্যই সন্দেহ ভর করেছিল তা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কঠোরতার সঙ্গে প্রকাশ করেছিলেন দিল্লিতে নিযুক্ত বিদায়ী মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ কিটিংয়ের কাছে। ইন্দিরা যে ঐ সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি কতটা ক্ষুব্ধ ছিলেন তার প্রামাণ্য দলিল হচ্ছে কিটিংয়ের একটি টেলিগ্রাম।

২৪ জুলাই, ১৯৭২

আমি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পৌছার পর মুহূর্তেই দেখলাম, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ও বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় বেরিয়ে এলেন। তার চোখে-মুখে বিষাদের ছাপ। কিন্তু আমাকে দেখেই স্মিত হাসলেন। বললেন, কত দিন আপনাকে দেখি না। এটি ছিল যেহেতু আমার বিদায়ী সাক্ষাৎকার, তাই নোট টুকে নিতে আমি কাউকে সঙ্গে নেইনি। কিন্তু তার (ইন্দিরা) তরফে এ কাজের জন্য ঠিকই একজন বসেছিলেন, যিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আমাদের পুরো সাক্ষাৎকার টুকে রাখেন।

গান্ধীকে আমি দেখলাম ক্লান্ত, অসুখী অথবা ব্যস্ততাজনিত কারণে চিন্তিত। তিনি অবশ্য আমাকে দেখে হাসলেন। প্রতিউত্তরে আমার মুখে বিস্মৃত হলো হাসি (কিন্তু পুরো সাক্ষাৎকারে উভয় তরফেই সেই ছিল শেষ হাসি)। তিনি আমাকে বললেন, আপনি প্রেসিডেন্টের জন্য নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিতে যাচ্ছেন না?

বললাম, হ্যাঁ। আমি তাকে আমার প্রতি প্রদত্ত তার শুভেচ্ছা ও সৌজন্যের জন্য অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানালাম। এ পর্যায়ে তিনি বললেন, যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে ভারত বিরোধিতায় লিপ্ত থাকছে তা ভুলে যাওয়া সত্যি কঠিন। আমি বললাম, আমি গভীরভাবে ব্যথিত। আমার প্রথম বছরটিতে এটি খুব খারাপ অবস্থায় ছিল। আমাদের মতপার্থক্য বিশেষ করে দক্ষিণ এশীয় সংকট সবারই জানা। উভয় পক্ষেই দুর্ভাগ্যজনক মনস্তাত্ত্বিক বাধা রয়েছে, যা কাটিয়ে উঠতে আরো সময় লাগবে।

আমি প্রধানমন্ত্রীকে বললাম, যুক্তরাষ্ট্র-ভারতের মধ্যে স্বার্থগত কোনো সরাসরি সংঘাত নেই। ভূখণ্ডগত, বাণিজ্যিক, সামরিক কিংবা আদর্শগত প্রশ্নেও কোনো স্বার্থের সংঘাত অনুপস্থিত। যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মনে করে, একটি প্রতিযোগিতামূলক মুক্তবাজার পদ্ধতি অর্থনৈতিকভাবে আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ। আর ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মনে করেন, ভারতীয় ধাঁচের সমাজতন্ত্রই অনবদ্য।

মিসেস গান্ধী আকস্মিকভাবে আমাকে ভীষণ চমকে দিয়ে বললেন, যুক্তরাষ্ট্র যা কিছুই করছে তা ভারতের বিরুদ্ধে। আমি তার মন্তব্যের ধাক্কা কাটিয়ে বললাম, তিনি এইমাত্র যে সুইপিং কমেন্ট করলেন তা যদি সুনির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আমি তাকে স্বাগত জানাব। বললাম, আমরা বহু বছর ধরে ভারতকে ১০ বিলিয়ন ডলারের সাহায্য দিয়ে আসছি, যার মধ্যে ২০ শতাংশ সরাসরি মঞ্জুরি; বাদবাকিটা ঋণ। কিন্তু তাও অত্যন্ত সহজ শর্তে। আপনিই বলুন, এসবই কি ভারতবিরোধিতার নমুনা?

এমন বিপুল পরিমাণ ঋণ আমরা আর কোনো দেশকে এককভাবে দেইনি। অন্যদিকে দক্ষিণ এশীয় সংকটের সময় (বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ) ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী উদ্বাস্তুদের আশ্রয়দানের বোঝা লাঘবে আমরা সহায়তা দিয়েছি। সর্বোপরি বাংলাদেশকে এখন আমরা যে সাহায্য দিচ্ছি তা দেশকে যাতে অর্থনৈতিকভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে শুধু সেই কারণেই। এবং আমরা ভেবেছি ভারতও বাংলাদেশকে এমন এক প্রতিবেশী হিসেবে দেখতে চায় যে কি না অর্থনৈতিকভাবে ভায়াবেল। আপনারা নিশ্চয় দেখতে চান ভারতবিরোধী কোনো উগ্রপন্থি গোষ্ঠী বাংলাদেশে বিকশিত না হোক। আর এখানেই আমাদের অভিন্ন স্বার্থ। সুতরাং বাংলাদেশকে সাহায্যদানে ভারতবিরোধিতার কোনো প্রশ্নই আসে না। আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম। আমার সরকারের নীতি অবশ্যই ভারতবিরোধী নয়। আমি দুঃখ প্রকাশ করে বললাম, আপনি কী করে যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে এমন ভ্রান্ত ধারণায় উপনীত হলেন? তাকে আরো বললাম, যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে তার রূঢ় অনুভূতি নিশ্চয়ই বিকৃত তথ্যের ভিত্তিতে হয়ে থাকবে। আর সেসব তথ্য তারাই তাকে জুগিয়েছে যারা আসলে ভারত যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের আরো অবনতি দেখতে চায়; এবং নিশ্চয় তাদের একটি অশুভ পরিকল্পনা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমি আরো বললাম, আমি একশ্রেণীর ভারতীয় প্রেসে কিছু 'ফ্যান্টাস্টিক স্টোরি' দেখলাম। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক সাহায্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতের কাছ থেকে বাংলাদেশকে দূরে সরিয়ে আনা। এবং সেই লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের এজেন্টরা বর্তমানে সক্রিয় রয়েছে।

তিনি বললেন, 'এসব কিন্তু মোটেই ফ্যান্টাস্টিক স্টোরি নয়। এসবই সত্য। আর তার চেয়ে বড় সত্য কথাটা জেনে রাখুন, বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দও কিন্তু ঠিক একই কথা ভাবছেন। জবাবে আমি তাকে বললাম, ম্যাডাম প্রাইম মিনিস্টার, আপনি আমাকে দারুণভাবে অবাক করলেন। এ ধরনের কোনো অপারেশন পরিচালনায়

যুক্তরাষ্ট্রের কী মতলব থাকতে পারে। বাংলাদেশে আমাদের কোনো বাণিজ্যিক, সামরিক, ভূখণ্ডগত অথবা অন্য আর কোনো লক্ষ্য নেই। একইভাবে ভারতেও নেই। স্থিতিশীলতার প্রতিষ্ঠা ছাড়া আমাদের অন্য কোনো ফায়দা নেই। সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার জন্যই আমাদের একই অভিপ্রায়। ভারত ও পাকিস্তানের স্থিতিশীলতা শুধু দক্ষিণ এশিয়ার জন্য নয়, যুক্তরাষ্ট্রসহ গোটা বিশ্বের জন্যই প্রত্যাশিত।

জবাবে প্রধানমন্ত্রী বললেন, যুক্তরাষ্ট্র খোদ ভারতের মাটিতেও আমাদের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাচ্ছে। আমি তাকে বললাম। আমি খবরের কাগজে এমন রিপোর্ট পড়েছি যে, আমরা সিপিএমকে সহায়তা দিচ্ছি, আপনি এবং আপনার দলকে খাটো করতে। আমি প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা বলুন তো বাম চরমপন্থিরা যে সিপিএম গঠন করেছে তার সঙ্গে আমাদের মিলটা কোথায়? মিসেস গান্ধী বলেন, এ ব্যাপারে কিন্তু আমাদের হাতে প্রমাণ রয়েছে। বললাম, খুবই ভালো কথা। তিনি যদি তার বক্তব্যের স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ হাজির করতে পারেন তাহলে আমি এবং আমার সরকার এ বিষয়টা অবিলম্বে খতিয়ে দেখব। এমন যদি কিছুর অস্তিত্ব থাকে তাহলে আমরা অবিলম্বে তা বন্ধ করে দেব, যদিও এমন কিছু আছে বলে আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। এ পর্যায়ে তিনি সেক্রেটারি রজার্সের সঙ্গে ১৯৭০ সালের অক্টোবরে নিউইয়র্কে যে স্টাইলে কথা বলেছিলেন ঠিক তার পুনরাবৃত্তি ঘটান। বলেন, আমরা হয়তো সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে তা আদালতে প্রমাণ করতে পারব না। কিন্তু এসব যে কিছু ঘটে চলেছে তা জানার উপায় আমাদের রয়েছে। আমি বললাম, এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার যে, এরকমের বিষয় আদালতে নিয়ে গিয়ে প্রমাণ করা। প্রতিষ্ঠিত নিয়ম হলো যখন কেউ কিছু সম্পর্কে অভিযোগ করবে, তখন প্রথমে সে অন্তত কিছু প্রমাণ হাজির করবে। শুধু সংশয় প্রকাশই যথেষ্ট নয়। বললাম, সত্যি বলতে কী, এ বিষয়ে আপনার মনের দুয়ার বন্ধ হয়ে আছে। আমি খুবই দুঃখিত যে, আপনি এমনটা ভাবতে পারেন। আমাকে এটা বলতে দিন যে, আমি এবং আমার সরকার আপনাকে এবং আপনার দলকে ভারতের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে স্বীকার করে। ডানপন্থি শিবির থেকে আপনার বিরোধিতা কার্যত মুছে গেছে। আর আপনার বিরোধী যে বাম তাদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কিছুতেই মিল নেই। আমি উদ্বিগ্ন এই ভেবে যে, আপনি দুষ্ট লোকের পাল্লায় পড়েছেন। তারা আপনাকে ক্রমাগত কুমন্ত্রণা দিচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য অসৎ হতে বাধ্য। আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি, যেসব অভিযোগ তারা করেছে তা ভ্রান্ত। আমি বললাম, যুক্তরাষ্ট্রের বহু অধ্যাপক ও গবেষক ভারতের বন্ধু; কিন্তু এখন তাদের ভিসা স্থগিত রয়েছে। আমি জানতে চাইলাম, এটা সরকারের নীতি, আমলাতান্ত্রিক সতর্কতা অথবা নিরেট মার্কিনবিরোধী মনোভাবপ্রসূত কি না? তিনি বললেন, এসব অধ্যাপকের অনেকেই ভারতে অপতৎপরতায় লিপ্ত, যা ভারতের স্বার্থের পরিপন্থি। আমি এক্ষেত্রেও তাকে সুনির্দিষ্ট তথ্য দিতে বললাম। কিন্তু তিনি এ ক্ষেত্রেও এড়িয়ে গেলেন।

কেনেথ কিটিং তার টেলিগ্রামে আলোচনার বৃত্তান্ত শেষে উপসংহারে লিখেছেন– ইন্দিরা গান্ধী রাখঢাক না করেই বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ভারতে সাহায্য প্রদান কিংবা কর্জ রেয়াতের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেয় বা না নেয়, তাতে ভারতের কিছুই যায়-আসে না। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য পাক আর না-ই পাক, ভারত অবশ্যই টিকে থাকবে এবং সে তার অগ্রগতিও নিশ্চিত করবে। পুরো আলোচনাজুড়েই তার মনোভঙ্গিটি ছিল বেপরোয়া। যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে নিকৃষ্টতর সবকিছুই ভাবতে তিনি ছিলেন প্রস্তুত। কোনো ব্যাখ্যা শুনতে চাননি, শুধু আক্রমণেই ছিলেন উদগ্রীব। কথা বলার শুরু থেকেই তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করতে তার চশমা ঘন ঘন খুলছিলেন। অনবরত বেল টিপেছেন এবং ভৃত্যদের ডেকে সাদামাটা কথা বলেছেন। টেলিফোন কল করেছেন, কথা বলেছেন হিন্দিতে। আমি যতবারই কথা বলেছি, তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে একটা না একটা কিছু কর্ম সম্পাদন করেছেন। আমি আসলে ওয়াকআউট করা থেকে বিরত এবং অতি কষ্টে আমার ভাবাবেগ অবদমিত করতে পেরেছি। অন্যদের সঙ্গে আলোচনাতেও কিন্তু তার কাছ থেকে আমি এমনটা দেখেছি। এটা হয়তো তার দিক থেকে আলাপ-আলোচনার প্রতি তার অনাগ্রহের ইঙ্গিত অথবা তিনি দেখাতে চান, তিনি আসলে কত ব্যস্ত এবং কত অতিথিই-না তার পথপানে চেয়ে থাকে। পাশ্চাত্যের জগতে আমরা একে বলি 'রুডনেস' বা রূঢ় আচরণ। প্রধানমন্ত্রী বললেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার মঙ্গল কামনা করি এবং আবারও তিনি কিন্তু বড় স্পষ্ট করে 'ব্যক্তিগত' শব্দটির ওপরই জোর দেন। আমরা করমর্দন করলাম এবং নিষ্ক্রান্ত হলাম।

এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালের ১২ এপ্রিল সিআইএ'র একটি রিপোর্টে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কের রূপরেখা দেওয়া হয় এভাবে : 'পূর্ব বাংলা খুব শিগগিরই অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও রাজনৈতিক সংকটে পর্যুদস্ত হবে। মডারেট মুজিব ক্ষমতায় এলেও এই প্রশ্ন থেকে যাবে যে, তিনি তার জনগণের ব্যাপক অংশের জীবনমানে কতটা পরিবর্তন আনতে পারবেন? যদি তিনি তা না পারেন, তবে স্বাধীনতার ভাবাবেগ তুলনামূলকভাবে খুব বেশি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ফিকে হয়ে যেতে পারে। আর তখন পশ্চিমবঙ্গের চরম ও উগ্রপন্থিদের মতবাদের দিকে বাংলাদেশ ক্রমবর্ধমান হারে ঝুঁকে পড়ার আগ্রহ দেখাবে। আর তখন বাংলাদেশের সরকার, যার কোনো সুসংগঠিত নিরাপত্তা বাহিনী থাকবে না, তখন তার পক্ষে সেই সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা কঠিন হতে পারে। আর সে কারণেই, বাংলাদেশ অব্যাহতভাবে ভারত সরকারের উদ্বেগের কারণ হবে। পূর্ব বাংলা দুর্বল কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে ভয়ঙ্কর। আর তাই ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী তাকে সবসময় কড়া নজরে রাখবে। আর তখন সম্ভবত জাতীয় নিরাপত্তার নামে দিল্লির তরফে বাংলাদেশ হবে ম্যানুপুলেশন এবং এমনকি প্রকাশ্য হস্তক্ষেপের লক্ষ্যবস্তু।'

ইন্দিরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাননি

ইন্দিরা গান্ধী নিক্সনের অর্থমন্ত্রী জন বি কোনালিকে বলেন, তিনি (মুজিব) সত্যিই যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রশ্নে আবেগপ্রবণ। প্রসঙ্গটি অবশ্য কোনালিই তুলেছিলেন। প্রভাবশালী মার্কিন রাজনীতিক কোনালি ১৯৭২ সালের ৬ জুন থেকে ১১ জুলাই বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানসহ বিশ্বের বহু দেশ সফর করেন। তিনি ঢাকায় বঙ্গবন্ধু, সিমলায় ইন্দিরা ও রাওয়ালপিন্ডিতে ভুট্টোর সঙ্গে যথাক্রমে ৩, ৫ ও ৬ জুলাই মিলিত হন।

কোনালি এই তিন নেতার সঙ্গে সাক্ষাতের পর হোয়াইট হাউসে ১৪ জুলাই ১৯৭২ নিক্সন ও কিসিঞ্জারের কাছে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ অবশ্যই হবে বিশ্বের নিকৃষ্টতম স্থান। কিন্তু দেশটির প্রয়োজন আমাদের সমর্থন। ভারতের সঙ্গে রচনা করতে পারে সেতু। প্রেসিডেন্ট নিক্সন এ সময় বলেন, জাপানিদের অবশ্যই উচিত এই এলাকার অধিকতর উন্নয়নে অর্থনৈতিক সহায়তা দেওয়া। কোনালি মুজিব সম্পর্কে বলেন, তিনি বাকপটু, চৌকস, দক্ষ অভিনেতা এবং বক্তৃতাবাগীশ। কোনালি বলেন, বাংলাদেশ টিকে থাকতে পারে কি না তা নিয়ে একটা প্রশ্ন ছিল। তার এখন দরকার পশ্চিম পাকিস্তানে আটকেপড়া দক্ষ বাঙালিদের। অন্যথায় তার বেসামরিক আমলার অভাব ঘুচবে না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অব্যাহত সমর্থনের দায়িত্ব নিতে পারে না। ভারতে মিসেস গান্ধী তাকে আশ্বস্ত করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভারতের কোনো বিদ্বেষ নেই। উল্লেখ্য, কেনেথ কিটিং ইন্দিরার সঙ্গে আলোচনায় যে তিক্ত অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন কোনালির অভিজ্ঞতা ছিল ঠিক বিপরীত। ইন্দিরার আচরণে তিনি ছিলেন মুগ্ধ। ভুট্টো সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ভুট্টো যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। কোনালি বলেন, পাকিস্তানি নেতৃত্বের গুণগত মান অত্যন্ত উঁচু। বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানিদের নিপীড়নের কথা ভুট্টো অস্বীকার করেন। যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রশ্নে ভুট্টো বলেন– এটা পাকিস্তানকে যুদ্ধে জড়াতে বাধ্য করবে। পাকিস্তান ভারতীয়দের অনুকম্পার জন্য বসে থাকবে না। ভুট্টোও একজন চৌকস রাজনীতিক এবং একজন চৌকস নেতা। (সূত্র : প্রেসিডেন্টের জন্য প্রস্তুত কিসিঞ্জারের স্মারক)

ইন্দিরার সঙ্গে মুজিবের ৫ জুলাইয়ের বৈঠকে মুজিব ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ এসেছে এভাবে– 'আমি আপনাকে পূর্ণ আস্থার সঙ্গে মুজিবের সঙ্গে আমার কথোপকথনের

বিবরণ দেব। আমি তাকে বললাম, মুজিব আমাকে স্পষ্ট করেই বলেছেন, বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত কোনো ইস্যু নিয়েই কোনোরূপ সমঝোতা হতে পারে না এবং আমার বিচারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু যা বাংলাদেশকে উদ্বিগ্ন রেখেছে তা হলো পাকিস্তান থেকে বাঙালিদের প্রত্যাবর্তন। ইন্দিরা বললেন, তিনি মুজিবকে চাপ দেয়ার চেষ্টা করেননি। কারণ তিনি ভেবেছেন এতে সুফল মিলবে না। বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাপ্ত সহায়তার জন্য বাঙালিরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু তিনি জানেন একটি নতুন জাতি হিসেবে তারা বহিঃস্থ কোনো চাপ বা প্রভাব সম্পর্কে কতটা সংবেদনশীল হতে পারে। সহায়তাদান সত্ত্বেও ভারত কিন্তু বাংলাদেশকে প্রভাবিত করার অবস্থানে নেই। এই পর্যায়ে আমি তাকে শুধু পুনর্ব্যক্ত করলাম যে, আমি আপনার অনুভূতি ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছি। আমরা সাধারণত ধরে নিয়ে থাকি আমরা যেসব দেশকে সহায়তা দিই সেখানে আমরা প্রভাব খাটাতে পারি। কিন্তু বেশিরভাগ সময় তা হয় না। যখন আমরা অধিক সহায়তা দিই তখন আমাদের প্রভাব থাকে কম। বললাম, মুজিবের সঙ্গে আমার বৈঠকে আমি তার প্রচণ্ড আবেগ দেখে বিস্মিত হয়েছি। তিনি যুদ্ধাপরাধের বিবরণ দিচ্ছিলেন। তিনি (ইন্দিরা) একমত হলেন যে, এই বিষয়ে তিনি একজন 'ইমোশনাল মানুষ' (আমি কিন্তু বলিনি মুজিব একজন ইমোশনাল মানুষ– শুধু বলেছি এই ইস্যুতে তিনি ইমোশনাল)। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, আপনি কি মনে করেন কথিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রশ্নে মুজিব কি অঙ্গীকারবদ্ধ? তিনি জানালেন, গত কয়েক মাস ধরে বস্তুগতভাবে এ বিষয়ে তাদের অবস্থান কঠিনতর বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে এবং বর্তমানে তাদের অবস্থান দাঁড়িয়েছে তারা বিষয়টি নিয়ে চাপ দেবে যাতে কিছু বিচার অনুষ্ঠিত হয়। ইন্দিরা গান্ধী অবশ্য এমন সুপারিশ দেয়া থেকে বিরত থাকেন যে, পাকিস্তানের প্রতি শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে তাদের অন্তত কিছু বেসামরিক বন্দিকে মুক্তি দেয়া উচিত। আমি বললাম, মুজিবের সঙ্গে আলোচনা করে আমারও একই ধারণা জন্মেছে। তিনি আমাকে ৩০০ থেকে ১ হাজার পাকিস্তানির বিচারের কথা বলেছিলেন (পাকিস্তান পরে যুক্তরাষ্ট্রকে বলেছে, যুদ্ধাপরাধের সংখ্যা প্রথমে বাংলাদেশ ১৫০০ দাবি করেছিল। এখন ১০০-তে নেমেছে। ভুট্টোও বলেছেন, তিনিও বিচার চান। ধর্ষকদের রক্ষা করতে চান না)।

কোনালি তার টেলিগ্রামে এ পর্যায়ে যে মন্তব্য করেন, তা থেকে ধারণা করা চলে যে, মুজিব পরিস্থিতির চাপে পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে ন্যূনতম হলেও একটা দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলেন, কিন্তু দৃশ্যত ইন্দিরা গান্ধী যে কোনো বিচারেই হোক এই ইস্যুটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে চাননি। কোনালি বলেছেন, 'আমি এখানে পুনশ্চ জোর দিয়ে বলছি যে, মিসেস গান্ধী আমাকে সর্বোত্তম বিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন যে, এসব বিষয়ে তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

কোনালি তার টেলিগ্রামে এ পর্যায়ে যে মন্তব্য করেন, তা থেকে ধারণা করা চলে যে, মুজিব পরিস্থিতির চাপে পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে ন্যূনতম হলেও একটা

দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলেন; কিন্তু দৃশ্যত ইন্দিরা গান্ধী যে কোনো বিচারেই হোক এই ইস্যুকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে চাননি। কোনালি বলেছেন, 'আমি এখানে পুনশ্চ জোর দিয়ে বলছি যে, মিসেস গান্ধী আমাকে সর্বোত্তম বিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন, এসব বিষয়ে তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আমার মনে হয়েছে, এসব তথ্যের গোপনীয়তার ব্যাপারে তিনি উদ্বিগ্ন। এ বিষয়ে বাংলাদেশের ভেটো থাকার কারণেই তিনি তা ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনা উত্থাপন থেকে বিরত থাকেন।

কোনালির কথায়, প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর সঙ্গে সিমলা চুক্তির ফলাফলে আমি তাকে পুনরায় ধন্যবাদ জানালাম। বললাম, আমরা আসলে বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছা ছাড়া বাংলাদেশ, ভারত কিংবা পাকিস্তানের কাছে কিছুই চাই না। শেখ মুজিবুর চাইছেন যুক্তরাষ্ট্র যেন জাতিসংঘে সদস্যপদ লাভে উদ্যোগ গ্রহণ করে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামাদ আজাদও তা-ই বললেন। বাংলাদেশের জাতিসংঘে প্রবেশে আমাদের সক্রিয় সমর্থন না দেওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু বাংলাদেশের বিষয় নিয়ে কোনো উদ্যোগ নিতে আমরা প্রতিশ্রুতি দেইনি। আমরা শিথিল মনোভাব নিয়েছি এই বিবেচনায় যে আমরা এখন কোনো উদ্যোগ নিতে গেলে তা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করবে।

৬ জুলাই রাওয়ালপিন্ডিতে সিমলা সম্মেলন সম্পর্কে ভুট্টো কোনালিকে বলেন, 'পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে যে সমস্যা তা নিরসনে ভারতের মধ্যস্থতা করার কোনো অভিপ্রায় প্রকাশ পায়নি। পাকিস্তান ভারতীয়দের জানে। পাকিস্তান তাদের সঙ্গে বাস করেছে। যুদ্ধবন্দিদের ফেরত অথবা যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রসঙ্গে ভারতের তরফে কোনো আগ্রহ দেখলাম না। বরং বাংলাদেশ ও বন্দিদের ইস্যু তারা কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়েছে। ভারত বলেছে, তারা যদি সীমান্ত বিরোধে নিষ্পত্তি ঘটাতে সক্ষম হয়, তাহলে যুদ্ধবন্দিদের ফেরত প্রশ্নে মুজিবরের ওপর তারা তাদের প্রভাব খাটাতে পারে।' ভুট্টো আরো বলেন, তিনি এক মিনিটের জন্যও নিজেকে মিথ্যা আশ্বাসে ভোলাতে চাননি। ভারতীয়রা প্রতিটি অজুহাতকে তারা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করেছে। তারা তাদের সমাধান চেয়েছে পাকিস্তানকে বিকিয়ে। ভারতীয়রা নিজেদের উপরে উপরে মহান নেতার ভাব দেখায়। কিন্তু তারা নিজেদের জাতিসহ কোনো কিছুতেই নেতৃত্ব দিতে অপারগ। তাদের সামর্থ্য কিংবা নেতৃত্বের গুণাবলির ঘাটতি রয়েছে। ভুট্টো বলেন, আমি ভারতীয়দের এ কথা বলেছি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিং আমার কাছে জানতে চাইলেন, তিনি এ দ্বারা কী বুঝিয়েছেন। জবাবে আমি বললাম, নেতৃত্ব মানে ভূগোল ও মানুষের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। এর সঙ্গে সম্পৃক্ত চরিত্র, পটভূমি, কাজ, জলবায়ু এবং সম্পদ। এরকম অনেক কিছুর মিশেলেই গড়ে ওঠে নেতৃত্ব। তিনি বলেন, 'ভারত কিন্তু কখনোই পাকিস্তানের জন্য নেতৃত্ব সরবরাহ করেনি। বিপরীতক্রমে ভারতের জন্য নেতৃত্ব কিন্তু সবসময়ই এসেছে আজকের পাকিস্তান কিংবা কাশ্মীর থেকে। আজকের ভারত থেকে কিন্তু কখনোই নয়।' আমি বললাম, আপনি নাকি যুদ্ধ শেষের পরে দুটো

ডিভিশন প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি স্বীকার করলেন। বললেন, ভারত এক জাতির বিরুদ্ধে অন্যকে খেলার চেষ্টা করেছে। তারা ভেবেছে, চীনের সঙ্গে তারা মৈত্রীর বন্ধন গড়ে তুলতে পারবে। কিন্তু আমি আজ বলছি, এতে দীর্ঘ সময় লাগবে। এমনটা ঘটার আগে বহু বছর কেটে যাবে। কারণ পাকিস্তানিদের মতোই ভারতীয়দের চেনা আছে চীনাদের। ভারতীয়রা রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব কিংবা জোটবদ্ধ ততদিন থাকবে যতদিন তাদের প্রয়োজন পড়ে। তারা বাংলাদেশে রুশ প্রভাব ঢোকাতে চাইছে। ভুট্টো বলেন, আমেরিকানরা দরকারি সময়ের মুহূর্তে খুবই বিচক্ষণ।

চীনারা প্রায়শ সময়ের ও প্রজ্ঞার ওপর নির্ভরশীল এবং যখন তারা দেখে শিগগিরই কোনো সমস্যা মিটে যাবে না, তখন তারা এমন অবস্থান নেয় যে, এখন না হোক ১০০ বছর পরে তো তাদের স্বার্থেই হবে। আর রাশানরা এক্ষুণি চায় শেষ রক্তের ফোঁটা। বাংলাদেশ ও ভারত উভয়ে একদিন এই বাস্তবতার মুখোমুখি হবে যে, ভাল্লুকের নখর থেকে মুক্তি পাওয়া কতই না কঠিন। ভুট্টো বলেন, প্রেসিডেন্ট কেনেডির মৃত্যুর এক মাস আগে তিনি তাকে বলেছিলেন, তিনি যদি তার চীনা-ভীতি কাটিয়ে উঠতে পারেন তাহলে চীনাদের সঙ্গে তার একটি বৈঠক ফলপ্রসূ হতে পারে। ভুট্টোর কথায়– চীনারা সবসময়ই দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত এবং কথা ও আচরণে বিনয়ী। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তারা সর্বদা তাদের অঙ্গীকার তা মৌখিক ও লিখিত যা-ই হোক না কেন তারা মর্যাদা রক্ষা করে। তারা যদি প্রতিশ্রুতি না দিতে চায় তাহলে তারা পুরো বিষয়টি এড়িয়ে যায়। কিন্তু একবার যদি তারা প্রতিশ্রুতি দেয় তাহলে সন্দেহাতীতভাবে তারা তা রক্ষা করবেই। ভুট্টো বলেন, 'দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ এশিয়ায় এবং ভারত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের জোরালো উপস্থিতি অপরিহার্য। আমি অবশ্যই শক্তিশালী সামরিক অর্থে অথবা পেশিশক্তি প্রদর্শনের জন্য নয়, আমি মনে করি, এখানে যেসব শক্তি সক্রিয় রয়েছে সেক্ষেত্রে একটি ভারসাম্য রক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিকল্প নেই।'

মৃত মুজিব বেশি ভয়ঙ্কর

পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রশ্নে আমেরিকার গোপন দলিলগুলো আরো কিছু সত্যকে সামনে এনেছে। কয়েকটি দলিল থেকে এই ইঙ্গিত স্পষ্ট যে, পাকিস্তান সরকার শেষ দিনটি পর্যন্ত অখণ্ড পাকিস্তান কিংবা অত্যন্ত শিথিল হলেও একটি কনফেডারেশনের স্বপ্ন দেখেছে। সিআইএ'র রিপোর্ট দাবি করেছে– মুজিব ফাঁসির রজ্জু থেকে অল্পের জন্য রেহাই পেয়েছেন।

পাকিস্তান মুজিবকে বাঁচিয়ে রাখতে বিশ্ব জনমতের চাপ ছাড়াও নিজের একটি স্বার্থও দেখেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইয়াহিয়ার কাছে '৭১ এর সেপ্টেম্বরেও এই বার্তা পৌঁছে দেন যে, জীবিত মুজিবের চেয়ে মৃত মুজিব বেশি ভয়ঙ্কর।

'ক্ষমা প্রদর্শনই উত্তম'

১২ ডিসেম্বর, ১৯৭১। কিসিঞ্জারের জন্য ২৩ পৃষ্ঠার এক স্মারকে স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি এল ইলিয়ট উদ্বাস্তু ও ত্রাণ সমস্যা মোকাবেলা প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'আমরা পাকিস্তান সরকারের কাছে এটা বলতে পারি যে, বিহারিবিরোধী সহিংস মনোভাব ছড়িয়ে পড়ার বর্তমান অবস্থা থেকে বাঙালি নেতাদের মধ্যে একজনই আছেন, যিনি এর রাশ টানতে পারেন। আর তিনি হলেন মুজিব। পাকিস্তানিদের এটা বিবেচনায় নিতে হবে এবং তাদেরই এটা ঠিক করতে হবে– মুজিবকে কখন তারা দেশে ফিরতে অনুমতি দেবেন। ভারতের কাছে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে এটা তুলতে পারি। আমরা আশা করি, বাংলাদেশীরা 'যুদ্ধাপরাধের' বিচার প্রক্রিয়ার একটা ন্যূনতম ব্যবস্থা চাইছে। অবশ্য এটা একদম না করলেই ভালো হয়। অপরাধ সংঘটন হয়েছে উভয় দিকেই। দক্ষিণ এশিয়ায় স্থিতিশীলতা আনতে ক্ষমা প্রদর্শনের মাধ্যমে বিচারের পথ বেছে নেয়াই সবচেয়ে রাষ্ট্রনায়কোচিত পদক্ষেপ হতে পারে।'

সুবিচারই পাবেন : ইয়াহিয়া

সেপ্টেম্বর ১৯৭১। কো-অর্ডিনেটর অব ইউএস ডিজাস্টার রিলিফ ফর ইস্ট পাকিস্তান, মরিস জে. উইলিয়ামস তার ১২ পৃষ্ঠার রিপোর্টে লিখেছেন, মুজিবুর রহমানের প্রতি এখন পাকিস্তানের 'বিচারিক দৃষ্টিভঙ্গি' রয়েছে। 'বিষয়টি যখন পুরোপুরি বিচার বিভাগের হাতে,

তখন আশা করা যায় মুজিব সুবিচার পাবেন,' এই মন্তব্য ইয়াহিয়ার। তিনি বর্ণনা করেছেন, মুজিবের জন্য যথেষ্টসংখ্যক স্বাধীন আইনজীবী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইয়াহিয়া নিজে বিশ্বাস করেন– মুজিব দোষী। 'দুটি এসেম্বলি ছিল, দুটো করেই ছিল এটা-সেটা কিন্তু যখন তারা দুটো পতাকা নিয়ে এলো এবং তারা পাকিস্তানের পতাকা ছিঁড়ে ফেলল, তখন তা কিন্তু হলো বাড়াবাড়ি' (মন্তব্য : যদি মুজিবুর রহমান প্রকাশ্যে বলে থাকেন যে, তিনি আর তার আগের বিশ্বাসে নেই, বিশ্বাস স্থাপন করেন দুই পতাকায়, তাহলে কি তিনি এখনো সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন?)। বাঙালি বন্ধুরা আমাদের বলেছেন, যদি মুজিবকে হত্যা করা হয়, তাহলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আবার ব্যাপকভাবে উদ্বাস্তুদের ঢল নামবে। এই মূল্যায়ন আমরা ইয়াহিয়াকে তার মুখ্যমন্ত্রী এম.এম. আহমদের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছি। এটা আমাদের এই সিদ্ধান্তে পৌছাচ্ছে যে, 'অখণ্ড পাকিস্তানের প্রতি জীবিত মুজিবের চেয়ে মৃত মুজিব বেশি ভয়ঙ্কর।'

ইয়াহিয়ার অনাগ্রহ

১০ জুলাই, ১৯৭১ সালে প্রস্তুত রিপোর্টে (সিনিয়র রিভিউ গ্রুপের জন্য প্রস্তুত এই সমীক্ষা স্টেট/ডিফেন্স/সিআইএ'র এডহক কমিটি অনুমোদন করে) রাজনৈতিক সমঝোতা প্রশ্নে মুজিব প্রসঙ্গও আসে। এতে বলা হয়, আমাদের তৃতীয় কৌশল হচ্ছে, ইয়াহিয়াকে যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতার পথে অগ্রসর হতে আহ্বান জানানো। যদিও ওটা ঠিক যে, এর সঙ্গে জটিল বিষয় জড়িত। তবে আমরা সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমঝোতার প্রকৃতি নিয়ে কোনো কথা বলতে যাব না। আমরা প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলতেই উৎসাহিত করব। ইয়াহিয়া আশা করছেন যে, তিনি আগামী চার মাসের মধ্যে জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে সক্ষম হবেন। কিন্তু তাই বলে তিনি আওয়ামী লীগের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেননি। কিংবা পূর্ব পাকিস্তানের অসাধারণ জনপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনায় কোনো আগ্রহ দেখাননি। যদিও আমরা ইয়াহিয়াকে একটি রাজনৈতিক সুরাহায় পৌছাতে বলছি। আর যখন ইয়াহিয়াকে এ নিয়ে কিছু বলা ঠিক হবে বলেই মনে করছি, তখন কিন্তু তা আরো সরাসরি ও খোলাখুলি বলাই উত্তম। তাকে বরং সাফ জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, এ ধরনের রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌছাতে ব্যর্থ হলে যুদ্ধের বিপদ কিন্তু বৃদ্ধি পেতে পারে। এই সমীক্ষায় বলা হয়, যদিও আমরা নিজেদের কোনো সাংবিধানিক সমাধানের ফর্মূলায় পৌছাতে জড়াব না। তবে আমরা ইয়াহিয়াকে এই ইঙ্গিত দিতে পারি যে, শুধু আওয়ামী লীগই পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র দল, যার রয়েছে সত্যিকারের জনপ্রিয় ম্যান্ডেট। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তান সংকটের কোনো টেকসই সুরাহা করতে হলে আওয়ামী লীগের সঙ্গেই করতে হবে। আমাদের কাছে বাঞ্ছনীয় হবে ইয়াহিয়া যদি সরাসরি মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় বসতে সচেষ্ট হন। অবশ্য এ কথাটা এখন আমাদের পক্ষে তার কানে তোলা প্রায় একটা অসম্ভব ব্যাপার।

এমনকি আওয়ামী লীগের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের বিষয়টিও কিন্তু সহজে অর্জনযোগ্য বলে মনে হয় না। কারণ ইয়াহিয়া স্বয়ং মনে করছেন, বাঙালিরা রাজনৈতিক সমঝোতার পথে আগের চেয়ে ঢের কম পেয়েও রাজি হবে। এই প্রস্তাবের সুবিধা সম্পর্কে বলা হয়েছে : এতে আমাদের এই মূল্যায়ন প্রতিফলিত হবে যে, আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ ছাড়া একটি ভায়াবেল রাজনৈতিক নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। এটা যদি গৃহীত হয়, তাহলে একটি স্থায়ী রাজনৈতিক সমঝোতা নিশ্চিত করার ভিত্তি পাওয়া যাবে। আর এর অসুবিধা হচ্ছে : ইয়াহিয়া আমাদের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। কারণ তিনি নিজেই একটি রাজনৈতিক ফর্মূলা ও দিনক্ষণ ঠিক করেছেন এবং তিনি আসলেই বিশ্বাস করেন যে, মুজিব একজন বিশ্বাসঘাতক। এছাড়া আমাদের প্রস্তাব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ হিসেবে গণ্য হবে এবং তা অসন্তোষ সৃষ্টি করতে পারে। এমনকি তার পরিণতি আরো খারাপ হতে পারে। ইয়াহিয়ার পরিবর্তে আরো নিষ্ঠুর সামরিক সরকারের উত্থানের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

মুজিবের বিচারে ঘোলাটে হবে

২৯ জুন, ১৯৭১ এ ১৫ পৃষ্ঠার এক রিপোর্টে বলা হয়েছে : ইয়াহিয়াকে আমাদের চূড়ান্তভাবে বলা উচিত, একটা রাজনৈতিক সমাধান বেছে নিন। এজন্য আওয়ামী লীগের জনপ্রতিনিধিদের, যারা জঘন্য অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত বা সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধের সঙ্গে জড়িত তাদের বাদ দিয়ে একটা সমঝোতায় আসা দরকার। ইয়াহিয়া যখন ইতোমধ্যেই রাজনৈতিক সমঝোতায় আসতে আগ্রহ দেখিয়েছেন, তখন এই পটভূমিতে এমন প্রস্তাব দেওয়া যেতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের জন্য রাজনৈতিক সমঝোতা স্পষ্টতই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয়রা স্বল্পমেয়াদের জন্য একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভাবছে। আমরা নির্দিষ্টভাবে ইয়াহিয়াকে বলতে পারি, ছয় দফা বা অন্যভাবে হলেও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে দ্রুত একটা সুরাহায় আসতে। দ্বিতীয়ত, মুজিবের বিচারের মাধ্যমে যেন পরিস্থিতিকে আরো ঘোলাটে করে তোলা না হয়। একইসঙ্গে জেনারেল টিক্কা খানকে সরিয়ে বেসামরিক বা বাঙালি কাউকে গভর্নর পদে নিয়োগ এবং সামরিক আইনের প্রতীক হিসেবে বিবেচ্য শান্তি কমিটিকে বিলুপ্ত করা।

চীন বাংলাদেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে

চীনের মতে মওলানা ভাসানী ছিলেন বোকা। ১৯৭২ সালের ২৭ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল মেজর জেনারেল আলেকজান্ডার হেগের দফতরে এক বৈঠক হয়। এতে অংশ নেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইফতেখার আলী, পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত সুলতান খান ও প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত উপ-সহকারী আলেকজান্ডার হেগ এবং এনএসসি স্টাফ হেরাল্ড এইচ স্যান্ডার্স। বৈঠকে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব বলেন, বাংলাদেশ এই মুহূর্তে জাতিসংঘের সদস্যপদ ছাড়াও চীনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে মরিয়া। তারা ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর খুব বেশি নির্ভরশীল হতে চায়নি। ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নে তিনি বলেন, ভারতের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে তার বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটছে। নিয়ন্ত্রণ রেখার ব্যাপারে সমঝোতা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট মানচিত্র ২১ অক্টোবর বিনিময় হবে এবং তার ১০ দিনের মধ্যে সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে। কিন্তু এখন ভারতীয়রা চাপ দিচ্ছে যে, মাঠ পর্যায়ে নতুন রেখা চিহ্নিতকরণ এখনই সম্পন্ন করতে হবে। আর সে কারণেই সৈন্য প্রত্যাহারে বিলম্ব ঘটছে। চীনারা জাতিসংঘে তার কাছে জানতে চেয়েছিল ভারতীয়রা কেন বিলম্ব করছে।

পাক পররাষ্ট্র সচিবের মতে বাংলাদেশের সঙ্গে যদি পাকিস্তানের সম্পর্কের বরফ গলে তখন ভারত এই বিলম্ব আরো দীর্ঘায়িত করতে নতুন শর্ত দেবে। ভারত চাইবে পাকিস্তান প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিক। এর কারণ হলো তারা সরেজমিনে নিয়ন্ত্রণ রেখার চিহ্নিতকরণ দেখতে চাইছে, যাতে এটা আন্তর্জাতিক সীমান্ত হিসেবে পরে পাকিস্তানের কাছে স্বীকৃতি চাইতে পারে। এই কারণেই তারা এ নিয়ে সতর্ক। জেনারেল হেগ বলেন, সম্ভবত ভারতীয়রা বৈদেশিক ইস্যু ইচ্ছা করেই জিইয়ে রাখতে চাইছে। কারণ ভারত সরকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অস্থিতিশীলতার মুখোমুখি। এদিনের বৈঠক শেষে আন্ডার সেক্রেটারি এলেক্স জনসন পররাষ্ট্র সচিবের সম্মানে এক মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেন। এ সময় পাক পররাষ্ট্র সচিব উল্লেখ করেন, যুদ্ধবন্দিদের ফেরত আনার ব্যাপারে পাকিস্তানের রাজনীতিতে এখনো উল্লেখযোগ্য চাপ সৃষ্টি হয়নি। বন্দিদের পরিবার এমনিতেই সৈনিকের জীবন ও চাকরি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। সৈন্যরা বছরের একটা লম্বা সময় পরিবার-পরিজনের সান্নিধ্য ছাড়াই কাটিয়ে থাকে। সুতরাং ভারতের মাটিতে তাদের অবস্থানের কারণে তারা বিচ্ছিন্নতা বোধ করছে না। যদিও তাদের স্বাভাবিক উদ্বেগ রয়েছে। এ নিয়ে পাকিস্তানে এ পর্যন্ত

একটি কী দুটি মিছিল বের হয়েছে। পররাষ্ট্র সচিব স্বীকার করেন, এই মিছিলও আসলে সরকারের আয়োজনেই বের করা হয়েছে। পাকিস্তানে এ মুহূর্তে রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভারতীয় সৈন্যদের প্রত্যাহার। কারণ এটা হলে ১৫ লাখ পাকিস্তানি স্বদেশে ফিরতে পারবে। বাংলাদেশের স্বীকৃতির বিষয়টি পাকিস্তানে অত্যন্ত সংবেদনশীল। কিন্তু যদি সব কিছু ঠিকভাবে চলে তাহলে তা ম্যানেজ করা সম্ভব হবে। পাক পররাষ্ট্র সচিব এ সময় বলেন, মেইন ল্যান্ডের চীনাদের সঙ্গে তার দীর্ঘ আলোচনার অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু তিনি কখনোই চীনাদের এমন ইঙ্গিত দিতে শোনেননি যে জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন কোনোভাবেই তাইওয়ান ইস্যুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। চীনারা তাদের অবস্থান দিয়ে বাংলাদেশের কাছে এই বার্তাই পৌঁছে দিতে চায় যে, চীন যে একটি ফ্যাক্টর তা বাংলাদেশকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। বাংলাদেশে চীনের রাজনৈতিক সম্পদ রয়েছে, যা দিয়ে সে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কিন্তু সেই সম্পদের মধ্যে ভাসানী কিন্তু নেই। কারণ চীনারা ভাসানীকে 'বোকা' মনে করে। কিন্তু মাওবাদী ও অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তির প্রতি চীনের একটা ভরসা আছে।

চীনা পত্র ভারতকে

১৯৭১ সালের ১২ এপ্রিল সিআইএ রিপোর্টে বলা হয়, কমিউনিস্ট চীন সম্প্রতি ভারতের কাছে একটি পত্র দিয়েছে। এতে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের জন্য চীন ভারতকে দায়ী করেছে। ইসলামাবাদ সরকার যদি চীনকে শক্তভাবে অনুরোধ করে তাহলে সম্ভবত অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সে গ্রহণ করতে পারে। এর মধ্যে হয়তো তারা পশ্চিম পাকিস্তানে সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ ও ভারতকে আরো কড়া ভাষায় হুশিয়ার করে দিতে পারে। এমনকি ভারতীয় সীমান্তের কাছে চীনা সৈন্যদের সমাবেশ ঘটিয়ে একটা বার্তা পৌঁছে দিতে পারে। তবে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সমর্থনে চীনা সামরিক হস্তক্ষেপের কোনো সম্ভাবনা এখনো নেই। বাঙালিদের ওপর ইসলামাবাদের নিপীড়নের নিন্দা জানিয়েছে রাশিয়া। ভারত এতে সন্তুষ্ট। কারণ সে এ ঘটনার মাধ্যমে উপমহাদেশে চীনের প্রভাব খর্ব করার একটা কার্যকর প্রচেষ্টা হিসেবে গণ্য করতেই পারে। তবে এ ধরনের মূল্যায়ন সম্ভবত যথার্থ। কারণ চীন জানে একটি জনপ্রিয় গণঅভ্যুত্থানকে শক্তি দিয়ে দমনের পশ্চিম পাকিস্তানি প্রচেষ্টায় সহযোগিতা দেয়ায় ঝুঁকে আছে। সুতরাং চীনা নেতৃত্ব এ মুহূর্তে পাকিস্তানের পাশে না দাঁড়ানোর সম্ভাবনাই বেশি। চীন বরং একটা উভয় সংকটের আশংকা করতে পারে। কারণ পূর্ব বাংলায় কোনো চরমপন্থি গ্রুপের উত্থান ঘটতে এবং তারা পিকিংয়ের সমর্থন চাইতে পারে।

চীনের সঙ্গে কথা বলা

১৯৭২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি কিসিঞ্জার নিক্সনকে জানিয়েছেন, চীনে আপনার সফর

যেহেতু আসন্ন, তাই বাংলাদেশের স্বীকৃতি প্রশ্নে এখন আমরা সিদ্ধান্ত নেব না। এ ব্যাপারে আমরা কী করব তা নিয়ে চীনাদের সঙ্গে মতবিনিময় করতে চাই। পাকিস্তান যেহেতু ভেঙে গেছে, চীন এখন উভয় দিকে ভালো খেলতে পারে। সংঘাতকালে পশ্চিম পাকিস্তানকে চীন যেহেতু সহায়তা দিয়েছে, তাই এখন তার পক্ষে বাংলাদেশের চরমপন্থিদের ওপর অধিকতর কার্যকর প্রভাব ফেলতে পারে। ১৯৭১ এর সংকটে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের স্বার্থ সমান্তরাল হলেও চীন এখন বাঙালিদের রেডিক্যালাইজেশনের প্রক্রিয়ায় আরো বেশি আগ্রহী হবে। তাদের মনে আশা থাকবে, এটা কালক্রমে পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে পড়বে আর তা পরিণামে ভারতকে দুর্বল করবে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ নিশ্চিত হবে বৃহত্তর স্থিতিশীলতায়।

১৯৭১ সালের ১৩ ডিসেম্বরের একটি সিআইএ ডকুমেন্ট অনুযায়ী (যার কয়েকটি স্থান কালো কালিতে লেপটে দেয়া হয়েছে।) ইন্দিরা গান্ধী ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ বলেছেন (কাকে বলেছেন তা মুছে দেয়া হয়েছে), বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জটিলতা এড়িয়ে চলবে ভারত। এ কারণেই জাতিসংঘের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব সে মেনে নেবে। এর ফলে বর্তমানে লাদাখে চীনা হস্তক্ষেপের বর্তমান সম্ভাবনাও কমে যাবে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম ও কয়েকজন সামরিক নেতৃবৃন্দ জাতিসংঘ প্রস্তাব মানার বিরোধিতা করছেন। তাদের যুক্তি, এর আগে দক্ষিণ অঞ্চলীয় আজাদ কাশ্মিরের কতিপয় অনির্দিষ্ট এলাকা মুক্ত করা এবং পাকিস্তানের যুদ্ধের সামর্থ্য ধ্বংস করে দিতে হবে। মিসেস গান্ধী বলেছেন, ঢাকায় আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই সে প্রস্তাব মেনে নেবে। প্রধানমন্ত্রী মনে করেন সোভিয়েতরা উদ্বিগ্ন এ কারণে যে, তারা চীনা হস্তক্ষেপের আশংকা করছে। চীন যদি প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে সে ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন সিনকিয়াং প্রদেশে হামলা চালাবে। ভারত তখন সোভিয়েতের বিমান শক্তির সহায়তা পাবে। গান্ধী বলেন, উপমহাদেশে চীনাদের সম্পৃক্ত করতে পাকিস্তানি উদ্যোগ সত্ত্বেও এটাই সত্য যে, চীন এ পর্যন্ত সংঘাতে জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত রয়েছে।

পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান পি এন ধর বর্তমানে মস্কো সফর করছেন। তিনি সোভিয়েতকে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো ভূখণ্ড দখল করে নিতে ভারতের কোনো পরিকল্পনা নেই। গান্ধী বলেন, যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব পাকিস্তান নাও মানতে পারে। সে তখন বাংলাদেশ হারানোর বেদনা বুকে নিয়ে পশ্চিমাংশে যুদ্ধাব্যাহত রাখতে পারে। পাকিস্তানিরা সেক্ষেত্রে চীনা সমর্থন নিয়ে চাম্ব এলাকায় হামলা চালাতে পারে। তারা লাদাখেও আসবে। লক্ষ্য থাকবে কাশ্মির উপাত্যকা বিচ্ছিন্ন করা। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন যে, ভারত বিরোধী ভূমিকা সত্ত্বেও চীন বাংলাদেশের বাস্তবতাকে মেনে নিতে পশ্চিম পাকিস্তানকে পরামর্শ দিতে পারে। গান্ধী বলেন, চীন ও যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতি আগ্রহ হারাবে। তিনি আরো ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও সিন্ধ

অধিকতর স্বায়ত্তশাসন পেতে আগ্রহী হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এক স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র হিসেবে একটি নতুন গণতান্ত্রিক পাকিস্তানের উত্থান ঘটবে আর সেই পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বে আগ্রহী হবে।

ভারতের পাশে যুক্তরাষ্ট্র

১৯৭১ সালের ৭ জুলাই নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কিসিঞ্জার কেনেথ কিটিং ও হেরাল্ড স্যান্ডার্স এবং ভারতের পক্ষে জগজীবন রাম, প্রতিরক্ষা সচিব কে.বি. লাল ও আমেরিকা ডেস্কের প্রধান মিসেস রুকমিনি মেনন অংশ নেন। প্রতিরক্ষা সচিব বলেন, চীনারা সীমান্তে বিরাট প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিসিঞ্জার বলেন, ভারতের বিরুদ্ধে চীন যে কোনো ব্যবস্থা নিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কড়া মনোভাব গ্রহণ করবে। উল্লেখ্য, সিআইএর একটি দলিলে এমন বিকল্প উল্লেখ করা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের সংকটে চীন ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে ওয়াশিংটন পক্ষ নেবে দিল্লির।

পিকিং যুদ্ধে জড়ালে ওয়াশিংটনকে কাছে পেত দিল্লি

একাত্তরের বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের ভূমিকা সমান্তরাল রেখায় দাঁড়িয়েছিল। প্রচলিত মত এমনই যে, চীন ভারতের শুধু বিরোধিতা নয়, এমনকি পাকিস্তানের পক্ষে সামরিক হস্তক্ষেপেও তার প্রস্তুতি ছিল। কিন্তু সদ্য প্রকাশিত মার্কিন দলিল এমন ধারণাও হাজির করেছে যে, যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান রক্ষায় চীনের অনুকূল ভূমিকা আশা করলেও একই সঙ্গে তার সামনে এই বিকল্পও ছিল যে, চীন ভারত আক্রমণ করলে সে সমর্থন দিত দিল্লিকেই। শুধু সামরিক ও বেসামরিক আমলা পর্যায়ে নয়, খোদ নিক্সন-কিসিঞ্জারের একান্ত সংলাপেও এ দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন মেলে। এই দুজন যেমন নিশ্চিত ছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে জড়াবেন না, শুধু সাজানো যুদ্ধের মহড়া দেখিয়ে সম্ভব হলে অখণ্ড পাকিস্তান রক্ষা করবেন; তেমনই তারা চীনের কাছ থেকে বড়জোর ভয় দেখানোটুকু আশা করেছেন। এর বেশি নয়। বোঝাই যাচ্ছে, ওয়াশিংটনের এই মনোভাব চীনেরও অজানা ছিল না।

১০ জুলাই, ১৯৭১

উনচল্লিশ পৃষ্ঠার এই দলিল তৈরি করা হয় সিনিয়র রিভিউ গ্রুপের জন্য। রিপোর্টটি সিআইএ, স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত। এতে বলা হয়েছে, একটি সীমিত পাক-ভারত সংঘাতের পটভূমিতে ভারতকে সামরিক সমর্থন প্রদান একটি কম সম্ভাবনাময় কৌশল হিসেবে গণ্য হতে পারে। তবে চীন যদি পাকিস্তানের পক্ষে ব্যাপকভাবে হস্তক্ষেপ করে অর্থাৎ সে যদি ভারতকে মারাত্মক উপায়ে হুমকি প্রদর্শন করে তাহলে ভিন্ন কথা। চীন যদি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় দখল করে নেয়ার উদ্যোগ নেয় তখন আমরা ভারতকে সামরিক সহায়তা দেয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নেব। ভারতকে এই ধরনের সহায়তা দেয়া রাজনৈতিকভাবে অধিকতর সহজ হবে যদি ভারত পাকিস্তান আক্রমণের উদ্যোক্তা না হয়। মনে রাখতে হবে, এশিয়ায় আমরা তুলনামূলকভাবে ভারতকেই বেশি গুরুত্ব দেব। আর সে কারণে চীনের সম্ভাব্য আক্রমণের পটভূমিতে ভারতকে সামরিক সহায়তা দেয়া হবে ঐ ধারণার প্রতি স্বীকৃতি। সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হোঁচট খাবে। আমরা অবশ্য আর যা-ই হোক পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য ভারতকে অস্ত্র দেব না। আমরা এটা বিবেচনায় রাখব যে, পাকিস্তানের সঙ্গে যাতে আমাদের একটা

যুদ্ধোত্তর সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব হয়। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র যদি একই সঙ্গে একটি সমঝোতামূলক রাজনৈতিক নিষ্পত্তিতে সাফল্য অর্জন করতে পারে, সে লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট যেসব পদক্ষেপ নেয়া হতে পারে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো :

১৯৬৪ সালের এয়ার ডিফেন্স এগ্রিমেন্ট নিয়ে ভারতের সঙ্গে আলোচনা, ভারত যদি চায় তাহলে একটি জরুরি সামরিক সহায়তা কর্মসূচি গ্রহণ, চীনা সামরিক তৎপরতা সম্পর্কে ভারতের সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়, অতিরিক্ত সহায়ক ব্যবস্থাদি নিয়ে ব্রিটিশ ও সোভিয়েতদের সঙ্গে সমন্বয়। এর সুবিধা হচ্ছে এটা হবে আমাদের সামগ্রিক এশীয় নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আমাদের নীতি হচ্ছে, এশিয়ায় যেসব দেশ চীন কর্তৃক হুমকিগ্রস্ত কিংবা চীনা আগ্রাসনের শিকার হবে তাদের সহায়তা দেয়া। সুতরাং সেক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের একটি দারুণ ভিত্তি তৈরি হবে। ভারতের ওপর সোভিয়েতের প্রভাব হ্রাস পাবে। আর অসুবিধার মধ্যে রয়েছে এ পদক্ষেপ নিলে চীন ও পাকিস্তান উভয়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের টানাপোড়েন তৈরি হবে।

২৫ মে, ১৯৭১

হেনরি কিসিঞ্জারের জন্য প্রস্তুত এক কনটিনজেন্সি স্টাডিতে বলা হয়– গত ১০ দিন ধরে আমরা ভারতীয় বাহিনী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্তের কাছাকাছি মুভমেন্ট জোরালো করেছে মর্মে অশুভ রিপোর্ট পাচ্ছিলাম। ভারত সরকার সীমান্তে বিএসএফের শক্তি বৃদ্ধি করেছে এবং নিয়মিত সেনাবাহিনীকে সীমান্ত থেকে তিন কিলোমিটারের ভেতরে মোতায়েন করেছে। পাঞ্জাবে ট্যাকের চলাচল লক্ষ্য করা গেছে। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দু উদ্বাস্তুরা স্রোতের মতোই ভারতে প্রবেশ করছে। এদের সংখ্যা দৈনিক এক লাখের বেশি হবে। এই পটভূমিতে ভারতের ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ স্বাভাবিক। ইতোমধ্যেই ৩৪ লাখের বেশি উদ্বাস্তু ভারত সীমান্ত অতিক্রম করেছে। ভারত সরকার প্রবল জনমত ও সংসদের চাপের মুখে। তারা উদ্বাস্তু স্রোত বন্ধ দেখতে চাইছে। চাইছে বাঙালিদের সমর্থন দিতে। ভারত সরকার আশংকা করছে উদ্বাস্তু আগমন যদি তারা ঠেকাতে না পারে তাহলে পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে উদ্বাস্তু সংখ্যা ৮০ লাখে পৌছাবে। ভারতীয়দের মতে এ ধরনের একটা অবস্থা সংশ্লিষ্ট এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপরে এক অসহনীয় বোঝা সৃষ্টি করবে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সামরিক সাফল্যের মুখে ভারত একই সঙ্গে বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সমর্থনে পদক্ষেপ নিচ্ছে। বিএসএফ প্রতিষ্ঠিত শিবিরে কথিত মতে ১০ হাজার বাঙালি গেরিলা ও অন্তর্ঘাত কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। বাঙালি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সীমিত পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদও সরবরাহ করা হচ্ছে এবং কিছু ভারতীয় বাহিনী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দিতে পূর্ব বাংলায় ঢুকে পড়েছে। ভারতীয় ও পাকিস্তানি সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে বেশ কিছু সংঘাতের ঘটনা

ঘটেছে। অন্তত একবার পাকিস্তানি বিমান ভারতীয় আকাশসীমাও লংঘন করেছে। আট পৃষ্ঠার এই সমীক্ষায় বলা হয়, ভারত সম্ভবত পাকিস্তানের সঙ্গে এখনো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চায় না। ভারত হয়তো বিশ্বাস করতে পারে যে, তার জাতীয় স্বার্থের জন্য দরকার হলো পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি 'প্রিএম্পটিভ' আক্রমণ। পাকিস্তানিরা তাদের দিকে সম্ভবত ভাবছে যে, বিদ্রোহ বেঁচে থাকতে পারে কেবলই ভারতীয় রাজনৈতিক ও সামরিক সমর্থনে। আর সে কারণেই তারা ভারতের মধ্যে অবস্থিত প্রশিক্ষণ শিবিরে সরাসরি হামলার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আর দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা থেকে এই বিপদও রয়েছে যে, পাকিস্তানিরা নিজেরাই ভারতের সঙ্গে একটি সংঘাত উস্কে দিতে পারে, যাতে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি ভিন্নদিকে প্রবাহিত হয়। সেক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে তারা এই ধারণা দিতে চাইতে পারে যে, আমাদের হুমকির চেয়ে বরং ভারতীয় হুমকি অনেক বেশি মারাত্মক। তাই হাঙ্গামার চেয়ে অখণ্ড পাকিস্তানই ভালো। আর পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি তাদের জন্যই মঙ্গল। সমীক্ষায় এ পর্যায়ে উল্লেখ করা হয় যে, চীনের দিক থেকে ভারতের মনে ভীতি রয়েছে।

তাদের ধারণা একটি সম্ভাব্য পাক-ভারত সংঘাতের পরিণতিতে প্রত্যক্ষ চীনা হস্তক্ষেপ নিশ্চিত হতে পারে। আমরা গোয়েন্দা সূত্র থেকে জানতে পেরেছি– ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্ভাব্য যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে চীন সম্ভবত ইতোমধ্যেই পাকিস্তানকে একটা শর্তসাপেক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকতে পারে। চীনারা হয়তো আশ্বাস দিয়েছে যে, তারা তিব্বত সীমান্ত দিয়ে সামরিক তৎপরতা শুরু করবে। তবে শর্ত হচ্ছে– এটা তারা করবে তখনই যখন তারা দেখতে পাবে যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী জোরপূর্বক এবং সুপরিকল্পিতভাবে পাকিস্তানি সীমান্ত অতিক্রম করেছে। চীনারা যদি সরাসরি জড়িয়ে পড়ে তাহলে সোভিয়েতরাও ভারতকে প্রকাশ্যে সমর্থন দেবে এবং প্রয়োজনীয় সামরিক সহায়তা নিয়েও তাদের পাশে দাঁড়াবে। ... ভারত ও পাকিস্তান যদি সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৫ সালের মতোই অনেক কঠিন সিদ্ধান্তের মখোমুখি হবে। কারণ ১৯৬৫ সালের পরিস্থিতির চেয়েও এবারের অবস্থা তাৎপর্যপূর্ণভাবে অধিকতর জটিল হবে এবং এই সম্ভাবনা প্রবল যে, যুদ্ধ একই সঙ্গে চলবে পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে এবং সেক্ষেত্রে কোনো না কোনো মাত্রায় চীন ও সোভিয়েত জড়িয়ে পড়বে। তবে যদিও সম্ভাবনা কম কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতের বিরুদ্ধে চীন যদি বড় ধরনের আক্রমণ পরিচালনা না করে তাহলে কোনো মার্কিন সামরিক অঙ্গীকারে জড়ানো চলবে না।

৩ মার্চ, ১৯৭১

বাঙালির জীবনে ২৫ মার্চ নেমে আসার অনেক আগেই বহু কনটিনজেন্সি স্টাডি প্রস্তুত

ভারত ভাঙনের প্রথম পদক্ষেপ বাংলাদেশ

নিক্সন ও কিসিঞ্জার ১৯৬৯ সালেই জানতেন বাংলাদেশ স্বাধীন হচ্ছে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক সমীক্ষায় এ কথাই বলা হয় যে, বাংলাদেশের অভ্যুদয় হবে ভারতীয় ইউনিয়ন খণ্ড-বিখণ্ড হওয়ার পথে প্রথম পদক্ষেপ। ১৯৬৯ সালের নভেম্বরে পাওয়া ১৯ পৃষ্ঠার এক মার্কিন দলিলে বলা হয়েছে, গত ৬ মাসে পাকিস্তান আরো বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানে একটি ডামাডোলপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি, পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতার বিশ্বাসযোগ্য হুমকি, আইয়ুব সরকারের পতন এবং সামরিক আইন দিয়ে আবারো সরকার প্রতিষ্ঠা পাকিস্তানকে এক ভয়ানক সংকটকালের মুখে দাঁড় করিয়েছে। অনেক বিজ্ঞ পাকিস্তানি ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে, 'রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অঘটন দিন দিন যেভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে তাতে এর পরিণামে, এমনকি আগামী অল্প কয়েক বছরের মধ্যে পাকিস্তান ভেঙে যেতে পারে।' আর যদি তাই ঘটে সেক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানে একটি উগ্র জাতীয়তাবাদী সরকারের উত্থানের সম্ভাবনা সবচেয়ে প্রবল। এই সরকারের উপর চীনা কমিউনিস্টদের প্রভাব অত্যধিক হওয়ার বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। একটি বিচ্ছিন্ন-পূর্ব পাকিস্তান হবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও তার পূর্বাঞ্চলীয় অংশগুলোর কাছে বিচ্ছিন্ন হওয়ার এক শক্তিশালী চুম্বক। একটি বিচ্ছিন্ন-পূর্ব পাকিস্তান ভারতীয় ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পথে হতে পারে প্রথম পদক্ষেপ।

এই দলিল তৈরি করেছিল মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল এটি অনুমোদন করে এবং ১৯ নভেম্বর এর কপি কিসিঞ্জারের কাছে পাঠানো হয়। এ সময়ে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশে মার্কিন অস্ত্র বিক্রির ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ বজায় ছিল। দলিলে বলা হয়েছে, ভারতের ওপর উল্লেখযোগ্য চীনা আক্রমণ অত্যাসন্ন প্রতীয়মান হয় না। এশিয়ার অন্যতম কমিউনিস্ট শক্তি চীনের বিরুদ্ধে ভারতের সামরিক সামর্থ্য শক্তিশালী থাকার ক্ষেত্রে আমাদের স্বার্থ রয়েছে। আরেকটি চীনা আক্রমণের ভয়ে ভারত যেন ভীত না থাকে সেদিকেও আমাদের খেয়াল দিতে হবে। এতে আরো বলা হয়, দক্ষিণ এশিয়া ইতোমধ্যেই দুই পরাশক্তির আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে এসে গেছে। এটা এমন একটা জায়গা, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কম-বেশি সমানতালে পা ফেলতে পারে। যদিও কমিউনিস্ট চীন এক্ষেত্রে এক সক্রিয় প্রতিযোগী। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো এখনো পর্যন্ত সোভিয়েত

অথবা চীনা শাসন পদ্ধতির প্রভাবের উর্ধ্বে থাকতে পেরেছে। এই মুহূর্তে এই অঞ্চলের সব দেশ অ-কমিউনিস্ট সরকার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু কমিউনিজমের প্রতি স্থানীয় ঝোঁক ভারতের গণতান্ত্রিক পরীক্ষার প্রতি এক বিরাট হুমকি এবং চীনা কমিউনিস্টরা পূর্ব পাকিস্তানের অসন্তোষ থেকে ফায়দা নিতে উদগ্রীব, যা কিনা পাকিস্তান বিভক্তি ও একইসঙ্গে ভারতীয় জঙ্গিদের প্রতি সমর্থনদানের জন্য এক অশনি সংকেত।

১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের অবস্থা মূল্যায়ন করতে গিয়ে আরেকটি দলিলে বলা হয়েছে, 'সবচেয়ে নাজুক অবস্থা বিরাজ করছে পূর্ব পাকিস্তানে। সেখানকার বেশিরভাগ লোক মনে করছেন, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে তাদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। সাম্প্রতিক অসন্তোষ কার্যত বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলনকেই নতুন গতি দিয়েছে এবং প্রায় সব বিরোধীদলীয় রাজনীতিক কোনো না কোনো মাত্রায় স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সোচ্চার। পশ্চিম পাকিস্তানেও একই অনুভূতি বিরাজমান। কিন্তু তা ততটা শক্তিশালী নয়। আইয়ুবের অধীনে পাঞ্জাবি ও পাঠানরা পাকিস্তানের রাজনীতিতে যেভাবে কর্তৃত্ব ফলাচ্ছে তা তারা মোটেই সুনজরে দেখছে না।

মে, ১৯৬৯

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিল্লিতে আধঘণ্টার এক আলোচনায় মিলিত হন। এই বৈঠকের বিবরণ দিয়ে রজার্স এক টেলিগ্রাম পাঠান। এতে লেখা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী বললেন, তিনি বুঝতে পারছেন যে, আমরা চীনাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করতে চাচ্ছি। ভারত মনে করে, চীনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার কারণ নেই। ইন্দিরা আশা প্রকাশ করেন যে, এমন একদিন আসবে, চীনারা বদলে যাবে। তিনি ইঙ্গিত দেন, চীনের প্রতি ভারতের অবস্থান অনমনীয় নয়। কিন্তু তিনি উল্লেখ করেন, চীনারা ভারতের কতিপয় বৈরী উপজাতী গোষ্ঠীকে অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা দিচ্ছে। চীনারা কতিপয় ভারতীয় রাজনৈতিক ও সমাজবিরোধী চক্রের সমর্থন পাচ্ছে বলেও ইন্দিরা উল্লেখ করেন। ইন্দিরার কথায়, 'চিনপন্থি কমিউনিস্ট গ্রুপ সহিংসতায় বিশ্বাস করে এবং এমনকি তারা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট সরকারের বিরোধিতায়ও লিপ্ত। সংখ্যায় তারা অল্প। কিন্তু তাদের প্রতি নজরদারি প্রয়োজন।' বৈঠক শেষে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট নিক্সনের চিঠি ইন্দিরার কাছে হস্তান্তর করেন। ইন্দিরা তার শুভেচ্ছা প্রেসিডেন্টকে পৌঁছে দিতে অনুরোধ জানান।

২৫ এপ্রিল, ১৯৬৯

পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ওয়েলার্ট তার টেলিগ্রাম বার্তায় লিখেছেন, আমরা

জানি না এই মুহূর্তে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের অগ্রাধিকার কোনটি। তবে প্রশ্ন হলো, বর্তমান ক্ষমতাসীনরা কি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব গ্রহণের চেয়ে দুই অংশের বিভক্তিকে মেনে নেবেন? বাঙালিরা বিচ্ছিন্নতার পথ বেছে নেয়ার পরিবর্তে কতটা রাজনৈতিক ক্ষমতা আশা করে? দুই অংশের জন্য কী বিকল্প রয়েছে? দুর্বল কেন্দ্র ও বর্ধিত স্বায়ত্তশাসন কী ফল বয়ে আনবে? পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা তার ঘাটতি পরিস্থিতিতে কতটা প্রভাব ফেলবে? রাষ্ট্রদূত এই পর্যায়ে মন্তব্য করেন, একটা বিষয় আমাদের অনুকূল বলে মনে হচ্ছে। আর তা হলো, নতুন সামরিক শাসক (ইয়াহিয়া) ব্যক্তিগতভাবে সম্ভবত তার পূর্বসূরির চেয়ে অধিকতর মার্কিনপন্থি। তবে পাকিস্তান সরকার তার পররাষ্ট্র নীতিতে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ও চীনের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখতে চাইছে। ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যতক্ষণ বৈরিতা থাকবে, ততক্ষণ যুক্তরাষ্ট্র কিংবা রাশিয়ার চেয়ে চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখতেই তার স্বাভাবিক ঝোঁক থাকবে। ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন জারি সম্পর্কে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মন্তব্য করেন, ২৫ মার্চ পাকিস্তানে যে সামরিক শাসন জারি হলো এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মূলত একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার বজায় রাখা, পশ্চিম পাকিস্তানের বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামো সংরক্ষণ এবং জনসংখ্যার অনুপাতে জাতীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রচেষ্টাকে স্তব্ধ করে দেয়া। রাষ্ট্রদূত উল্লেখ করেন, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধির ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন। আমরা অবশ্যই সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের অনুসৃত নীতি ও তার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করব। কিন্তু দুই অংশের সম্পর্কের প্রশ্নে আমরা কোনো পক্ষ নিতে যাব না। এক্ষেত্রে কোনো বিকল্প বেছে নেয়া হলে, তার বিপদ হবে এই যে, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ দেখবে আমরা স্পষ্টতই এবং প্রকাশ্যে 'ঔপনিবেশিক' শক্তিকে সমর্থন দিচ্ছি। অথচ এই শক্তি পূর্ব পাকিস্তানে ভবিষ্যতে কখনো গ্রহণযোগ্যতা পাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

২৫ এপ্রিল, ১৯৬৯

মার্কিন রাষ্ট্রদূত ওয়েলার্ট আরেকটি বার্তায় (৪১৬৯ নং টেলিগ্রাম) উল্লেখ করেন, আমরা মনে করছি দুই অংশের বিচ্ছিন্নতার চেয়ে অখণ্ড পাকিস্তানই যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য অধিকতর অনুকূল। পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হলে সম্ভবত সেটি হবে দুর্বল, বিশৃঙ্খলাপূর্ণ এবং সরকারে থাকবে বামপন্থিরা। তখন সেই সরকারের ওপর পশ্চিমবঙ্গ ও চীন থেকে সহজেই প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হবে। এমনকি সেই অবস্থায় স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান হতে পারে সোভিয়েতপন্থি ও চীনাপন্থি কমিউনিস্টদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার এক ব্যাটেলগ্রাউন্ড বা রণক্ষেত্র। তাই একটি দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার এবং অধিকতর স্বায়ত্তশাসন সংবলিত পূর্ব পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য বেশি সহায়ক হবে। মোট কথা, একেবারে দুটুকরো হওয়ার চেয়ে আর যে কোনো ব্যবস্থাই হওয়া উচিত আমাদের কাম্য। রাষ্ট্রদূত একই টেলিগ্রামে উল্লেখ করেন যে, আজকে যারা

সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের মধ্যে আছেন, তাদের সম্ভবত কেউ দায়িত্ব নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে কথা বলার অবস্থানে নেই। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন, তাদের বর্ধিত সম্পদ বণ্টন, প্রদেশগুলোর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার সমীকরণ, ন্যাশনাল এসেম্বলিতে প্রাদেশিক প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের মনোভাব কিন্তু স্পষ্ট নয়। তবে আমরা অনুমান করতে পারি, পাকিস্তানের বর্তমান কর্তৃপক্ষ অধিকতর মূল্য ও ঝুঁকি নিয়ে হলেও শক্তিশালী কেন্দ্র এবং অখণ্ড পাকিস্তানসহ বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামো সংহত রাখবে। তারা পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক ক্ষমতার 'মাত্রাতিরিক্ত' হস্তান্তর প্রয়াসও প্রতিরোধ করবে।

২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের গোয়েন্দা ও গবেষণা শাখার পরিচালক একটি গোয়েন্দা নোট দিয়েছেন। এর শিরোনাম– 'ধ্বংসের মুখে পাকিস্তান'। এতে বলা হয়, পাকিস্তানের পরিস্থিতি খুবই খারাপ। বহু স্থানে নৈরাজ্য চলছে। আইয়ুব ও বিরোধী দলের মধ্যে ১৯ ফেব্রুয়ারি নির্ধারিত গোলটেবিল বৈঠক ভেঙে যাওয়ার পরে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি অধিকতর নাজুক হয়ে পড়েছে। এটা ক্রমেই এমন এক অবস্থায় পৌছতে চলেছে যা আর বিদ্যমান রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সুরাহা হবে না। ... কথায় ও কাজে ভুট্টো, ভাসানী এবং মুজিব স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, শাসক দলের সঙ্গে আপোসের সময়সীমা পার হয়ে গেছে। আইয়ুবকে তাদের দাবির পুরোটাই মানতে হবে। এসব দাবি-দাওয়া প্রচণ্ড গতি পাচ্ছে এবং ইতোমধ্যেই এটা স্পষ্ট যে, পাকিস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক সিস্টেম ভেঙে যাবে। সবচেয়ে কঠিন দাবির একটি হচ্ছে, মুজিবকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে রেহাই দেয়া। পূর্ব পাকিস্তানিরা এই মামলায় মুজিবের বিচারকে তাদের ওপরে পশ্চিম পাকিস্তানি আধিপত্যের প্রতীক হিসেবে গণ্য করছেন। তবে সেনাবাহিনী, যারা যে কোনো রাজনৈতিক পরিবর্তনের অনুঘটক, তারা মুজিবকে এই মামলা থেকে অব্যাহতি দেবে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। এর ওপরে রয়েছে ভুট্টোর দাবি। রাজপথ প্রকম্পিত স্লোগানে : 'আইয়ুবকে যেতেই হবে'। পরিস্থিতি বাগে আনতে হলে ন্যূনতম সমাধান হচ্ছে শেখ মুজিবের সঙ্গে সমঝোতায় পৌছা এবং পূর্ব পাকিস্তানিদের দাবির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো।

২৫ মার্চ, ১৯৬৯

হেনরি কিসিঞ্জার আইয়ুব খানের পদত্যাগ শীর্ষক এক স্মারক প্রেরণ করেন প্রেসিডেন্টের কাছে। এতে তিনি বলেন, জেনারেল ইয়াহিয়াকে সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করে আইয়ুব খান আজ পদত্যাগ করেছেন। আইয়ুব বলেছেন, আমি আমার দেশ ধ্বংসের প্রক্রিয়ায় সভাপতিত্ব করতে পারি না। এখন প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ এই সামরিক আইন ঘোষণাকে আদৌ গ্রহণ করে কি না?

গাদি গ্রহণ করে তাহলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি হবে। নতুন সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ আইয়ুবের রেখে যাওয়া সমঝোতা প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে উদ্যোগী হবে। এর লক্ষ্য থাকবে দেশের জন্য একটি নতুন রাজনৈতিক কাঠামো তৈরি। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান যদি মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখায়, তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি হবে অত্যন্ত ভয়ংকর। কারণ এই সামরিক আইনকে তারা পশ্চিম পাকিস্তানি স্টাবলিশমেন্ট কর্তৃক তাদের বিরুদ্ধে কার্যত এক অভ্যুত্থান হিসেবে গণ্য করতে পারে। এই পশ্চিম পাকিস্তানিরাই দীর্ঘকাল ধরে তাদের ওপরে প্রভুত্ব করেছে। সুতরাং সেক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতা আগের চেয়ে আরো ব্যাপক ও প্রকট হতে পারে। বিদেশীদের বিশেষ করে কমিউনিস্ট চীনাদের প্রভাব আরো বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং এই মুহূর্তে পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয় তা বলা কঠিন। যাই হোক, সাম্প্রতিককালে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে মিলিটারি মুভমেন্টের খবর পাওয়া গেছে। আইয়ুব এবং তার সেনাবাহিনী সম্ভবত ধারণা করেছে যে, সামরিক বাহিনী পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে।

ঢাকায় ভারতপন্থি সরকারই পশ্চিমা স্বার্থের রক্ষাকবচ

বারমুডা ২১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের নীতি নির্ধারকরা এদিন ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, ভবিষ্যতের বাংলাদেশে ভারতঘেঁষা সরকারই হবে পশ্চিমা স্বার্থের রক্ষাকবচ। বারমুডায় অনুষ্ঠিত ঐ আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট নিক্সন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স, ড. হেনরি কিসিঞ্জারসহ ৯ জন। ব্রিটেনের পক্ষে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার এলেক ডগলাস-হোম, যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত লর্ড ক্রোমারসহ আট জন। আলোচনার শুরুতেই স্যার এলেক মন্তব্য করেন, পাক-ভারত পরিস্থিতির মূল্যায়নে তাদের দুই দেশের মধ্যে তেমন মতপার্থক্য নেই। ব্রিটেনের মত হচ্ছে দুদেশের সংকটের সূত্রপাত ঐতিহাসিকভাবে তখনই, যখন পাকিস্তান সরকার সিয়েটো পরিত্যাগ এবং সেন্টোর সঙ্গে বাঁধনটা আলগা করে দিয়ে চীনের দিকে ঝুঁকে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ভারত ধরে নেয় উপমহাদেশের নিরাপত্তার জন্য এটা এক প্রকৃত হুমকি। আর এই পটভূমিতে ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়, 'ট্রিটি অব কনভিনিয়েন্স'। ব্রিটিশদের সন্দেহ হয়, ভারত এবার বুঝি একেবারেই সোভিয়েতের পকেটে চলে গেল। ভারত তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে ঘাঁটি স্থাপনের অধিকার দিয়ে বসে কিনা। সুতরাং আজ সময় এসেছে, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রকে উপমহাদেশের ভবিষ্যত সমস্যা মোকাবেলায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পরিস্থিতির তিনটি দিক রয়েছে। প্রথমত, পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য করণীয় নির্ধারণ। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে অনতিক্রম্য দুর্ভিক্ষ ঠেকাতে মানবিক সহায়তা প্রদান। তৃতীয়ত, উপমহাদেশের সবচেয়ে ক্ষমতাবান রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের সঙ্গে বোঝাপড়ার একটা পথ খুঁজে বের করা।

স্যার এলেক অভিমত দেন, অখণ্ড পাকিস্তানের জন্য আর কোনো চিন্তাভাবনা করা অবাস্তব। আমাদের বুঝতে হবে উপমহাদেশের তিনটি দেশ রয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স এ সময়ে বলেন, ভুট্টো আসলে কী করেন তা বোঝা কঠিন। তবে একটা বিষয়ে যে কেউ নিশ্চিত হতে পারেন যে, তিনি তার নিজস্ব রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলে পরিস্থিতিকে কাজে লাগাবেন। তিনি সম্ভবত উপযুক্ত সময়ে মুজিবকে মুক্তি দেবেন এবং সেনাবাহিনীকেই দায়ী করবেন যে, তারা কেন আগে বেসামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়নি।

প্রেসিডেন্ট নিক্সন এ পর্যায়ে বর্তমান পরিস্থিতে সোভিয়েত স্বার্থের ব্যাপারে ব্রিটিশ দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চান। রাশিয়া কি ভারতের জন্য একাই দায়দায়িত্ব নেবে না কি এটা দেখতে চাইবে যে, পশ্চিমা দেশগুলোও তাতে অংশ নিক। উত্তরে স্যার এলেক বলেন, তিনি মনে করেন, জোটনিরপেক্ষ থাকার ঐতিহ্য ভারত বজায় রাখবে। অন্তত কিছু করার জন্য তো বটেই। ভারতীয়রা অবশ্যই বাংলাদেশে সম্ভাব্য চীনা প্রভাব বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। আর সে কারণেই তারা বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে উদারপন্থি নেতাদের দেখতে চাইবে। নিক্সন প্রশ্ন করেন, যদি এমন চীনা বিপদের উত্থান কখনো ঘটে তাহলে ভারতীয়রা কি আমাদের, না সোভিয়েতের, নাকি উভয়ের কাছ থেকে সাহায্য লাভের চেষ্টা করবে। নিক্সন আরো বলেন, কংগ্রেস এবং অন্যত্র ভারত সম্পর্কে একটা ভিন্নতর মূল্যায়ন বর্তমানে ক্রিয়াশীল। আর তা হলো গত ২৫ বছর ধরে আমরা ভারতকে সাহায্য দিয়েছি। এটা ১০ বিলিয়ন ডলারের কম হবে না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ভাগ্যে জুটেছে দাঁতের ওপর লাথি। প্রশ্ন উঠেছে, আমরা যদি কোনো প্রভাব খাটানো ছাড়াই এটা অব্যাহত রাখি তাহলে কি এই সাহায্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করবে? যুক্তি দেয়া হচ্ছে, ঐ অর্থ বরং অভ্যন্তরীণভাবে খরচ করা ঢের উত্তম।

নিক্সন এ ব্যাপারে ব্রিটিশ রায় জানতে চাইলে স্যার এলেক বলেন, আমরা অনুমান করতে পারি যে, ভারতীয় রাজনীতিকদের তরফে কোনো কৃতজ্ঞতা বোধ থাকবে না। তবে তা সত্ত্বেও ভারত কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হতে চাইবে না। সুতরাং ভারতের সঙ্গে আমাদের ভালো সম্পর্কের সূত্রগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে যেতে হবে। এলেক বলেন, আমার ধারণা ভারতও এটা চাইবে। গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রকে ভারত প্রশ্নে বেশ উদ্বিগ্ন হতে দেখেছে ব্রিটেন। এলেক মনে করেন, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে যতটা শুভেচ্ছা থাকা দরকার যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ভারতে তা এখনো রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মিসেস গান্ধী যদিও আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাহায্য যে একটি ফ্যাক্টর তা উল্লেখ করতেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস অন্য কোনো কর্মসূচি অনুমোদন করবে বলে মনে হয় না। স্যার এলেক প্রশ্ন করেন, ভারতের তরফে কেউ কি কখনো সাহায্য প্রাপ্তির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানিয়েছে? রজার্স বলেন, ভারতীয়রা যে মনোভাব দেখিয়েছে তা অন্য কোনো দেশের কাছ থেকে আমরা পাইনি। তবে অবশ্য আমরা আশা করি যে ভারতে অন্তত নতুন করে প্রভাব বিস্তারের একটা সুযোগ যুক্তরাষ্ট্র পাবে। প্রেসিডেন্ট বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয়দের কাছ থেকে কেবল 'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ' শুনতে রাজি নয়। আমরা যা করি, তা আমাদের নিজস্ব স্বার্থে এবং আমাদের গৃহীত পদক্ষেপের যথার্থতাও দিতে আমাদের সক্ষম হতে হবে সেই শর্তেই। যদি ব্যাপারটা এরকমই দাঁড়ায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের আশীর্বাদ লাভে ধন্য হতে চায় তাহলে তা অর্জনে আমরা কিছু করব। নিক্সন এ মন্তব্যের পরে উল্লেখ করেন, আসলে সমস্যার দিকে

নজর দেয়ার ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি মনে হয় ঠিক নয়। তিনি নিজেই বলেন, আমাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে। ভারতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সে নিজেকে আনোয়ার সাদতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেবে কী দেবে না। নিক্সন বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, আমরা কি এমন একটা অবস্থান মেনে নেব যে, ভারত যা কিছু করবে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঠিক বলে গণ্য হবে। আর আমাদেরটা প্রমাণিত হবে ভ্রান্তিপূর্ণ।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডগলাস হোম এ সময় পুনর্ব্যক্ত করেন যে, আসলে এটাই গুরুত্বপূর্ণ, চীনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার প্রশ্নে পাকিস্তান কত দূর যায়। মিসেস গান্ধী জুয়া খেলেছেন, বাংলাদেশে চীনা প্রভাব কোনো অবস্থাতেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে দেয়া হবে না। আর পশ্চিমা স্বার্থ হলো নতুন বাংলাদেশকে হতে হবে চীনাকেন্দ্রিক হওয়ার পরিবর্তে মূলত ভারতকেন্দ্রিক। নিক্সন এ কথার পিঠে মন্তব্য করেন, এটা নিয়ে কোনো প্রশ্নই চলে না যে, আমাদের অভিন্ন লক্ষ্য থাকবে ভারত যেন সোভিয়েত থলের ভেতরে আটকে না যায়। প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ভারতীয় সেটাই তৈরির চেষ্টা করছে। সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে আমাদের প্রভাবকে উৎকৃষ্ট পন্থায় ব্যবহার করতে পারি? এক্ষেত্রে ব্রিটিশ পরামর্শকে আমি স্বাগত জানাই। নিক্সন বলেন, আমাদের অবশ্যই এটা স্বীকার করতে হবে যে, ভারতের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়াটা এক ঐতিহাসিক ব্যর্থতা। একটি দৃষ্টান্ত হলো, যেসব ইস্যু গুরুত্বপূর্ণ, মার্কিন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এমন ইস্যুতে জাতিসংঘের ভোটাভুটিতে ভারতের ৯৩ শতাংশ সিদ্ধান্তই আমাদের প্রতিকূলে।

বাস্তবতার নিরিখে আমরা ভারতের পন্থা স্বীকার করে নিতে পারি এবং ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক উন্নয়নে একটা অধিকতর হিসাব-নিকাশের ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়ার কথাও ভাবতে পারি। রজার্স বলেন, ভারত জাতিসংঘে আমাদের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েই শুধু ক্ষান্ত থাকে না। আমাদের বিরোধিতা করার যে কোনো সুযোগ তারা কাজে লাগায়। স্যার এলেক বলেন, আপনাকে তাহলে এই ধারণার ভিত্তিতে অগ্রসর হতে হবে যে, আপনি ভারতীয়দের কাছ থেকে কিছুই পাবেন না। কিন্তু ভারতে যে মৌলিক পশ্চিমা স্বার্থ রয়েছে তা আপনাকে অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। তিনি একমত হন যে, নতুন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমা বিশ্বকে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নিক্সন বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতকে চীনা প্রভাবের বাইরে নিয়ে আসার চেয়ে সোভিয়েত মুক্ত রাখাই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো এই ধারণা বদলে যেতে পারে। আমরা একমত হতে পারি যে, আমরা ভারতকে স্বাধীন দেখতে চাই। আমাদের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ব্রিটিশদের মতো অভিন্ন। যদিও কৌশলগত দিক থেকে আমাদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেন, ভারত যদি সোভিয়েতকে সুবিধা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে তা মার্কিন জনমতকে বিগড়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। নিক্সন উপসংহার টানেন এই বলে, এই ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সম্পর্ক দরকার। বাংলাদেশ প্রশ্নে

সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে আমাদের উচিত হবে ভুট্টোকে তার অবস্থান সংহত করার জন্য আরো কিছুটা সময় দেওয়া।

২২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

কিসিঞ্জার নিক্সনকে দেয়া এক স্মারকে বলেন– ভুট্টো বলেছেন, মুজিবকে শিগগিরই কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হবে এবং তাকে এক ধরনের গৃহবন্দি করে রাখা হবে। এটা অবশ্যই এক ধরনের শুভেচ্ছামাত্র। তবে তা মুজিবের মুক্তি, যুদ্ধবন্দি ও ভারতীয় নিরাপত্তা হেফাজতে থাকা অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানির প্রশ্নে ভারতীয় ও বাংলাদেশী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সংলাপ শুরুর সুর নির্ধারণে একটি ভালো পদক্ষেপ হতে পারে। এ পর্যায়ে কিসিঞ্জার উল্লেখ করেন, ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি কী হবে তা নিয়ে নয়া দিল্লিতে বিরাট জল্পনাকল্পনা রয়েছে। আমাদের দূতাবাস নিশ্চিত হয়েছে যে, অর্থনৈতিক সহায়তা বিশেষ করে উদ্বাস্তুদের প্রত্যার্বতন এবং বাণিজ্য সম্পর্ক নির্ধারণে একটি ট্রিটি ইতোমধ্যেই স্বাক্ষরিত হয়েছে। সেখানে এমনকি নিরাপত্তা সংক্রান্ত কিছু বিধানাবলিও সংযোজিত হতে পারে। এটা হবে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পাদিত মৈত্রী চুক্তির আলোকে।

বাংলাদেশের বিজয়লগ্নে কাশ্মীর নিয়ে দরকষাকষি

প্রেসিডেন্ট নিক্সনের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপসহকারী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলেকজান্ডার হেগ রুশ কূটনীতিক ভরনস্তবকে ডেকে পাঠান ১৪ ডিসেম্বর রাত ১২টা ২২ মিনিটে। তিনি এসে হোয়াইট হাউসে পৌছান ১২টা ৪০ মিনিটে। এদিন সকালেই সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে খসড়া যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব পান নিক্সন। জেনারেল হেগ রুশ কূটনীতিককে বলেন, সোভিয়েত প্রস্তাবে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কোনো উল্লেখ নেই। এতে বেশ ফাঁকফোকর থেকে গেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো– ভারত যে পশ্চিম পাকিস্তানের ভূখণ্ড দখল করে নেবে না, তার কোনো অঙ্গীকার নেই। হেগের কথায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে এটাই হলো অন্যতম মুখ্য বিষয়। তবে হেগ এ কথাও বলেন যে, সোভিয়েত বার্তার সংক্ষিপ্ত সার তিনি এভাবে বুঝতে চান যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বর্তমানে যে সীমান্ত রেখা রয়েছে, তার কোনোই পরিবর্তন হবে না। রুশ কূটনীতিক বলেন, এমনটা সোভিয়েতেরও দৃষ্টিভঙ্গি বলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করেন। ১৪ ডিসেম্বরেই ভারত মহাসাগরে সপ্তম নৌবহর প্রেরণ প্রশ্নে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট একটি টেলিগ্রাম পাঠায় দিল্লিতে তাদের দূতাবাসে। এতে বলা হয়– ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ঝা সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিসকোর সঙ্গে দেখা করে বলেছেন, ভারত মহাসাগরে পারমাণবিক অস্ত্র সজ্জিত মার্কিন নৌবহর মোতায়েনে ভারত সরকার উদ্বিগ্ন। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বলেন, 'এর আগে মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি আরউইন তাকে অবহিত করেন যে, আসলে লোকজন সরিয়ে আনার লক্ষ্যেই হেলিকপ্টারগুলো অবস্থান নিয়েছে থাইল্যান্ডে। তিনি অনুমান করেছেন যে, হেলিকপ্টারগুলো সম্ভবত ব্যাংককে রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা এমন ইঙ্গিত পেয়েছেন যে, ঐ হেলিকপ্টারগুলো পারমাণবিক জ্বালানিচালিত এয়ারক্রাফট কেরিয়ারের ওপরে সজ্জিত রয়েছে। ঝা বলেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে এর আগে এটা স্পষ্ট করে বলেছেন, বিদেশী নাগরিকদের নিরাপদে সরিয়ে নিতে সবরকম পদক্ষেপ গ্রহণে ভারত সংকল্পবদ্ধ এবং সে লক্ষ্যে তার সরকারের রয়েছে সর্বাত্মক প্রস্তুতি। যদি দরকার পড়ে ঢাকা থেকে সব বিদেশী নাগরিককে তারা সরিয়ে নেবে। ভারত সরকার এখন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এই নিশ্চয়তা চায় যে, দিল্লির সঙ্গে আগাম চুক্তি ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র যেন লোকজন সরানোর কাজ শুরু না করে। ১৩ ডিসেম্বর পেন্টাগনের এক সংবাদ সম্মেলনে সপ্তম নৌবহর মোতায়েন সংক্রান্ত এক

প্রশ্নের জবাবে সেক্রেটারি লেয়ার্ড ইঙ্গিত দেন– যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কনটিনজেন্সি পরিকল্পনা রয়েছে এবং ইভাকুয়েশন কাজে এর ব্যবহার প্রয়োজন হতে পারে। ঝা বলেন, নয়াদিল্লি থেকে তিনি এমন রিপোর্ট পেয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা পাকিস্তানি সৈন্যদের পশ্চিম পাকিস্তানে সরিয়ে নিতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশের কোনো এলাকায় তার নৌবহরের নোঙর নিশ্চিত করতে পারে। ঝা বলেন, এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেয়া হলে তা হবে খুবই মারাত্মক বিষয় এবং দীর্ঘমেয়াদে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। এর আরো নানাবিধ মাত্রা সৃষ্টি হতে পারে। তবে সংঘাতের আশু অবসানের প্রক্রিয়ায় তা কোনো প্রভাব ফেলবে না। ১৪ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টায় হেনরি কিসিঞ্জার, সোভিয়েত চার্জ দ্য এফেয়ার্স/মিনিস্টার ভরনস্তব ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হেগ এক বৈঠকে মিলিত হন। ড. কিসিঞ্জার এ সময় বলেন, সোভিয়েত সরকারের কাছ থেকে নিশ্চয়তা পেয়ে আমরা আশ্বস্ত হচ্ছি যে, পশ্চিম পাকিস্তানের ভূখণ্ড দখল নিয়ে ভারতের সত্যি কোনো উদ্দেশ্য নেই । তিনি স্পষ্টতই বুঝতে চান যে, বর্তমান সংকট শুরুর আগে দুদেশের সীমান্ত রেখা যেমনটা ছিল, ঠিক তেমনটাই রাখতে ভারতের মনে কোনো দ্বিধা নেই । জবাবে রুশ দূত তার সঙ্গে একমত হন। তবে কিসিঞ্জারের এদিনের বক্তব্যের বিবরণ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ১৬ ডিসেম্বরে ঢাকায় পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিরঙ্কুশ অর্থেই পশ্চিম পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ভবিষ্যতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাকুলতার কারণ ছিল একটাই। যে করেই হোক, পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হবে। সে কারণেই রুশ মিনিস্টারের সঙ্গে আলোচনায় কিসিঞ্জার বলেন, যুদ্ধবিরতি প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদে যে প্রস্তাব উঠেছে, সে ব্যাপারে চীনের মনোভাব আমাদের জানা নেই। কিন্তু সব পক্ষ যদি এ ধরনের একটি রেজুলেশন বাস্তবায়িত হতে দেখে, তাহলে উপমহাদেশের বিরোধ নিষ্পত্তি হতে পারে আগামীকালই। রুশ মিনিস্টার এ সময়ে বলেন– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি সাধারণ যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের উর্ধ্বে যেতে রাজি হচ্ছে না। আবার এটাও সত্য যে, এ ধরনের প্রস্তাব মেনে নেয়া সোভিয়েত ও ভারতীয় নেতৃবৃন্দের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ড. কিসিঞ্জার বলেন, এ ধরনের একটি রেজুলেশন সৈন্য প্রত্যাহারের (সম্ভবত পূর্ব পাকিস্তান থেকে) শর্ত পূরণে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, ভারতীয় সৈন্যরা ইতোমধ্যেই পাকিস্তানি ভূখণ্ডে ঢুকে পড়েছে। রুশ মিনিস্টার বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এই জটিলতার জন্য দায়ী। কারণ, সোভিয়েতের কাছে এক সপ্তাহ আগে দেওয়া প্রস্তাব তারা গত সোমবার পুনরায় পরিবর্তন করেছে। এজন্য সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। উদ্বেগের সুনির্দিষ্ট কারণ হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার এর আগে ড. কিসিঞ্জারের হাত দিয়ে যে প্রস্তাব দিয়েছিল সেখান থেকে সরে এসেছে। বিশেষ করে ঐ প্রস্তাবে রাজনৈতিক সমাধানের কথা লেখা থাকলেও পরে তা বাদ দেওয়া হয়। ড. কিসিঞ্জার বলেন, এ কথা সত্য। কিন্তু মার্কিন প্রস্তাবে দ্রুত সাড়া দিতে

সোভিয়েতের ব্যর্থতার কারণেই এই অবস্থার উদ্ভব ঘটেছে। রুশ মিনিস্টার বলেন, আমাদের বুঝতে হবে সমস্যাটাই জটিল। এটা আসলে সোভিয়েত অথবা যুক্তরাষ্ট্রের কোনো অসৎ চিন্তার ফসল নয়। কিসিঞ্জার বলেন, ভারতকে বিপুল পরিমাণ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের তোড়জোড় এবং ভারতকে রক্ষাকবচ দিতে চীনকে হুমকি দেওয়ার বিষয়টি পরিস্থিতিকে আরো জটিল করেছে। রুশ মিনিস্টার জবাবে বলেন, পাকিস্তানেরও কিছু মার্কিনি, কিছু সোভিয়েত ও কিছু চীনা অস্ত্র রয়েছে। প্রকৃত সমস্যা কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানিদের মারাত্মক ভুল পদক্ষেপ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। কিসিঞ্জার বলেন, অতীতচারিতা নয়, আমরা কিন্তু এখন বাস্তব সমস্যা মেটাতে চাইছি। এটাই জরুরি। যুক্তরাষ্ট্র এই মুহূর্তে তার দিক থেকে সৈন্য প্রত্যাহার সংক্রান্ত দাবি পরিত্যাগে প্রস্তুত। এখন যুক্তরাষ্ট্র আশা করছে, সোভিয়েতও তাদের দিক থেকে রাজনৈতিক নিষ্পত্তির দাবি বর্জন করুক। তাহলেই একটা আপোসের রাস্তা তৈরি হবে। রুশ মিনিস্টার এ সময় উল্লেখ করেন, যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু তার আগের 'ল্যাঙ্গুয়েজ' থেকে সরে এসেছে। আর তার ফলেই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। মি. ব্রেজনেভের কাছে লেখা চিঠিতে প্রেসিডেন্ট নিক্সন ঢাকায় মার্কিন উদ্যোগ সম্পর্কে যে কথা উল্লেখ করেছিলেন, সেজন্য মস্কো খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্যোগ থেকে ওয়াশিংটনের আকস্মিক বিচ্যুতি প্রত্যক্ষ করে মস্কো খুবই বিরক্ত বোধ করেছে। আসলে এখন পূর্ব পাকিস্তানে রক্তস্নাত প্রতিরোধের সময়। সব পক্ষকে একযোগে কাজ করতে হবে। এই মুহূর্তে একটি ভায়াবেল রেজুলেশনের একমাত্র অর্থ হচ্ছে, বাংলাদেশের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর। ড. কিসিঞ্জার বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার এ ধরনের কোনো প্রস্তাব মেনে নিতে পারে না। রুশ মিনিস্টার জবাব দেন, সত্যি বলতে কী, এই প্রশ্নটি এখন নিতান্তই একাডেমিক। কারণ তিনি এ সংবাদ জানতে পেরেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তান সরকার ইতোমধ্যেই পদত্যাগ করেছে। ড. কিসিঞ্জার এ পর্যায়ে উল্লেখ করেন, তিনি এখন তিনটি বিষয়ের ওপর জোর দিতে এবং সমঝোতায় পৌঁছাতে চান। এক. ভারতীয়রা পশ্চিম পাকিস্তানে হামলা চালাবে না। দুই. ভারতীয়রা পাকিস্তানি ভূখণ্ড (স্পষ্টতই কাশ্মীরকে বোঝানো হয়েছে) দখলে রাখার ইচ্ছা ব্যক্ত করবে না। তিন. সংকট শুরুর আগের সীমান্ত রেখা মেনে চলবে। রুশ মিনিস্টার বলেন, এতে আমাদের আপত্তি নেই। এটা সোভিয়েতেরও মনের কথা।

কিসিঞ্জার এ পর্যায়ে আরো কিছুক্ষণ তার মতামত ব্যক্ত করেন। এ থেকেও স্পষ্ট হয়, বাংলাদেশের বিজয়লগ্নে নিক্সন ও কিসিঞ্জার স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় নিয়ে নয়, বরং কাশ্মীরসহ পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষার প্রশ্নেই ছিলেন যেমন উদ্বিগ্ন, তেমনি সংবেদনশীল। কিসিঞ্জার মন্তব্য করেছেন– যুক্তরাষ্ট্র সরকার জানে, পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যাবে না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র আইনগতভাবে এই পরিবর্তনকে এই মুহূর্তে মেনে নিতে অপারগ। সুতরাং জাতিসংঘের মাধ্যমে যদি তেমনটা করতে যুক্তরাষ্ট্রকে বাধ্য করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে সে অবশ্যই ভেটো দেবে। ভারত এখন

শুধু পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করেই ক্ষান্ত হতে চাইছে না। একইসঙ্গে সে এই নতুন ব্যবস্থাকে একটা বৈধতা দিতে চাইছে। মাত্র দুসপ্তাহ আগে মাডাম গান্ধী বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকেই যুদ্ধ বন্ধ হওয়া উচিত। কিসিঞ্জার বলেন, বাংলাদেশের মতো একটা ইস্যু নিয়ে কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিছিমিছি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করতে চাইবে? উপরন্তু অনেকে যেমনটা ভাবে, সেভাবে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতবিরোধী নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ঠিকই জানে প্রকৃত সমস্যা কোথায়। ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সকাল হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে কিসিঞ্জার নিক্সনকে বলেন, 'রাশানরা গতকাল এসে এই মর্মে গ্যারান্টি দিয়েছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানে হামলার ঘটনা ঘটবে না। এখন তা হলে প্রশ্ন হলো, কোন আইনানুগ পথ আমরা বেছে নেব। কিসিঞ্জারের এ সময়ের উপলব্ধি হচ্ছে, সংকটের একটা সমাধান আনুষ্ঠানিক রূপ পেতে পারে, যদি নিক্সন ও ব্রেজনেভের মধ্যে পত্র চালাচালি হয় এবং তা জনসমক্ষে প্রকাশের ব্যবস্থা করা যায়। কিসিঞ্জারের কাছে নিক্সন জানতে চান, আচ্ছা বলুন তো, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে একটা প্রকাশ্য বোঝাপড়ার বিষয়টিকে চীন কিভাবে দেখবে। কিসিঞ্জার ত্বরিত জবাব দেন, ওহ, যদি পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষা করা যায়, তাহলে চীনারা আনন্দে লাফিয়ে উঠবে। লক্ষণীয় যে, নিক্সন এ সময় কিসিঞ্জারের কাছে এ কথাও খোলাসা করে নেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে শাসন না চালানোর অর্থ কি বিরোধপূর্ণ কাশ্মীরেও হামলা অথবা দখল করে নেয়ার চেষ্টা থেকে বিরত থাকা? কিসিঞ্জার সোভিয়েত মিনিস্টার ভরনস্তবের বরাত দিয়ে নিশ্চিত করেন যে– 'হ্যাঁ, ঠিক তাই। তিনি আমাকে বলেছেন, এখনো পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের ভূখণ্ড দখল করে নেয়ার কোনো ঘটনা ঘটেনি। আমি তাকে এও বলেছি, আমার সঙ্গে আবার কোনো আইনি খেলা খেলতে যেও না। আমরা মনে করি, বিদ্যমান সীমান্ত রেখার অর্থ হচ্ছে– বিরোধপূর্ণ কোনো ভূখণ্ডও দখল করে নেয়া যাবে না।' কিসিঞ্জার এ পর্যায়ে আরো বলেন, আমার এই মন্তব্য শুনে ভরনস্তব স্পষ্ট করেছেন যে– হ্যাঁ, আমরা সেই গ্যারান্টিই দিচ্ছি। সুতরাং এখন দেখার বিষয় হলো, বিষয়টি কিভাবে আনুষ্ঠানিক রূপ নিচ্ছে। কিসিঞ্জার আবেগের সঙ্গে এ সময় নিক্সনকে এমন কথাও বলেন যে, তিনি যে ফলাফল আশা করছেন, তা যদি বাস্তবে রূপ লাভ করে তাহলে সেটা হবে 'একটি নিরঙ্কুশ অলৌকিক ঘটনা'। তার বক্তব্যের সমর্থনে কিসিঞ্জার এ সময় নিক্সনকে তথ্য দেন– 'আমার কাছে অসংখ্য গোয়েন্দা ফাইল রয়েছে যাতে সন্দেহাতীতভাবে এটা স্পষ্ট যে, ভারতীয় স্ট্র্যাটেজি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানকে তারা একটা বিরাট বিস্ময় উপহার দেবেই।' ১৫ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১১টায় কিসিঞ্জার ও সোভিয়েত চার্জ দ্য এফেয়ার্স ভরনৎসোভের সঙ্গে বৈঠক হয়। কিসিঞ্জার এ সময় বৈরিতার অবসানে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কসিগিনকে লেখা একটি চিঠি হস্তান্তর করেন। এই বৈঠকের সার সংক্ষেপে লেখা আছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন

যুক্তরাষ্ট্রকে নিঃশর্তে এই গ্যারান্টি দিচ্ছে যে, পশ্চিম পাকিস্তান অথবা কাশ্মীরে কোনো হামলা হবে না। তারা যখন পশ্চিম পাকিস্তানের কথা উল্লেখ করে, তখন পাক অংশের কাশ্মীরসহ বিদ্যমান বিভাজন রেখাকেই বুঝিয়ে থাকে। এ পর্যায়ে কিসিঞ্জার মন্তব্য করেন যে, 'সোভিয়েতরা এ নিয়ে প্রকাশ্যে বলতে পারে না। কারণ তখন তা হয়তো একটি বন্ধু-রাষ্ট্রকে আহত করার পর্যায়ে পড়বে। এটা তো সত্য যে, ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি ক্লায়েন্ট রাষ্ট্র ছিল না। আমি ভরনস্তবকে বললাম, দুটি পথ খোলা। পশ্চিম পাকিস্তানে শিগগিরই যুদ্ধবিরতি কার্যকর দেখতে চাই। তা যেভাবেই হোক, জাতিসংঘ কিংবা আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে। অন্যথায় উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়া আমাদের সামনে কোনো বিকল্প পথ থাকবে না।'

নিক্সনের জন্য কাশ্মীর পেল পাকিস্তান

কাশ্মীর প্রশ্নে নিক্সন এতটাই আবেগপ্রবণ ছিলেন যে, তিনি যে কোনো মূল্যে ঢাকার পতন মুহূর্তে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের কাছে নিশ্চয়তা চেয়েছেন। ১৯৭১ এর ১৫ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা ৫৫ মিনিটে কিসিঞ্জার নিক্সনকে বলছেন, ভারতীয়দের বিশ্বাস করা যায় না। তারা চাইছে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের বৈধতা জাতিসংঘের কাছ থেকে নিয়ে নিতে। এর ফলে জাতিসংঘকে আগ্রাসনের এক সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে গণ্য করা সহজ হবে। সে কারণেই আমরা এটা মানতে পারি না। ... সোভিয়েতরা আমাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছে, পশ্চিম পাকিস্তানে হামলা হবে না। কিন্তু এমন কায়দা করে বলছে, তাতে কাশ্মীর প্রশ্নে নিশ্চয়তা মিলছে না। আমি আজই দক্ষিণ এশিয়ায় এইডের দায়িত্বপ্রাপ্ত মারি উইলিয়ামসের সঙ্গে কথা বলেছি। ব্যাটা ভারতের পক্ষে। কিন্তু তিনিও বলছেন, পাকিস্তান যদি তার অংশের কাশ্মীর হারায় তাহলে তার আর কিছুই থাকবে না। নিক্সন এ পর্যায়ে বলেন, ভালো কথা ভারতীয়দের এখন অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিতে হবে। তারা নিতে পারে, কিন্তু যদি তা তারা করে তবে তাদের ... । ঠিক আছে আমরা অপেক্ষা করব। আমাদের কোনো বিকল্প নেই, শুধুই অপেক্ষা। এটা এখন ভারতীয়দের হাতে।

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১, সকাল সাড়ে ৯টা

নিক্সন : ঢাকা আত্মসমর্পণ করেছে। এখন ইস্যু হলো–

কিসিঞ্জার : আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভারত যদি পশ্চিম পাকিস্তানে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে রাজি না হয়, তাহলে আমরা পক্ষ নেব। এ পর্যন্ত না হয়, সোভিয়েতদের অপেক্ষার যুক্তি ছিল। এখন তো ঢাকা আত্মসমর্পণ করেছে।

নিক্সন : প্রস্তাবটা কি তোলা হয়েছে ...।

কিসিঞ্জার : না। এটা টেবিলে আছে, আজ সম্ভবত ভোট হবে। আর সেটাই হবে পরীক্ষা।

নিক্সন : সোভিয়েতরা এতে ভেটো দেবে।

কিসিঞ্জার : তিনটি সম্ভাবনা আছে। প্রথমত, ব্রিটিশ প্রস্তাব গ্রহণ। দ্বিতীয়ত, পাক-ভারতের যুদ্ধবিরতি। তৃতীয়ত, ভারত কাশ্মীরে পাকিস্তানিদের নাস্তানাবুদ করা পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত রাখা। আমরা কিন্তু এদিকে গত রাতে পাকিস্তানিদের কাছ থেকে

আরেকটি আবেদন পেয়েছি। তারা আমাদের কাছে বিমান চাইছে। কিন্তু আমরা তো এখন এটা বিবেচনা করতে পারি না। এটা যদি কাল রাতের মধ্যে নিষ্পত্তি না ঘটে তাহলে আমরা জানিয়ে দেব রাশানরা এটা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিল।

নিক্সন : আমি কিন্তু একটা বিষয়ে অসন্তুষ্ট। ভারতের মন্ত্রিসভায় কী ঘটছে, তা আপনিও আমাকে জানাতে পারছেন না। আমি জানি স্টেট ডিপার্টমেন্টে ভারতপন্থি অনেক লোক আছে, তারা বিলম্ব ঘটাচ্ছে। কিন্তু আমি এটা চাই। আমি প্রতিদিন ভারতকে এ নিয়ে চাপের মধ্যে রাখতে চাই। ঢাকার তো পতন ঘটেছে। এখন আমরা সেই রাষ্ট্রদূতকে (ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ঝা) এখানে দেখতে চাই। তাকে জানিয়ে দিন তিনি আমাদের টেলিভিশন ও রেডিওর সুবিধা নিয়ে যে কাণ্ড করে চলেছেন, তাতে প্রেসিডেন্ট খুবই ক্ষুব্ধ। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় কী পরিমাণ সাহায্য পায় সে সম্পর্কে আমি সাচ্চা খবর জানতে চাই। তারা যে পরিসংখ্যান ব্যবহার করছে তা সঠিক নয়। আমি একটি রিপোর্ট চাই। পিএল ৪৮০ একক ও বহুপক্ষীয়– সব হিসাবই আমি একসঙ্গে পেতে চাই। কারণ ওদের একটা চাপ দিতেই হবে। ভারতীয়রা যতদূর যেতে চায় রাশানরা কিন্তু তত দূরই যাবে। ভারতীয়দের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তারা একটি রাশান তাঁবেদার রাষ্ট্র হিসেবে থাকতে চায় কী চায় না।

কিসিঞ্জার : মি. প্রেসিডেন্ট আমাদের পরবর্তী করণীয় হলো– যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতে পণ্য সরবরাহ বন্ধ করা। ১২৩ মিলিয়ন ডলারের পণ্য যাচ্ছে ভারতে। অবশ্য এ জন্য ভারত ইতোমধ্যেই পরিশোধ করেছে। এটা বন্ধ করতে গেলে অনেক মামলায় জড়াতে হবে।

নিক্সন : ভারতীয়রা যদি তাদের বর্তমান পথচলা অব্যাহত রাখে তাহলে তো আমাদের কোনো উপায় থাকবে না। এমনকি তাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেব। হেনরি কথাটা কি ঠিক বললাম?

কিসিঞ্জার : বিলকুল ঠিক। ইতোমধ্যেই তারা এক শক্তিশালী বিজয় লাভের বিবৃতি দিয়েছে। চীনের জন্য তা বয়ে এনেছে এক অবিশ্বাস্য অভিঘাত। এটা আমাদের গায়ে লাগেনি বটে, কিন্তু কথা হলো– ভারতীয়রা অবশ্যই চীনাদের অপদস্ত করেছে।

নিক্সন : ও, ভালো কথা। জর্ডান কি প্লেন পাঠিয়েছে?

কিসিঞ্জার : ১৭ টি।

নিক্সন : এখন আমার কথা হলো– এসব ছোটখাটো বিষয়ের প্রতি আমরা কিন্তু একটা নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছি। এখন আমরা রাশানদের এটা বলতে চাই, তোমরা এতই অবিশ্বস্ত যে, তোমাদের সঙ্গে ডিল করা চলে না কোনো ইস্যুতে। এখন তাহলে সেই কার্ড খেলতে পারি।

কিসিঞ্জার : হ্যাঁ, আমরা কথাটা এখন সুন্দরভাবে বলতে পারি।

নিক্সন : আমরা ঘরোয়াভাবে বলতে পারি, কিন্তু তারা তা বিশ্বাস নাও করতে

পারে।

কিসিঞ্জার : আচ্ছা। তারা যদি শেষ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে যুদ্ধবিরতিতে রাজি না হয়, তখন আমরা কী করব?

নিক্সন : মধ্যপ্রাচ্যে আলোচনা বন্ধ করে দিতে হবে। ইসরাইলকে দিতে হবে অস্ত্র। সল্ট নিয়ে আলোচনা স্থগিত করতে হবে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পরিষদ প্রকাশ্য অবস্থান নিতে পারে। তারা বলতে পারে বিপদে স্বরূপটা কী হবে? এটা ঝুঁকিপূর্ণ, কিন্তু উপায় কী? আমি আরো অনেক দূর যাব। আমরা তাদের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনা বন্ধ করে দিতে পারি। মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে স্মিথকে আর অগ্রসর হতে দেব না এবং যে কোনো পরিস্থিতি হোক না কেন, ডবরিনিনের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেয়া হবে।

কিসিঞ্জার : সবই ঠিক। হোয়াইট হাউস চ্যানেল ভেঙে দিন।

নিক্সন : আর রাশানদের প্রতি যে কোনো প্রকাশ্য বিবৃতিতে শীতল মনোভাব দেখাতে হবে। আর প্রতিরক্ষা বাজেট পরিকল্পনাও আমি বাড়িয়ে দেব।

কিসিঞ্জার : প্রতিরক্ষা বাজেট প্রণয়নের কাজ চলছে।

নিক্সন : শুক্রবার (১৭ ডিসেম্বর) রাতের মধ্যে কাজটা শেষ করতে পারবেন না?

কিসিঞ্জার : পারব।

নিক্সন : কিন্তু হেনরি, আমি তো কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না। এই যে সহায়তার রিপোর্ট যে এখানে আসছে না তা সত্যই আমাকে পাগল করে তুলেছে। ভারতকে আমরা কত সাহায্য দিচ্ছি, আগামী বছরে কী দেব? এসবই আমি জানতে চাই। আমি জানি, বড় খেলা হচ্ছে রাশিয়ার খেলা। কিন্তু ভারতীয়রা খেলেও আজ আমাদের এখানে এনেছে। এটাও জানি। তারা তাদের খেলা শেষ হলে এসে বলবে, আচ্ছা, সব ভুলে যান। আমরা দুঃখিত। কিন্তু আমরা কিছুতেই তা মানব না। তারা যদি রাশিয়ার প্রতি নির্ভরশীল থাকতে চায় তাহলে তাই থাক। ভারতের পরিচয় হবে রাশিয়ার একটি তাঁবেদার রাষ্ট্র। ভারত যদি একান্তই কথা না শুনে তাহলে সাহায্য বন্ধ করে দেব।

কিসিঞ্জার : কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে এই বাস্তবতা। আমাদের একটি আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি রয়েছে এবং আমি মনে করি, ভারতকে যদি কথাটা স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলে তাহলেই ভালো।

নিক্সন : সিসকোকে ডাকুন। তিনি ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে ডাকবেন। তাকে সাফ জানিয়ে দিতে হবে, যদি যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব কার্যকর না হয়, তাহলে আমাদের সামনে কোনো বিকল্প থাকবে না। আমরা ভারতকে সব ধরনের সহায়তা বন্ধ করে দেব। এক ঘণ্টার মধ্যে আমাকে জানাবেন।

কিসিঞ্জার : ইয়েস মি. প্রেসিডেন্ট।

এর পরে ফুট নোটে লেখা হয়েছে কিসিঞ্জার নিক্সনকে ১০টা ৪০ মিনিটে ফোন করেন এবং জানান ভারত পশ্চিম পাকিস্তানে একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে। তার কথায় 'এটা আমরাই করেছি।'

কিসিঞ্জার অবশ্য এজন্য ভারতের ওপর পর্যাপ্ত চাপ সৃষ্টির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

লক্ষণীয় হচ্ছে নিক্সন ও কিসিঞ্জারের সংলাপে পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের হাতছাড়া হওয়ায় কোনো আক্ষেপ করেননি। বরং ঢাকায় যখন আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষরদান চলছে তখন কিসিঞ্জার নিক্সনকে বলছেন, মি. প্রেসিডেন্ট, কনগ্র্যাচুলেশন্স। আপনার জন্যই রক্ষা পেল পশ্চিম পাকিস্তান।

৭ মার্চের ভাষণ শুনতে ওয়াশিংটনের রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা

শেখ মুজিব ৭ মার্চে কী বলতে যাচ্ছেন– তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে ওয়াশিংটন। শুধু মুজিব কী বলতে পারেন আর সে পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতি কোন দিকে গড়াতে পারে– তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণে মেতে উঠেন হেনরি কিসিঞ্জার ও তার হোয়াইট হাউসের পারিষদবর্গ। কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে সিনিয়র রিভিউ গ্রুপের এই বৈঠক বসে ওয়াশিংটনে ৬ মার্চ, ১৯৭১। সকাল ১১টা ৪০ মিনিট থেকে ১২টা ২০ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বৈঠকে কিসিঞ্জার, স্টেট ডিপার্টমেন্টের এলেক্স জনসন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডেভল ব্রেট, সিআইএ-র রিচার্ড হেলমস, জয়েন্ট চিফ অব স্টাফের ভাইস অ্যাডমিরাল জন ওয়েনেল। ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের কর্নেল রিচার্ড কেনেডি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কিসিঞ্জার আলোচনার শুরুতেই বলেন– যাক আমাদের কি করণীয় হবে তা রাত পোহালেই একটা ধারণা হবে। জনসন বলেন, মুজিবের ভাষণেই অনেক কিছু স্পষ্ট হবে। ইয়াহিয়া যে ভাষণ দিয়েছেন, তাকে আমাদের দূতাবাস মিঠেকড়া হিসেবে বর্ণনা করেছে। মুজিব যদি আমাদের কাছে আসেন এবং বলেন, তিনি এক তরফা স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে চলেছেন, আর সে ক্ষেত্রে জানতে চান আমাদের মনোভাব কি হবে? তখন কিন্তু আমরা একটা ফাপরে পড়ব। সেজন্য আমাদের একটা অবস্থান ঠিক করতে হবে। ইয়াহিয়া যদি তার ঘোষণা অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানে শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেন তাহলে আমাদের করণীয় নির্ধারণ করতে হবে। আমরা মনে রাখব, সেখানে ইয়াহিয়ার সৈন্য সংখ্যা ২০ হাজার। এরমধ্যে ১২ হাজার নিয়মিত সৈন্য। আর সবচেয়ে বড় কথা সাড়ে সাত কোটি মানুষের একটি বৈরী জনসংখ্যা। এর পরিণতি হবে একটি রক্তস্নান। আর কোনো দিনই পশ্চিম পাকিস্তানি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে না পূর্ব পাকিস্তানের ওপর। সেক্ষেত্রে আমরা তাড়াতাড়ি সংঘাত নিরসনে উদ্যোগী হব। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে নেতৃত্ব আমাদের হাতে না অন্যদের কাছে চলে যাবে তা এখনই বলা মুশকিল। আমরা পরিস্থিতি নিয়ে আজ অপরাহত ব্রিটিশদের সঙ্গে কথা বলেছি। মুজিবের রয়েছে অতুলনীয় রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ। গত নির্বাচনে ১৬২ আসনের মধ্যে মুজিব পেয়েছেন ১৬০ এবং তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। অন্যদিকে ভুট্টো যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি পুরোদস্তুর বৈরী। যদিও আমরা আশা করছি যে, দুই অংশ একসঙ্গে থাকবে। রক্ষা করা যাবে পাকিস্তানের অখণ্ডতা। কিন্তু আমার মনে হয়

সেই সম্ভাবনা এখন একেবারেই ক্ষীণ। এটা আসলে শুধু সময় ও পরিস্থিতির বিষয়। তারা কিভাবে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে। সেই বিভক্তিটা কেমন হবে? সম্পূর্ণ নাকি একটা লোক দেখানো কনফেডারেল ব্যবস্থা থাকবে? আমি আজ ঢাকা ও ইসলামাবাদে আমাদের লোকদের কাছে সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে একটা ধারণা সম্বলিত বার্তা পাঠাতে যাচ্ছি। ঢাকাকে বলব, তাদের কাছে মুজিব যদি প্রস্তাব পাঠায় তাহলে তারা যেন নিজেরা কোনো সিদ্ধান্ত না নেয়, দ্রুত অবহিত করে ওয়াশিংটনকে। আমরাই তখন সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় একটা সিদ্ধান্ত দেব। সাধারণভাবে আমরা পাকিস্তানের অখণ্ডতা দেখতে চাই। যদি তা না হয়, তাহলে চেষ্টা করব যাতে যতটা সম্ভব কম রক্তক্ষয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির। মুজিব যদি আমাদের বলেই বসেন আমরা তখন একটা টান টান রশির ওপর দিয়ে হাঁটব। আমরা এমন একটা ভাব দেখাব যে, এ ব্যাপারে আমাদের মনোভাব শীতল। যদি আদৌ কোনো সমঝোতার সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে তাহলে আমরা চেষ্টা করব ভাঙনের দিকে না যেতে। আমরা তাকে নিরুৎসাহিত করব। এ পর্যায়ে ক্রিস্টোফার ভ্যান হোলেন বলেন, আগামীকাল মুজিবের সামনে সম্ভবত তিনটি বিকল্প খোলা। প্রথমত, একতরফাভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা, এর চেয়ে কম কিছু– সম্ভবত দুটি সংবিধান প্রণয়নের দাবি জানানো। তৃতীয়ত, ২৫ মার্চে ইয়াহিয়া ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির যে বৈঠক ডেকেছেন তাতে যোগ দিতে রাজি হওয়া।

কিসিঞ্জার : মুজিব কি অ্যাসেম্বলি নিয়ন্ত্রণ করছেন না?

হোলেন : হ্যাঁ। কিন্তু ইয়াহিয়াকে ছাড়া তিনি অ্যাসেম্বলির বৈঠক আহ্বান করতে পারেন না।

কিসিঞ্জার : ২৫ মার্চে অ্যাসেম্বলি ডাকা কেন পূর্ব পাকিস্তানের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়? তারাই তো অ্যাসেম্বলি নিয়ন্ত্রণ করছে এবং তাদের বাদ দিয়ে তো কোনো কিছু পাস করা সম্ভব নয়।

হোলেন : তারা এটাকে ইয়াহিয়ার আরেকটা কূটকৌশল হিসেবে গণ্য করতে পারে। কিসিঞ্জার তারা যদি একটি অ্যাসেম্বলি বৈঠকের প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে তাহলে তো আমাদের কোনো পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক সমস্যা নেই।

জনসন : আমি একমত। তাপমাত্রা নামবে।

কিসিঞ্জার : স্বাধীনতার ঘোষণার পেছনে কি মতলব থাকতে পারে?

হোলেন : পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলন সেদিকেই যাচ্ছে। ইয়াহিয়া ৩ মার্চে ডাকা অ্যাসেম্বলির বৈঠক স্থগিত করে তার গতি তীব্র করেছেন। বাঙালিরা ইয়াহিয়ার গতকালের বৈঠককে কঠোরভাবেই নিয়েছেন। কারণ, ঐ ভাষণে পরিস্থিতির জন্য মুজিবকে দায়ী ও শক্তি প্রয়োগের হুমকি দেওয়া হয়েছে।

কিসিঞ্জার : আমি একমত যে, শক্তির হুমকি দেখিয়ে লাভ নেই।

হোলেন : ঠিক। কিন্তু তারা সেই চেষ্টাই করতে পারবে।

হেলমস : আমরা এ কথাটা মনে রাখতে পারি যে, ইয়াহিয়া বলেছেন, তিনি

পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভাঙনের প্রক্রিয়ায় সভাপতিত্ব করবেন না।

কিসিঞ্জার : তাদের সৈন্য সংখ্যা কত?

হেলমস : ২০ হাজার সৈন্য।

কিসিঞ্জার : পূর্ব পাকিস্তান কি রুখে দাঁড়াবে? তাদের জনসংখ্যা কত?

জনসন : সাড়ে সাত কোটি এবং তারা প্রতিহত করবেই। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা ভারতের ওপর দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে আসার অনুমতি হারাবে।

কিসিঞ্জার : এটা হবে একটা অসম্ভব ব্যাপার। সৈন্য সংখ্যা বাড়াতে হলে তাদের নৌপথ ব্যবহার করতে হবে।

জনসন : তাদের কিছু সি-১৩০ বিমান রয়েছে। যেগুলো সিলন (শ্রীলংকায়) জ্বালানি সুবিধা নিয়ে ঢাকায় আসতে পারবে।

কিসিঞ্জার : সিলন হয়তো সে সুযোগ প্রত্যাহার করতে পারে। তারা তা করবে কি?

হোলেন : তারা এখন অনুমতি দেবে। কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটলে তারা মুখ ঘুরিয়ে নিতে পারে।

জেমস নয়েস (স্টেট ডিপার্টমেন্টের) : সিলন যাতে প্রত্যাখ্যান করে ভারত সেজন্য চাপ দেবে।

জনসন : পাকিস্তানিরা তাদের জেট ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করতে পারে।

নয়েস : তাদের মাত্র ১১টি আছে। তার ধারণক্ষমতাও সীমিত।

কিসিঞ্জার : তাদের নিশ্চয় কিছু লজিস্টিক্স ব্যাকআপ রয়েছে।

নয়েস : তাদের তিনটি জাহাজ আছে। যা দিয়ে এক সপ্তাহের মেয়াদে আট হাজার লোক স্থানান্তর করতে পারে।

হোলেন : এসব সমস্যা সত্ত্বেও আমাদের ইসলামাবাদ দূতাবাস অনুমান করছে ইয়াহিয়া শক্তি প্রয়োগের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

নয়েস : ঢাকায় তাদের ১৫ হাজার সৈন্য রয়েছে।

কিসিঞ্জার : আপনি বলতে চাইছেন, তাদের ২০ হাজার সৈন্যের মধ্যে ১৫ হাজার এখন ঢাকায়? তারাই ঢাকা কব্জা করতে পারবে?

জনসন : আসলে পরিস্থিতি এমন নয় যে, ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করা সম্ভব।... পশ্চিম পাকিস্তান যদি শক্তি প্রয়োগ করে, তাহলে রক্তস্নান অথবা অন্তত পূর্ব পাকিস্তানে আগুন জ্বলে উঠবে। যদি এর দ্রুত অবসান ঘটে তাহলে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এটা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে সমস্যা হবে। কারণ, ভারতীয়রা এবং সম্ভবত অন্যরাও তখন হস্তক্ষেপের চিন্তা করতে পারে। কিন্তু স্বল্পকালীন সময়ের জন্য এমন সম্ভাবনা নেই।

কিসিঞ্জার : পশ্চিম পাকিস্তানিরা যাতে শক্তি প্রয়োগ না করে, এজন্য তাদের নিরুৎসাহিত করতে আমাদের কি করা উচিত। ইয়াহিয়াকে কি আমরা বলব যে, আমরা কিন্তু এটা সমর্থন করব না?

জনসন : আমাদের প্রথমেই ব্রিটিশদের কাছে পেতে হবে। তাদেরকেই বলব আপনারাই নেতৃত্ব দিন। আমাদের নেতৃত্ব নেয়া ঠিক হবে না।

হেলমস : আমেন!

কিসিঞ্জার : হস্তক্ষেপ করা হবে প্রায় আত্মপরাজয়ের শামিল।

জনসন : পরিস্থিতির প্রতি আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। প্রভাবও খুবই সামান্য।

কিসিঞ্জার : মুজিব কখন ভাষণ দেবেন?

হেলমস : আগামীকাল। গ্রিনিচ মান সময় ১৬০০।

হোলেন : নেতৃত্ব দিতে আমাদের না জড়ানোর আর একটি কারণ হলো পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের সন্দেহ করে। তারা ভাবে আমরা একটি পৃথক পূর্ব পাকিস্তান সমর্থন করছি। আমরা যদি এখন ইয়াহিয়াকে বলি শক্তি প্রয়োগ করা ঠিক হবে না। তাহলে এতে শুধুই সন্দেহের আগুনে ঘি ঢালা হবে।

কিসিঞ্জার : প্রেসিডেন্ট এমন কিছু করতে খুবই শীতল মনোভাব দেখাবেন। যাকে ইয়াহিয়া ব্যক্তিগতভাবে দোষে নিতে পারেন। ...

ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভুট্টোকে নাচাতে সক্ষম হবেন। যদি পূর্ব পাকিস্তান একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানকে ভুট্টো করায়ত্ত করতে পারবেন।...

জনসন আমরা কাল ব্রিটিশদের সঙ্গে কথা বলব। নিজেরাও আবার বৈঠকে বসব। দেখি মুজিব তার ভাষণে কি বলেন? যদি তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন আমরা কি তাহলে অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের অনুরোধ পাব?

জনসন : সম্ভবত। কিন্তু আমরা কিন্তু তাড়াহুড়া করব না। আমাদের দেখতে হবে মুজিব আমাদেরকে কিভাবে এপ্রোচ করেন? আমরা কিন্তু প্রথম স্বীকৃতি দাতাদের দলে থাকব না। আমরা ব্রিটিশদের সঙ্গে প্রথমে কথা বলব। কারণ, পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অংশে তাদের স্বার্থ রয়েছে।

হোলেন : জাপান, সম্ভবত পশ্চিম জার্মান ও ফরাসের কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে।

জনসন : শেষ পর্যন্ত আমরা স্বীকৃতি দেব। কিন্তু প্রথম দেশ হব না।

কিসিঞ্জার : আচ্ছা স্বীকৃতির অনুরোধ যদি ঢাকায় আমাদের কনসাল জেনারেলের কাছে প্রথম আসে? তখন তিনি কি বলবেন?

হোলেন : কেন? তিনি তখন বলবেন আচ্ছা, আমি ওয়াশিংটনকে জানিয়ে দিচ্ছি।

জনসন : আমি আজই তাদের এ কথা জানিয়ে দেব। অবশ্যই আমাদের না জানিয়ে তারা তো কিছু বলবে না।

কিসিঞ্জার : আমাদের তৃতীয় বিকল্পে বলা হয়েছে, যদি সামরিক হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটে তাহলে আমরা ভারতীয়দের সঙ্গে কথা বলব। আমি অবাক হচ্ছি এটা কি

বলা ঠিক হবে? আমি বরং বলি কি, যদি ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপের হুমকি থাকে, তাহলে বরং ভারতকে আমরা এটা বলি যে, দেখ এমনটা করা কিন্তু ঠিক হবে না।

হোলেন : একেবারে গোড়াতেই ভারতীয় হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ।

কিসিঞ্জার : চীনা সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাও কিন্তু খুবই কম।

হোলেন : যদি সত্যিই একটি প্রকৃত রক্তস্নানের ঘটনা ঘটে। আর আমরা বায়াফন্ধা পরিস্থিতি দেখতে পাই তাহলে আমরা গোটা বিষয়টি রিভিউ করতে পারি। সেক্ষেত্রে এই সমস্যার প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে।

জনসন : যাই ঘটুক না কেন? পশ্চিম পাকিস্তানকে কোনো নিষেধাজ্ঞা দিয়ে হুমকি দেব না।... আচ্ছা মুজিবের ভাষণ সম্পর্কে আমরা কখন শুনতে পারব।

নয়েস : সকাল প্রায় ৫টায়।

স্যান্ডার্স (এনএসসি স্টাফ) : দশ ঘন্টার ব্যবধান। কিন্তু আমাদের এটা জানতে হবে খুব সকালেই। ইয়াহিয়ার ভাষণ গতকাল আমরা শুনেছি সিবিএস এর আটটার খবরে।

জনসন : মুজিবের ভাষণের জন্য আমাদের অপারেশন সেন্টারে সতর্ক অবস্থা জারি থাকবে।

কিসিঞ্জার : মুজিবের ভাষণ সম্পর্কে যখনই আমরা জানতে পারব, তখনই আমরা পরস্পরের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলব।

মুজিব নিয়েছিলেন গান্ধীর পথ : কিসিঞ্জার

কিসিঞ্জার মনে করেন, মুজিব ৭ মার্চে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে একটু কৌশলী হন। তিনি মহাত্মা গান্ধীর মতোই শান্তিপূর্ণভাবে স্বাধীনতার দাবি আদায় করতে চেয়েছিলেন। ৭ মার্চে মুজিব পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে নিশ্চিতভাবেই একটি সংঘাত এড়িয়ে গেছেন। ১৩ মার্চে নিক্সনকে দেওয়া এক স্মারকে এ মন্তব্য করেন কিসিঞ্জার। কিন্তু তিনি বলেন যে, আপাতত শোডাউন এড়ানো গেলেও পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো ধরনের সমঝোতা ও নিষ্পত্তির প্রশ্নটি আগের মতোই রয়ে গেছে নাজুক। পরিস্থিতির কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। ইয়াহিয়া ও পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখতে চাইবেন। এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ মিলছে যে, সিলনের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ইয়াহিয়া ব্যক্তিগতভাবে সমঝোতা চাইতে পারেন। কিন্তু সেজন্য তাকে তার সেনাবাহিনীর পরাক্রমশালী কট্টরপন্থিদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানি নেতা মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া থেকে সামান্য পিছু হটলেও তার ৭ মার্চের ভাষণের দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে। মনে হচ্ছে তার এই পেছনে সরে আসা মূলত কৌশলগত। তিনি তার ভাষণে ইমানসিপেসন বা 'মুক্তি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যা আসলে স্বাধীনতা ঘোষণারই নামান্তর। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, এটা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন থামবে না। এটা লক্ষণীয় যে, মুজিব তার দল আওয়ামী লীগকে দেশের একমাত্র বৈধ কর্তৃপক্ষ হিসেবে ঘোষণার মধ্য দিয়ে তিনি ইয়াহিয়ার মুখোমুখি হলেন। কিসিঞ্জার লিখেছেন, ইসলামাবাদে আমাদের দূতাবাসের বিশ্বাস মুজিব তার লক্ষ্যে অটল থেকেছেন। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানি কর্তৃত্ব থেকে পূর্ব পাকিস্তানের 'বন্ধনমুক্তি' চেয়েছেন। তবে এখনো একটি অখণ্ড পাকিস্তানের মধ্যে তিনি 'পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন' মেনে নিতে পারেন বলে গণ্য করা যেতে পারে। এ কথাও ঠিক যে, মুজিবুর রহমান নিশ্চিতভাবেই এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছেন যে, যে স্বাধীনতা তিনি চেয়েছেন তা শুধুই সরাসরি স্বাধীনতার দাবি জানানোর পথেই অর্জিত হতে পারে। ৭ মার্চের ভাষণ বিশ্লেষণ করলে এমনটা প্রতীয়মান হয় যে, সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি তিনি এড়াতে চেয়েছেন। তার ধারণা তিনি ধীরে ধীরে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তার লক্ষ্য অর্জন করবেন। আর এই প্রক্রিয়াতেই একতরফা স্বাধীনতাদানের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। বর্তমানের এই জটিল রাজনৈতিক

সমীকরণের আরেক চরিত্র হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনৈতিক নেতা জেড এ ভুট্টো। এই মুহূর্তে তিনি নীরব রয়েছেন। মধ্য ফেব্রুয়ারিতে ডাকা গণপরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে অস্বীকার করে তিনি বর্তমান সংকটকে ঘনীভূত করেছেন। যদি গণপরিষদ আহ্বান করা সম্ভব হয় তাহলে ভুট্টো ও রহমানের মধ্যে কেন্দ্র এবং প্রদেশের ক্ষমতার বণ্টন প্রশ্নে অন্তত কাগজে-কলমে হলেও একটা সুরাহা হতে পারে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, ভুট্টো ও রহমান এই মুহূর্তে সংকট অবসানে সত্যিই কতটা আন্তরিক হবেন। কিসিঞ্জার তার স্মারকে উক্তরূপ বর্ণনা দানের পর মন্তব্য করেন যে, ইয়াহিয়া ও পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী অখণ্ড পাকিস্তান রক্ষায় কোনো রাজনৈতিক সমাধানের প্রশ্নে এগিয়ে আসে কি না তা সামনের দিনগুলোতে স্পষ্ট হবে। ইয়াহিয়া মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে শিগগিরই ঢাকা যাচ্ছেন। যেসব পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারে তা হলো :

১. ইয়াহিয়া হয়তো রহমানের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেবেন। হয়তো বড় জোর রহমান ও অন্য নেতাদের গ্রেফতার করবেন এবং পূর্ব পাকিস্তানে একটা সামরিক সমাধান থেকে নিজেকে সংযত রাখবেন। এক্ষেত্রে দুটো সমস্যা আছে। প্রথমত, রহমান-গান্ধী আদলে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছেন। সে কারণে ইয়াহিয়া যে সামরিক আক্রমণ চালাবেন তার যথার্থতা দেওয়া কঠিন হবে। দ্বিতীয়ত, পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর রয়েছে সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা। তারা একটি প্রলম্বিত জনবিদ্রোহকে দীর্ঘমেয়াদে প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না।

২. একটা নিশ্চল অপেক্ষার খেলার উদ্ভব ঘটতে পারে। সেনাবাহিনী অথবা বেসামরিক কোনো তরফেই অচল অবস্থা নিরসনে কোনো সাহসী পদক্ষেপ নেয়া হবে না। উভয়পক্ষ আশা করবে অন্যপক্ষ এটা ভাঙতে আগে এগিয়ে আসবে। সম্ভবত মুজিব এবং আমরা বর্তমানে ঠিক এই ধরনের একটি বাস্তবতার মুখোমুখি। এই অবস্থা থেকে শক্তি প্রয়োগের ঘটনা ছাড়াই পর্যায়ক্রমে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর একটি কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে মুজিব সক্ষম হবেন।

৩. ইয়াহিয়া, রহমান অথবা ভুট্টো অধিকতর কৌশলগত রাজনৈতিক চাল দিতে পারেন। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে একটুও না ছাড় দিয়ে সময়ক্ষেপণ করতে পারেন। সংক্ষেপে পাকিস্তানের সংকট অবসানের কোনো লক্ষণ নেই। বরং তা হঠাৎ জ্বলে উঠতে পারে। আপনি জানেন গত শনিবার ৬ মার্চ সিনিয়র রিভিউ গ্রুপ বৈঠকে বসেছিল। লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানের পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য ভূমিকা নির্ধারণ। ঐ বৈঠকে সাধারণভাবে সবাই একমত হয়েছেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক হস্তক্ষেপ তেমন কোনো সুফল বয়ে আনতে পারবে না। তাই উৎকৃষ্ট পন্থা হলো নিষ্ক্রিয় থেকে ঘটনার পর্যবেক্ষণ করা। আমি বলতে চাইছি, আমাদের একেবারে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে যাতে ইয়াহিয়া আপত্তিকর কিছুই না দেখতে পায়। কিসিঞ্জার নিক্সনকে স্পষ্টই এ কথা উল্লেখ করেন যে, পূর্ব

পাকিস্তান এখন একটি রক্তস্নাত গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে। এই অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র নিম্নোক্ত কারণে নীরবতা পালন করে যাবে। প্রথমত, ইয়াহিয়া জেনে এসেছেন, আমরা অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে। সুতরাং এখন এই অবস্থান নাটকীয়ভাবে বিসর্জন দেওয়া যায় না। ইয়াহিয়া আরো জানেন, একটি রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য আমরা সম্ভব সব চেষ্টা করে যাচ্ছি। দ্বিতীয়ত, এ কথা সত্য যে, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির প্রতি আমাদের প্রভাব যত সামান্য। আর সে কারণে আমাদের হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছিত। এখন আমরা কিছু করতে গেলেই তা পশ্চিম পাকিস্তানিদের অসন্তুষ্টি করবে। ভবিষ্যতে সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারা অভিযোগ করবে আমরা অনধিকার চর্চা করছি। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, আমরা যদি এখন এই অবস্থান গ্রহণ করি তাহলে পূর্ব পাকিস্তান যদি কোনোদিন স্বাধীন হয় তাহলে আমাদের ভূমিকাকে তারা সুনজরে দেখবে না। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নতুন রাষ্ট্রের সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাই।

এর পরের দলিলটি ১৫ মার্চ '৭১ এ লেখা। স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাছে প্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সহকারী মন্ত্রী সিসকো লিখেছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী রজার্সকে। এই তথ্য স্মারকের শিরোনাম 'মুজিব নিয়ে নিলেন–পূর্ব পাকিস্তান; ইয়াহিয়া উড়ে গেলেন–ঢাকায়।

'শেখ মুজিবুর রহমান আজ ঢাকায় ঘোষণা করেছেন, তার দল আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। কারণ প্রাদেশিক পরিষদে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ৩০০ আসনের ২৮৮ পেয়েছে আওয়ামী লীগ। মুজিব পদক্ষেপ নেন একতরফাভাবে এবং ইয়াহিয়া খানের সামরিক আইন প্রশাসনকে উপেক্ষা করেই। সত্যি কথা হলো, মুজিব যে পঁয়ত্রিশ দফা দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তা খুবই পরিকল্পিত ও সতর্কতার সঙ্গে। এই পদক্ষেপের তাৎপর্য হচ্ছে, মুজিব ইয়াহিয়া সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিরোধে জড়িয়ে পড়লেন ঠিকই কিন্তু একই সঙ্গে তিনি শর্তহীনভাবে একতরফা পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা থেকে দূরে সরে থাকলেন। এখন ইয়াহিয়ার সামনে বিকল্প হচ্ছে ইতোমধ্যেই বিপন্ন হওয়া অখণ্ড পাকিস্তানের অস্তিত্ব আরো হুমকিগ্রস্ত করবেন কি করবেন না? সেক্ষেত্রে ইয়াহিয়া তার সামরিক আইনের ক্ষমতা প্রত্যাহার করে নিতে পারেন অন্তত পূর্ব পাকিস্তান থেকে। অবশ্য একই সঙ্গে তা আবার পশ্চিম পাকিস্তানে বহাল রাখা কঠিন হবে। ইয়াহিয়া এবং সামরিক বাহিনীর অন্যরা যদি সিদ্ধান্ত নেন যে, মুজিবকে তারা শক্তি দিয়ে প্রতিহত করবেন, তাহলে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হবে। আর তার পরিণতিতে বাংলার স্বাধীনতা হবে অনিবার্য। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সব প্রকারের বন্ধন ছিন্ন হবে। ভরসা একটাই যদিও তা দীর্ঘমেয়াদে ধরে রাখা সম্ভব হবে না, তা হলো সেনাবাহিনী সাফল্যের সঙ্গে অভ্যুত্থান দমাতে পারে। মুজিব তার ভাষণে বাঙালিদের ওপর যদি শক্তি প্রয়োগের কোনো ঘটনা ঘটে, তাহলে 'যার যা কিছু আছে'

তা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ১৪ মার্চ করাচিতে ভুট্টো উভয় অংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানিয়েছেন। যার অর্থ হলো ভুট্টোকে পশ্চিমে আর মুজিবকে পূর্বে। সিসকো এ পর্যায়ে মন্তব্য করেন, ভুট্টোর ভাষণ প্রকারান্তরে মুজিবের গৃহীত পদক্ষেপকেই উস্কে দিতে পারে। এটা কিন্তু বেশ কিছু সময় ধরে সন্দেহ করা হয়েছে যে, ভুট্টো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, পাকিস্তান যদি দুটুকরো বা তার কাছাকাছি কিছু হয়, তাহলেই ভুট্টো পশ্চিমাংশে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন। ভুট্টোর অবশ্য মুজিবের মতো পন্থা অনুসরণ কঠিন। কারণ, পশ্চিমে সেনাবাহিনী খুবই শক্তিশালী এবং তারা সম্ভবত সেখানে কোনো বিদ্রোহ হলে তা সাফল্যের সঙ্গে স্তব্ধ করতে পারবে। এই দলিলের শেষ মন্তব্য পাকিস্তানে যেসব ঘটনা ঘটছে তাতে অখণ্ড পাকিস্তানে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ইয়াহিয়া এখন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তার ওপর নির্ভর করছে অনেক কিছু।

মোশতাকের গোপন মিশনের চাঞ্চল্যকর বৃত্তান্ত

৭১ এর আগস্টে কলকাতায় মার্কিন মিশনের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ স্থাপন করেন কাজী জহিরুল কাইউম। কনসাল জেনারেল গর্ডন ৭ আগস্ট স্টেট ডিপার্টমেন্টে প্রেরিত টেলিগ্রামের সার সংক্ষেপে উল্লেখ করেন, 'আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে মতানৈক্য নেই। তারা সর্বসম্মতভাবে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে একটা আপোসমূলক নিষ্পত্তি চায়। কাইউম বলেন, বাংলাদেশ মন্ত্রীর কাছে এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। মন্ত্রী আশা করেন, বর্তমানে যে অচলাবস্থা বিরাজমান তা নিরসনে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে নিষ্পত্তি সম্ভব। তবে তার পূর্বশর্ত হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে উদ্যোগ নিতে হবে। কাইউম বলেন, বাংলাদেশে সামরিক শক্তি বর্তমানে দুটি 'কনভেনশনাল' ডিভিশন গঠনের চেষ্টা করছে। এছাড়া গেরিলারা তো রয়েছেই। ওই ডিভিশন যখন গঠন করা সম্ভব হবে তখনই পূর্ববাংলার ভূখণ্ড দখল করার পরিকল্পনা নেয়া হবে।' এই টেলিগ্রামের ফুটনোটে লেখা হয়েছে ১ জুলাই কনসাল জেনারেলের অফিসের একজন রাজনৈতিক কর্মকর্তা এবং আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি কাজী জহিরুল কাইউমের সঙ্গে বৈঠক হয়। কাইউম কর্মকর্তাকে বলেছেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেলে উদ্ভূত সম্ভাব্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ উদ্বিগ্ন। তারা আশঙ্কা করছেন, পূর্ব পাকিস্তানের গেরিলাযুদ্ধ যদি প্রলম্বিত হয় তাহলে বাংলাদেশ আন্দোলনের নেতৃত্ব চরমপন্থিরা কব্জা করতে পারে। আর সেই ভীতি থেকেই আওয়ামী লীগ এখনই একটি রাজনৈতিক আপোস চাইছে। এজন্য তারা পূর্ণ স্বাধীনতা থেকেও পিছিয়ে আসতে প্রস্তুত রয়েছে। কাইউম এ লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি, পাকিস্তান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের সঙ্গে মিলেমিশে একটা সমঝোতায় আসতে চায়। কিন্তু কাইউম স্পষ্ট করেন যে, আলোচনার প্রক্রিয়া যা-ই হোক না কেন, তাতে শেখ মুজিবুর রহমানের অংশগ্রহণের কোনো বিকল্প নেই।

গর্ডন তার বার্তায় উল্লেখ করেন, ১. পলিটিক্যাল অফিসার ৭ আগস্ট আবার কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের এমএনএ কাজী জহিরুল কাইউমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি নিশ্চিত করেন, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদের সুনির্দিষ্ট নির্দেশে তিনি কনসাল জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কাইউম দুটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেন। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র দেশ যে সাফল্যের সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌঁছানোর চেষ্টা করতে সক্ষম। দ্বিতীয়ত, এ

ধরনের নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অবশ্যই শেখ মুজিবুর রহমানকে রাখতে হবে। কাইউম বলেন, যদি মুজিবের বিচার করা হয়, ফাঁসি কার্যকর করা হয়, তাহলে আপোসের সম্ভাবনা নেমে যাবে শূন্যের কোঠায়। বাংলাদেশের মন্ত্রিসভায় অন্য যেসব আওয়ামী লীগের নেতা রয়েছেন, তাদের কোনোই নিয়ন্ত্রণ নেই বাংলাদেশের জনগণের ওপর। আর সে কারণে কোনো আপোসরফায় পৌঁছাতে তারা অপারগ। অন্য দিকে মুজিবকে নিয়ে যদি কোনো আপোসরফা করা সম্ভব হয় তাহলে তা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে। এমনকি একটা স্থিতাবস্থা প্রত্যাবর্তন সম্ভব হতে পারে। কাইউম বলেন, শেখ মুজিবের অনুমোদিত সমঝোতার আওতায় উদ্বাস্তুরা দেশে ফিরে যাবে। কাইউম মনে করেন, পাকিস্তানকে সীমিত অস্ত্রসরবরাহের সিদ্ধান্ত নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সঠিক নীতি অনুসরণ করেছে। সে কারণেই রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান সরকারকে সহজেই রাজি করাতে পারবে।

২. কাইউমের মতে আওয়ামী লীগ নেতারা মনে করেন, ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার এক বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। হয়তো আগামী ১৫/২০ দিনের মধ্যেও এটা ঘটতে পারে। আর তা নিশ্চিতভাবেই উপমহাদেশের প্রত্যেকের জন্য বড় বিপজ্জনক। কাইউম বলেন, গুজব রয়েছে, ভারত শিগগিরই বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিতে পারে। আর এটা বাস্তবে রূপ পেলে পাক-ভারতের সংঘাত তীব্রতর হবে, রাজনৈতিক সমঝোতার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে। যুদ্ধের সম্ভাবনাও অধিকতর বৃদ্ধি পাবে। যদি যুদ্ধ আসে তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষেই শান্তিপূর্ণ আপোস-রফার প্রক্রিয়ায় নেতৃত্বদানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আর সে ধরনের পরিস্থিতি হবে আওয়ামী লীগের জন্য প্রতিকূল।

৩. কাইউম বলেন, হাতে সময় অল্পই আছে। তাই তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তৎপর হতে অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রই ভালো জানে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কী করে সমঝোতা শুরু করতে হয়। তিনি সুপারিশ রাখেন, এক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হবে পাকিস্তান সরকারকে এটা জানানো যে, আওয়ামী লীগ সমঝোতার জন্য প্রস্তুত। এটা ওয়াশিংটনে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত অথবা ইসলামাবাদে মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে পাকিস্তানকে জানানো যেতে পারে। তিনি নির্দিষ্ট করে বলেন, আমার সঙ্গে আপনার যেসব কথাবার্তা হলো প্রয়োজনে তার খুঁটিনাটি পাকিস্তান সরকারের কাছে প্রকাশ করতে পারেন। কাইউম বলেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে আগ্রহী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুশতাক আহমেদও এই সফরে সঙ্গী হবেন। কিন্তু কথা হলো এজন্য সর্বাগ্রে ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। নিশ্চয়তা পেতে হবে যে তাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করা হবে। মোশতাক আহমেদ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চান। কিন্তু তিনি এটা জানেন না যে, কিভাবে অগ্রসর হলে ভালো হয়।

৪. কাইউম বলেন, মুক্তিবাহিনী ক্রমেই শক্তিশালী সামরিক শক্তি হিসেবে

আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। তারা ইতোমধ্যেই দুই ধরনের কৌশল উদ্ভাবন করেছে। তারা মুক্তিবাহিনীকে দিয়ে দুটো ডিভিশন করবে– তাদের বর্তমান এক ডিভিশনে ১০ ব্যাটেলিয়ন সৈন্য রয়েছে। প্রতিটি ব্যাটেলিয়ন ১২০০ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত। তাদের দ্বিতীয় ডিভিশন যখন প্রশিক্ষিত ও সুসজ্জিত হবে তখন তারা পূর্ববাংলার অংশবিশেষ দখল করে নিতে উদ্যোগী হবে। অবশ্য মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যোদ্ধারা প্রদেশজুড়ে গেরিলাযুদ্ধ অব্যাহত রাখবে। কাইউম বলেন, ভারত সরকারের হাতে দেরাদুন ও রাজস্থানে ৫০০ পূর্ব পাকিস্তানি (অজ্ঞতাপ্রসূত মন্তব্য?) অফিসার স্কুল রয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের মুক্তিবাহিনীর দায়িত্বে দেয়া হবে। ভারত সরকার ইতোমধ্যেই কনভেনশনাল ডিভিশনকে বিমান বিধ্বংসী কামানসহ অন্যান্য আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করছে। গেরিলা যোদ্ধাদের সীমান্ত সন্নিহিত শিবিরে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

৫. দীর্ঘমেয়াদে আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে, সামরিক বিজয় তারা অর্জন করতে পারে। কিন্তু ততদিনে পূর্ববাংলা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। আর যদি পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ হয় তাহলে পরিস্থিতি হবে আরো নিকৃষ্টতর। আর এসব কারণেই একে রাজনৈতিক আপোসরফায় পৌছানোকে আওয়ামী লীগ বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। তবে যা-ই ঘটুক না কেন, পূর্ববাংলায় এক ব্যাপকভিত্তিক পুনর্গঠনের কাজ কিন্তু প্রয়োজন হবে। কাইউম মনে করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র দেশ যে কিনা প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে সক্ষম হবে।

গর্ডন এ পর্যায়ে মন্তব্য করেন, 'কাইউমের যথার্থতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশের কোনো অবকাশ নেই। কাইউমের জানা মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে আওয়ামী লীগের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম তিনিই। সামরিক দিক থেকে তাকে খুবই আস্থাবান মনে হয়েছে, মুক্তিবাহিনীর বিজয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু একইভাবে তার দৃঢ় বিশ্বাস রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়োজন রয়েছে।' এই টেলিগ্রামের ফুটনোটে লেখা হয়েছে ঢাকার কনসুলেট জেনারেল আওয়ামী লীগে কাইউমের ভূমিকা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন। তাদের মূল্যায়ন হচ্ছে, তিনি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে উল্লেখযোগ্য কেউ নন। কিন্তু সম্ভবত তিনি খন্দকার মোশতাক আহমেদের বিশ্বস্ত এবং একজন সাচ্চা প্রতিনিধি। মুশতাক বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে 'পররাষ্ট্রমন্ত্রী'। (ঢাকা থেকে পাঠানো টেলিগ্রাম ৩০৫৭, ৮ আগস্ট, আরজি ৫৯, সেন্ট্রাল ফাইলস ১৯৭০-৭৩, পল ২৩-৯ পাক) ৯ আগস্ট পাকিস্তানের মার্কিন দূতাবাস কাইউমের প্রস্তাব সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন দেন। এতে তারা বলেছে, যদি ধরে নেয়া হয়, তার উদ্যোগ বৈধ এবং বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দের মতামত প্রতিফলিত হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইয়াহিয়া খানের সরকারের কাছে এটা গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে মনে হয় না। দূতাবাস মনে করে, এ ধরনের প্রস্তাব নিয়ে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আলোচনায় জড়িয়ে পড়লে হিতে বিপরীত হতে পারে। তবে যুক্তরাষ্ট্র যদি ভবিষ্যতে বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সম্পর্কের কথা বিবেচনায় রাখে তাহলে ঝুঁকি নেয়াটার একটা গ্রহণযোগ্যতা আছে।

মোশতাকের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান

ওয়াশিংটন ১৩ আগস্ট, ১৯৭১

ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের স্টাফ হেরাল্ড সেন্ডার্স কিসিঞ্জারকে দেয়া এক স্মারকে বলেন, আপনি জানেন যে, ভারতে বাংলাদেশ প্রতিনিধিরা সম্প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌঁছতে নয়াদিল্লি ও কলকাতায় মধ্যম পর্যায়ের মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট নয়, তারা সত্যিই কী মাছ শিকার করতে চাইছে। কলকাতায় বাংলাদেশ 'পররাষ্ট্রমন্ত্রী'র তরফে কথিত আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে কিছু কম পেয়ে সমঝোতা চান। অন্যদিকে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের 'পররাষ্ট্র সচিব' পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নে ঠিক বিপরীত আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। এই প্রশ্নে আগামীকাল কলকাতায় আরেক দফা আলোচনার দিনক্ষণ স্থির হয়েছে।

[এই নথির ফুটনোটে লেখা হয়েছে ৮ আগস্ট নয়াদিল্লিতে মার্কিন দূতাবাসের পলিটিক্যাল কাউন্সিলর বাংলাদেশ আন্দোলনের 'পররাষ্ট্র সচিব' এম. আলমের (মাহবুব আলম চাষী) বৈঠক করেন। আলম রাষ্ট্রদূত কিটিংয়ের সঙ্গে বৈঠকের আগ্রহ ব্যক্ত করেন। কিন্তু যখন তাকে জানানো হয় যে, কিটিংয়ের পদমর্যাদার কারণে তার পক্ষে কোনো বাংলাদেশ প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক করা সম্ভব নয়। পরে তিনি পলিটিক্যাল কাউন্সিলরের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে রাজি হন। আলম যা বলেছেন, তার সার কথা হচ্ছে– বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেজন্য তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন কামনা করেন। (টেলিগ্রাম ১২৬৯৮, নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট, ন্যাশনাল আরকাইভস, আর জি ৫৯, সেন্ট্রাল ফাইলস, ১৯৭০-৭৩, পল ২৩-৯ পাক)।]

কিসিঞ্জারের কাছে প্রদত্ত স্মারকে সেন্ডার্স একটি টেলিগ্রাম বার্তার খসড়া উপস্থাপন করেন। আওয়ামী লীগ নেতাদের সমঝোতা প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে নয়াদিল্লি ও কলকাতার মার্কিন মিশনে সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে এতে কিসিঞ্জারের অনুমোদন প্রার্থনা করা হয়। এই ক্যাবলটি ১৪ আগস্ট স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে পাঠানো হয়। এটি অবশ্য মুদ্রিত হয়নি। তবে যেসব সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে কিসিঞ্জারের অনুমোদন চাওয়া হয় তা ছিল নিম্নরূপ:

'– স্টেট ডিপার্টমেন্টকে না জানিয়ে বাংলা দেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভবিষ্যতের

কোনো বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রশ্নে কোনোভাবেই কথা দেয়া যাবে না।

– ইতোমধ্যেই আগামীকাল যে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে তাতে আমাদের তরফে কোনো উৎসাহ দেখানো যাবে না। শুধু শুনে যেতে হবে। স্বাধীনতার চেয়ে কম কিছুতে আওয়ামী লীগ সমঝোতায় আসতে ইচ্ছুক কি না তা খতিয়ে দেখা হয়েছে। এটা অবশ্য অনুমোদিত (ফুটনোট : কলকাতায় কনস্যুলেট জেনারেলের একজন কর্মকর্তা ১৪ আগস্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধির কাইউমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কাইউম পুনরায় নিশ্চিত করেন যে, তিনি যা কিছুই বলছেন তা তার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশক্রমেই। পররাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে কম কিছু পেলেও সমঝোতার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন। কাইউম গুরুত্ব আরোপ করেন যে, পূর্ববাংলার জনগণের পক্ষে শুধু মুজিবুর রহমানই সমঝোতায় পৌছাতে পারেন এবং তিনিই শুধু জনসাধারণকে এ ব্যাপারে রাজি করাতে সক্ষম [টেলিগ্রাম : ২৩২১, কলকাতা থেকে ১৪ আগস্ট])।

– আমরা অবশ্যই এমন কোনো অবস্থান নেব না, যেখানে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ নিয়ে ইসলামাবাদ বা তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি না হয় (ফুটনোট : ইসলামাবাদের দূতাবাস ১২ আগস্ট সতর্ক করে দিয়েছে, পাকিস্তান সরকার যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন সম্পর্কে খুবই সংবেদনশীল। দূতাবাস পরামর্শ দিয়েছে যে, এ ধরনের যোগাযোগকে যতটা সম্ভব লো-প্রোফাইলে এবং বেসরকারি চরিত্র দিতে হবে।

– সমস্যার প্রতি আমাদের করণীয় সম্পর্কে এ পর্যন্ত এরকমের একটা অবস্থান নেয়াই উত্তম। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটা অনানুষ্ঠানিক যোগসূত্র বজায় রাখা আমাদের স্বার্থের অনুকূল। তবে একই সঙ্গে এ ব্যাপারে অগ্রসর হতে হলে অবশ্যই ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখব।

– ক্যাবলের বক্তব্য হচ্ছে, পররাষ্ট্র দফতরের উচিত হবে এসব ঘটনাবলি সম্পর্কে ইয়াহিয়াকে অবহিত করা। কিছু জানা মাত্রই কালবিলম্ব না করে তাকে জানিয়ে দিতে হবে। এই স্মারকে এ পর্যায়ে সুপারিশ করা হয় যে, যাতে কোনো ভ্রান্তির অবকাশ না থাকে। সেজন্য সংশ্লিষ্ট ক্যাবলটি আপনি অনুমোদন করতে পারেন। আপনি চাইলে সিসকোকে (সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী) মৌখিকভাবে বলতে পারেন। এ ব্যাপারে পরে কোনো বার্তা প্রেরণ করতে হলে তা যেন আপনাকে দেখিয়ে নেয়া হয়।'

১৪ আগস্ট নিক্সন ইয়াহিয়ার কাছে প্রেরিত তার চিঠিতে উল্লেখ করেন। আপনি ২৮ জুন যে ভাষণ দিয়েছেন তাতে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমর্থন নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে জাতীয় রিকনসিউলিশনের যে উদ্যোগ নেয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন তা সংকট নিরসনে সহায়ক হবে। এরপর ১৯ আগস্ট ৭১ পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড ইয়াহিয়ার সঙ্গে বৈঠক করেন। ২০ আগস্ট প্রেরিত এক টেলিগ্রামে তিনি এ বিবরণ জানিয়ে বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তার পরিকল্পনা ব্যক্ত

করে বলেন, তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনে বাঙালিদের সম্পৃক্ত করতে চান। এজন্য ৮৮ জন সাবেক এমএনএ'কে তিনি দায়মুক্ত ঘোষণা করছেন। প্রশ্নের জবাবে ইয়াহিয়া এ কথাও বলেন, অবশিষ্ট নির্বাচিত এমএনএ'দের বিরুদ্ধে অপরাধের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। অবশ্য তারা চাইলে নিজেদের মুক্ত করে নিতে পারে। সেক্ষেত্রে তারা ন্যাশনাল এসেম্বলিতে যোগদানের সুযোগ পাবেন। ইয়াহিয়া তথ্য দেন যে, এই ৮৮ এমএনএ-র মধ্যে বর্তমানে ঢাকায় ১৫ বা ১৬ জন উপস্থিত রয়েছে। তাদের জীবনের নিরাপত্তায় সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। অবশিষ্ট ৭২ জন এমএনএ হয় গ্রামাঞ্চলে অথবা ভারতে অবস্থান করছেন। ইয়াহিয়া অবশ্য জানেন না, এদের মধ্যে কতজন এসেম্বলিতে যোগদানে এগিয়ে আসবে। তিনি অবশ্য বলেন, এসেম্বলিতে যোগদানের ক্ষেত্রে আমি একটা সময় সীমা বেঁধে দেব।

ইয়াহিয়ার সঙ্গে ফারল্যান্ডের এই বৈঠককালে মরিস উইলিয়ামস উপস্থিত ছিলেন। তিনি ১৭-২৩ আগস্ট পাকিস্তান সফর করেন। মরিস আলোচনার এ পর্যায়ে মত প্রকাশ করেন, আওয়ামী লীগকে তো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ৮৮ জন ছাড়া অন্যদের যদি ক্লিন করা হয় তাহলে তিনি দলটিকে পুনর্জীবিত করতে পারেন এবং পুনরুজ্জীবিত আওয়ামী লীগের ৮৮ সদস্যের সঙ্গে তিনি আলোচনা করতে পারেন। ফারল্যান্ড লিখেছেন এ প্রসঙ্গটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়। এতে ইয়াহিয়া এই দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয় যে, শুদ্ধিকরণ যেমনই হোক না কেন, তিনি আওয়ামী লীগের নাম শুনতেও রাজি নন। (ফুটনোট : ইসলামাবাদ থেকে ২০ আগস্ট ১০৩১ টেলিগ্রামে ফারল্যান্ড কিসিঞ্জারকে জানান, উইলিয়ামস নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগকে পুনরায় বৈধতাদানের উদ্যোগ নিয়েছিলেন; কিন্তু বাস্তবতা এমনই যে, ইয়াহিয়া এমন কথা কানে তুলতেই রাজি নন। তার এই সংবেদনশীলতা সম্পর্কে কিসিঞ্জার ঠিকই অনুমান করতে পেরেছিলেন)।

ইয়াহিয়া মনে করেন ৮৮ জন আওয়ামী লীগার হিসেবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে তার সঙ্গে সমঝোতা করবেন। তিনি বরং এই ৮৮ জনকে এসেম্বলিতে বসতে দিতে রাজি হওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন।

২৪ আগস্ট ১৯৭১। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে ইয়াহিয়ার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ফারল্যান্ড টেলিগ্রাম পাঠান সিসকোর কাছে (ফুটনোট : ২২ আগস্ট ইসলামাবাদে স্টেট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রেরিত ১৫৪০৭৮ নম্বর টেলিগ্রামে এই ইস্যুতে ইসলামাবাদের মার্কিন দূতাবাসকে পাক পররাষ্ট্র সচিব সুলতান খানের সঙ্গে আলোচনার অনুমতি দেয়া হয়। এতে সম্মতি দেন সিসকো, আরউইন এবং কিসিঞ্জার। এতে উল্লেখ করা হয়, 'কাইউমের প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে রাজনৈতিক সমঝোতার একটা ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে।' দূতাবাসকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, মার্কিন কর্মকর্তারা নিজেরা যেন জড়িয়ে না পড়েন। কাইউমের কথা তারা শুনবেন, কিন্তু সে ব্যাপারে তারা তাদের নিজেদের

মতামত প্রকাশ থেকে বিরত থাকবেন। মনে রাখতে হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতে চায় না। শুধু বন্ধু হিসেবে সাহায্য করতে আগ্রহী)।

এতে লেখা হয়েছে, কলকাতায় মার্কিন কনসাল জেনারেলের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল অনেকের বিশেষ করে কাজী জহিরুল কাইউমের (কলকাতার কনসাল জেনারেল স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাছে প্রেরিত বার্তায় প্রথমে ভুলক্রমে কুমিল্লার সাবেক আইনজীবী খান আবদুল কাইউম খানের কথা উল্লেখ করেছিলেন) কাছ থেকে সংকেত পাওয়া গেছে। এই সংকেত থেকে দৃশ্যত ইঙ্গিত মিলছে যে, কলকাতায় এবং অন্যত্র অবস্থানরত উল্লেখযোগ্যসংখ্যক এমপিএ এবং এমএনএ পাকিস্তানের সঙ্গে আপোস চাইছে। তারা এমন এক সমঝোতা চায় যাতে পাকিস্তান অখণ্ডতা ও ঐক্য বজায় থাকে। তবে তা তথাকথিত ৬ দফার সাধারণ মতবাদের আলোকে এবং মুজিব বিচারাধীন সত্ত্বেও সমঝোতা হতে হবে মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যেই। আমি ইয়াহিয়াকে বললাম আমরা এ কথা উল্লেখ করছি বটে। তবে আপনাকে স্পষ্ট বুঝতে হবে, যুক্তরাষ্ট্র এই ইস্যুতে উদ্যোগ নিতে উৎসাহী নয়। পাকিস্তান সরকার কিংবা বেআইনি ঘোষিত আওয়ামী লীগের মধ্যে কোনোভাবেই মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় যেতে চায় না যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্র সরকার অব্যাহতভাবে এই কূটনৈতিক অবস্থান রক্ষা করে চলেছে যে, আমরা এ ব্যাপারে জড়িত নই। 'বাংলাদেশ সরকারের' প্রতিনিধিদের সঙ্গেও কোনো যোগাযোগে যেতেও রাজি নই। আমি অবশ্য ইয়াহিয়ার সঙ্গে এ সংক্রান্ত নানা আলোচনার ফাঁকে বলেছি, এ ধরনের একটা সমঝোতায় পৌছানো সম্ভব হলে তিনি জনগণের কাছে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকার এ সংক্রান্ত তথ্য আপনার কাছে পৌছে দেয়াটা কর্তব্য মনে করেছে শুধুই শান্তি স্থাপনের আশায়।

ইয়াহিয়া-মোশতাক মধ্যস্থতায় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব

পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড লিখেছেন, কলকাতায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করায় 'ইয়াহিয়ার প্রতিক্রিয়া ছিল অনুকূল ও ইতিবাচক।' ২৪ আগস্ট '৭১ স্টেট ডিপার্টমেন্টে প্রেরিত টেলিগ্রামে ফারল্যান্ড আরো উল্লেখ করেন, 'আমি যে তাকে এই ধরনের গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করেছি ইয়াহিয়া তাতে খুবই খুশি হয়েছেন। তিনি অনুভব করছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক অবস্থানের ক্ষেত্রে সঠিক পন্থাই অনুসরণ করছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, মার্কিন কর্মকর্তারা তাদের প্রথাগত সাবধানতা ও ডিসক্রিশন বলে উপযুক্ত যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে। ইয়াহিয়া উল্লেখ করেন, তার বিরাট আশাবাদ যে, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে স্বাভাবিক রাজনৈতিক অবস্থার পুনরুজ্জীবন ঘটাতে তিনি সক্ষম হবেন। এর মধ্যে পূর্বাংশে ব্যাপকভিত্তিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমন্বয় ঘটাতে তিনি উদগ্রীব। এ লক্ষ্যে তিনি যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়েছেন। ইয়াহিয়া অভিমত দেন, আমি বুঝতে পারছি না, যেসব এমপিএ এবং এমএনএ'র বিরুদ্ধে ইতোমধ্যেই সব অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে তারা কেন এগিয়ে আসছে না। তারা এগিয়ে এলেই তো তিনি অতি দ্রুত পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারেন। এসব বিষয়ে সাধারণ আলোচনার পরে আমি ইয়াহিয়াকে জিজ্ঞাস করলাম, আচ্ছা বলুন তো, আপনি কি মনে করেন, আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তৃতীয় কোনো দেশে সংলাপ অনুষ্ঠানে বড় কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে? কাইউম যাদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, সেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিরা এ ধরনের সংলাপে যোগ দিতে পারেন। তবে এটা করতে হবে গোপনে। নিশ্চিত করতে হবে যাতে বিষয়টি কোনোভাবেই প্রচার না পায়। আমি বললাম, এ ধরনের হাইপোথিটিক্যাল বৈঠকের মাধ্যমে যৌথভাবে সম্ভাব্য রাজনৈতিক সমঝোতার নানা দিক চিহ্নিত করা যেতে পারে। এ ধরনের আলোচনার ফলে উদ্বাস্তু, খাদ্য বণ্টন ও পুনর্বাসনের মতো সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে অর্থবহ উপায়ও বেরিয়ে আসতে পারে। জবাবে ইয়াহিয়া বলেন, তিনি এ ধরনের একটি অগ্রগতি সর্বান্তকরণে রূপ দিতে আগ্রহী। সুতরাং এ ব্যাপারে যখনই কোনো নতুন অগ্রগতি ঘটবে, তখনই তিনি এ ব্যাপারে তাকে অবহিত করতে অনুরোধ জানান। ফারল্যান্ড এ পর্যায়ে মন্তব্য করেন, প্রতীয়মান হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতিতে বহুমুখী শক্তি নানা খেলা খেলছে। প্রথমত, অন্তত কিছু

বাংলাদেশী এমনটা উপলব্ধি করছেন, তাদের অর্জিত স্বাধীনতা ভারতের স্বার্থ দ্বারা বেদনাদায়কভাবে সীমিত থাকবে। আর সে কারণেই স্বাধীনতা হতে পারে তাদের কাছে এক অলীক কল্পনা। দ্বিতীয়ত, ইয়াহিয়া শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে আসতে পারেন, আক্রমণের যে কৌশল তিনি অবলম্বন করছেন, তাতে তার ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটছে না। আর সে কারণেই যেটুকু অগ্রগতি ঘটেছে তা হয়তো নিকষ অন্ধকারে ক্ষীণ আলোর স্ফূরণ।'

৩১ আগস্ট, ১৯৭১

এই টেলিগ্রাম খসড়া তৈরি হয় ২৫ আগস্ট। হোয়াইট হাউসে এটি পরিমার্জিত হয় ৩০ আগস্ট এবং অনুমোদনের পরে তা ইসলামাবাদ, কলকাতা, নয়াদিল্লি, লন্ডন ও ঢাকার মার্কিন মিশনে প্রেরণ করা হয়। এতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স উল্লেখ করেন, '১. আমরা একমত, রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডের কাছে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, তাতে আশার 'ক্ষীণ' আলো হয়তো রয়েছে। কিন্তু আমরা তাই বলে বিশ্বাস করি না, এই ইস্যুতে মধ্যস্থতা করার ভূমিকা পালনের সুযোগ যুক্তরাষ্ট্রের সামনে এসেছে। অন্যদিকে আমরা অবশ্য বর্তমান পরিস্থিতিতে সততার সঙ্গে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালনের পথে আরেকটি ধাপ এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে যুক্তি খুঁজে পেতে পারি। এর অর্থ হলো কোনো একটা নিরপেক্ষ ভূখণ্ডে উভয় পক্ষকে আলোচনায় বসতে সহায়তা করতে পারি। যাতে তারা ভবিষ্যতে সিরিয়াস আলোচনায় নিজেদের সম্পৃক্তি করতে পারে। ২. প্রথম পদক্ষেপ নিতে হবে রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকেই। অবশ্য তিনি যদি বড় কোনো সমস্যার মুখে না পড়েন। আমাদের ধারণাগুলো আমরা ইয়াহিয়াকে অবহিত করতে পারি। কোনো প্রকার ওকালতি না করে শুধুই তার প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে পারি। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে বিপদের দিনে বন্ধু যেভাবে পাশে দাঁড়ায়। এটা মনে রাখতে হবে, ইয়াহিয়া না চাইলে আমরা কিন্তু বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে আর কোনো আলোচনায় জড়াব না। ৩. আমাদের মনে হচ্ছে কাইউম যে প্রস্তাব নিয়ে হাজির হয়েছেন, তা সত্যি কতটা যথার্থ তা আরেকবার যাচাই করে নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আমাদের বিবেচনায় এটা করতে হলে কলকাতায় বাংলাদেশ 'পররাষ্ট্রমন্ত্রী' মোশতাক আহমেদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করাই উচিত হবে। দ্রুততম সময়ে এর চেয়ে অধিকতর ভালো ফল লাভের আর কোনো উপায় নেই। তার সঙ্গে কথা বলে যদি মনে হয়, কাইউম যা বলেছেন তা ঠিক, তাহলে মোশতাককে আমরা জানিয়ে দিতে পারি, আপনারা যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তার সার কথা আমরা ইতোমধ্যেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে অবহিত করেছি। ৪. আমরা মোশতাক আহমেদকে আরো জানিয়ে দেব, বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের বৈঠক অনুষ্ঠানের ইয়াহিয়া আগ্রহ দেখিয়েছেন। এটা শুনে মোশতাক যদি নতুন করে কোনো তথ্য দেন, তাহলে আমরা ইয়াহিয়াকে পুনরায় জানিয়ে দিতে

পারি। আমরা যদি লক্ষ্য করি, উভয় পক্ষ আলোচনায় বসতে আন্তরিক, তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে কতদূর কী ভূমিকা পালন করব অথবা করব না, তা নির্ধারণ করব। ৫. সতর্কতা– আমরা বিশ্বাস করি যে, এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। পাকিস্তান সরকার এবং বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের খবর ফাঁস হয়ে পড়লে বিপদ আছে। আমাদের ভূমিকা চিহ্নিত হবে অথবা মুশতাক আহমেদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের কথা জানাজানি হলে এই প্রক্রিয়ার হঠাৎ মৃত্যুর কারণ হতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, প্রতিটি পা ফেলতে গিয়ে সবসময় আমাদের মনে রাখতে হবে শেষ পর্যন্ত এসব সমঝোতার প্রভাব মার্কিন নীতির ওপর কতটা বৃহত্তর প্রভাব ফেলবে। আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে, কারা এই সমঝোতার প্রক্রিয়াকে বানচাল করতে আগ্রহী? আমরা ধরে নিতে পারি, এ ধরনের লোক পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ আন্দোলনের মধ্যেই রয়েছে। ৬. কলকাতার জন্য : রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড যদি ইয়াহিয়ার অনুমোদন পান, তাহলে আপনি (কলকাতার কনসাল জেনারেল) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাংলাদেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশতাক আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। কিন্তু তাকে একথা জানিয়ে দিতে হবে যে, আমরা শুধু এ সংক্রান্ত বার্তাই পৌঁছে দেব। মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হব না। মোশতাক আহমেদকে ভিসা প্রদানের প্রশ্ন যদি আসে, তাহলে আপনি স্টেট ডিপার্টমেন্টের ১৫৪০৭৮ নম্বরে প্রেরিত বার্তায় উল্লিখিত নির্দেশনা অনুসরণ করবেন। অর্থাৎ আপনি বলবেন, ভিসা চেয়ে আপনি যে অনুরোধ করেছেন, তা আমরা ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দিয়েছি। সাবধান। আপনি কিন্তু কোনো অবস্থাতেই এ ব্যাপারে তাকে উৎসাহ জোগাবেন না। আপনি তাকে এ কথাও বলতে পারেন, মোশতাক সাহেব, এখন যেহেতু পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের একটা যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে, তখন আপনার যুক্তরাষ্ট্র সফর একটু বিলম্বিত করলে ভালো হয় না কি? মোশতাক আহমেদকে যদি কলকাতায় না পাওয়া যায়, তবে তার গন্তব্য সম্পর্কে দ্রুততম সময়ে অবহিত করতে হবে।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স এ পর্যায়ে সব মিশনের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ দিকনির্দেশনা দেন : '৭. আমরা নিম্নোক্ত বিষয়ে অব্যাহতভাবে বিশ্লেষণ ও মন্তব্য আশা করি। ক. পাকিস্তান সরকার ও বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের মধ্যে সম্ভাব্য সমঝোতা। খ. মুক্তিবাহিনীসহ বাংলাদেশ আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা 'স্বাধীনতা বনাম সমঝোতা' প্রশ্নে অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন ও বিভক্তি। গ. ইয়াহিয়া ঠিক কী ধরনের আপোসমূলক ফর্মূলা পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ও রাজনীতিকদের গেলাতে পারবেন। ঘ. কোনো সমঝোতার জন্য মুজিবের মুখ্য ভূমিকা দাবি করছেন বাংলাদেশ প্রতিনিধিরা, অন্যদিকে দৃশ্যত ইয়াহিয়ার দরকার 'বিচ্ছিন্নতাবাদী বলির পাঁঠা'– এ দুয়ের মধ্যে কি করে সমন্বয় আনা যায়। এছাড়াও এ সংক্রান্ত অন্য যে কোনো পরামর্শ ও সুপারিশ স্টেট ডিপার্টমেন্ট স্বাগত জানাবে। বার্তাটি এখানেই শেষ। তবে ফুটনোটে লেখা

আছে, রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড স্টেট ডিপার্টমেন্ট প্রেরিত বার্তার সঙ্গে একমত হয়েছেন এবং ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, ৪ সেপ্টেম্বরে ইয়াহিয়ার সঙ্গে অনুষ্ঠেয় বৈঠকে তিনি এই ইস্যুতে কথা বলবেন। তিনি মন্তব্য করেন, এই সমঝোতার প্রক্রিয়ায় ইয়াহিয়া যেমনটি চাইবেন, ঠিক তেমন পন্থাই তারা অনুসরণ করবেন। এরপরের বার্তায় উল্লেখ করা হয়, ইয়াহিয়া ৪ সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগে অনুমোদন দেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার কনসাল জেনারেলকে স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, তিনি যেন এ ব্যাপারে অগ্রসর হন।

৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের হেরাল্ড স্যান্ডার্স ও স্যামুয়েল হসকিনসন কিসিঞ্জারের কাছে এক সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন এভাবে, 'বাংলাদেশ-পশ্চিম পাকিস্তানি আলোচনা : ৪ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড যদি ইয়াহিয়ার কাছ থেকে সবুজ সংকেত পান এবং বাংলাদেশ প্রতিনিধিরা একমত হন, তাহলে আমরা শিগগিরই তাদের মধ্যকার গোপন আলোচনার ঘনিষ্ঠ পক্ষ হতে পারি। তখন প্রধান ইস্যু হবে, অবশ্য যদি তেমন মুহূর্ত আদৌ আসে, আমরা একটি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রভাব খাটাতে পারি। সিসকো (সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী) কিন্তু মনে করেন, মধ্যপ্রাচ্যের মতোই, মধ্যস্থতা করার সুযোগ যদি এসেই যায়, তাহলে আমাদের কালবিলম্ব করা উচিত হবে না। একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।'

এই ইস্যুটি ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ কিসিঞ্জারের নেতৃত্বাধীন ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠকে আলোচিত হয় এভাবে :

'কিসিঞ্জার : আমরা কি এখন বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা করতে পারি?

সিসকো : আমরা এখন অখণ্ড পাকিস্তানের মধ্যে কি করে একটা রাজনৈতিক আপোসরফা করা যায়, তা নিয়ে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের চিন্তাভাবনা জানার চেষ্টা করছি। আমরা মনে করি, ছয় দফা এখন স্টেডিয়ামের মধ্যে। আমরা ইয়াহিয়ার অনুরোধে বাংলাদেশ বিষয়ক বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছি। ইয়াহিয়া আমাদের তৎপরতার প্রশংসা করেছেন এবং আমরা তাকে নিশ্চয়তা দিয়েছি, আমরা কোনো উল্লেখযোগ্য অবস্থান গ্রহণ করিনি।

কিসিঞ্জার : এটা খুবই সহায়ক হতে পারে।

আরউইন : তবে অনেকটাই নির্ভর করছে মুজিবের ট্রিটমেন্টের ওপর।

ভারতের সম্মতিতে সংলাপে রাজি ছিলেন নজরুল

১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ কলকাতায় কনসাল জেনারেলের কাছে স্টেট ডিপার্টমেন্টের আরউইন প্রেরিত টেলিগ্রামে বলা হয়, কলকাতা যেভাবে উল্লেখ করেছে বাংলাদেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশতাক আহমেদের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠানে কাইউমের অপারগতা কিংবা শীতল মনোভাব কিন্তু ভালো ঠেকছে না। মনে হচ্ছে মোশতাকের উদ্যোগে তেমন সাড়া মেলেনি। এর অনেক কারণ থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের জন্য যা বিবেচ্য তা হলো : ১. অনিচ্ছুক বাংলাদেশী প্রতিনিধিদের সমঝোতায় আনার জন্য আমাদের কোনো তৎপরতা চালানো ঠিক হবে না। ২. এ সময়ে আমরা কাইউমের আরেকটি প্রস্তাবের কোনো মেরিট দেখছি না। তার বিকল্প প্রস্তাব হচ্ছে, 'প্রধানমন্ত্রী' তাজউদ্দীন আহমেদ অথবা 'ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট' নজরুল ইসলামের সঙ্গে বৈঠকে বসতে। কিন্তু আমরা অনুমান করতে পারি, এই দুজনের কেউই মোশতাকের উদ্যোগ উস্কে দেননি। সুতরাং আপনার উচিত হবে কাইউমকে কোনোভাবেই উৎসাহ না দিতে। কাইউমকে কোনোভাবেই আপনি বলতে যাবেন না যেন আপনি এই বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাতে আগ্রহী। আর যদি একান্তই দেখেন যে, কাইউম নিজেই এই দুজনের যে কারো সঙ্গে বৈঠকের আয়োজন করে দিচ্ছে তাহলে সে পথ খোলা রাখুন এবং এ ব্যাপারে কিছু জানামাত্র দ্রুততম সময়ে আমাদের অবহিত করবেন। ডিপার্টমেন্ট তখন ভাববে কী করা যায়। ৩. আমরা অবশ্য মোশতাকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ অব্যাহত রাখতে চাই। এর অন্য কোনো কারণ না হলেও এটা যাচাই করে দেখা দরকার যে, কাইউমের রিপোর্টিং মোশতাকের পূর্ববর্তী কি না বর্তমান অবস্থা কতটা যথার্থ। ডিপার্টমেন্টের সুপারিশ হচ্ছে, আপনি অব্যাহতভাবে মোশতাকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। এটা করতে গিয়ে যে চ্যানেলকে উপযুক্ত ভাববেন সেটাই বেছে নেবেন। কাইউমকে এড়ানোর চেষ্টা করাই ভালো। কারণ তার সাম্প্রতিক মতিগতি ভালো ঠেকছে না। ক্রমেই তিনি যেন আবেগাপ্লুত এবং অস্থিরতায় ভুগছেন। তবে মনে রাখবেন, আপনাকে কিন্তু বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করে চলতেই হবে। আমরা মোশতাকের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য যে 'গুরুত্বপূর্ণ' বার্তা পেয়েছি তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া স্মরণে রাখতে হবে। কারণ, সেখানে বা অন্যত্র উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের প্রস্তাব পাওয়া গেছে। এটা হতে পারে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বৈঠকের অংশ। মোশতাকের সঙ্গে যদি বৈঠক হয়, তাহলে এটা কিন্তু জানাতে ভুলবেন

না যে, সমঝোতার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আগ্রহ রয়েছে।

২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

ফুটনোট ২০ সেপ্টেম্বর কলকাতার কনসাল জেনারেল স্টেট ডিপার্টমেন্টকে জানান যে, কলকাতায় বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দ মার্কিন সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠকে বসার প্রশ্নে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। কাইউম একজন বার্তাবাহকের মাধ্যমে জানিয়েছেন, মোশতাক আহমেদ এবং তাজউদ্দীন আহমেদ এ ধরনের বৈঠকে যোগ দিতে রাজি নন। ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট নজরুল ইসলাম অবশ্য কনসাল জেনারেলের অফিসের একজন পলিটিক্যাল অফিসারের সঙ্গে বৈঠকে 'আগ্রহী' (Keen) [কলকাতা থেকে পাঠানো টেলিগ্রাম ২৫২৭, ২০ সেপ্টেম্বর]।

স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে কলকাতার কনসাল জেনারেলের কাছে পাঠানো টেলিগ্রামে (ভ্যানহোলেন, সিসকো ও আরউইন অনুমোদিত) বলা হয়, বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্বের সদস্যের সঙ্গে এ পর্যন্ত কোনো মার্কিন কর্মকর্তা যোগাযোগ স্থাপন হয়নি। পলিটিক্যাল অফিসারকে অবশ্য ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট নজরুল ইসলামের সঙ্গে বৈঠকের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আমাদের কাছে এই বৈঠকের অর্থ হচ্ছে– ক. 'বাংলাদেশ সরকারের' তরফ থেকে এ পর্যায়ে কোনো রাজনৈতিক আপোস প্রশ্নে সত্যিই কোনো আগ্রহ রয়েছে কি না? খ. বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের চাহিদা কী? গ. নজরুল ইসলাম এবং তার মাধ্যমে বাংলাদেশ মন্ত্রিসভাকে এটা জানানো যে, আমরা ইতোমধ্যেই সমঝোতার ব্যাপারে বাংলাদেশের সম্ভাব্য আগ্রহের কথা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে জানিয়ে দিয়েছি (ফুটনোট : ২১ সেপ্টেম্বর ইয়াহিয়া তার আগ্রহ পুনর্ব্যক্ত করেন)। টেলিগ্রামে উল্লেখ করা হয়, ১. আমরা বিশ্বাস করি, বর্তমান মুহূর্তে বাংলাদেশ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা অন্তত এটা ভালোই বুঝতে পারেন যে, ইয়াহিয়া সরকারের পক্ষ থেকে সমঝোতামূলক সমাধানে আগ্রহ রয়েছে।

আপনি কিন্তু এই অবস্থান অব্যাহত রাখবেন যে, আমরা কিন্তু এই প্রক্রিয়ার সাতেপাঁচে নেই। আমরা শুধুই বার্তাবাহক। না চাইছি সমঝোতা, না চাইছি আলোচনায় অংশ নিতে। আমাদের এই ভূমিকার কথা যদি তেমন পরিস্থিতি আসে তাহলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকেও জানিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হবেন না। ২. আপনি কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে জাতিসংঘের ত্রাণ তৎপরতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে বৈঠকের সুযোগ পেলে তাদের জানিয়ে দেবেন। ৩. ডিপার্টমেন্ট বিশ্বাস করে, কাইউমকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বাদ দেয়াই সমীচীন। নজরুল ইসলামের সঙ্গে যদি বৈঠকের সুযোগ আসে তাহলে বিকল্প কাউকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে বিকল্প মাধ্যমে আমরা নজরুল ও বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করব (ফুটনোট : একটি স্বাক্ষরবিহীন নথি থেকে মুদ্রিত : 'এই নির্দেশনাপ্রাপ্তির এক সপ্তাহ পরে কনসাল জেনারেল ইঙ্গিত দেন, নজরুল ইসলামের

সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠানে তার প্রচেষ্টাকে কেউ থামিয়ে দিয়েছে। সুতরাং ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম কাইউমই থাকল। কাইউম বার্তা পাঠিয়েছে, নজরুল ইসলাম এখনো পর্যন্ত একজন মার্কিন পলিটিক্যাল অফিসারের সঙ্গে আলোচনায় আগ্রহী, কিন্তু সেজন্য তাকে ভারত সরকারের কাছ থেকে অনুমতি লাভ করতে হবে (কলকাতা থেকে প্রেরিত টেলিগ্রাম ২৫৭০, ২৮ সেপ্টেম্বর)।

৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

এক সম্পাদকীয় নোটে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও হেনরি কিসিঞ্জার হোয়াইট হাউসে এদিন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার এলেক্স ডগলাস হোম এবং রাষ্ট্রদূত ক্রমারের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। দক্ষিণ এশিয়ার সংকট নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ডগলাস হোম উল্লেখ করেন, একটি রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার গুরুত্ব কতটা? কিসিঞ্জার জবাবে বলেন, 'কলকাতায় বাংলাদেশের লোকজনের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি। ভারতের বাইরে পশ্চিম পাকিস্তানি ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠানের আমরা একটা উদ্যোগ নিয়েছি এবং সে লক্ষ্যে ইয়াহিয়ার কাছ থেকে সম্মতিও আমরা পেয়েছি। কিন্তু ভারতীয়রা এখন এটা পুরোপুরি ব্যর্থ করে দিতে চাইছে। যেসব লোক এ সমঝোতা চাইছে তাদের জীবন কঠিন করে তুলছে তারা। তাদের সবকিছুই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে ভারত তাদের বাধ্য করছে। যেসব বিষয় বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়, তারা অনবরত সেসব দাবি তুলছে।' নিক্সন মনে করেন যে, ভারতীয়রা সংকটের একটি নিষ্পত্তি প্রতিরোধ করতে মরিয়া। তার কথায় 'তারা একটি খেলা খেলছে। আমি মনে করি এই খেলাটা তাদের ভুল, আমার ধারণা কোনো সমাধান যাতে না হয়, সে লক্ষ্যে তারা সুপরিকল্পিতভাবে বাধা দিচ্ছে। এদিনের আলোচনার শেষ দিকে কিসিঞ্জার বলেন, 'সত্যি বলতে কী, বাংলাদেশের মানুষ আলোচনার জন্য সম্পূর্ণভাবে উদগ্রীব। প্রথমত, তারা স্বায়ত্তশাসনের ইস্যুর নিষ্পত্তি চায়। আর আমরা তো সবাই জানিই যে, এই স্বায়ত্তশাসনই তাদের জন্য স্বাধীনতা এনে দেবে। এটা ছাড়া অন্য কোনো দিকে পানি গড়াতেই পারে না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ভারতীয়দের নিয়ে। তারা অনতিবিলম্বে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভে তাদের আকাঙ্ক্ষাকে উস্কে দিচ্ছে। কিসিঞ্জার বলেন, ইয়াহিয়া কখনোই এই দাবি মেনে নেবেন না। একটা তো আসলে মুখ রক্ষার ফর্মূলা বের করতে হবে। একটা ক্রান্তিকাল তো অতিক্রম করতে দিতে হবে। এ সময় নিক্সন আগামী নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রী গান্ধীর যুক্তরাষ্ট্র সফর নিয়ে কথা বলেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য গান্ধীর সঙ্গে আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে যথাসময়ে মতবিনিময় করবে। নিক্সন বলেন, এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ।

মুজিবকে বাদ দিয়ে সংলাপে পীড়াপীড়ি

২ অক্টোবর, ১৯৭১

'বাংলাদেশ-পাকিস্তান সরকারের সমঝোতা' নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স ও ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিংয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকের বিবরণ এক টেলিগ্রাম বার্তায় ইসলামাবাদ, নয়াদিল্লি ও কলকাতার মার্কিন মিশনে প্রেরণ করা হয়। এতে বলা হয়, ১. সংক্ষিপ্তসার : দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠককালে সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিসকো এই ইস্যুতে এর আগে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ঝায়ের সঙ্গে তার আলোচনার কথা অবহিত করেন। (২৭ সেপ্টেম্বর ঝায়ের সঙ্গে আলোচনাকালে সিসকো বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের বৈঠক অনুষ্ঠানকে উৎসাহিত করতে ভারতের সহযোগিতা কামনা করেন।) পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং মন্তব্য করেন, দেখুন সত্যি বলতে কি, বাংলাদেশের ওপর ভারত সরকারের কোনো প্রভাব নেই। তাদের রয়েছে তহবিল সংগ্রহের স্বাধীন উৎস। তারা বরং আমরা কেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হচ্ছি, সে কারণে আমাদের ওপর নাখোশ। সিং অবশ্য একই সঙ্গে বলেন, এর অর্থ এই নয় যে, ভারত সংলাপ চায় না। ২. পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স ভারতকে সংলাপের উদ্যোগ নিতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তবে শর্ত দেন যে, ভারত যেন মুজিবের অংশগ্রহণ প্রশ্নে চাপ সৃষ্টি না করে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে একটা সমঝোতায় পৌছানো যায়, সে নিয়ে আলোচনায় মুজিবকে জড়াতে চায় না। শরণ সিং বলেন, বাংলাদেশী লোকজনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের তো যোগাযোগ রয়েছে। সুতরাং তাদের প্রভাবই বেশি। তাই সংলাপের ব্যাপারে তাদেরই উদ্যোগ নেয়া উচিত। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উপসংহার টানেন এই বলে যে, বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের সমঝোতার প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র সম্ভব সব কিছুই করবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, ভারত এ ব্যাপারে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। ৩. ১ অক্টোবরে দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে শরণ সিং রাজনৈতিক সমাধানে গুরুত্বারোপ করেন। (ফুটনোট : এর আগের আলোচনায় শরণ সিং বলেন, প্রতিদিন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে গড়ে প্রায় ৩৩ হাজার উদ্বাস্তু প্রবেশ করছে। এর ফলে ইতোমধ্যেই নাজুক হওয়া পরিস্থিতি আরো গুরুতর রূপ নিয়েছে। তিনি বলেন যে, সমস্যার সমাধানে মানবিক কর্মসূচি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি রাজনৈতিক নিষ্পত্তির বিকল্প নেই। ভারতের কাছে কোনো নির্দিষ্ট সমাধানের ফর্মূলা নেই। কিন্তু ভারত এটা মনে করে যে, একটি সমাধানে

পৌঁছাতে পাকিস্তানের ওপর প্রয়োজনীয় প্রভাব খাটাতে যুক্তরাষ্ট্রের সামর্থ্য রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সমস্যা সমাধানে যে উপায় উত্তম মনে করে, তা-ই অনুসরণ করতে পারে। ভারত আশা করে যুক্তরাষ্ট্র মানবিক ত্রাণ নিশ্চিত করবে। কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স বলেন, এটা কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সমস্যা নয়, সুতরাং সমাধানের আশায় যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে থাকা ভারতের এক ভ্রান্তি।) সিসকো ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংলাপ শুরুর তাগিদ দেন। তিনি বলেন, গেরিলাদের মধ্যে উগ্রপন্থিদের প্রভাবশালী হওয়ার ব্যাপারে ভারতের উদ্বেগ যথার্থ। আর সে কারণেই মুজিবকে বাদ দিয়ে হলেও সংলাপ শুরু করাটা গুরুত্বপূর্ণ। সিসকো প্রশ্ন রাখেন, মুজিবকে বাদ দিয়ে এ ধরনের একটি আলোচনা শুরু করা সম্ভব হলে, তা কি যৌথভাবে ভারত, পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করবে না? ৪. শরণ সিং উত্তর দেন– বাংলাদেশের ওপর ভারত সরকারের যথেষ্ট প্রভাব নেই। বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান থেকে অর্থের যোগান পাচ্ছে। বিদেশ থেকেও তাদের সংগ্রহ ভালো। উপরন্তু আমরা তাদের স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা সন্তুষ্ট নয়। তাছাড়া বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা ভারতকে সন্দেহের চোখেও দেখছে। তাদের আশংকা আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের বাদ দিয়ে আলোচনা শুরুর পরিবেশ সৃষ্টি করতে ভারত তাদের মধ্যে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা করছে কী না আসলে ভারত সরকার সংলাপের বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু কথা হলো, সেজন্য মুজিব গুরুত্বপূর্ণ। ৫. রজার্স বলেন, মুজিবের নিচের পর্যায়ে আলোচনা শুরুর অর্থ এই নয় যে, তাকে পরিত্যক্ত করা। আলোচনা শুরু করার অর্থ হচ্ছে– কোন পথে সমঝোতায় পৌঁছা সম্ভব তা খতিয়ে দেখা। শরণ সিং উত্তর দেন, বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যোগাযোগ রয়েছে। যেহেতু তাদের বৃহত্তর প্রভাব রয়েছে, তাই তাদেরই উচিত সংলাপ শুরুর উদ্যোগ নেয়া। এ কথার পিঠে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অবশ্য পুনরুল্লেখ করেন যে, ভারতই ব্যাপকভাবে প্রভাব খাটাতে সক্ষম। ৬. ভারতীয় স্থায়ী প্রতিনিধি সেন এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, আমরা বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে নিম্নপর্যায়ে আলোচনা শুরুর প্রস্তাব করছি। সিসকো উত্তরে বলেন, আলোচনা শুরুর জন্য আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের কিন্তু কোনো অভাব নেই। এমনকি 'পররাষ্ট্রমন্ত্রীও' রয়েছেন। সিসকো অবশ্য উভয় পক্ষের নিম্নপর্যায়ে আলোচনা শুরুর ব্যাপারে কোনো প্রস্তাব দেননি। সিসকো বলেন, শরণ সিং যেভাবে বললেন যে, বাংলাদেশের ওপরে ভারতের তেমন কোনো প্রভাব নেই, তা তিনি মানতে অপারগ।

উল্লেখ্য, ৭ অক্টোবরের পরে সম্পাদিত আর কোনো নথিতে মোশতাকের গোপন মিশন নিয়ে আলোচনা দেখা যায় না। নথিপত্র থেকে ধারণা করা যায়, মোশতাক স্বশরীরে মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেননি। একমাত্র ভগ্নদূত কাজী কাইউম। ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ এর পরে কাইউমের সঙ্গে মার্কিন কর্মকর্তাদের আর কোনো বৈঠকের তথ্য জানা যায় না।

১৪ সেপ্টেম্বরের বৈঠকে কাইউম বলেছেন, মোশতাক এবং পলিটিক্যাল অফিসারের সঙ্গে প্রস্তাবিত বৈঠক নিয়ে খন্দকার মোশতাক বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তখন মন্ত্রিসভা জানতে চেয়েছে, এ ধরনের বৈঠকের উদ্দেশ্য কি? মোশতাক কাইউমকে জিজ্ঞেস করেছেন, এটা খতিয়ে দেখতে যে, কেন মার্কিন পলিটিক্যাল অফিসার মোশতাকের সঙ্গে বৈঠক করতে চান। জবাবে পলিটিক্যাল অফিসার বলেছেন, তার ওপর নির্দেশ এসেছে, তিনি যেন বাংলাদেশের সর্বশেষ অবস্থান জানতে মোশতাকের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। এর একটা নিহিত অর্থ হচ্ছে এ ধরনের আলোচনাকালে পলিটিক্যাল অফিসার হয়তো কিছু বিষয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবহিত করবেন। ১৫ সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে প্রেরিত ২৫১০ নম্বর টেলিগ্রামে এই বিবরণ দিয়ে বলা হয়– কাইউম বলেছেন, তিনি নিজেও এ ধরনের একটি বৈঠক অনুষ্ঠানে আগ্রহী। কিন্তু মোশতাক যদি একান্তই রাজি না হন, তাহলে তাকে বাদ দিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ অথবা ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট নজরুল ইসলামের সঙ্গে কথা বলার সুপারিশ করবেন। ১৬ সেপ্টেম্বর পলিটিক্যাল অফিসার কাইউমের সঙ্গে আবার দেখা করেন। কাইউম এদিন বলেন, একটি ব্যক্তিগত বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মোশতাকের মন থেকে সন্দেহ ঘোচেনি। তিনি শুধুই জানতে চাইছেন, এই ধরনের বৈঠক করে ফায়দা কী হবে? ১৬ সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে প্রেরিত ২৫১৩ নম্বর টেলিগ্রামে এ বিষয়ে আরো তথ্য দেয়া হয় যে, পলিটিক্যাল অফিসার এ পর্যায়ে কাইউমকে বলেন, আসলে মোশতাক যা কিছুই বলুন না কেন, তা-ই তিনি শুনতে প্রস্তুত।

৭ অক্টোবর ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল স্টাফ একটি পর্যালোচনামূলক সারসংক্ষেপ তৈরি করে। কিসিঞ্জারের কাছে এটি পাঠানো হয় ৭ অক্টোবরে। এই নথির প্রচ্ছদ থেকে ধারণা মেলে, এটি তৈরি করেছেন স্যামুয়েল হসকিনসন এবং রিচার্ড কেনেডি। এই নথির শুরুতেই যেসব জিনিস যুক্তরাষ্ট্রের জন্য করণীয় তার তিনটি দিকনির্দেশ করা হয়। ক. উভয় পক্ষে নিয়মিত বাহিনীর মধ্যে উত্তেজনা প্রশমন ও গেরিলা তৎপরতা হ্রাস। খ. বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দ ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে সংলাপের সূচনা। গ. উদ্বাস্তু প্রবাহ হ্রাস এবং তাদের দেশে ফিরতে উৎসাহিত করা। এসব ইস্যু সম্পর্কে ইন্দিরা গান্ধী ও ইয়াহিয়া খানকে উদ্দেশ্য করে চিঠির খসড়াও প্রস্তুত করা হয়। এই নথিতে 'সমঝোতায় অগ্রগতি' শীর্ষক পরিচ্ছেদে বলা হয়, স্টেট ডিপার্টমেন্ট মনে করে যে, আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে সংকটের সুরাহা করতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এ পর্যন্ত যেসব রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিয়েছেন তা ফলপ্রসূ হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কলকাতায় বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য হবে না। একটি রাজনৈতিক সম্ভাবনা নিশ্চিত করতে এই নথিতে সে কারণে সুপারিশ করা হয় যে, 'আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দ ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে কী করে একটি সংলাপ শুরু করা যায় সে লক্ষ্যে

পরিকল্পনা গ্রহণ করা। আমাদের সামনে সম্ভাব্য দুটো চ্যানেল রয়েছে। একটি হলো ভারত সরকার এবং অন্যটি হলো কলকাতা ও অন্যত্র অবস্থানরত বাংলাদেশের প্রতিনিধিবৃন্দ। ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট বিশ্বাস করে, সংলাপ অনুষ্ঠানের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ইতিবাচক মনোভাব দেখাতেই রাজি হবেন। কিন্তু সমস্যা হলো আমরা যা জানি তা হলো, বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দ কেবল স্বাধীনতা এবং মুজিবের মুক্তির ভিত্তিতে সমঝোতায় আগ্রহী। ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট মনে করে ভারত বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দকে একটি সংলাপের ব্যাপারে তাদের প্রভাব খাটাতে তখনই রাজি থাকবে যখন তারা বুঝতে পারবে ইয়াহিয়ার ওপর প্রভাব খাটাতে আমাদের প্রস্তুতি রয়েছে। সুতরাং আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমরা এ ধরনের একটি সংলাপের মাঝামাঝি অবস্থান নেব কি নেব না। আরব-ইসরায়েল সংঘাতের মতো অবস্থার সৃষ্টি হলে আমরা কিন্তু একটা সমাধানে পৌঁছতে আশাবাদী হতে পারি।

পাকিস্তানকে হতাশ করেছিল রিয়াদ-আম্মান-তেহরান

আরব বিশ্ব পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। কিন্তু তাই বলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তাদের কেউই শেষ পর্যন্ত যথাসময়ে অস্ত্র সরবরাহ করেছে বলে সদ্য প্রকাশিত আমেরিকার গোপন দলিল থেকে প্রমাণ মেলে না। ইরানের শাহ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ মেটাতে প্রস্তাব দিয়েছিলেন বলে কিসিঞ্জার ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব সুলতান খানের মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনায় প্রকাশ পায়।

৮ জুলাই ১৯৭১ রাওয়ালপিন্ডিতে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে পাক পররাষ্ট্র সচিব অবহিত করেন যে, ইরানের শাহ ইন্দিরা গান্ধীর কাছে প্রস্তাব দেন যে, দুদেশের বিরোধ মেটাতে তার দেশ নিরপেক্ষ স্থান হিসেবেই বিবেচ্য হতে পারে। গান্ধী শোনামাত্রই তা প্রত্যাখ্যান করেন। শাহ এতটাই ক্রুদ্ধ হন যে, তিনি তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন। ৩০ জুলাই '৭১ ওয়াশিংটনে সিনিয়র রিভিউ গ্রুপের বৈঠকে সিআইএ'র পরিচালক হেলমস বলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে ইরানের শাহকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে আমরা কি কিছু চিন্তাভাবনা করেছি? (একটি বাক্য অবমুক্ত করা হয়নি) তিনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন। এই ব্যক্তি কে তা দলিল থেকে বোঝা যাচ্ছে না। এ পর্যায়ে কিসিঞ্জার বলেছেন, আমি মনে করি, আমরা যদি শুধু উদ্বাস্তু সমস্যার দিকে নজর দেই তাহলে ইয়াহিয়া অনেক ভূমিকা রাখতে পারেন। একটা বিষয় স্পষ্ট যে, আওয়ামী লীগকে অন্তত একটি ইন্সটিটিউশন বিবেচনায় ইয়াহিয়া কথা বলতে চাইবে না। তিনি সম্ভবত ব্যক্তিগতভাবে কতিপয় আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। আরউইন বলেন, রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড কিন্তু মনে করেন না, ইয়াহিয়া আদৌ আওয়ামী লীগের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হবেন। ভ্যান হোলেন মন্তব্য করেন, ইয়াহিয়ার সমস্যা আসলে তার সামরিক নেতাদের নিয়ে। তিনি আলোচনায় ততদূরই যেতে পারেন যতটা সামরিক নেতারা অনুমতি দেন।

৭ অক্টোবর ১৯৭১ ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, সোভিয়েত ইউনিয়নকে বলা হবে, ভারতকে সংযত হতে আহ্বান জানাতে। একই আহ্বান রাখা হবে শাহের মাধ্যমে ইয়াহিয়া খানের কাছে। এই বৈঠকে জনসন মন্তব্য করেন, একটা উল্লেখযোগ্য নতুন অগ্রগতি ঘটেছে। সেটা উৎসাহব্যঞ্জক। ইরানের শাহ ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এবং রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছতে প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছেন। ভ্যান হোলেন বলেন, শাহ ইয়াহিয়াকে বলেছেন, আপনারা যদি

ক্ষতি পুষিয়ে নিতে চান তাহলে মিলিটারি শোডাউনের কোনো সুযোগ নেই, রাজনৈতিক সমঝোতার পথই বেছে নিতে হবে। জনসন বলেন, বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ বজায় রেখে চলেছি, সংলাপে উৎসাহিত করছি কিন্তু বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ অনতিবিলম্বে সম্পূর্ণ ও নিঃশর্ত স্বাধীনতার জন্য চাপ দিচ্ছেন। স্যান্ডার্স এ পর্যায়ে প্রশ্ন করেন, আমরা কি রাষ্ট্রদূত ম্যাক আর্থারকে শাহের সঙ্গে পুনরায় আলাপ করতে বলব? শাহ যাতে বিষয়টি নিয়ে আবার ইয়াহিয়ার সঙ্গে কথা বলে। ৮ অক্টোবর স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে পাকিস্তান দূতাবাসে প্রেরিত টেলিগ্রামে তথ্য দেয়া হয়, তেহরানে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে বলা হয়েছে তিনি অনতিবিলম্বে শাহের সঙ্গে দেখা করবেন এবং তাকে জানিয়ে দেবেন বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা ভয়ানক উদ্বিগ্ন। রাষ্ট্রদূত শাহকে এ কথাও বলবেন, বর্তমান পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক সমাধানের শাহ এবং আমাদের স্বার্থ অভিন্ন। শাহকে যদি না পাওয়া যায় রাষ্ট্রদূত সেক্ষেত্রে আলমের মাধ্যমে বার্তা পৌছে দেবেন। রাষ্ট্রদূতকে পরামর্শ দেয়া হয়, শাহ অথবা আলমের সঙ্গে আলোচনায় আপনি এই তথ্য দেয়া থেকে বিরত থাকবেন, বর্তমান মাসেই ৪০ হাজারের বেশি মুক্তিবাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করতে পারে।

৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ওয়াশিংটনের নির্দেশক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা (নাম প্রকাশ করা হয়নি) শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই কর্মকর্তা শাহকে উৎসাহিত করেন, তিনি যেন পাকিস্তানকে অস্ত্র সহায়তা দেন। জবাবে শাহ বলেন, আমি পাকিস্তানের পাশে দাঁড়াতে পারলে খুবই বাধিত হব। তবে আমি যা কিছু পাকিস্তানকে দেব তা কিন্তু আপনাদের অবিলম্বে প্রতিস্থাপন করে দিতে হবে। একই দিন আম্মানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডিন ব্রাউন বাদশা হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বাদশা এ সময় তাকে ইয়াহিয়ার প্রেরিত একটি টেলিগ্রাম দেখান। ইয়াহিয়া বাদশার কাছে ৮/১০টি এফ-১০৪ যুদ্ধ বিমান চেয়েছেন। বাদশা হোসেন বলেন, এসব বিমান যেহেতু আপনাদের তাই মতামত জানতে চাইছি।

৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১ একজন উর্ধ্বতন দূতাবাস কর্মকর্তা তেহরানে শাহের সঙ্গে দেখা করেন। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল পাকিস্তানকে অস্ত্র সহায়তা দেয়া। শাহ বলেন, তিনি তেহরানে পাকিস্তানি রাষ্টদূতকে জানিয়েছেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের মৈত্রী চুক্তির ফলে তিনি পাকিস্তানকে ইরানীয় বিমান ও পাইলট দিতে অপারগ। কারণ তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি নিতে পারেন না। শাহ একটি বিকল্প প্রস্তাব দেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জর্ডানকে অনুরোধ করুক যে, পাকিস্তানকে এফ-১০৪ যুদ্ধ বিমান দিতে। জর্ডান এতে রাজি হলে তিনি জর্ডানকে দুই স্কোয়াড্রন বিমান সরবরাহ করবেন। জর্ডানের প্লেন ও পাইলটরা পাকিস্তানে মুসলিম ভ্রাতাদের সহযোগিতা দানকালে যে শূন্যতার সৃষ্টি হবে তা তখন পূরণ করতে সচেষ্ট থাকবে ইরান। দূতাবাস কর্মকর্তা ইঙ্গিত দেন, মার্কিন সামরিক সম্ভার

স্থানান্তরে নিষেধাজ্ঞা থাকায় ওয়াশিংটনের পক্ষে এ ধরনের বোঝাপড়ার অনুকূলে কোনো সবুজ সংকেত দেয়া সম্ভব নয়। শাহ বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম হবে না। একই দিনে নিক্সন এটর্নি জেনারেল মিশেল ও কিসিঞ্জার দক্ষিণ এশীয় সংকট নিয়ে আলোচনা করতে এক বৈঠকে মিলিত হন। কিসিঞ্জার ইরানের শাহের কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি বার্তা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের মনোযোগ আকর্ষণ করেন, এতে শাহ বলেছেন, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে চুক্তি থাকার কারণে তিনি পাকিস্তানকে যুদ্ধ বিমান দিতে পারবেন না। তাই তিনি বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছেন, জর্ডান যেন পাকিস্তানে তাদের যুদ্ধ বিমান পাঠায়। এর আরেকটা সুবিধা হচ্ছে পাকিস্তানিরা জর্ডানীয় প্লেন চালাতে সক্ষম। নিক্সন বলেন, 'জর্ডান সম্পর্কে আমরা ইসরাইলের কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার আদায় করতে পারি।' নিক্সন ও কিসিঞ্জার একমত হন, ইসরাইল এ সময় যাতে সংযত থাকে তা আমরা আলাপ-আলোচনা করে ঠিক করে নিতে পারি। নিক্সন এ সময় কিসিঞ্জারকে প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মায়ারের সঙ্গে আলোচনার জন্য পরামর্শ দেন। নিক্সন বলেন, হেনরি, আপনি গোল্ডা মায়ারকে বুঝিয়ে বলবেন, দেখুন এটা একটা রাশান ষড়যন্ত্র।

৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১। কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠক। এতে জয়েন্ট চিফ অব স্টাফের অ্যাডমিরাল টমাস এইচ মুরার বলেন, আমরা একটা রিপোর্ট পেলাম, চীনা ট্রাক এগিয়ে আসছে। কিন্তু তাতে কী রয়েছে তা আমরা জানি না। ইরান জ্বালানি সরবরাহের যৌক্তিক উৎস। আমি ন্যাটোতে তুর্কি চিফ অব স্টাফের সঙ্গে কথা বললাম। বুঝতে চাইলাম পাকিস্তানকে সহায়তা দিতে ইরান কতটা প্রস্তুত। তিনি বললেন, শাহ সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তার এক চোখ স্থির ছিল ইরাকের ওপর। সুতরাং তিনি বিশ্বাস করেন না, শাহ উল্লেখযোগ্য কোনো সহায়তা দেবে। এ সময়ের সিআইএ'র পরিচালক বলেন, আমরা আজকেই ডগ হেকের কাছ থেকে একটি উত্তম টেলিগ্রাম পেয়েছি। তিনি জানিয়েছেন, শাহ খুব ঠাণ্ড মাথায় এবং ভেবে-চিন্তেই পরিস্থিতি নিয়ে খেলছেন। তিনি পুন সরবরাহের জটিলতার দিকে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিসিঞ্জার মন্তব্য করেন, আসলে আমাদের জটিল দৃষ্টিভঙ্গিই যত সমস্যার মূলে। আমাদের কাছ থেকে তারা যদি ইঙ্গিত পেত তাহলে তাদের পক্ষে পাকিস্তানকে সাহায্য করা সম্ভব হতো। কিন্তু জর্ডানের সঙ্গে আমরা যা করেছি তা তারা নিশ্চয় বিবেচনায় নিয়েছে। তারা আসলে আমাদের কাছ থেকে পাকিস্তানকে সহায়তা না দেয়ারই সংকেত পাচ্ছে। কথাটা সরাসরি না হলেও অন্তত অবচেতনগতভাবে তো বটেই।

১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ প্রেসিডেন্ট নিক্সন কিসিঞ্জারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। নিক্সন জানতে চান, বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর প্রেরণ কতদূর? কিসিঞ্জার তাকে নিশ্চিত করেন। সবকিছুই ঠিকঠাক মতো এগিয়ে যাচ্ছে। এ সময় তিনি আরো বলেন,

পাকিস্তানের পথে ইতোমধ্যেই চারটি প্লেন রওয়ানা হয়ে গেছে, আরো ২২টি আসছে। আমরা সৌদি আরব ও তুরস্কের সঙ্গে কথা বলেছি। মনে হচ্ছে তুরস্ক পাঁচটি প্লেন দেবে। ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ জাতিসংঘে নিযুক্ত চীনের স্থায়ী প্রতিনিধি হুয়াং হুয়ার সঙ্গে বৈঠক করেন কিসিঞ্জার ও জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি জর্জ বুশ (সাবেক প্রেসিডেন্ট ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট বুশের পিতা জর্জ হার্বার্ট ওয়াকার বুশ)। কিসিঞ্জার এ সময় বলেন, মি. হুয়াং হুয়া আপনাকে এটা বুঝতে হবে, আমাদের পক্ষে এই মুহূর্তে পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করা সম্ভব নয়। আইন আমাদের হাত-পা বেঁধে রেখেছে। শুধু তাই নয়। আমরা এমনকি মার্কিন অস্ত্র রয়েছে এমন কোনো বন্ধু দেশকেও বলতে পারি না, তোমরা এখন পাকিস্তানকে আমাদের অস্ত্র দাও। সে কারণে আমরা কিছু বিকল্প ব্যবস্থা নিয়েছি। আমরা ইতোমধ্যে কথা বলেছি জর্ডান, ইরান ও সৌদি আরবের সঙ্গে। আমরা কথা বলব তুরস্কের সঙ্গে। রাষ্ট্রদূত বুশ সাধারণভাবে এসব আলোচনার জন্য যেসব চ্যানেলে কথা বলে পরিচিত সে পথে আমরা যাব না। আমরা বলছি, তারা যদি তাদের নিজস্ব নিরাপত্তার স্বার্থে আমেরিকান অস্ত্র পাকিস্তানে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে তার প্রতিবাদ ছাড়া আমাদের পথ খোলা নেই। কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই বিষয়টি বুঝতে সক্ষম থাকব। আমরা প্রতিবাদ ঠিকই করব, কিন্তু একটু রেখে ঢেকে। একেবারে গলা ফাটিয়ে নিশ্চয় নয়। আর আগামী বাজেটে তাদের সমস্যা পুষিয়ে দিতে সচেষ্ট থাকব। এই বোঝাপড়ার ভিত্তিতে আজ জর্ডান থেকে চারটি প্লেন রওয়ানা দিচ্ছে। আর সপ্তাহান্তে আরো ২২টি রওয়ানা দেবে। এছাড়া ইরান থেকে অন্যান্য সরঞ্জাম ও গোলাবারুদ যাচ্ছে। এই আলোচনা যখন হচ্ছিল তখন ওয়াশিংটন সময় ছিল সন্ধ্যা ৬টা ৫ মিনিট থেকে ৭টা ৫৫ মিনিট। রাষ্ট্রদূত হুয়াং বলেন, আপনি কি সপ্তাহজুড়ে বলছেন। কিসিঞ্জার বলেন, আমরা ঠিক জানি না সঠিক সময়। কিন্তু এটা যে অনতিবিলম্ব তা বুঝতে পারি। নিকট ভবিষ্যতে তুরস্ক থেকে ছয়টি প্লেন যাবে। দেখুন এটা কিন্তু খুবই গোপনীয়। জানা হোক তা আমরা চাই না।

১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১। এদিনটিতে যুক্তরাষ্ট্রের তরফে আমরা উষ্মা লক্ষ্য করি। কারণ, নিজেরা তো পাকিস্তানকে অস্ত্র দিতেই পারল না, আর এতদিন ধরে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে সরবরাহের যে আশ্বাস তারা পেয়েছিল তা বাস্তবে কাজে আসেনি। দেব, দিচ্ছি বলে কেউ কিছুই দেয়নি। এদিন কিসিঞ্জার নিক্সনের কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন এক স্মারকের মাধ্যমে। এই স্মারকের ওপর একটি স্ট্যাম্প রয়েছে, যার থেকে ইঙ্গিত মেলে, প্রেসিডেন্ট নিক্সন এটা দেখেছিলেন। এই স্মারকের শুরুতেই বলা হয়েছে, ঢাকায় যুদ্ধবিরতির জন্য পাকিস্তানি কমান্ডার যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তা গত রাতে দিল্লিকে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। কিন্তু সকাল ৮টা পর্যন্ত কোনো সাড়া মেলেনি। নিরাপত্তা পরিষদের খসড়া প্রস্তাব নিয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের তৎপরতা আজ সকাল পর্যন্ত চলবে। ভুট্টো দৃশ্যত পূর্ব পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের দায়দায়িত্ব যাতে কোনোভাবে তার কাঁধে এসে না পড়ে, সে ব্যাপারে সতর্ক। সর্বশেষ ভারতীয় রিপোর্টগুলো থেকে

ইঙ্গিত মিলছে, ঢাকায় ভারি গোলাবর্ষণ হচ্ছে এবং তিনটি ভারতীয় সেনাদল ঢাকার কয়েক মাইলের মধ্যে পৌঁছে গেছে। তারা এখন আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এমন পটভূমিতে কিসিঞ্জার নিক্সনকে আক্ষেপের সুরে জানাচ্ছেন, নভেম্বরের শেষাশেষি থেকে বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট পাচ্ছিলাম যে, অন্য মুসলিম দেশগুলো পাকিস্তানকে সামরিক সরবরাহ ইতোমধ্যেই পাঠাতে শুরু অথবা পরিকল্পনা করছে। এসব দেশের মধ্যে ছিল তুরস্ক, জর্ডান, সৌদি আরব, লিবিয়া ও মিসর। কিন্তু এসব রিপোর্ট থেকে ইঙ্গিত মিলছিল, পাকিস্তানি এয়ারক্রাফ্টের জন্য স্পেয়ার পার্টস এবং নতুন যুদ্ধ বিমান ও তার যন্ত্রাংশ সরবরাহ করবে। কিন্তু কোনো বস্তুনিষ্ঠ সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই, (এখানে একটি বাক্যের কম অংশ অবমুক্ত করা হয়নি) যা দিয়ে আমরা এসব রিপোর্টের একটিরও সত্যতা যাচাই করতে পারি। আমরা সত্যি বুঝতে পারছি না, আসলে কেউ পাকিস্তানকে আদৌ কিছু পাঠিয়েছে কি না?

ইয়াহিয়ার আত্মসমর্পণ নিয়ে চৌ-কিসিঞ্জার সংলাপ

১৯৭২ সালের জুনে চীন সফরে গিয়েছিলেন কিসিঞ্জার। ২০ জুন সন্ধ্যা ২টা ৫ থেকে ৬টা ৫ মিনিট পর্যন্ত চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এনলাই কিসিঞ্জারের সঙ্গে কথা বলেন। ৪ ঘণ্টার আলোচনার বাংলাদেশ অংশের বিবরণ থেকে দেখা যায়, তারা বাংলাদেশ শব্দটির পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তানই ব্যবহার করেন। আর দুজনই একমত হন, জেনারেল ইয়াহিয়া যুদ্ধ সম্পর্কে ছিলেন অজ্ঞ। পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক সৈন্যের সমাবেশ ঘটিয়ে তিনি ভুল করেছেন। দক্ষিণ এশিয়া নিয়ে এদিন আলোচনার সূচনা ঘটান কিসিঞ্জার।

কিসিঞ্জার : আপনি জানেন, দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতিতে আমরা ভয়ানক কঠিন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলাম। একদিন সকালে আমরা যখন একটি বার্তা পেলাম, আপনারা একটি বার্তা পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে। আমি কিন্তু ধরেই নিয়েছিলাম, আপনারা সৈন্য পাঠিয়েছেন। আর তক্ষুণি সিদ্ধান্ত নিলাম, এই সৈন্য প্রেরণের কারণে সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি আপনাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করে তাহলে আমরা আপনাদের সমর্থন দেব। সেই হামলা নস্যাৎ করতে প্রয়োজনে সামরিক ব্যবস্থা নেব। সম্ভবত আমরা আপনাদের বার্তা পেয়েছিলাম ১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১। আমাদের সময় তখন সকাল। দুপুরে যখন বার্তাটি পড়ার সুযোগ পেলাম, দেখলাম বিষয়বস্তু ভিন্ন। আপনার স্মরণে আছে আমরাও কিন্তু হুমকি...।

চৌ : আসলে সেই সময় কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানকে আর রক্ষা করা সম্ভব ছিল না।

কিসিঞ্জার : না না, আপনারা সঠিক সিদ্ধান্তটিই নিয়েছিলেন। সৈন্য প্রেরণের জন্য সত্যি বড় দেরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আপনাদের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল।

চৌ : তারা তো ছিলেন জাতিসংঘে। পরিস্থিতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ভুট্টো নিজেই সামরিক বিষয় ভালো বুঝতেন না। ইয়াহিয়া খান সামরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে দম্ভোক্তি করেছিলেন। সুতরাং আমার বিশ্বাস, ভুট্টো ১১ ডিসেম্বরে পৌঁছেছিলেন, আর তার ধারণা ছিল ওই সময়ে পাকিস্তানের সামরিক পরিস্থিতি খুবই ভালো যাচ্ছিল। অথচ তিনি জানতেন না, তার নিজ দেশেই ক্যু ঘটে গেছে।

কিসিঞ্জার : আমার ধারণা তারিখটি ছিল ১১ ডিসেম্বর। ভুট্টো নিউইয়র্কে এলেন– শুক্রবার, ডিসেম্বরের ১০ তারিখ হবে। আপনাদের সময় ১১ তারিখ। ১০ তারিখে

আমি হুয়াং হুয়ার সঙ্গে বৈঠক করলাম। আমি হুয়াং হুয়ার সঙ্গে প্রথম মিলিত হই ১০ তারিখে। মানে শুক্রবারের সন্ধ্যায়। তার পরে ১১ তারিখ সকালে। না আমি মনে হয় ভুল বললাম। আমি হুয়াং হুয়ার সঙ্গে ১০ তারিখ সন্ধ্যায় কথা বলি। এবং তারপর আবার তার সঙ্গে কথা হয় আপনাদের বার্তাটি পাওয়ার পর। আমার মনে আছে, হুয়াং হুয়া খুবই কঠোর লাইন নিলেন। অথচ তিনি পরিস্থিতি জানতেন না। আর আমি কিনা ভাবলাম– আপনারা সামরিক ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছেন। আমরা কিন্তু এমন নির্দেশও দিয়েছিলাম, সোভিয়েত ইউনিয়ন আপনাদের বিরুদ্ধে গেলে আমরাও তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব।

চৌ : আচ্ছা বলুন ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠকের আংশিক অথবা পূর্ণ বৃত্তান্ত সংবাদপত্রে কী করে ছাপা হলো?

কিসিঞ্জার : এ সংক্রান্ত আমাদের আলোচনা কিন্তু কখনো ওয়াশিংটন স্পেশাল গ্রুপের বৈঠকে হয়নি। কারণ এটা ছিল খুব বেশি রকম সংবেদনশীল। আমরা খুব ছোট গ্রুপে এ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম।

চৌ : আমি তা জানি। কিন্তু ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপ পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে যা কিছু আলোচনা করেছে তার প্রতিটি ধাপ কেন সংবাদপত্রে ছাপা হলো?

কিসিঞ্জার : মি. প্রধানমন্ত্রী আপনাকে বুঝতে হবে, ওয়াশিংটন স্পেশাল গ্রুপ এমন একটি গ্রুপ যার কাজ সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তার কাজ নয়। আসলে এই গ্রুপে আমাকে অত্যন্ত কঠোর অবস্থান নিতে হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে, আমাদের আমলাতন্ত্রের এক বিরাট অংশ ভারতপন্থি এবং সোভিয়েতপন্থি।

চৌ : বলেন কি, তাই বলে সোভিয়েতপন্থি?

কিসিঞ্জার : যে কোনো বিষয়ে আমরা দেখি, তারা চীনপন্থি হওয়ার চেয়ে বেশি প্রবণতা দেখায় সোভিয়েতপন্থি হওয়ার। আমি মস্কো সামিট বাতিলের হুমকি দিলে, আমি তো প্রায় সহিংস আক্রমণের কবলে পড়ে যাই! আসলে ঘটেছিল কী? আমাদের আমলাতন্ত্রের কোনো আনুগত্যহীন সদস্য সংবাদপত্রের কাছে এই দলিল পাচার করেছিল। এবং তারা আমাদের ধ্বংস করে দেয়ার জন্য তা পত্রিকায় পরিবেশন করে। তারা দ্বিতীয় কোনো সুযোগ নিতে দেবে না।

চৌ : কিন্তু সংবাদপত্রে সেই দলিলের বিবরণ পড়ে আমার মনে হয়েছে, এই গ্রুপের আলোচনাকারীরা বিভিন্ন মহল থেকে এসেছে।

কিসিঞ্জার : হ্যাঁ। তারা আমাদের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে প্রায় সর্বসম্মত অবস্থান গ্রহণ করেছিল।

চৌ : বিশেষ করে ভারতের প্রতি।

কিসিঞ্জার : তারা আমাদের সামগ্রিক স্ট্র্যাটেজি বুঝতে পারেনি। তারা যদি বুঝতে পারতেন, আমরা আসলে সোভিয়েত ইউনিয়নকেও সঙ্গে রাখতে চেয়েছি।

তখন তাদের প্রতিক্রিয়াটা তুলনামূলক কম হতো। ভারত মহাসাগরে আমরা আমাদের সপ্তম নৌবহর নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু প্রাথমিকভাবে ভারতকে উদ্দেশ্য করে নয়। এটা ছিল মূলত সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর চাপ সৃষ্টি করা, যাতে একটু আগে আমি যা বললাম সেদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সরে আসে।

চৌ : সোভিয়েতরা কিন্তু আপনাদের একেবারে ভারত মহাসাগরের নিচ পর্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে।

কিসিঞ্জার : হ্যাঁ হ্যাঁ, তারা এমনভাবে নিজেদের অবস্থান বজায় রাখে, যাতে আমরা আমাদের খেয়ালখুশিমতো বিচরণ করতে পারি।

চৌ : সোভিয়েতরা আসলে চেষ্টা করেছিল পূর্ব বাংলায় অধিকতর ডামাডোল সৃষ্টি করা। তারা সে কারণে প্রকাশ্যে প্রথমে সুশীমা প্রণালী এবং পরে মালাক্কা প্রণালীর মধ্য দিয়ে তাদের বহর অতিক্রম করায়।

কিসিঞ্জার : হ্যাঁ। কিন্তু এমন কোনো শক্তি প্রদর্শন করেনি, যাতে কিনা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কারণ ঘটে।

চৌ : আপনি জানেন এটা তো ঠিক যে, ওই রকম মহড়ার মাধ্যমে পূর্ববাংলার প্রতি তাদের সমর্থনের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে।

কিসিঞ্জার : হ্যাঁ, তা ঠিকই বলেছেন। ওই মহড়া তারা ওই লক্ষ্যেই দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এর পাঁচ দিন পরই আত্মসমর্পণ করেছে। সুতরাং আপনাদের কিছু করা সত্যিই বড় বেশি বিলম্বিত পদক্ষেপ হতো।

চৌ : ইয়াহিয়া খানও ১১ অথবা ১২ ডিসেম্বরে আত্মসমর্পণের পদক্ষেপ নিতে তার নির্দেশ পাঠিয়েছেন।

আলোচনার এ পর্যায়ে চীনের উপ-পরাষ্ট্রমন্ত্রী চিয়াও মন্তব্য করেন, আমি এক্ষেত্রে একটি কথা যোগ করতে চাই। ১০ তারিখ শুক্রবার সকালে জাতিসংঘের মহাসচিব ইউ থান্ট আমাদের জানিয়েছিলেন, পূর্ব পাকিস্তান তাদের লোকজনের মাধ্যমে অবহিত করেছে, পূর্ব পাকিস্তান...

কিসিঞ্জার : ঠিকই বলেছেন, ভাইস ফরেন মিনিস্টারের বক্তব্য নিরঙ্কুশভাবে নির্ভুল। অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে বলছি, আমরা তাদের বিরত থাকতে অনুরোধ করছিলাম। বলেছিলাম, আরেকটু সবুর করুন। আমরা চীনের সঙ্গে কথা বলে নিই, পরিস্থিতির একটা মূল্যায়ন করে নিই। আমার বিশ্বাস আপনারাও তেমন পরামর্শই দিয়েছিলেন।

চিয়াও : এটা ঘটল ভুট্টো যেদিন নিউইয়র্কে এলো। পৌঁছামাত্রই আমরা তাকে এই সংবাদ জানালাম, তিনি মূলত ইউ থান্টের সঙ্গে দেখা করার জন্যই প্রস্তুত ছিলেন। আমরা থান্টের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করে দিই। ভুট্টো এরপর তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে গেলেন। কথা বললেন ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে এবং তাকে পরামর্শ দিলেন, তেমন কিছু করা থেকে বিরত থাকতে। আমার ঠিক মনে আছে, এটা

কিন্তু ঘটেছিল ভুট্টো নিউইয়র্কে পৌঁছার দিনটিতে।

চৌ : কিন্তু আজ আমাদের এটা অবশ্যই বলতে হবে, ইয়াহিয়া খান পিকিং-ওয়াশিংটন সম্পর্ক উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। তার সঙ্গে আমাদের যখনই দেখা হয়, তখনই এ কথা আমরা তাকে বলি। কিন্তু এটা ঠিক যে, তিনি এমন একজন জেনারেল ছিলেন, যিনি জানতেন না কিভাবে একটি যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়। যুদ্ধকালে তিনি ছিলেন একেবারেই অথর্ব। তিনি যেসব তৎপরতা চালিয়েছেন, তা পরিস্থিতিকে আরো অবনতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। এটা এমন কিছু যা কিন্তু আমরা আশা করিনি। আমরা এটা আশা করেছিলাম, তিনি পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে পারবেন না ঠিক, কিন্তু তিনি যে এতটা খারাপভাবে পরিস্থিতির মোকাবেলা করবেন তা নিশ্চয় আমরা জানতাম না। তার চার ডিভিশন সৈন্য ছিল। অথচ তাদের তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রেই পাঠালেন না। অথচ যুদ্ধ শুরুর আগেই তারা ধূলায় লুটিয়ে পড়তে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জানামতে এই সশস্ত্র বাহিনী যুদ্ধে অংশ নিতে সক্ষম ছিল।

কিসিঞ্জার : সত্যিই, ইয়াহিয়া তার সৈন্যদের সীমান্তজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে তিনি অহেতুক ব্যাপক সৈন্য মোতায়েন করেছিলেন। ঐ সৈন্যদের যদি তিনি পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্ত থেকে আক্রমণাত্মক ভূমিকা পালন করাতে সক্ষম হতেন তাহলে তা হতো অধিকতর উত্তম। দ্বিতীয়ত, তার উচিত ছিল ভারতীয়দের উপেক্ষা করা। সৈন্যদের একটি স্থানে সন্নিবেশ ঘটিয়ে তাদের কোথাও না কোথাও পরাস্ত করা।

চৌ : আসলে তেমন ব্যবস্থা নিতে ইয়াহিয়া খানের চেয়ে আইউব খানই ছিলেন অধিকতর সক্ষম।

কিসিঞ্জার : ইয়াহিয়া খান ছিলেন চমৎকার মানুষ। কিন্তু খুব বেশি বুদ্ধিদীপ্ত নন। এবং সেই হিসেবে খুব ভালো জেনারেলও তিনি ছিলেন না। কিন্তু আমরা তার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। কারণ তিনিই আপনাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘটিয়েছেন। আমার বিবেচনায় ইয়াহিয়ার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে পিকিং-ওয়াশিংটন মৈত্রীর দূতিয়ালি তার সর্বশেষ সাফল্যের কাহিনী। তিনি সত্যিই গোপন মিশন পছন্দ করতেন। তিনি পরম ধৈর্যের সঙ্গে এ মিশনের পক্ষে কাজ করেছেন। আপনাদের এখানে আসার আগে তার সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনা হলো। আমি লক্ষ্য করলাম তার অভিব্যক্তিতে ষড়যন্ত্রমূলক কূটকৌশল এখনো দারুণ ঝিলিক দিচ্ছে। তিনি আমাকে চীনা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কী করে আলাপ-আলোচনা করতে হবে, তার কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞান দিলেন। তিনি যেসব শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়েছিলেন, তা দেখছি এখন সবই ভ্রান্ত!

(প্রধানমন্ত্রী চৌ মুচকি হাসলেন)।

বাংলাদেশ হবে ভারতের ক্যান্সার : চৌ-কিসিঞ্জার

১৯৭২ সালের ২২ জুন চীনের গ্রেটহলে প্রধানমন্ত্রী চৌএন লাইয়ের সঙ্গে বৈঠকে বসেন হেনরি কিসিঞ্জার। এ সময় চীনের পক্ষে উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী চিয়াও কুয়ান হুয়া, সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যাং ওয়েন চীন ও ওয়াং হাই জুং এবং যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে দুই ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল স্টাফ উইন স্টোন লর্ড ও জোনাথন টি হাউই উপস্থিত ছিলেন। সেদিনের আলোচনা শুরু হয়েছিল এভাবে :

চৌ : আমার ধারণা ইন্দিরা গান্ধী তার বাবার মতোই ডিসকভারি অব ইন্ডিয়ার পথ অনুসরণ করছেন। ওটা ছিল নেহেরুর উচ্চাকাঙ্ক্ষা। বলা যায় ওই বইটি ছিল তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার আবিষ্কার।

কিসিঞ্জার : তার আসলে ওটা এগিয়ে নেয়ার সামর্থ্য ছিল না। তিনি ছিলেন বড় বেশি তাত্ত্বিক।

চৌ : যাই হোক, তার আকাঙ্ক্ষা নির্দেশনা দেখিয়েছেন ...

কিসিঞ্জার : আমরা বিশ্বাস করি, ভারতের কৌশল হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানকেও খণ্ড-বিখণ্ড করা। যেমনটা তারা করেছে পূর্ব পাকিস্তানে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান নিয়ে তাদের চিন্তা-ভাবনা আছে। মিসেস গান্ধী যখন নভেম্বরে ওয়াশিংটন এলেন তখন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনায় তিনি স্পষ্ট করেই বললেন, পূর্ব পাকিস্তান নিয়ে তিনি আর কোনো কথাই বলতে চান না। তিনি পশ্চিম পাকিস্তান সংশ্লিষ্ট বিশ্বাসঘাতকতার কথা উল্লেখ করেন। সুতরাং, সমস্যা হলো পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষা করা সম্ভব কিনা। আর তার পরের কথা হলো– অন্য আর সবাইকে গলধঃকরণে তাকে অবাধে বিচরণ করতে দেয়ার প্রশ্নে উপমহাদেশে ভারতের কিছু ক্ষমতা হ্রাস করা দরকার। দেখুন, আমি যে এই কথা বলছি এটা কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায়, এটাই আমাদের বিশ্লেষণ। পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষা করতে দুটি দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমত অর্থনৈতিক ও দ্বিতীয়ত সামরিক। আমরা দেড়শ' মিলিয়ন ডলার সরাসরি ও আরো প্রায় ১৮০ মিলিয়ন ডলার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দিয়েছি।

চৌ : সেটা সাম্প্রতিক, যুদ্ধের পরে?

কিসিঞ্জার : সামরিক ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো আমাদের গণতান্ত্রিক কংগ্রেস এটা প্রতিহত করছে। ...

চৌ : আমরা পাকিস্তানে সাহায্য বন্ধ করিনি। এটা অব্যাহত রয়েছে। আর আমরা

পাকিস্তানকে যে ট্যাংক দিয়েছি তা কিন্তু হালকা (লাইট ট্যাংকস)। পাকিস্তানকে যে যুদ্ধ বিমান আমরা দিয়েছি তাও কিন্তু তেমন সুবিধার নয়। মিগ-১৯ একটু ঝালাই করে নতুনত্ব দিয়েছি। সত্যি বলতে কি আপনার সঙ্গে দিব্যি করে বলছি, ভিয়েতনামকে আমরা যত সংখ্যক মিগ-১৯ দিয়েছিলাম তার চেয়ে পাকিস্তানকে সরবরাহকৃত মিগ সংখ্যায় বেশি। কিন্তু আবার বলছি এ সবই রেনোভেটেড। আমরা ভিয়েতনামকে খুব বেশি মিগ কিন্তু দেইনি। সুতরাং, আপনিই বলুন আমরা কোন দুঃখে ইন্দোচীনের যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের অস্ত্র পরীক্ষা করব?

কিসিঞ্জার : আমি একমত। আমরা ইন্দোচীনে যুদ্ধ অব্যাহত থাকা দেখতে চাইনি।

চৌ : আমরা এটা নিয়ে পরে কথা বলব। ভিয়েতনামে যদি যুদ্ধ থেমে যায় তাহলে আমরা আমাদের অস্ত্রশস্ত্র পাকিস্তানকে আরো বেশি পরিমাণে দিতে পারব। আমরা ইতোমধ্যেই তাদের অনেক কিছু দেব বলে অঙ্গীকার করেছি যা আমরা আজো পূরণ করতে পারিনি। দুঃখের কথা কি জানেন, পূর্ব পাকিস্তানে দুই ডিভিশন সৈন্য তাদের অস্ত্রশস্ত্র খোয়াল অথচ তারা যুদ্ধেই অংশ নিল না।

কিসিঞ্জার : ঠিকই বলেছেন। ওটা ছিল একটা গর্দভ মার্কা সৈন্য মোতায়েনের সিদ্ধান্ত।

চৌ : কিন্তু আমরা কিছুই বলিনি। কারণ আমরা এটা স্পষ্ট করেছি যে, আমরা যখন তাদের ওই অস্ত্র দিয়েছি তখন এটাও নিশ্চিত করেছি যে, সেসব অস্ত্র তারা তাদের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করবে। তাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের কোনো অধিকার আমাদের নেই। আর এটাও ঠিক, আমরা সেখানে একমাত্র উপদেষ্টা নই। তাদের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপের কোনো অধিকারই আমরা রাখতে চাই না।

কিসিঞ্জার : আরে, আমাদেরও কোনো আগ্রহ নেই পাকিস্তান নিয়ে। আমরা শুধু এটুকু চাই তার স্বাধীনতা টিকে থাকুক। এছাড়া সেখানে আমাদের অন্য কোন লক্ষ্য নেই।

চৌ : উপমহাদেশ নিয়ে আপনি উদাসীন থাকতে পারেন না। কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন সেখানে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে।

কিসিঞ্জার : হ্যাঁ, সে কারণেই আমরা চেষ্টা করছি ...

চৌ : ব্রিটেন ইতোমধ্যেই অসন্তোষ প্রকাশ করছে।

কিসিঞ্জার : কিন্তু ব্রিটেন তো এই ডিসেম্বরেই অবদান রেখেছে।

চৌ : আমরা কিন্তু ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডগলাস হোমকে বলেছি, আপনারা কেন এটা এত দেরিতে উপলব্ধি করলেন।

কিসিঞ্জার : এটা খুবই মজার হতে পারত আপনি যদি আপনার পরিস্থিতি সম্পর্কে ইউরোপীয়দের অবহিত করতেন। কারণ উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী গত ডিসেম্বরের অবস্থা ভালোই জানেন। তারা আমাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলত।

চৌ : জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনের একশ' চার ভোটের মধ্যে ব্রিটেন ও ফ্রান্স কিন্তু অন্তর্ভুক্ত হয়নি। আমাদের ভাইস মিনিস্টার সেজন্য তাদের সমালোচনা করেছেন প্রকাশ্যে। অথচ ২০ ও ২১ ডিসেম্বরে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে তারা সম্মত হলেন। ঢাকার পতনের পর তারা রাজি হলেন যুদ্ধ বিরতির নিয়মনীতি বিষয়ক সিদ্ধান্তে। তখন সেটা সত্যিই খুব বেশি দেরি হয়ে গিয়েছিল। সাধারণ পরিষদে ৭ ডিসেম্বরে ভোটাভুটি হয়। প্রকৃতপক্ষে সেই সময় যদি অ্যাকশন নেয়া সম্ভব হতো তাহলে ঢাকাকে বাঁচানো সম্ভব ছিল।

চিয়াও : নিরাপত্তা পরিষদে চরম মুহূর্ত এসেছিল ১১ও ১২ ডিসেম্বরে।

কিসিঞ্জার : আমি ঠিক এ কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম। ব্রিটিশরা খুবই খারাপ। ভাইস ফরেন মিনিস্টার তা ভালোই জানেন।

চৌ : পরিস্থিতি তখন কিছুটা পরিষ্কার হয়ে এসেছিল। কিন্তু তাও ঢের বিলম্ব ঘটেছিল।

কিসিঞ্জার : পররাষ্ট্রনীতির কলা (আর্ট) হচ্ছে কোনো কিছু স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠার আগেই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা ।

চৌ : ঠিক বলেছেন। আপনার দূরদর্শিতা থাকতে হবে। ... আসলে কি জানেন– ব্রিটিশরা ভাবে তারা এখনো সেই লর্ড মাউন্টব্যাটেনের দিনগুলোতেই আছে। কিন্তু সেসব দিন কতদিন হলো পেরিয়ে গেছে।

কিসিঞ্জার : এবং তারা বিকল্প কিছু প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা তাতে সফল হবে না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, বর্তমান নিক্সন প্রশাসনেরও তাই বিশ্বাস যে, সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতিতে ভারতের যে সংযোজন ঘটে গেছে তার অতি ভয়ানক প্রভাব সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পড়বে। গত পাঁচ বছরে ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে একশ' দুই কোটি ডলারের সামরিক সরবরাহ লাভ করেছে।

চৌ : এটা খুবই ব্যয়বহুল।

কিসিঞ্জার : হ্যাঁ, সোভিয়েতরা একশ' কোটি ডলারের অস্ত্র নিজেদের জন্য তৈরি করেছে। একই সময়ে পাকিস্তান পাঁচশ' মিলিয়ন ডলারের অস্ত্রও পায়নি। এ কথার আমি কি বলব। আপনারাই তো ভালো জানেন। বেশিরভাগটা তো আপনারাই দিয়েছেন।

চৌ : আচ্ছা ভারত কি সোভিয়েতের কাছ থেকে সামরিক সাহায্য ঋণ আকারে পেয়েছে?

কিসিঞ্জার : হ্যাঁ, খুবই কম সুদের ঋণ। আমি ভাইস চেয়ারম্যানকে ইতোমধ্যেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আমি তাকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য দেব। বলুন কখন, কোথায় এ নিয়ে বসতে চান।

চৌ : আপনার কি মনে হয় রাষ্ট্রদূত হুয়াং হুয়ার মাধ্যমে আমাদের অবহিত করলে ভালো হয়?

কিসিঞ্জার : আগামী সপ্তাহেই আমি এ নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলব। আপনি তো জানেন সোভিয়েতরা মিগ-২১ ভারতেই তৈরি করার পরিকল্পনা করছে।

চৌ : মিগ-২১ এর শক্তি সামর্থ্য তেমন ভালো নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে তার কার্যকারিতা মিগ-১৯ এর চেয়েও খারাপ। এই কেলিবারের যে বিমান আপনার দেশে রয়েছে তার চেয়েও ওটা নিকৃষ্ট বলতে হবে।

কিসিঞ্জার : সেটা ঠিকই বলেছেন। আমরা ইরানকে অধিকতর আধুনিক যুদ্ধবিমান দিতে চাইছি। যাতে তারা তাদের বিমান বহর থেকে অন্তত কিছু পাকিস্তানকে দিতে পারে। সেগুলোর অবস্থা এখনো খুব ভালো। অবশ্য তারা কিছু এফ-১৪ ও এফ-১৫ উৎপাদন করছে। আমরা এজন্য চাপ দিচ্ছি যাতে তারা তাদের কিছু এফ-৪ বিমান পাকিস্তানকে দিতে পারে। উপমহাদেশ সম্পর্কে এটাই হলো আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি।

চৌ : পাকিস্তান কি এখনো সেন্টোর সদস্য আছে?

কিসিঞ্জার : হ্যাঁ, টেকনিক্যাল অর্থে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে পাকিস্তানকে যথেষ্ট শক্তিশালী করা, যাতে সে পাকিস্তানকে আক্রমণ করতে সক্ষম না হয়। অন্যথায় পাকিস্তান পরিণত হবে ভারতের একটি 'ভ্যাসেল' এ। সেক্ষেত্রে ভারত হবে মুক্তবিহঙ্গ। সে বিচরণ করবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অথবা অন্য ভূখণ্ডে।

চৌ : আপনাদের কূটনৈতিক প্রতিনিধি কি পূর্ব পাকিস্তানে গেছেন?

কিসিঞ্জার : হ্যাঁ।

চৌ : পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি ভালো নয়।

কিসিঞ্জার : পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি খুবই খারাপ। দীর্ঘমেয়াদে, আমি মনে করি এটা হবে ভারতের জন্য এক ক্যান্সার।

চৌ : আমিও তাই মনে করি।

কিসিঞ্জার : কারণ হচ্ছে পরিস্থিতি যদি বিশৃঙ্খলাপূর্ণ থাকে তাহলে এটা ভারতীয় সম্পদে ভাগ বসাবে। আর যদি পরিস্থিতির উন্নতি ঘটে তাহলে এটা হবে পশ্চিমবঙ্গের জন্য এক চুম্বক (চৌ-এর হাসি)। কিন্তু আমাদের ধারণা হলো ঢাকার সরকার এতটাই অযোগ্য যে প্রশাসনের কার্যকর নিয়ন্ত্রণভার এখনো রয়ে গেছে ভারতীয়দের হাতেই।

চৌ : তাদের সত্যিই ঔপনিবেশিক শাসনের আমেজটা রয়ে গেছে।

কিসিঞ্জার : হ্যাঁ।

চৌ : এবং প্রকৃতপক্ষে কিছু ভারতীয় সৈন্য এখনো পাকিস্তানে রয়ে গেছে।

কিসিঞ্জার : পুলিশ হিসেবে।

চৌ : এবং কর্মকর্তারাও।

কিসিঞ্জার : এবং তারা আসলে ভারতীয় সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত।

চৌ : তাহলে এই হলো উপমহাদেশের চালচিত্র। উপমহাদেশের স্বার্থেই আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের স্বাধীনতা রক্ষায় সমর্থন দিয়ে যাব। এটা এমন এক দায়িত্বশীলতা

যা আমরা অব্যাহতভাবে পালন করব ভবিষ্যতের দিনগুলোতেও। একই সময়ে আমরা এটাও চাইব যে, পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন থাকবে। সত্যি বলতে কি, ভারতের চেয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে আমদের বন্ধুত্বের মেয়াদ দীর্ঘতম। কিন্তু পাকিস্তানিরা কিছুটা উদ্বেগ অনুভব করছেন। কারণ গত মাস তিনেক ধরে মিসেস গান্ধী সর্বত্র বলছেন যে, তিনি চীনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন চান। স্বাভাবিকভাবেই, আমরা তার প্রতি কোনো প্রকার মনোযোগ দেখাইনি। ভারতের সঙ্গে রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের বিষয়টি আমরা বরং কিছুটা বিলম্বিত করতে পারি। এ পর্যন্ত ভারতই একমাত্র দেশ, যাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে কিন্তু রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হয়নি। ভারতীয়দের কিছু কূটকৌশলের জন্যই এটা ঘটেছে।

কিসিঞ্জার : সোভিয়েত সামরিক সহায়তার ওপর তাদের নির্ভরশীলতার কারণেই তাদের কাজের স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে।

চৌ : ভারতীয়দের অবশ্য বড় ধরনের অভ্যন্তরীণ জটিলতা রয়েছে। প্রেসিডেন্ট নিক্সন এখানে সফরকালে বলেছেন, বিশ্বব্যাংকসহ ভারতের মোট ঋণের পরিমাণ প্রায় দশ বিলিয়ন ডলার। সুতরাং ভারত ঋণ পরিশোধ না করার নীতি গ্রহণ করেছে।

কিসিঞ্জার : কথাটা হয়তো এখনো সেভাবে খাটে না। কিন্তু আমি নিশ্চিত ইন্দিরা ঠিক তাই করতে যাচ্ছেন। (চৌয়ের হাসি)

ভারতও বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায়নি : কিসিঞ্জার

১৯৬৯ সালে সিআইএর একাধিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, অখণ্ড পাকিস্তানে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ অভিন্ন। ভারত তার স্বার্থেই অখণ্ড পাকিস্তান চেয়েছে। এক্ষেত্রের যুক্তি হচ্ছে, পশ্চিম পাকিস্তানিরা ভারতবিরোধী। মুজিব এবং বাঙালিরা ভারতের প্রতি বন্ধুপ্রতিম। পাকিস্তানের বিদেশনীতির মূল টার্গেট হচ্ছে ভারত বিরোধিতা। সত্তরের নির্বাচনে ভুট্টোর পশ্চিম পাকিস্তান বিজয় ছিল ভারতের জন্য অধিকতর অস্বস্তিকর। তবে ভারত ভেবেছিল পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের ফলে তারা এবার নীতি নির্ধারণে প্রভাবশালী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। ১৯৭১ সালের ১৮ আগস্ট কিসিঞ্জার নিক্সনকে দেয়া এক স্মারকে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন, 'ভারতীয়রা মার্চের আগে পাকিস্তানের অখণ্ডতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। তখন তারা ভেবেছিল পাকিস্তানের রাজনীতিতে বাঙালিরা প্রভাবশালী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। কিন্তু এখন তারা দেখছেন, বাঙালিদের এই ভূমিকা রাখা আর সম্ভব হবে না। সুতরাং এখন তারা যত শিগগির সম্ভব একটি স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় দেখতে চান। এখন তাদের সমস্যা হলো নীতি নিয়ে। ভারতীয়রা সম্ভবত পূর্ব পাকিস্তানে গেরিলাদের সমর্থন দানের মাধ্যমে একটা রাজনৈতিক অচল অবস্থা সৃষ্টিতে সক্ষম হতে পারে। কিন্তু তা স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট নয়। বর্ধিত গেরিলা তৎপরতা খাদ্যবণ্টন কর্মসূচি মন্থর করবে এবং উদ্বাস্তু প্রবাহ বৃদ্ধি করবে।'

এই পটভূমিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি কী হতে পারে তা উল্লেখ করতে গিয়ে কিসিঞ্জার কার্যত এটা স্পষ্ট করেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করার প্রশ্নটি চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত। কিসিঞ্জারের কথায়, 'এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, একটি সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষ এড়াতে যুক্তরাষ্ট্রের উচিত হবে পূর্ব পাকিস্তানকে ত্রাণ সরবরাহ করা। মনে রাখতে হবে, ভারত কিন্তু তার হস্তক্ষেপের জন্য এই উদ্বাস্তু ইস্যুকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করতে চাইবে। কিন্তু সমস্যা হলো, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যদি অক্ষমতার পরিচয় দেন তাহলে খাদ্য বণ্টন অসম্ভব হতে পারে। ইয়াহিয়া সামরিকভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে এবং রাজনৈতিকভাবেও গেরিলাদের সঙ্গে সমঝোতায় পৌছাতে ব্যর্থ হতে পারেন। সেক্ষেত্রে আমাদের জন্য মোক্ষম কৌশল হচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তানে সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষ এড়াতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বিশেষভাবে সচেষ্ট হওয়া। এতে এক

ঢিলে দুই পাখি মারা হবে। ভারতকে হস্তক্ষেপের অজুহাত থেকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হবে, অন্যদিকে ইয়াহিয়া যাতে রাজনৈতিকভাবে একটা মুখরক্ষার ব্যবস্থা নিতে পারে সে লক্ষ্যে তাকে কিছুটা সময় দেয়া সম্ভব হবে। কিন্তু সবটাই নির্ভর করছে ইয়াহিয়ার ইচ্ছার উপর। তিনি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে রাজনৈতিক না সামরিক ব্যবস্থাই আঁকড়ে ধরে থাকবেন তা নির্ভর করছে তার উপর। এই পরিপ্রেক্ষিতে চীনের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র যদি আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নামে পূর্ব পাকিস্তানের ভাঙনকে সমর্থন দেয় তাহলে তা চীনের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে। চীন ভাববে, যুক্তরাষ্ট্র যে কারণে বাঙালিদের স্বাধীনতায় সায় দিয়েছে একই কারণে তাহলে সে তাইওয়ান ও তিব্বত ইস্যুকেও মোকাবিলা করতে পারে। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানের আমাদের নীতিকে পিকিং এভাবেই মূল্যায়ন করবে। কাজেই এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, তাকে এমন অনুভূতিও পেতে দেয়া ঠিক হবে না যে, যুক্তরাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। সে কারণেই এই মুহূর্তে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সোভিয়েত ও ভারতের চেয়ে এক কদম পিছিয়ে থাকা। যদিও দীর্ঘমেয়াদে এ কথা তো আমাদের জানাই আছে যে, ৬০ কোটি ভারতীয় ও বাঙালির স্বার্থ উপেক্ষায় আমাদের কোনো স্বার্থ নেই। একই সময়ে আমরা আমাদের তরফে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাব, ভারত যেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আক্রমণের অজুহাত না পায়। আমরা ভারতের কাছ থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হওয়ার মতো অবস্থান নিতে চাই না। অথবা সোভিয়েত ও চীনের মধ্যে কোনো পক্ষ অবলম্বনেও নারাজ। এই পর্যায়ে আমাদের এক তীব্র যন্ত্রণাদায়ক বিকল্প বেছে নিতে হবে, যদি পাক-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে পিকিং আক্রমণ করে বসে দিল্লিকে।' নিক্সন কিসিঞ্জারকে আরো উল্লেখ করেন, পরিস্থিতি সত্যিই জটিল। কারণ আমরা ভারতের পক্ষে কতটা কী করব তা অনিশ্চিত। ভারতীয়রা এখনো চাইছে, যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েতের সঙ্গে তাদের সখ্যতায় একটা ভারসাম্য হয়ে থাকুক। পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তাদের প্রত্যাশা একই। ভারতে গিয়ে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, 'আপনি তাহলে বলছেন, আপনি পাকিস্তানের প্রতি আপনার প্রভাব সংরক্ষণ করতে চান। দয়া করে আমাদের এটা দেখতে দিন।' ...ভারতীয়রা কিন্তু এখনো এটাই জানে যে, বাঙালি উদ্বাস্তুদের জন্য তারা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অবশিষ্ট বিশ্বের তুলনায় অধিক সহায়তা লাভ করবে।

৭ জুলাই, ১৯৭১

নয়া দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন কিসিঞ্জার। ইন্দিরার সঙ্গে রয়েছেন তার ব্যক্তিগত সচিব পিএন হাকসার। কিসিঞ্জারের সঙ্গে রয়েছেন ভারতের নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ কিটিং ও এনএসসি স্টাফ হ্যারোল্ড সেন্ডার্স। কিসিঞ্জার প্রথম ১০-১৫ মিনিট ইন্দিরার সঙ্গে একান্তে কথা বলেন। কিসিঞ্জার পরে

বলেছেন, ইন্দিরা তাকে তার রাজনৈতিক সমস্যা ব্যাখ্যা করেছেন। ইন্দিরা বলেছেন, তিনি শক্তি প্রয়োগে নারাজ। যুক্তরাষ্ট্র যদি কোনো সুপারিশ দেয় তা তিনি মেনে নিতে আগ্রহী। ইন্দিরা স্পষ্ট করে বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক সমাধান প্রশ্নে ভারত কোনো বাজি ধরেনি। তিনি একই সঙ্গে বলেন, পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু আসা প্রতিরোধেও তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি বলে পাকিস্তানিরা অভিযোগ করছেন। পূর্ব পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান চীনা প্রভাব নিয়ে তিনি শঙ্কিত। ইন্দিরার ঘরোয়া বৈঠককালে কিসিঞ্জার নিক্সন প্রশাসনের নেয়া চীনা নীতি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, নিক্সন প্রশাসন চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক পর্যায়ক্রমে উন্নত করতে আগ্রহী। কিসিঞ্জার ইন্দিরাকে আশ্বস্ত করেন যে, আমরা চীনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি চাইছি তা কিন্তু আপনাদের বিরুদ্ধে নয়। এটা আমাদের বৈশ্বিক নীতির অংশ। কিসিঞ্জার এ সময় উল্লেখ করেন, দেখুন আমরা আপনাদের অবস্থাটা বিবেচনায় নিয়েছি। আমরা আশঙ্কা করছি বর্তমান পরিস্থিতিতে শক্তি প্রয়োগের ঘটনা ঘটতে পারে। যার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে একটি ভয়ানক যুদ্ধ। অন্যদিকে পাকিস্তানের তরফে একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছা, যাতে উদ্বাস্তুরা দেশে ফিরে যেতে পারে। ইন্দিরা এ সময় স্মরণ করিয়ে দেন যে, আমি আপনাদের প্রেসিডেন্টকে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেছি যে, ৬ দশমিক ৮ মিলিয়ন উদ্বাস্তু ভারতে এসেছে, এই সমস্যার আশু সমাধান জরুরি। ইন্দিরা অবশ্য উল্লেখ করেন যে, প্রকৃত উদ্বাস্তুর সংখ্যা নির্ধারণ সত্যিই কঠিন। কারণ অনেকেই ভারতে এসে বিভিন্ন বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। তারা নিবন্ধনের ভয়ে নাম লেখাননি। তাদের আশঙ্কা, তারা যদি আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের নিবন্ধিত করে তাহলে ভারত সরকার তাদের ফেরত পাঠাতে পারে। ৬ দশমিক ৮ মিলিয়ন উদ্বাস্তু হচ্ছে 'নিবন্ধিত'। ড. কিসিঞ্জার বলেন, এ ব্যাপারে এ মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কোনো ধারণা নেই। ইসলামাবাদে গিয়েই তিনি বুঝতে পারবেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কিভাবে অগ্রসর হতে চান। তিনি ইয়াহিয়ার ২৮ জুনের ভাষণ শুনেছেন। তিনি বুঝতে পারছেন না ইয়াহিয়ার কোনো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা আদৌ আছে কি-না। আমরা অবশ্যই একটি সমাধানে পৌঁছাতে আমাদের প্রভাব খাটাতে সচেষ্ট থাকব। আমরা আমাদের চেষ্টা এমনভাবেই করব যে, যাতে উদ্বাস্তুরা দেশে ফিরতে উৎসাহিত হয়। আমরা তেমনই একটি অনুকূল পরিস্থিতি আশা করি। কিন্তু তা যদি নিশ্চিত করতে আমরা সক্ষম না হই তাহলে, আমাদের অবশ্যই নীতি পুনঃপরীক্ষার প্রয়োজন হবে। কিসিঞ্জার এ কথাও বলেন যে, আমি আসলে এর চেয়ে বেশি আর কিছুই বলতে পারব না। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা মন্তব্য করেন, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের অনুভূতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশই আবেগনির্ভর। এর কারণ হলো, উদ্বাস্তুদের আগমন ঘটায় খাদ্যের ঘাটতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং মজুরির দরে পতন ঘটেছে। কিসিঞ্জার জিজ্ঞেস করেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে আর কতটা সময় বাকি? ইন্দিরা বলেন, এ সমস্যা তো এখনই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে

গেছে। আমরা শুধুই ইচ্ছাশক্তির জোরে টিকে আছি। পার্লামেন্টে আপনি বড়জোর দুজন লোক পাবেন যারা আমাদের নীতি সমর্থন করছে। অনেক দল এটাকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে। কিসিঞ্জার বলেন, গত মার্চে আপনার অসাধারণ বিজয় লাভের পরে বিরোধী দল অধিকতর হতাশ হয়ে পড়েছে। কিসিঞ্জার এ সময় ইন্দিরার কাছে জানতে চান, পূর্ব পাকিস্তানের সমঝোতায় আওয়ামী লীগ নেতা মুজিবুর রহমানের অন্তর্ভুক্তিকে তিনি আবশ্যক মনে করেন কি-না। ইন্দিরা বলেন, সমঝোতা অবশ্যই হতে হবে, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে। এটা পাক-ভারতের সমস্যা নয়। উদ্বাস্তুদের ইস্যু ছাড়া আর কিছুতেই ভারত জড়াবে না। ইন্দিরা এ সময় হাকসারের দিকে তাকিয়ে বলেন, তিনি বিপজ্জনক সংবাদ পেয়েছেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানিরা বিগত আদমশুমারিতে ভ্রান্তি ঘটেছে মর্মে আওয়াজ তুলেছে। এতে মনে হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানিরা সমগ্র জনসংখ্যার সরকারি চিত্র পাল্টে দিতে চাইছে। তারা সম্ভবত জনসংখ্যা হ্রাস করতে চাইছে এ কারণে যে, পাকিস্তানের পূর্ণ জনসংখ্যা থেকে পূর্ব পাকিস্তানিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি যে অসার তা প্রমাণ করতে। এ সময় আদমশুমারির সঙ্গে রাজনৈতিক প্রশ্নের সম্পর্কের কথা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়। হাকসার মন্তব্য করেন, কখনো কখনো একটি আদমশুমারি রাজনৈতিক সমস্যার জন্ম দিতে পারে। কিসিঞ্জার উল্লেখ করেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। লেবাননের সরকারকে একটি রূপকথা বাঁচিয়ে রাখতে হচ্ছে। তারা বলছেন, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের সংখ্যা সমান। কিসিঞ্জার এ সময় আবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আসেন। বলেন, এটা একটা বিয়োগান্তক অধ্যায় যে উদ্বাস্তু সমস্যা ঠিক এই সময়টাতে এসেছে। মার্চে যুক্তরাষ্ট্রের সব বিশেষজ্ঞ একমত ছিলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানি সরকার পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করবে। রাষ্ট্রদূত কিটিং এ সময় মুহূর্তের নীরবতা ভেঙে উল্লেখ করেন, কিসিঞ্জার পরিকল্পনা মন্ত্রী সুবরেমনিয়ামের সঙ্গে এর আগে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, উদ্বাস্তুদের আগমনের কারণে ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ইন্দিরা বলেন, ১৯৬২ থেকে ভারত আসলে 'অন্ধকার সময়' অতিক্রম করে এসেছে। '৬৫-'৬৭ পর্ব কেটেছে খরায়। কিসিঞ্জার ইন্দিরাকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সমস্যার দিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাকাবে। তারপরও তিনি উল্লেখ করেন যে, ইয়াহিয়াকে কোনো শক্ত ভাষায় পরামর্শ দেয়ার সুযোগ যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আসলেই খুব সীমিত। ...

ইন্দিরা গান্ধী বলেন, ভারত আসলে কঠোর পদক্ষেপ নিতে চায় না। ভারত তাই করবে যা কি-না উদ্ভূত পরিস্থিতি তাকে তা করতে বাধ্য করে। এটা সত্য যে, পাকিস্তানকে যুক্তরাষ্ট্র কিছু অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছে, তা খুব বড় ব্যাপার নয়। কিন্তু সমস্যা অন্যত্র। যুক্তরাষ্ট্রের এই অস্ত্র সহায়তা দেয়ায়, মনস্তাত্ত্বিকভাবে পরিস্থিতি অধিকতর জটিল হয়ে পড়েছে। ইন্দিরা বলেন, পাকিস্তান এসব বছরে এমন একটা ভাব নিয়েছে যে, সে যাই করুক না কেন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সে সাহায্য পাবেই। এটাই আসলে

তাকে 'দুঃসাহসিক নীতি' অনুসরণে উৎসাহিত করেছে। ভারত কিন্তু 'কোনো অবস্থাতেই ভূখণ্ডের প্রাপ্তিতে উৎসাহিত নয়।' কিন্তু এটা মেনে নেয়া কঠিন যে, পাকিস্তানের সমগ্র অস্তিত্বের ভিত্তি হচ্ছে ভারতের বিরোধিতা করা। তিনি বলেন, যদি পাকিস্তানিদের অন্তরে সত্যিই ইসলামের আদর্শ থাকত তাহলে তারা ভারতে অবস্থানরত ৬০ মিলিয়ন মুসালমানের কথা বিবেচনায় নিত।

স্বাধীনতার নেতৃত্ব হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর ছয় মাস পর প্রস্তুত রিপোর্টে সিআইএ বলেছে, মুক্তিবাহিনীর সত্যিকার সামর্থ্য সম্পর্কে খুব অল্পই জানা সম্ভব হয়েছে। ১৯৭১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে এক দীর্ঘ সমীক্ষায় উল্লেখ করেছে, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি দিন দিন আরো উত্তেজনাকর ও ঘোলাটে হয়ে পড়ছে। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা ও আধাসামরিক বাহিনীর সংখ্যা এখন প্রায় ৮০ হাজার হবে। তারা অন্তত দিনেরবেলা বিভিন্ন শহর এবং গ্রামের কিছু এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হচ্ছে।

সমীক্ষায় বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তান কিংবা ভারতে যেখানেই থাকুক, রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে তাদের পরিচয় মুক্তিবাহিনী বা লিবারেশন ফাইটার। ভারতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ৫০ হাজার বাঙালি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিরোধ শক্তির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। অনেকেই, যদি অধিকাংশ না-ও হয়ে থাকে, এদের একটি বড় অংশ একাত্তর-পূর্বকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনীতে ছিল। সংখ্যায় তারা সম্ভবত ১৫ হাজার হবে। তারা সময়ে সময়ে সীমান্ত অতিক্রম করেন এবং গেরিলা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। একটি বৃহত্তম গ্রুপ, যারা এখন ভারতে অবস্থান করছে, তারা সম্ভবত পূর্ব পাকিস্তানের কোনো ভূখণ্ড দখল করে নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর প্রতিরোধ মোকাবেলা করে তারা চাইছে পূর্ব পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করে নিতে। এই ভূখণ্ডে তারা নিজেদের স্বাধীন বাংলাদেশের কার্যক্রম চালাতে আগ্রহী। এটি এমন এক পদক্ষেপ, যা খুবই উস্কানিমূলক এবং এর ফলাফলও অনিশ্চিত। মুক্তিবাহিনীর অবস্থা অনেকটা তিউনিসিয়ায় অবস্থানরত আলজেরীয় সেনাবাহিনীর মতো। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তারা অবস্থান করেছিল তিউনিসিয়ায়। তাদের মতোই মুক্তিবাহিনী অনতিবিলম্বে দেশ দখল করতে চায় না। অপেক্ষা করতে চায়, কখন পশ্চিম পাকিস্তানিরা দেশ ছেড়ে চলে যায়। তারপর তারা দেশ দখল করে নেবে। তবে এক্ষেত্রে আরেকটা সম্ভাবনা আমাদের মনে রাখতে হবে। এমনও হতে পারে, দেশ দখলে নেয়ার সিদ্ধান্ত এখনো তারা পায়নি। যা-ই ঘটুক না কেন, তারা ইদানীং কিছু প্রকাশ্য তৎপরতা প্রদর্শন করছে। এর উদ্দেশ্য হতে পারে, কলকাতার প্রবাসী সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য নিশ্চিত করা। তবে যেসব গেরিলা সক্রিয়, তাদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা, তাদের প্রকৃত সংখ্যা, কমান্ড কাঠামো ইত্যাদি

সাধারণভাবে অজ্ঞাত। কিন্তু বাঙালিরা ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং এমনকি চারিত্রিকভাবে নৈরাজ্যবাদী। বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর মধ্যে সম্ভবত সামঞ্জস্য নেই। এমনও হতে পারে, গ্রুপগুলো পরস্পরের প্রতি বৈরী। তাই তারা একে অন্যের সঙ্গে সমন্বয় ছাড়াই স্বাধীনভাবে বিদ্রোহ তৎপরতায় নিজেদের সম্পৃক্ত রেখেছে। তবে যারা আওয়ামী লীগের প্রতি অনুগত তারাই সংখ্যায় বেশি হবে। কিন্তু বিদ্রোহীদের অন্তত একটি অংশ কট্টরপন্থি। এদের সঙ্গে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শহুরে গেরিলাদের মিল রয়েছে।

মুক্তিবাহিনী ক্রমেই পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে পরিশীলিতভাবে ও কার্যকর প্রতিরোধ নিশ্চিত করতে সক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছে। তারা ব্রিজ উড়িয়ে দিয়ে, জাহাজ ও নৌকায় নাশকতা চালিয়ে, সড়কে মাইন পুঁতে, ট্রেন লাইনচ্যুত করে, এলাকাসমূহের পরিবহন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করেছে। তারা শান্তি কমিটির অনেক সদস্য হত্যা করেছে।

পাট শিল্প মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই খাতই পাকিস্তানের প্রধান রফতানিমুখী পণ্য। মুক্তিবাহিনীর নাশকতা ও প্রতিরোধের ফলে পাটের উৎপাদন স্বাভাবিক পর্যায়ের চেয়ে ইতোমধ্যে এক-চতুর্থাংশে নেমে এসেছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অনেকে হতাহত হয়েছে। কিন্তু সংখ্যাটা যে ঠিক কত, সে ব্যাপারে আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য নেই। আমাদের ঢাকা কনস্যুলেট অফিস শহরে একাধিক বিস্ফোরণের খবর পাঠিয়েছে। এক বা তার চেয়ে অধিকবার বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং শহরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় হোটেলের লবি একটি বোমার আঘাতে ধ্বংস হয়ে গেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার নেমে এসেছে প্রায় শূন্যের কোটায়। 'শান্তি প্রতিষ্ঠা' এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে। ইসলামাবাদ অবশ্য অব্যাহতভাবে দাবি করে চলেছে, পরিস্থিতি তাদের হাতের মুঠোয়।

সিআইএ লিখেছে, মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারত সরকারের সম্পর্ক এখনো রয়ে গেছে একটি বিতর্কিত বিষয়ে। ইসলামাবাদ দাবি করছে, শুধু ভারতের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতার কারণেই 'দুর্বৃত্তরা' তৎপরতা চালাতে সক্ষম হচ্ছে। একটা শান্তিপূর্ণ অবস্থা ও উদ্বাস্তুদের স্রোত বন্ধ করার লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হতো, যদি ভারত তার সীমান্ত বন্ধ করে দিত এবং যদি তারা ভারতে পলায়নরত বিদ্রোহীদের নিরস্ত্র ও তাদের তৎপরতা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করত। নয়াদিল্লি অবশ্য এ ধরনের সহযোগিতার কথা অস্বীকার করে চলেছে। তাদের যুক্তি হচ্ছে, ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত হচ্ছে আড়াই হাজার মাইল দীর্ঘ। এটা এতই বন্ধুর যে, এখানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা খুবই জটিল। নয়াদিল্লির আরো দাবি, 'এটা কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয়, ভারতে অবস্থানরত বাঙালিরা কোথা থেকে এসেছে? তারা পূর্ব না পশ্চিমবঙ্গের এটা ঠাহর করা কঠিন। উপরন্তু পূর্ববাংলায় বিদ্রোহ এক বিরাট জনপ্রিয় বিষয়। সুতরাং এটা থামানো দূরের কথা, তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করাও সম্ভব নয়। ভারতের সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকেই মুক্তিবাহিনী সাহায্য পাচ্ছে।' এ

পর্যায়ে সিআইএ'র মন্তব্য হচ্ছে, উভয় পক্ষের দাবির অনুকূলে কিছু সত্যতা রয়েছে। কিন্তু নয়াদিল্লি প্রকাশ্যে যতটা স্বীকার করছে, তার চেয়ে বাস্তবে মুক্তিবাহিনীর প্রতি তাদের সমর্থন অনেক ব্যাপক। (একটি অংশ কালি দিয়ে লেপটে দেয়া হয়েছে) রিপোর্ট এবং পশ্চিমা সাংবাদিকদের মতো বহিরাগতদের পর্যবেক্ষণ থেকে ইঙ্গিত মিলছে, ভারতীয় সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাঙালিকে অস্ত্র সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও আশ্রয় দিচ্ছে। দুদেশের সীমান্তে নিয়মিত ভারতীয় ও পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর মধ্যে গুলিবিনিময় ও সংঘর্ষের ঘটনায় এটা স্পষ্ট যে, ভারত সরাসরি বিদ্রোহীদের সমর্থন দিচ্ছে। এটা অবশ্য ঠিক, ভারতীয়দের ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিদ্রোহীদের সহায়তাদানের কিছু নজির রয়েছে। কিন্তু তা এমন নয় যে, তেমন সহায়তার মধ্যে অস্ত্র কিংবা গোলাবারুদ রয়েছে। মুক্তিবাহিনী প্রকৃতপক্ষেই ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কাছ থেকে অস্ত্র পাচ্ছে। নয়াদিল্লি কেন এই নীতি গ্রহণ করেছে– এর পেছনে একাধিক কারণ বিদ্যমান। মুক্তিবাহিনী যে কারণে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে, তার প্রতি ভারতীয় জনগণের রয়েছে অকুণ্ঠ সমর্থন। ভারত সরকার যদি এটা জবরদস্তিমূলক দমন করতে উদ্যোগী হয়, তাহলে তা বড় ধরনের রাজনৈতিক 'ব্যাকল্যাশ' সৃষ্টি করতে পারে। 'রিয়েল পলিটিক' এর দিক থেকে ভারত এটাও বিবেচনা করছে, তার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর কোনো অনিষ্ট সাধন তার স্বার্থের অনুকূল। এছাড়া ভারতীয়রা এমনও ভাবতে পারে যে, ইসলামাবাদের বিরুদ্ধে কার্যকর বিরোধিতা আগে যা মনে হয়েছিল তার চেয়ে ব্যাপক এবং সম্ভবত তারা পূর্ববাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর প্রকৃত সামর্থ্যকে খাটো করে দেখার প্রয়াস পেয়েছিল। সে কারণেই প্রত্যেক পর্যায়ে তারা বিপুলসংখ্যক গেরিলাদের সশস্ত্র করতে উৎসাহিত হয়েছে। সীমান্ত অতিক্রমকেও তারা সাধুবাদ জানিয়েছে এই আশায় যে, এটা শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাবি সামরিক শাসকদের উৎখাত নিশ্চিত করবে। বিদ্রোহীদের সহায়তার মাধ্যমে নয়াদিল্লি অবশ্য মুক্তিবাহিনীর ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখারও চেষ্টা করছে। কারণ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ বিশ্বের রাজনৈতিক চরমপন্থিদের উল্লেখযোগ্য আবাসভূমি হিসেবে স্বীকৃত। ওই চরমপন্থিরা পশ্চিমবঙ্গের (এবং ভারতের) শহর এলাকার শিল্পনির্ভর অর্থনীতির বিরাট ক্ষতি বয়ে আনতে পেরেছে। এই চরমপন্থিদের বিরুদ্ধে প্রবল নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার কারণে তাদের বাগে রাখা সম্ভব হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা একই বিচারে ভারত সরকারের কাছে সন্দেহভাজন। তারা ধরে নিয়েছে যদি এ ধরনের চরমপন্থিরা কখনো একটি স্বাধীন বাংলাদেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়, তাহলে তারা ভারতীয় নিরাপত্তার প্রতি সৃষ্টি করবে এক অপ্রতিরোধ্য হুমকি। উপরন্তু পশ্চিমবঙ্গের ওপর বাংলাদেশ আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় নিয়েও তারা এখনই উদ্বেগ অনুভব করছে। নয়াদিল্লি সম্ভবত বাঙালিদের শুধু বন্ধু ভেবেই সমর্থন দিচ্ছে না; তারা চরমপন্থিদের সম্ভাব্য উত্থান প্রতিরোধেরও চেষ্টা করছে।

সিআইএ'র চোখে মুক্তিবাহিনীর ভূমিকা

২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

ভারতের মার্কিন দূতাবাস স্টেট ডিপার্টমেন্টে আজ একটি টেলিগ্রাম পাঠায়। এতে উল্লেখ করা হয়, জে. জে. সিং ৪ আগস্ট টাইমস অব ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত এক চিঠিতে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র মেকিয়াভেলির নীতি অনুসরণ করছে। তারা মুক্তিবাহিনীকে বিশ্বের চোখে খাটো করতে চায়।

১৯৭১ সালের ৭ অক্টোবর ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠকে সিআইএ পরিচালক হেলমস তথ্য দেন যে, 'আমার কাছে একটি তরতাজা রিপোর্ট রয়েছে। এটা এখন আমি আপনাদের পড়ে শুনাতে চাই। পশ্চিম ফ্রন্টে দুদেশ সীমান্তের কাছাকাছি প্রায় ২ লাখ করে সৈন্যের সমাবেশ ঘটিয়েছে। তারা সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায়। পাকিস্তানি সৈন্যদের অনেকেই অগ্রবর্তী অবস্থান নিচ্ছে। পশ্চিম ফ্রন্টে ভারতের রয়েছে দুটি পদাতিক ও একটি ট্যাংক ডিভিশন। অবশ্য এই তিনটি ডিভিশনই বর্তমানে সীমান্ত থেকে কয়েকশ' মাইল দূরে অবস্থান করছে। পাকিস্তানিরাও একইভাবে দুটি পদাতিক ও একটি ট্যাংক ডিভিশন নিয়ে অপেক্ষার প্রহর গুণছে। পূর্ব পাকিস্তান ফ্রন্টে ভারতের রয়েছে ১ লাখের বেশি, আর পাকিস্তানের ৭০ হাজার সৈন্য। আক্রমণ শুরুর আগে ভারতীয়রা সম্ভবত আরো এক ডিভিশন সৈন্য পূর্ব ফ্রন্টে নিয়ে আসবে। এটা অবশ্য পাকিস্তানিদের দাবি। আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি। পাকিস্তানিরা সর্বতোভাবেই গেরিলাদের নিয়ে ব্যস্ত। তারা উল্লেখযোগ্য কোনো অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নিতে পারেনি। যুদ্ধ সম্ভবত ঘনিয়ে আসছে; যেমনটা অনেক ভ্রান্তিপূর্ণ মূল্যায়নের ধারায় সংঘটিত হয়েছিল ১৯৬৫ সালে। কিন্তু এখন আমরা যে কোনো পক্ষের কাছ থেকে একটি পরিকল্পিত যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্ভাবনা উড়িতে দিতে পারি না। উদ্বাস্তু আগমনের স্রোত বন্ধ করতে মিসেস গান্ধী পূর্ব পাকিস্তানে আগ্রাসন চালানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

প্রতিদিন ৩০ হাজারের বেশি উদ্বাস্তু ঢুকছে। তাদের মোট সংখ্যা ৯০ লাখ অতিক্রম করেছে।' কিসিঞ্জার এ সময়ে প্রশ্ন করেন, ৯০ লাখের সংখ্যাটি কি সঠিক বলে আপনি মনে করেন? জবাবে হেলমস বলেন, 'এটা যথার্থ না-ও হতে পারে। কিন্তু সংখ্যাটি যদি ৭০ লাখও হয় তাহলেও তা বিশাল এবং সত্য হচ্ছে প্রতিদিনই উদ্বাস্তুরা ভারতে ঢুকছে; কেউ ফিরছে না। যে কোনো বিচারেই মধ্য নভেম্বর নাগাদ মিসেস গান্ধী সামরিক পদক্ষেপ নিতে চাপের সম্মুখীন হবেন। পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকা হবে এবং অনেক সদস্যই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলবেন। উর্ধ্বতন পাকিস্তানি কর্মকর্তারা এ মর্মে নিশ্চিত যে, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ইয়াহিয়া একটি 'প্রি-অ্যাম্পটিভ' আক্রমণ পরিচালনা করবেন। ইয়াহিয়া নিজেই ব্রিটিশদের কাছে এমন ধারণা ব্যক্ত করেছেন। তিনি অবশ্য আমাদের ডেপুটি চিফ অব মিশনকে নিশ্চিত করেছেন যে, এমন কাজ তিনি করবেন না। তিনি সম্ভবত ভারতের ওপর

পশ্চিমা চাপ বৃদ্ধির চেষ্টা চালাবেন। অথবা তিনি এমনো ভাবতে পারেন যে, একটা আক্রমণ পরিচালনা করলে তখন উভয়পক্ষের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়াতে সহায়ক হবে।' সিআইএ পরিচালক আরো বলেন, 'বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরে গেরিলারা পূর্ব পাকিস্তানে অধিকতর সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং ভারতীয়রা উভয়ই চাইছে, সমাধান দ্রুত হোক। এমনকি যুদ্ধের ঝুঁকি নিয়ে হলেও। তাদের অভিন্ন আশঙ্কা হচ্ছে, স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব যেন কোনো অবস্থাতেই উগ্র বামপন্থিদের হাতে চলে না যায়। আমরা এমন রিপোর্ট পেয়েছি যে, ভারতে প্রশিক্ষিত ১ লাখ গেরিলা আগামী দুমাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করবে। এই বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের উত্তর পূর্বাংশের একটি এলাকায় তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে, এই এলাকা থেকে অস্থায়ী সরকারের কার্যক্রম পরিচালনা। সেক্ষেত্রে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে সক্ষম হবে। আর এ রকমের একটি অবস্থা প্রায় নিশ্চিতভাবেই পাকিস্তানিদের যুদ্ধে ঠেলে দেবে।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের ইউ. এলেক্স জনসন এ সময় উল্লেখ করেন, আমাদের কাছে একটি পৃথক রিপোর্ট রয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, ১৫ অক্টোবরের মধ্যে প্রায় ৪০ হাজার গেরিলা পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকে পড়বে (ফুটনোট : ৩ অক্টোবর কাজী জহিরুল কাইউম কলকাতায় মার্কিন পলিটিক্যাল অফিসারকে বলেছেন, অক্টোবরের শেষ নাগাদ মুক্তিবাহিনী ৪০ থেকে ৬০ হাজার লোককে পূর্ব পাকিস্তানে প্রেরণের পরিকল্পনা করেছে। ১৫ অক্টোবরের মধ্যে ৪০ হাজার এবং অবশিষ্ট ২০ হাজার মাসের শেষ নাগাদ প্রবেশ করবে)।

সিআইএ'র পরিচালক হেলমস বলেন, এসব পরিসংখ্যান নিয়ে বড় ঝামেলায় আছি। আবহাওয়া যখন শুষ্ক হবে, তখনই গেরিলারা দলে দলে ঢুকতে শুরু করবে। তখন তাদের সংখ্যা ৪০ হাজার অথবা ১ লাখ অথবা সংখ্যাটি এর মাঝামাঝি কিছু একটা হবে কী হবে না তা বড় কথা নয়। এটুকু ভালোই বুঝতে পারছি, সংখ্যায় তারা অনেক বেশি হবে। ভারতীয়রা বিশ্বাস করে যে, উত্তরের তুষার এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া পাকিস্তানিদের কাশ্মীর দখল থেকে নিবৃত্ত রাখবে। তখন চীনের পক্ষেও পাকিস্তানিদের সাহায্য করা কঠিন হবে। আর সেই সুযোগে পূর্ব পাকিস্তানে গেরিলারা সাফল্যের মুখ দেখবে। পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসন ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা মোকাবেলা করতে পারবে না। আর কিছু এলাকায় গেরিলারা ইতোমধ্যেই নিজস্ব প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছে। পাকিস্তানি সরকার পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মন জয় করার কোনো সুযোগই পাবে না। মুক্তিবাহিনীর প্রতি জনগণের সমর্থন দৃশ্যত ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

ইয়াহিয়া আগেই জানতেন যুদ্ধে পরাজয় অনিবার্য

১৯৭১ সালের ৭ অক্টোবর ওয়াশিংটন অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠকে কিসিঞ্জার জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ দফতরের এডমিরাল থমাস এইচ. মুরারের কাছে প্রশ্ন রাখেন, 'সামরিক পরিস্থিতি নিয়ে আপনার কি মনে হয়?' জবাবে মুরার বলেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ভারতীয়রা সংখ্যায় বেশি। পাকিস্তানীদের সঙ্গে তাদের স্থল সৈন্য সংখ্যার অনুপাত ৪ঃ১। বিমান শক্তির প্রশ্নে ফলাফল অনেকটা নির্ভর করছে, কারা আগে হামলা চালায়। কিসিঞ্জার বলেন, আমি স্মরণ করতে পারি একজন ভারতীয় পাইলটের গল্প। যিনি ঢাকার কাছে দুর্ঘটনায় পতিত হন। ভারতীয়রা বিমান চালনায় এতটাই কাঁচা যে, তারা এমনকি ঠিকমতো অবতরণও করতে পারে না। এডমিরার মুরার তাকে সমর্থন জানিয়ে বলেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। পাকিস্তানি পাইলটদের দক্ষতার তুলনায় ভারতীয়রা কিছুই না। তবে উভয় পক্ষের বিমান শক্তির ক্ষয় ঘটবে দ্রুত। ... ভারতীয়রা সন্দেহাতীতভাবে পূর্ব পাকিস্তান অবরোধের চেষ্টা করবে এবং সম্ভবত তারা সফলও হবে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীও পাল্টা ব্যবস্থা ভালোই নিতে পারবে। কিন্তু সমস্যায় পড়বে রসদ নিয়ে। ভারতীয় সেনাবাহিনী চূড়ান্ত বিচারে অধিকতর ভালো অবস্থানে থাকবে। কারণ, তারা সংখ্যায় বেশি। প্রয়োজনে তারা চীন সীমান্তেও পাঁচ বা ছয় ডিভিশন সৈন্য রাখতে পারে। কিসিঞ্জার বলেন, আমি কি এটা ঠিক জানি যে, চীনা শক্তি বৃদ্ধির কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণই আমাদের হাতে নেই। মুরার তা নিশ্চিত করেন। বলেন, সত্যিই কোনো প্রমাণ নেই। কোনো পক্ষেরই অব্যাহতভাবে আক্রমণ পরিচালনার মুরোদ নেই। ৪ বা ৬ সপ্তাহের মেয়াদে তারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে। আর সে কারণেই সংখ্যাধিক্যের কারণে ভারতের জয়লাভের সম্ভাবনাই বেশি। জনসন বলেন, 'এটা পূর্ব পাকিস্তানে আরো বেশি সত্য। সেখানে তাদের নিয়মিত সৈন্যসংখ্যা যেমন তেমনি তাদের রয়েছে মুক্তিবাহিনীর সমর্থন।'

'৭১ এর ৯ এপ্রিল কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে সিনিয়র রিভিউ গ্রুপের বৈঠকে সিআইএ'র প্রতিনিধি লে. জে. রবার্ট কুশম্যান জানিয়েছিলেন, '২৫ মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ চলছে। ৩০ হাজার পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য আনুমানিক ১০ হাজার গেরিলার বিরুদ্ধে লড়ছে।' লক্ষণীয় যে, সদ্য অবমুক্ত করা নথিপত্রে এটা স্পষ্ট যে, নিক্সন প্রশাসন সযত্নে মুক্তিযোদ্ধা শব্দটির ব্যবহার এড়িয়ে গেছে। প্রথমদিকে গেরিলা বা বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং শেষের দিকে মুক্তি ফৌজ বা মুক্তিবাহিনী উল্লেখ করেছে।

জেনারেল কুশম্যান এপ্রিলের পরিস্থিতি বর্ণনা করছিলেন এভাবে– ১০ হাজার গেরিলা যোদ্ধার সঙ্গে বাঙালি সৈন্যদের কয়েক ব্যাটালিয়ন রয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য সেনানিবাস পশ্চিম পাকিস্তানিদের নিয়ন্ত্রণে। ১৯ এপ্রিল '৭১ একই গ্রুপের বৈঠকে কিসিঞ্জারের প্রশ্ন রাখেন বগুড়া কি বিদ্রোহীদের হাতে চলে গেছে? জবাবে কুশম্যান বলেন, বিদ্রোহীরা সেখানে আছে। সেনাবাহিনী এখনো সেদিকে যায়নি। তারা কোনো প্রকৃত বাধা ছাড়াই গ্রামের দখল নিচ্ছে। সেখানে কুড়ি থেকে চল্লিশ হাজার বা সম্ভবত তার চেয়ে বেশিসংখ্যক সৈন্য রয়েছে। বাঙালি সৈন্যরা এখনো প্রতিরোধ গড়তে পারছে না।

কিসিঞ্জার : তারা কি হারিয়ে যাচ্ছে বা বিভক্ত হয়ে পড়ছে?

কুশম্যান : তারা বিভক্ত হয়ে পড়ছে। নিজেদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ রক্ষা করতে পারছে না। এমনকি তারা কোনো কার্যকর বাহিনীতেও পরিণত হয়নি। নিজেদের প্রতি তাদের আস্থাও দুর্বল । তারা অসংগঠিত এবং অদৃশ্যবাদী। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তারা সমস্যার কারণ হতে পারে। যদি ভারতের কাছ থেকে তারা সাহায্য পায়। তাহলে তারা সন্ত্রাস ও নাশকতার পথ বেছে নেবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, গোপন তৎপরতায় ভারতীয়রা সম্পৃক্ত। তারা তাদের অস্ত্র, গোলাবারুদ, খাদ্য ও চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করছে। ১৩ এপ্রিলে ঘোষিত বাংলাদেশ সরকার গঠনেও তারা সাহায্য করেছে।

কিসিঞ্জার : পূর্ব পাকিস্তানে আমরা কারো সন্তুষ্টি অর্জনে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছি কি না? যদি সেখানে গেরিলারা কোনো কার্যকর বাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আবার পশ্চিম পাকিস্তান যদি নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারে?

আরউইন : আমাদের মাঝামাঝি অবস্থান নেয়ার এটা একটা ভালো সুযোগ। আমরা নিজেদের জন্য অঙ্গীকারে যেতে পারি না।

কিসিঞ্জার : কিন্তু মাঝামাঝি অবস্থানের অনেক সমস্যাও আছে। এটা পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরক্তির কারণ হতে পারে। পূর্ব পাকিস্তানের কাছ থেকে নির্দিষ্ট কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছাড়াই, আমরা আমাদের সম্পর্ক তাদের কাছে বন্ধক রাখতে পারি না।

তা ছাড়া এটাও ঠিক যে, আমরা কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃত্বকে সংজ্ঞায়িত করতে পারি না। স্টেট ডিপার্টমেন্টের ক্রিস্টোফার ভ্যান হোলেন এ সময়ে উল্লেখ করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা বড় শহরগুলোতে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তারা সীমান্ত শহরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই দুই শহর এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে তারা কখনো কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে কি না? চট্টগ্রামে তারা অস্ত্র খালাস করতে পারে না। কারণ, এই শহরটি তাদের পূর্ণ দখলে নেই। বাঙালিদেরও তারা কোনো কাজে লাগানোর অবস্থানে নেই। প্রশ্ন হলো, ভারত এখনো বসে থাকবে কি না? তারা পূর্ব পাকিস্তানের চরমপন্থিদের নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং

তারা গোপনে আন্তঃসীমান্ত কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে বাসযোগে চলাচলের কোনো উপায় নেই। রেল যোগাযোগও বন্ধ। পূর্ব পাকিস্তানের সরকার কার্যত অচল। কিসিঞ্জার প্রশ্ন রাখেন, এখন আমাদের করণীয় কী হবে, তা নির্ধারণে আমাদের বুঝতে হবে যে, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি বাস্তবে কোন পর্যায়ে? প্রেসিডেন্ট মনে করেন, ইয়াহিয়ার সঙ্গে তার একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং তার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে তিনি খুবই শিথিল মনোভাব দেখাবেন। এ ধরনের শীতলতা হয়তো অতিক্রম করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এই পর্যায়ে তা করা সম্ভব নয়। ২১ এপ্রিল '৭১ পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডের কাছ থেকে ব্যাক চ্যানেল বার্তা পৌঁছায় কিসিঞ্জারের কাছে। এতে উল্লেখ করা হয়, পূর্ব পাকিস্তান একটি গেরিসন স্টেটে পরিণত হতে চলেছে। ভারত পদ্ধতিগতভাবে অনুপ্রবেশ ঘটানো এবং অস্ত্র সহায়তা নিশ্চিত করবে। গেরিলা যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। তবে এর ব্যাপকতা কতটা তা এখন নিরূপণ করা যাচ্ছে না। আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ প্রবক্তারা সব সরকারি ও বেসরকারি ফোরাম ব্যবহার করবে। যদি বাংলাদেশ কখনো বাস্তবতায় পরিণত হয়, তখন তা হবে বিশ্বের অন্যতম নিকৃষ্ট শিরপীড়ার কারণ। তাদের ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক অবকাঠামো থাকবে এবং নিজেদের গড়ে তুলতে তাদের কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ নেই। এটা অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য যে, দেশটি আয়তনে প্রায় লুজিয়ানার মতো। ২০০০ সালে এটির লোকসংখ্যা ২০০ থেকে ২৭৫ মিলিয়নে পৌঁছাবে। ২৮ এপ্রিল, ১৯৭১ কিসিঞ্জার নিক্সনকে জানান, পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানি মিলিটারি ক্র্যাক ডাউনের তিন সপ্তাহ পর পরিস্থিতির তিনটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। ক. পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী দৃশ্যত দৈহিকভাবে প্রধান শহর ও অদূরবর্তী এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। পাক সৈন্যরা প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু তা বড় দুর্বল। গেরিলারা অসংগঠিত এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্রও অপ্রতুল। খ. পাক সেনাদের দৈহিক উপস্থিতি, খাদ্যবন্টন ও স্বাভাবিক অর্থনৈতিক তৎপরতা নিশ্চিত করতে পারবে না। এটা করতে হলে তাদের অবশ্য বাঙালিদের সহযোগিতা পেতে হবে। আর তা এখন প্রায় অনিশ্চিত। গ. নিপীড়নমূলক পদক্ষেপের ফলে যদি সাফল্য আসেও তাহলে তার ওপর ভরসা করা যাবে না। কারণ এটা পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে গণঅসন্তোষ ও ঘৃণা ছড়িয়ে দেবে। কিসিঞ্জার বহিস্থ প্রভাব সম্পর্কে উল্লেখ করেন, ভারতের ভূমিকা হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালিদের ক্ষুদ্র প্রতিরোধ বাহিনীকে তারা ইচ্ছা করলে অস্ত্র প্রশিক্ষণ ও রসদ দিয়ে গেরিলা যুদ্ধের স্থায়িত্বকে বাড়িয়ে দিতে পারে। আমরা যেসব ইঙ্গিত পাচ্ছি তাতে এটা স্পষ্ট যে, ভারত সেদিকেই যাচ্ছে। ভারত একটি বাঙালি সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে ইয়াহিয়ার রাজনৈতিক সমঝোতার পথ রুদ্ধ করে দিতে পারে। পাকিস্তানিদের এ কারণে অধিকতর সতর্ক মনে হচ্ছে।

৪ মে, ১৯৭১

এই তারিখে নির্দিষ্টভাবে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক একটি টেলিগ্রাম যায় ভারতের মার্কিন দূতাবাস থেকে স্টেট ডিপার্টমেন্টে। লক্ষণীয়ভাবে এই টেলিগ্রামের শিরোনাম হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি কথিত ভারতীয় সমর্থন। এতে বলা হয়– ৩ মে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিংয়ের সঙ্গে আমার বৈঠকে আমি তাকে অবহিত করি যে, ডিপ্লোমেটিক কোরের একাধিক সহযোগী জানিয়েছেন যে, তাদের কাছে সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে, ভারতীয় ভূখণ্ডে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। (ফুটনোট : ৩০ এপ্রিল স্টেট ডিপার্টমেন্ট এক টেলিগ্রামে সংবাদপত্রের রিপোর্টের বরাতে উল্লেখ করে, ইঙ্গিত মিলছে যে, ভারত পূর্ব পাকিস্তানে গেরিলা কার্যক্রম চালাতে উদ্বাস্তুদের প্রশিক্ষণদানের পরিকল্পনা করছে। ডিপার্টমেন্ট মনে করে যে, এ ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান উদ্বাস্তুদের জন্য মানবিক সাহায্যের সরবরাহকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে)। আমি তার কাছে ব্যক্তিগতভাবে জানতে চাইলাম, আচ্ছা আপনারা যে বাংলাদেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে সহায়তা দিচ্ছেন, তার যুক্তিটা কী? পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আপনি যেসব তথ্যের ভিত্তিতে এ কথা বলছেন, তা 'নিরঙ্কুশভাবে ভ্রান্ত'। পররাষ্ট্র সচিব কাউল এ সময় ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে ফ্রাঙ্ক মোরাস ও অন্যান্য ব্রিটিশ ও আমেরিকান সাংবাদিকদের পরিবেশিত রিপোর্ট নিয়ে কথা বলেন। তার কথায়, 'উদ্বাস্তুদের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। তারা ক্ষুধার্ত, রুগ্ণ এবং কখনো কখনো প্রায় নগ্ন।' কাউল গুরুত্ব আরোপ করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধের যারা প্রস্তুতি নিচ্ছে, সেসব স্বেচ্ছাসেবীদের বরং তারা প্রতিরোধ করেছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং বলেন, তিনি এটা ভেবে অস্বস্তিবোধ করছেন যে, পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো ভারতের ভূমিকার প্রশ্নে নানা কথা বানিয়ে বলছে। এসব খবরাখবর উপযুক্তভাবে যাচাই করে নেয়া হয়নি। মি. সিং বলেন, 'আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে এ সব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করছি।' তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বলেন, আমি আপনার কাছে একটি বিশেষ অনুরোধ রাখছি যে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে ভারতকে রক্ষণাত্মক অবস্থানে ফেলতে যুক্তরাষ্ট্র যেন শতবার ভাবে।

৮ জুলাই, ১৯৭১

কিসিঞ্জার ইয়াহিয়ার সঙ্গে একান্তে মিলিত হন ইসলামাবাদে। এই সংলাপ রেকর্ড করা হয়নি। পরে কিসিঞ্জার বলেন, 'ইয়াহিয়া এবং তার সহযোগীদের বিশ্বাস ভারত যুদ্ধে জড়াবে না। তবে ইয়াহিয়া স্বীকার করেন যে, যুদ্ধ হলে ভারতই জিতবে। আমি তখন কৌশলে বললাম, ভারত সংখ্যা ও সরঞ্জামে এগিয়ে। তখন তারা অবশ্য ইসলামি জোশের দোহাই দেন। বলেন, ঐতিহাসিকভাবে মুসলিম যোদ্ধাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত।'

মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র দিতে কোসিগিনের আশ্বাস

২১ মে, ১৯৭১

ওয়াশিংটনে হেনরি কিসিঞ্জার বৈঠক করেন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এল কে ঝায়ের সঙ্গে। ঝা আলোচনার শুরুতেই ভারতের উদ্বাস্তু পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, এটা শুধুই অর্থ ও ত্রাণের বিষয় নয়। বড় সমস্যা হলো ভারত এত বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তুকে ধারণ করতে অপারগ। সুতরাং তারা যাতে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যায় তেমন ব্যবস্থা তাকে বের করতেই হবে। ঝা উল্লেখ করেন, উদ্বাস্তুদের একটি বড় সংখ্যাই হিন্দু। তাছাড়া উদ্বাস্তু ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ দানা বাঁধছে। পশ্চিমবঙ্গে এই সমস্যা মারাত্মক রূপ নিয়েছে। তার কথায় পরিস্থিতি 'অত্যন্ত বিস্ফোরনুখ'। ঝা উল্লেখ করেন, প্রেসিডেন্টের কাছে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর লেখা চিঠিতে এসব বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। কিসিঞ্জার এ সময় মন্তব্য করেন, উদ্বাস্তুদের ওপরে আপনি যুদ্ধে যেতে পারেন না। রাষ্ট্রদূত ঝা বলেন, অনেকে চাইবে, উদ্বাস্তুদের সশস্ত্র করে ফেরৎ পাঠানো হোক পূর্ব পাকিস্তনে। অন্যরা চাইছে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করা হোক। কিসিঞ্জার প্রশ্ন রাখেন, আমরা কী করতে পারি? ইয়াহিয়া দাবি করছেন, তিনি একটি রাজনৈতিক সমঝোতা চান। ঝা বলেন, ভারতও কিন্তু এটা দেখতে চাইছে। আমরা নিশ্চিত হতে চাইছি, পরিস্থিতি একটি রাজনৈতিক সমঝোতার দিকে গড়াচ্ছে। কিসিঞ্জার বলেন, 'আমি তা বেশ বুঝতে পারছি।' 'তবে খোলাখুলি আপনাকে অবশ্য একটা কথা বলতে হবে যে, প্রধানমন্ত্রীর চিঠিটি পাঠ করতে কিন্তু আমি সক্ষম হইনি। লেট'স নট প্লে গেমস'। (এ সময় কিসিঞ্জার ইন্দিরা গান্ধীর চিঠিটি খুঁজে নিয়ে দ্রুত তা পাঠ করেন)। কিসিঞ্জার এরপর বলেন, আমরা এটি যত্নের সঙ্গে পাঠ করব। আপনি আবার যখন আসবেন তখন এ নিয়ে কথা হবে। আপনাকে আমি এখন এটুকু বলতে পারি যে, বিষয়টা যেভাবে একেবারে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে তার আমরা নিন্দা জানাই। আমরা বিশ্বাস করি, পূর্ব পাকিস্তনের ঘটনাবলি পর্যায়ক্রমে এবং অতি সতর্কতার সঙ্গে নাড়াছড়া করা উচিত। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিশ্চিত নই যে, 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তন ভারতের স্বার্থ রক্ষা করবে।' রাষ্ট্রদূত ঝা এ সময় ইঙ্গিত দেন, এই দৃষ্টিভঙ্গি তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন। তিনি বলেন, ভারত পাকিস্তনের ভাঙন দেখতে চায়নি। কিন্তু বাস্তবতা এটা যে, পাকিস্তন যে টিকছে ভারত এটাও দেখতে পায়নি। এটাই হলো ঘটনা। আমারা গেরিলা তৎপরতার আশঙ্কা করছি। একই সঙ্গে

পূর্ব পাকিস্তনে চীনা সম্পৃক্ততার প্রশ্নটিও আমাদের বিবেচনায় রয়েছে। আমাদের মতে চীনা সম্পৃক্ততার জন্য এটাই প্রকৃষ্ট সময়।

২২ মে, ১৯৭১

করাচির কন্স্যুলেট জেনারেল স্টেট ডিপার্টমেন্টে একটি টেলিগ্রাম প্রেরণ করে। এতে উল্লেখ করা হয়, 'আমি করাচিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আজ দেড় ঘণ্টার এক বৈঠকে মিলিত হয়েছি। আমি এ সময় ভারতে উদ্বাস্তু পরিস্থিতি এবং সে সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উদ্বেগের কথা তাকে অবহিত করছি। জবাবে ইয়াহিয়া বলেন, তিনি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু তার যুক্তি হচ্ছে, ভারত আড়াই মিলিয়ন পূর্ব পাকিস্তনি উদ্বাস্তুর যে পরিসংখ্যান দিচ্ছে তা ঠিক নয়। পাকিস্তন সরকার অবশ্য এটা জানে যে, উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করেছে। ইয়াহিয়া বলেন, গত তিন অথবা চার বছরের ব্যবধানে আনুমানিক দেড় মিলিয়ন 'উদ্বাস্তু' পূর্ব পাকিস্তনে অনুপ্রবেশ করেছে। এদের এই যাতায়াত ভারত কখনো স্বীকার করেনি। এবং এমনকি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এ নিয়ে আক্ষেপ করেনি। বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে ভারতের মদদ দান এবং সশস্ত্র জঙ্গিদের পূর্ব পাকিস্তনের অব্যাহত অনুপ্রবেশ নিয়ে পাকিস্তনের অভিযোগ তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন। আমি তাকে বললাম, আপনাদের অবস্থানের কথা আমরা জানি। কিন্তু উদ্বাস্তুদের স্রোত অবশ্য রোধ করতে হবে। তিনি ইঙ্গিত দেন যে, আমার বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে; এবং উল্লেখ করেন, একটি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য তিনি আন্তরিক পদক্ষেপ নেবেন। ইয়াহিয়া আশা প্রকাশ করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে সংযত থাকতে তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। কারণ তারা ভারতীয় ও বাঙালি অনুপ্রবেশকারীদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ দিচ্ছে। ভারতের সীমান্তের কাছাকাছি এলাকায় তারা তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে এসবই প্রতিবন্ধক।

২৫ মে, ১৯৭১

ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠকের জন্য প্রস্তুত স্মারকে উল্লেখ করা হয়, এমন খবর পাওয়া গেছে যে, ইন্দিরা গান্ধী তার সেনাবাহিনীকে পূর্ব পাকিস্তন দ্রুত দখল করে নিতে একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছে। এর সামরিক কৌশলটা হবে 'ইসরায়েলি টাইপ লাইটেনিং প্রাস্ট'। ভারত বাঙালি গেরিলাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সাহায্য দিচ্ছে। কিছু ভারতীয় ও আধা সামরিক সৈন্য পূর্ব পাকিস্তনে গিয়ে সম্ভবত সীমিত আকারের অপারেশনও পরিচালনা করছে।

২৬ মে, ১৯৭১

পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স নিক্সনের কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেন, তিনটি বিষয়

যুদ্ধের বিপদ সৃষ্টি করেছে– অব্যাহত সামরিক নিপীড়ন, পূর্ব পাকিস্তনে রাজনৈতিক সমঝোতার ঘাটতি ও অর্থনৈতিক দুর্যোগ, ভারতে উদ্বাস্তুদের বিরাট স্রোত (ভারতীয়দের হিসাব অনুযায়ী উদ্বাস্তুদের সংখ্যা এখন ৩০ লাখের বেশি) এবং ভারত কর্তৃক বাঙালি গেরিলাদের আন্তঃসীমান্ত সমর্থন।

৯ জুন, ১৯৭১

ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরউইন নিক্সনকে এক স্মারকে পাকিস্তনের অর্থনৈতিক সহায়তার পরিপ্রেক্ষিত অবহিত করেন। এতে তিনি উল্লেখ করেন, পূর্ব পাকিস্তনে গেরিলাদের প্রতিরোধ কার্যক্রম ক্রমেই কার্যকর ও সংগঠিত হয়ে উঠছে। গেরিলারা পরিবহন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে দিয়েছে এবং সামরিক আইন প্রশাসনকে যারা সহায়তা দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে।

২৬ জুন, ১৯৭১

ভারতের মার্কিন দূতাবাসে স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক টেলিগ্রামে বলা হয়, ২৪ জুন ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে প্রিন্স সদরুদ্দিন আগাখানের আলোচনা হয়েছে। সদরুদ্দিন ছিলেন জাতিসংঘের উদ্বাস্তু-বিষয়ক হাইকমিশনার। তিনি ওই বৈঠকে জাতিসংঘের উদ্বাস্তু হাইকমিশন ইউএনএইচসিআর এর পূর্বপাকিস্তন ও ভারতে কার্যক্রম শুরু সম্পর্কে তার প্রচেষ্টার বিবরণ দেন। তিনি বলেন, পাকিস্তন সরকার ঢাকায় তার উপস্থিতির প্রস্তব মেনে নিয়েছে। এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে, উদ্বাস্তুদের জন্য অভ্যর্থনা কেন্দ্র খুলতে তিনি পাকিস্তানকে রাজি করাতে পারবেন। কিন্তু ভারত সরকার নির্দিষ্টভাবে পূর্বপাকিস্তানে উদ্বাস্তু হাইকমিশনের উপস্থিতি প্রত্যাখ্যান করেছে। ভারত বলেছে, নয়াদিল্লির বাইরে উদ্বাস্তু হাইকমিশনের উপস্থিতি তারা মানতে নারাজ। সদরুদ্দিন ভারতীয় নীতির সমালোচনায় মুখর। তার যুক্তি, ভারত আন্ত ঃসীমান্ত অনুপ্রবেশ যাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে প্রকাশ না পায় সেজন্যই তারা রাখঢাক নীতি অনুসরণ করছে। তিনি একই সঙ্গে জাতিসংঘের সম্ভাব্য কার্যক্রমে সোভিয়েত আপত্তি সম্পর্কেও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। স্টেট ডিপার্টমেন্ট অবশ্য সদরুদ্দিনকে বলে দিয়েছে তিনি যেন তার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। সদরুদ্দিন তার আলোচনাকালে মত প্রকাশ করেন যে, পূর্বপাকিস্তান সংকটের সমাধান না হলে দক্ষিণ এশিয়ায় এক নতুন ভিয়েতনামের জন্ম হতে পারে। বাঙালি ও পাঞ্জাবিদের মধ্যে মেরুকরণ চলছে। তাদের পরস্পরের প্রতি কোনো সহানুভূতি নেই। পূর্বপাকিস্তানের চরমপন্থি বিশেষ করে নকশালীরা তাদের নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করতে 'বিদেশী সেনাবাহিনীর' ভীতিকে কাজে লাগাচ্ছে। এর পরিণতিতে গেরিলাযুদ্ধ প্রলম্বিত হতে পারে। সদরউদ্দিন ব্যাখ্যা করেন, ভারত এ বিষয়টি নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন। সে কারণেই ভারতের 'ইনার কেবিনেট' সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, তারা বাংলাদেশকে

স্বীকৃতি দেবে না। পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও যুদ্ধে যাবে না। কিন্তু 'মুক্তিফৌজের' প্রতি সব রকম সমর্থন দিয়ে যাবে। আর সে কারণে ভারত পূর্বপাকিস্তান সীমান্তে জাতিসংঘের উপস্থিতি চায় না। তারা উদ্বাস্তুদের জন্য বিদেশী ত্রাণ ঠিকই চায়, কিন্তু বিদেশীরা সীমান্তে ঘুরে বেড়াক তা তারা দেখতে নারাজ।

৯ জুলাই, ১৯৭১

প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা-বিষয়ক উপসহকারী জেনারেল হেগ নিক্সনকে অবহিত করেন, 'আপনি জানেন যে, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং ওয়াশিংটন আসার পথে মস্কো সফর করেছেন। এ সময় সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত তার বৈঠকে বাঙালি গেরিলাদের অস্ত্র সহায়তা দেয়া নিয়ে কথা হয়। এ সময় কোসিগিন ভারত সমর্থিত গেরিলাদের ক্ষুদ্র অস্ত্র (স্মল আর্মস) সরবরাহের প্রস্তাবে রাজি হন। প্রশ্ন হলো কোসিগিন-শরণ সিং গোপন আলোচনার বিষয় কোন সূত্রে যুক্তরাষ্ট্র জানতে পেরেছিল? সদ্য অবমুক্ত মার্কিন দলিল থেকে এ প্রশ্নের জবাব মেলেনি। কারণ এই রিপোর্টের সোর্স বা উৎস ডিক্লাসিফাই বা অবমুক্ত করা হয়নি। তবে এই সারসংক্ষেপ থেকে ধারণা করা চলে যে, ১৯৭১ এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সোভিয়েত অস্ত্র সহায়তা ও সম্ভাব্য চীনা আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতেই ১৯৭১ সালের ৯ আগস্টে সম্পাদিত হয়েছিল সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী চুক্তি। এই দলিলে দেখা যাচ্ছে, শরণ সিং পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় হস্তক্ষেপ সম্ভাবনা নস্যাৎ করতে সম্ভাব্য চীনা হুমকি মোকাবেলায় সোভিয়েতের কাছে সামরিক সুরক্ষা দেয়ার অনুরোধ জানায়। কোসিগিন এই প্রস্তাবে ইতিবাচক মনোভাব দেখান। কিন্তু কথিত মতে তিনি শর্ত আরোপ করেন যে, এজন্য মিসেস গান্ধীর কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধপত্রের প্রয়োজন হবে। নিক্সন মুক্তিযোদ্ধাদের সোভিয়েত অস্ত্র সরবরাহের স্থানে কলম দিয়ে দাগ কাটেন এবং মন্তব্য জুড়ে দেন যে, 'কিসিঞ্জার, এটা যদি সত্য হয়, কিটিংকে (ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত) নির্দেশ দিন এ ব্যাপারে দিল্লির কাছে শক্ত প্রতিবাদ জানাতে। তবে প্রথমে এটা ঘরোয়াভাবে উল্লেখ করতে হবে।

ভারতের কোনো মাস্টার প্লান ছিল না : কিসিঞ্জার

২৩ জুলাই, ১৯৭১

ওয়াশিংটনে সিনিয়র রিভিউ গ্রুপের বৈঠকে স্টেট ডিপার্টমেন্টে যোশেফ সিসকো বলেন, যুদ্ধ প্রতিরোধ করতে পারা আমাদের স্বার্থের অনুকূল। তবে আমরা যদি ধরে নিই যে, ভারতীয়দের অবস্থান বদলাতে একমাত্র উপায় হচ্ছে লাঠি নিয়ে দাঁবড়ানো, তাহলে তো মুশকিল। আমি ভারতীয়দের মনস্তত্ত্ব বুঝতে পারি না। ভারতীয়দের এই ধারণা দিতে হবে যে, আমরা তাদের সাহায্যে আসতে পারি এমন কিছু একটা করছি। কিসিঞ্জার বলেন, আমি আপনার সঙ্গে একমত। সেজন্য আমাদের প্রস্তুতিও রয়েছে। কিন্তু ভারতীয়দের অবশ্যই কোনো ভ্রান্ত ভীতির মধ্যে থাকা উচিত নয়। উদ্বাস্তু সমস্যার নিরসনে আমাদের পক্ষে সম্ভব আমরা সবকিছুই করতে চাই। কিন্তু ভারতকেও বুঝতে হবে যে, তারা কোনো হঠকারী পদক্ষেপ নিলে তার পরিণতি কি দাঁড়াতে পারে। আরউইন বলেন, পরিস্থিতির বিচারে এ কথাটাই মুখ্য। ভারত আমাদের সন্দেহ করছে। তাদের ধারণা আমরা পাকিস্তানপন্থি। তারা চাপের বিষয়টি নিশ্চয় বুঝবে। যদি তারা বিশ্বাস করে যে, আমরা সাহায্যের জন্য সত্যিই আন্তরিক। কিন্তু সে ধরনের চাপ কোনো কাজে দেবে না। আমাদের এটা দেখাতে হবে যে, পাকিস্তান এমন ব্যবস্থা নিচ্ছে যার ফলে উদ্বাস্তুদের স্রোত মন্থর অথবা বন্ধ হয়। পূর্ব পাকিস্তানে উদ্বাস্তুরা ফিরতে আগ্রহী এমন একটা পরিবেশ দরকার। অন্যথায় রাজনৈতিক সমঝোতার ক্ষেত্রে একটা অগ্রগতি বাঞ্ছনীয়। কিসিঞ্জার এ কথায় সায় দিয়ে বলেন, উদ্বাস্তুদের প্রবাহ বন্ধ করতে আমাদের সর্বাত্মক পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। ভারত তো নিশ্চয়ই আর উদ্বাস্তু উৎপাদন করছে না। করছে কি? অথবা ফিরে যেতে নিরুৎসাহিত করছে? সিসকো বলেন, উভয় পক্ষ থেকেই একযোগে পদক্ষেপ নিতে হবে। পাকিস্তানের দিক থেকে রাজনৈতিক সমঝোতাই হলো সমস্যার শেকড়। তবে ইয়াহিয়ার দিকটাও ভাবতে হবে। তারও কিন্তু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ২৮ জুনের বক্তৃতায় ইয়াহিয়া চার মাস সময়ের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতা হস্তান্তরের অঙ্গীকার করেছেন। আমার বিবেচনায় এত দূরেই কেবল তিনি যেতে পারেন। আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, সত্যিকারের অগ্রগতি ততক্ষণ নিশ্চিত করা যাবে না, যদি না রাজনৈতিক ক্ষমতা নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের কাছে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব না হয়। ২৮ জুনের বক্তৃতা একধাপ অগ্রগতি বটে। কিন্তু রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য

তা যথেষ্ট নয়। আমাদের অবশ্যই আরো পদক্ষেপ নিতে ইয়াহিয়াকে উৎসাহ দিতে হবে। জাতিসংঘের উপস্থিতি মেনে নিতে ইয়াহিয়া খুবই ভালো মনোভাব দেখিয়েছেন। তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন এবং উদ্বাস্তুদের নিজ গ্রামে ফিরতে আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু তিনি সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে পদক্ষেপ নেননি। তবে এর প্রাথমিক কারণ হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে যেসব ঘটনা ঘটছে তা সামলাতে সেনাদের দরকার। ভারত এখনো স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন দিয়ে চলেছে। তারা সীমান্ত অতিক্রম করতেও সহায়তা দিচ্ছে। এখন আমরা যদি ইয়াহিয়কে তার সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে বলি তবে তার কিন্তু কোনো মানে থাকবে না। মুদ্রার অপর পিঠ হচ্ছে আমরা ভারতকে উদ্বাস্তুদের জন্য সহায়তা হিসেবে ৫০ মিলিয়ন ডলার দিয়েছি। কিন্তু সীমান্তে ভারতীয় দিকে জাতিসংঘের উপস্থিতি মেনে নিতে জাতিসংঘ মহাসচিব ইউ থান্টের অনুরোধ তারা প্রত্যাখ্যান করে চলেছে। এ পর্যায়ে কিসিঞ্জার মন্তব্য করেন, ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আমাকে বলেছেন, জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক নিয়োগের যে প্রস্তাব দিয়েছে তাকে তারা অবক্ষুসুলভ হিসেবে গণ্য করছে। সিসকো বলেন, আমি এ ব্যাপারে একমত যে, উভয়ের পাশে যাতে পর্যবেক্ষক নিয়োগ হয় তার প্রতি সমর্থন দিয়ে যাওয়া। ভারত উদ্বাস্তু প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে কতিপয় রাজনৈতিক সমঝোতাকে যুক্ত করছে। আমাদের আসলে এখন উচিত হবে রাশানদের সঙ্গে এই ইস্যুতে যোগাযোগ স্থাপন করা। আমাদের এখানে একটা অভিন্ন স্বার্থ রয়েছে যে, পরিস্থিতির বিস্ফোরণ ঘটবে না। আরউইন পরামর্শ দেন যে, ভারতকে আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর করাতে হলে এই মুহূর্তে জাতিসংঘের উপস্থিতি পাকিস্তানের সীমান্তে নিশ্চিত করা সহায়ক হবে। কারণ, জাতিসংঘ যদি তার অবস্থান নেয়ার পরে দেখাতে পারে যে, উদ্বাস্তুদের প্রবাহের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে তাহলে এই যুক্তি দাঁড় করানো সম্ভব হবে, এখন তা হলে ভারতীয় পক্ষে জাতিসংঘের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হোক। আমরা উদ্বাস্তুদের ফেরত পাঠাতে ভারতকে অব্যাহতভাবে উৎসাহ যুগিয়ে যাব। কিন্তু ব্যাপকভিত্তিক চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব না হলে আমরা তাতে সফল হবো না। সুতরাং আর দেরি না করে জাতিসংঘের উপস্থিতি পাকিস্তানের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কিসিঞ্জার বলেন, ইয়াহিয়া কিন্তু জাতিসংঘের উপস্থিতি ভারতের মেনে নেয়ার শর্তে মেনে নেননি। তিনি মেনেছেন, নিঃশর্তে। তবে এটা ঠিক যে, এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই যে, এই ইস্যুতে ভারতের ব্যাপক আবেগ ও স্পর্শকাতরতা রয়েছে। আমার নিজের ধারণা হচ্ছে, ভারতীয়দের একটি প্রবণতা হচ্ছে হিস্ট্রিরিয়া তৈরি করা। কিন্তু এ থেকে প্রয়োজনে কিভাবে পালাতে হবে তা তাদের জানা নেই। তারা একটি বড় ধরনের সংঘাত বয়ে আনতে পারে এবং আমার এই বিশ্বাস নেই এই পটভূমিতে চীন আসবে না। সিসকো উল্লেখ করেন, ভারতের মনস্তত্ত্ব হচ্ছে তারা খুব নির্দিষ্টভাবে নিজেদের একটি অবস্থানে দাঁড় করাতে চায়। যেক্ষেত্রে একমাত্র বিকল্প দাঁড়ায় শক্তির প্রয়োগ। ভারতের এই মনোভাব

বিবেচনায় রেখে ভারত নিজের ফাঁদে আটকে না পড়া পর্যন্ত পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রাখতে পারি। কিসিঞ্জার বলেন, ভারতীয়রা ভালোই জানে আমরা যে অস্ত্র পাকিস্তানকে দিচ্ছি তা সংখ্যায় বড়ই অল্প। তারা জানে, অন্য যে কোনো জাতির তুলনায় তারাই অধিকতর মার্কিন সাহায্য পেয়েছে। কিন্তু আমি যখন ভারত সফর করছিলাম তখন তাদের সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল মারমুখী। অথচ তারা প্রেসকে শান্ত করতে কোনো উদ্যোগই নেয়নি। আমি এটা ভেবে অবাক হচ্ছি যে, এটা কি পরিস্থিতির ফল, না ইচ্ছা করে সৃষ্টি করা হয়েছে? আমরা যদি ধরে নিই যে, ভারতীয় সংক্ষুব্ধতার পেছনে বড় কারণ হচ্ছে মানবিক দুর্ভোগ (যদিও মানবিক দুর্ভোগের প্রতি ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আমার নিজস্ব মূল্যায়ন রয়েছে), তারা যদি পূর্ব পাকিস্তানকে ধরাশায়ী করতে চায়, তাহলে সেটা এক বিরাট বিপর্যয় ডেকে আনবে। পশ্চিম পাকিস্তানে যে মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হবে তা অকল্পনীয়। আমি মনে করি না যে, ভারতের কোনো মাস্টার প্ল্যান রয়েছে। কিন্তু তারা একটি বড় সংকটে নিজেদের নিপতিত করতে পারে।

কিন্তু পরিস্থিতিকে তারা একটি বড় সংকটের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

আরউইন : পাকিস্তানকে অস্ত্র সহায়তা দেয়ার ব্যাপারে আমরা কিন্তু ভারতের কাছে নিজেদের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পারি। তাকে আমরা সঠিক তথ্য দিতে পারি, তাহলে তিনি বুঝবেন সাহায্যের পরিমাণ সত্যি কত কম।

কিসিঞ্জার : আমি কিন্তু তা তাকে বলেছি। আপনার পরামর্শের প্রতি আমার কোনো নির্দিষ্ট মত নেই। তবে এটুকু বুঝি আমাদেরকে অবশ্যই অতিরিক্ত পুনঃনিশ্চয়তা এবং অতিরিক্ত ভয় পাইয়ে দেয়ার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হবে।

আরউইন : ঝা বলেছেন, আমরা তাদের অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করছি। কিন্তু কখনো রাজনৈতিকভাবে নয়। তারা সত্যিই ভগ্নমনস্ক। আমরা তাদের জন্য যা করেছি তা তারা স্বীকার করে; কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের প্রতি অবিশ্বস্ত। অবশ্যই তারা কখনোই রাজনৈতিকভাবে আমাদের সঙ্গে ছিল না।

সিসকো : যখন অনেক আমেরিকান ভারত নিয়ে ভেবেছে তখন তারা ব্যস্ত থেকেছে কৃষ্ণ মেননকে নিয়ে এবং তা কিন্তু ভ্রান্ত ভাবমূর্তি নয়।

কিসিঞ্জার : পাকিস্তানের কথা বলতে গেলে আমি বলব যে, আইকিউ বিষয়ে যদি পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয় তবে ইয়াহিয়া এবং তার সহযোগীরা কখনোই পাবেন না। তারা অনুগত, খোলা মনের সৈন্য কিন্তু একটা বিষয় বুঝতে প্রকৃতপক্ষেই তারা বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যায় ভুগছে। আর তা হলো, কেন পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের অংশ হওয়া উচিত নয়। বর্তমান কাঠামোর কাছ থেকে আওয়ামী লীগের প্রতি কখনোই গ্রহণযোগ্যতা মিলবে না। ভারত যদি আক্রমণ করে তাহলে তা আগামী ছয় মাসের মধ্যে ঘটবে। আর পাকিস্তানিরাও আগামী ছয় মাসের মধ্যে আওয়ামী

লীগকে পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতায় বসাবে না। এটা এখন অবশ্যম্ভাবী যে, যে কোনো রাজনৈতিক প্রক্রিক্রয়ার নিষ্পত্তি ঘটবে পূর্ব বাংলার জন্য কিছু স্বায়ত্তশাসন অর্জনের মধ্য দিয়ে। আমরা কি এমন একটি কর্মসূচি পেতে পারি? যেখানে উদ্বাস্তু ইস্যুকে রাজনৈতিক সমঝোতার প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হবে? পাকিস্তানিরা এরকম একটা কিছু তাদের জন্য ভাবতে সক্ষম নয়। তাদের সেই রাজনৈতিক দূরদর্শিতা নেই।

হেলমস (সিআইএ'র পরিচালক) : আমি একমত যে ইয়াহিয়া কোনো রাজনৈতিক সমাধান দেখছেন না।

সিসকো : ভারতীয়রা যদি এই সিদ্ধান্তে পৌছায় যে, আর কোনো সমঝোতার আশা নেই তা হলে তাদের মধ্যে হতাশা জন্ম নেবে। আর তা তাদেরকে কালক্রমে অযৌক্তিক পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত করবে।

কিসিঞ্জার : ভারতীয়দের এই অধিকার রয়েছে যে, তারা তাদের ভূখণ্ড থেকে উদ্বাস্তুদের সরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তাদের এই অধিকার নেই যে, কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ফর্মূলায় সংকটের সমাধানে চাপ সৃষ্টি করা।

আরউইন : আমি জানি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা আপনাকে বলেছেন, তারা কোনো ফর্মুলা চাপিয়ে দেবে না। কিন্তু ঝা চাপ দিচ্ছেন যে, আওয়ামী লীগকে যাতে পুনর্জীবিত করা হয়।

কিসিঞ্জার : সে কথা সত্য। আবার একই সঙ্গে তারা একটি স্বাধীনতার আন্দোলনকেও সমর্থন দিচ্ছে এবং বলছে আওয়ামী লীগকে ফিরে আসতেই হবে। এখন আমরা যদি এমন একটা কর্মপরিকল্পনা নিতে পারি যাতে উদ্বাস্তুরা ফিরে আসতে শুরু করে, তাহলে ইয়াহিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করার একটা সুযোগ কিন্তু আমরা পেয়ে যাব। তিনি উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে বেশ ভালোই অবস্থান নিয়েছেন।

আরউইন : তিনি যা মুখে বলছেন, তা উত্তম বটে, কিন্তু আমরা কিছু (এক লাইনের চেয়েও কম সোর্স টেক্সট অবমুক্ত করা হলো না) ইঙ্গিত পেয়েছি যে, এটা শুধুই একটা ফ্রন্ট। (সিআইএ পরিচালকের দিকে তাকিয়ে) আচ্ছা আপনিই বলুন, ইয়াহিয়া কি সত্যিই চান, বিপুলসংখ্যক হিন্দু উদ্বাস্তু প্রত্যাবর্তন করুক?

হেলমস : নির্দিষ্ট করে আমরা এটা বলতে পারি না।

পাকিস্তানিরা গর্দভ, ভারতীয়রা ধূর্ত : নিক্সন

২৩ জুলাই, ১৯৭১

সিসকো : আমরা যে করেই হোক আওয়ামী লীগের প্রতি ঝুঁকতে ইয়াহিয়াকে রাজি করাব।

হেলমস : কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা যতক্ষণ গুলি চালাতে থাকবে, ততক্ষণ কিন্তু এসবে কাজ হবে না।

আরউইন : আওয়ামী লীগারদের কেউ কি পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করেছেন? যার সঙ্গে ইয়াহিয়া কথা বলতে পারেন!

কিসিঞ্জার : ইয়াহিয়ার দাবি ১৬৭ জন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যের মধ্যে ৪৫ থেকে ৬০ জনকে তিনি তার দলে পাবেন।

ভ্যানহোলেন : এই অনুমান সত্যি খুব বাড়াবাড়ি।

আরউইন : এটা কাজে আসতে পারে, তবে তিনি যদি তেমনি কিছু আওয়ামী লীগারকে খুঁজে পান, অখণ্ড পাকিস্তানের প্রতি যাদের কিছু আনুগত্য এখনো অবশিষ্ট রয়েছে।

কিসিঞ্জার : ইয়াহিয়া বলছেন, তিনি এমন ৪৫ থেকে ৬০ জনকে পাবেন। অবশিষ্ট আসনগুলোতে তিনি দিতে চান নির্বাচন। আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি, ১৬৯ সদস্যের এসেম্বলির ১৬৭ জনকেই তিনি দাঁড়াতে দিলেন না। অথবা আমরা তাকে এমন কিছু ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলতে পারি, যা তার পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব হবে না। আমি সেনাবাহিনীর প্রধানের সঙ্গে কথা বলে দেখলাম তিনি ইয়াহিয়ার চেয়েও কট্টরপন্থি।

সিসকো : আমি একমত যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইয়াহিয়ার পূর্ণ ক্ষমতা নেই।

কিসিঞ্জার : আমি বিশেষজ্ঞ নই, কিন্তু আমি মনে করি, পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের দিকেই গড়াতে পারে। ভারত উদ্বাস্তুদের ফেরত পাঠানো এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবহারের অজুহাত হিসেবে তাদের ব্যবহার করার সুযোগ কাজে লাগানোর প্রশ্নে সন্দেহের দোলাচলে দুলছে। পাকিস্তান উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে আনতে খুবই নমনীয়, কিন্তু আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রশ্নে তারা বড়ই অনমনীয়।

উইলিয়ামস : আমি মনে করি, এটা বড়ই নিরঙ্কুশ একটা অবস্থা। আমি মনে করি না যে, রাজনৈতিক সমঝোতা প্রশ্নে কিছু অগ্রগতি ছাড়া উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে আনা সম্ভব

হবে। ইয়াহিয়াও মুজিবের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রথম সুযোগেই পরিহার করতে পারবেন।

হেলমস : কিন্তু সর্বাগ্রে দরকার ভারতকে পূর্ব পাকিস্তান বিষয়ক তৎপরতা থেকে নিবৃত্ত করা।

উইলিয়ামস : যখন দুর্বৃত্ত অবস্থা বৃদ্ধি পাবে তখন উদ্বাস্তুর সংখ্যাও বাড়বে।

কিসিঞ্জার : হেলমসের কথাটাই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ, ভারতীয়রা যদি সত্যি আন্তরিক হয়, তাহলে উচিত হবে মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থন দেয়া থেকে বিরত থাকা।

আরউইন : ঝাঁয়ের বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, সার্বিক লড়াই থেকে গেছে, কিন্তু উদ্বাস্তু আগমন অব্যাহত রয়েছে। তার দাবি, পাকিস্তান পরিকল্পিতভাবে এমন অবস্থা সৃষ্টি করছে, যার ফলে উদ্বাস্তুরা দলে দলে আসছে। এটা যদি বন্ধ না হয়, তাহলে গেরিলাদের সাহায্যদান ছাড়া ভারতের পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং উদ্বাস্তু স্রোত বন্ধ করাই বড় কথা। এর লাগাম টেনে ধরতে পারলে ভারতীয়দের পক্ষে অজুহাত দেয়া সম্ভব হবে না। এটা সত্যি একটা মুরগি ও আণ্ডা পরিস্থিতি।

সিসকো : এটা হলো গোড়ার দিনগুলোতে পাকিস্তানিদের শক্তি প্রয়োগের ফল। একই সঙ্গে অব্যাহত গেরিলা তৎপরতা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার পরিণতি। ভারত যখন সীমান্তে প্রশিক্ষণ শিবির খুলেছে, তখন আমরা ইয়াহিয়াকে তার সৈন্যবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে বলতে পারি না। ভারত সত্যিই আন্তঃসীমান্ত অনুপ্রবেশ এবং স্বাধীনতার আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন দিচ্ছে।

হেলমস : (সিসকোর প্রতি) আপনি একটি সম্ভাব্য রুশ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। আমি কখনো রাশানদের সঙ্গে নিজেদের জড়ানো পছন্দ করি না। তবে তাসখন্দে তারা একটা ভালো কাজ করেছে।

সিসকো : জাতিসংঘে উপস্থিতির প্রশ্নে আমরা স্বাভাবিকভাবেই নিরাপত্তা পরিষদের সব সদস্যের সমর্থন আশা করব। রাশিয়া অবশ্যই ভারতীয়দের প্রভাবিত করতে পারে। আমরা সত্যি রাশানদের দূরে সরিয়ে রেখে আরেকটি ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু সঙ্কট পরিচালনা করতে পারি না। আমাদের তাদের দরকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয়ভাবেই। ভারত যদি জাতিসংঘের সীমিত উপস্থিতি ও বিরোধিতা করে তাহলে রাজনৈতিক সমস্যা সব ক্ষেত্রেই ছড়িয়ে পড়বে। ইয়াহিয়া বলেছেন, তিনি চার মাসের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। তিনি কি এটা দুমাসের মধ্যে নিশ্চিত করতে পারেন? তারা কি আওয়ামী লীগারদের ফিরিয়ে আনতে এখনই উদ্যোগ নিতে পারেন না?

উইলিয়ামস : পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যতক্ষণ যুদ্ধ করছে, দেশ শাসন করছে, ততক্ষণ তাদের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে বেসামরিক প্রশাসন থেকে সেনা সম্পৃক্ততা একেবারেই ঘুচিয়ে দেয়া।

৬ আগস্ট, ১৯৭১

স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে ভারতের মার্কিন দূতাবাসে একটি টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স। তিনি বলেন, আমি সরকারি এবং গোয়েন্দা সূত্রে অব্যাহতভাবে এই ইঙ্গিত পাচ্ছি যে, ভারত ও পাকিস্তানের সরকার উভয়ই ভাবতে শুরু করেছে, যুদ্ধ সম্ভবত অবশ্যম্ভাবী এবং এটা তারা ধরে নিয়েই কার্যক্রম শুরু করেছে। উভয় দেশের বিমান সেনারা সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জানানো হয়েছে যে, ১৫ আগস্টের পরে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য তারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপস্থিতির ওপর নির্ভরশীল নাও থাকতে পারে। বাংলাদেশের গেরিলারা আশাবাদী হয়ে উঠেছে যে, তারা সেপ্টেম্বরে বড় ধরনের আক্রমণ পরিচালনায় সক্ষম হবে। ভারতীয় ও পাকিস্তানিরা আন্তঃসীমান্ত বোমাবর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। ইতোমধ্যে মুক্তিযোদ্ধারাও তৎপরতা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আগে তারা লিপ্ত ছিল শুধু নাশকতামূলক তৎপরতায়। এখন তারা পশ্চিম পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর সরাসরি হামলা চালাচ্ছে। ভারত জাতিসংঘের উপস্থিতি প্রত্যাখ্যান করায় অনুমান করা চলে এই এলাকার তৎপরতার জন্যই তাদের এত সংবেদনশীলতা। এই পটভূমিতে আপনি ভারত সরকারকে জানিয়ে দেবেন যে যুক্তরাষ্ট্র আশা করে তারা যেন সংযম প্রদর্শন করে এবং বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তারা যাতে প্রভাব খাটায়; কারণ মুক্তিযোদ্ধারা যেভাবে আক্রমণ তীব্র করছে তাতে দুদেশের মধ্যে যুদ্ধ সহসাই এসে পড়তে পারে দোরগোড়ায়। আমরা ভারত সরকারের কাছে আশা করি, তারা যেন প্রকাশ্যে উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা-বিবৃতি দেয়া থেকে বিরত থাকে। একই সঙ্গে তারা যেন এমনভাবে সেনা মোতায়েন না করে যা উস্কানিমূলক বলেই প্রতীয়মান হতে পারে। আপনি পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানাতে পারেন। ইসলামাবাদকে আমরা সংযত হতে বলেছি।

১০ আগস্ট, ১৯৭১

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স একদিন দুদফা বৈঠক করেন জাতিসংঘ মহাসচিব ইউফান্টের সঙ্গে। জাতিসংঘ মহাসচিব এ মর্মে উদ্যোগ প্রকাশ করেন যে, গেরিলা নেতৃবৃন্দ জাতিসংঘ কর্মীদের যে কোনো উপস্থিতির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে। তাদের শর্ত হচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তানে একমাত্র সমাধান হচ্ছে আওয়ামী লীগের সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছাতে হবে। ফান্ট উল্লেখ করেন, শান্তির প্রতীক মারাত্মক হুমকির বিবেচনায় তিনি জাতিসংঘ সনদের ৯৯ অনুচ্ছেদ ব্যবহার করতে পারেন। এর মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তানের সমস্যার দিকে নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব। এ সপ্তাহে তিনি ঘোষণা করবেন সম্ভবত বুধবারেও হতে পারে। তিনি অবশ্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, ঢাকায় সেপ্টেম্বরের গোড়ায় ৩৮ জন জাতিসংঘ কর্মকর্তা অবস্থান নেবেন। তারা ত্রাণ তৎপরতাকে ত্বরান্বিত করবেন। তার কর্মসূচির মধ্যে এটা বিবেচনাধীন যে, পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য অংশে প্রায় দেড়শ' অতিরিক্ত

কর্মী প্রেরণ করবেন। রজার্স নিক্সনকে লেখার এক স্মারকে এই বিবরণ দিয়ে এ কথা উল্লেখ করেন যে, নিরাপত্তা পরিষদে প্রয়োজনে তিনি ভারত-পাকিস্তানের বিষয়টি তুলবেন। ফান্টকে খুবই আন্তরিক মনে হয়েছে। তিনি তার ভালো স্বাস্থ্যের কথাও উল্লেখ করেন। এ থেকে আমরা ধারণা করতে পারি যে, তিনি জাতিসংঘের মহাসচিব পদে পুনঃবহাল থাকতে দারুণ আগ্রহী।

১১ আগস্ট, ১৯৭১

ওয়াশিংটনে সিনিয়র রিভিউ গ্রুপের বৈঠকে কিসিঞ্জার বলেন, প্রেসিডেন্ট নিক্সন ভারতের কাছে এটা স্পষ্ট করেছেন যে, যদি দুই ডিভিশন পাকিস্তানি গেরিলা (মুক্তিযোদ্ধা) সীমান্ত অতিক্রম করে তাহলে আমাদের সম্পর্ক নিরঙ্কুশ সংকটে পড়বে। সিসকো বলেন, আমি এটুকু নিশ্চিত যে, কোনো আনুষ্ঠানিক ভারতীয় আক্রমণ ঘটবে না। কিন্তু তারা সম্ভবত সীমান্ত অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে তাদের সমর্থন অব্যাহত রাখবে। এটা আমাদের মস্কোর সঙ্গে সম্পাদিত দিল্লির নতুন চুক্তির আলোকে যত্নের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হবে।

একই দিনে সিনিয়র রিভিউ গ্রুপের আরেকটি বৈঠক হয় নিক্সনের উপস্থিতিতে। কিসিঞ্জার বলেন, প্রেসিডেন্ট আশা প্রকাশ করেছেন যে, এই বৈঠকে সংশ্লিষ্ট সবাই অংশ নেবেন। নিক্সন বৈঠকের শুরুতেই উল্লেখ করেন যে, প্রথমত দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ প্রাধান্য দিয়ে মূল্যায়ন করতে হবে। যদি প্রকাশ্য সংঘাতে উভয়ে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে মার্কিন স্বার্থ দারুণভাবে বিঘ্নিত হবে। আমাদের অবশ্যই সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যাতে কোনো পক্ষই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে না পারে। গণমাধ্যম প্রশ্নে তিনি বলেন, ভিয়েতনাম নিয়ে এখন আর কেউ কিছু লিখছে না। এখন পত্রিকাগুলোর বড় বড় শিরোনাম হচ্ছে পাকিস্তান নিয়ে। ডেমোক্রেট ও রিপাবলিকানরা এই ইস্যু নিয়ে শুরু করেছেন হুলস্থুল। তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার এই পরিস্থিতির সঙ্গে ১৯৬৯ সালের নাইজেরিয়ার বিরাট পার্থক্য রয়েছে। বায়াফদ্বার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততায় রাজনৈতিক দিকটি ছিল না। আমরা পূর্ব পাকিস্তানে মানুষের দুর্ভোগ এবং ভারতের উদ্বাস্তু পরিস্থিতি নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। রাজনৈতিক সমস্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে নিক্সন বলেন, তিনি খুব শক্তভাবে তার অবস্থানকে এক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারছেন না। কতিপয় ভারতীয়দের মতে, ভারতের স্বার্থ সবচেয়ে ভালোভাবে রক্ষিত হবে একটি যুদ্ধের মাধ্যমে। অন্যদিকে পাকিস্তানিদেরও অনেকে নিশ্চয়ই যুদ্ধে জড়াতে চাইবে। আমি জানি না সোভিয়েত ইউনিয়ন কী চায়? কিন্তু এটা ঠিক যে, একটি যুদ্ধের দ্বারা মার্কিন স্বার্থ রক্ষিত হবে না। চীনের সঙ্গে সম্পর্ক দানা বেঁধেছে তাতে ধস নামবে। সম্ভবত আর কখনো জোড়া লাগবে না এবং সোভিয়েতের সঙ্গে আমাদের এ সম্পর্ক খুবই জটিল রূপ নেবে। এখন আমাকে একটা কথা স্পষ্ট করে বলতে হবে যে, ১৯৫৩ সাল থেকে আমার ভারত সফরের অভিজ্ঞতা

রয়েছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রদূত যারাই ভারতে গেছে তারাই ভারতের প্রেমে পড়েছে। কিছু রাষ্ট্রদূতের অবশ্য পাকিস্তানেও একই ঘটনা ঘটেছে; কিন্তু তাদের সংখ্যা বেশি নয়। কারণ পাকিস্তানিরা ভিন্ন প্রজাতির। তারা স্পষ্টবাদী এবং অনেক সময় দারুণভাবে গর্দভ। অন্যদিকে ভারতীয়রা অধিকতর ধূর্ত। অনেক সময় তারা এমনই চৌকস হয়ে ওঠে যে, আমরা বিভ্রান্ত হয়ে তাদের ফাঁদে পা দেই। নিক্সন এ সময় আরো উল্লেখ করেন যে, যুক্তরাষ্ট্র কোনোক্রমেই পাকিস্তান ভাঙার জন্য উদ্বাস্তুদের অজুহাত হিসেবে ব্যবহার হতে দেবে না। কেউ কেউ মনে করেন চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কের কারণেই রাশিয়া ইসলামাবাদকে শাস্তি দিতে চায়। নিক্সনের মতে, ১৯৬৭ সালের জুনের আগে রাশিয়া যেভাবে মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা দেখেছে আজ তারা একইভাবে পাক-ভারতের পরিস্থিতি মূল্যায়ন করছে। কিন্তু বিপদ হচ্ছে তারা শক্তি প্রয়োগকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে, যা নিয়ন্ত্রণ করতে কেউ সক্ষম থাকবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে, ভারতীয়রা যদি 'পূর্ব পাকিস্তান নিয়ে বাচ্চাদের মতো খেলতে শুরু করে' অথবা গেরিলা প্রেরণ করে তাহলে পাকিস্তানিরা কিন্তু যুদ্ধে জড়াবেই। এমনকি তারা যদি এটা জানেও যে, এই যুদ্ধ হবে তাদের জন্য আত্মঘাতী।

নিক্সন এ সময় সিসকো ও আরউইনের দিকে লক্ষ্য করে বলেন, আমাদের অবশ্যই স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও দক্ষিণ এশিয়ায় কর্মরত ভারতপন্থিদের ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা করতে হবে। (ফুটনোট : ১০ আগস্ট ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ কিটিং নয়াদিল্লিতে একটি টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন। এতে তিনি উল্লেখ করেন যে, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের সম্পর্ক এখন 'বিষে জর্জরিত।' তিনি যুক্তি দেন যে, ভারতের প্রতি যুক্তিরাষ্ট্রের নীতি একেবারেই উল্টে দিতে হবে। ভারতীয়রা সাধারণভাবে মনে করে, যুক্তরাষ্ট্র 'রাজনৈতিকভাবে কর্তৃত্ববাদী, অন্তর্গতভাবে ভঙ্গুর; তৃতীয় স্তরের পাকিস্তানকে গণতান্ত্রিক, তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ও আঞ্চলিকভাবে ক্ষমতাধর ভারতের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে চলেছে। নিক্সন বলেন, আমরা ভারতকে সাহায্য করতে চাই, তাই বলে পাকিস্তান ভাঙতে তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নে আমরা পক্ষ হতে পারি না। 'যদি যুদ্ধ হয়, আমি জাতীয় টেলিভিশনের সামনে দাঁড়াব, কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জানাব, ভারতকে সব সাহায্য বন্ধ করে দিতে। তারা একটি ডলারও পাবে না।

৮৮ আওয়ামী লীগ সাংসদকে দায়মুক্ত করেন ইয়াহিয়া

১৭ আগস্ট, ১৯৭১

ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল স্টাফ প্রণীত এক সার-সংক্ষেপে বলা হয়, দক্ষিণ এশিয়ায় একটি নতুন যুদ্ধের বিপদ এখনো প্রকৃতই রয়ে গেছে। যদি সত্যিই পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি এবং সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরের মধ্যে ভারত থেকে বাঙালি উদ্বাস্তু প্রত্যাবাসনে অগ্রগতি না ঘটে তাহলে বৈরিতার সম্ভাবনা আরো বৃদ্ধি পাবে। সম্ভাব্য যেসব পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারে তা হলো : ক. ভারতীয় সামরিক বাহিনী আক্রমণ চালিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ন্যূনতম ভূখণ্ড দখল করে নেবে। উপরন্তু বড়জোর পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের বিতাড়িতও করতে পারে। খ. ভারত মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থন দানের প্রক্রিয়ায় অধিকতর প্রত্যক্ষ সমর্থন নিশ্চিত করতে পারে। এক্ষেত্রে তাদের লক্ষ্য থাকবে পূর্ব পাকিস্তানের একটি এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। পর্যায়ক্রমে তারা পূর্ব পাকিস্তান-ভারত সীমান্তে সংঘাতের ঘটনা বৃদ্ধি করবে। এতে সৃষ্টি হবে বিভ্রান্তি। বোঝা যাবে না সংঘাতের জন্য ঠিক কোন পক্ষ দায়ী। গ. পশ্চিম পাকিস্তানিরাও পূর্ব ভারতে অবস্থিত গেরিলাদের অভয়ারণ্যে হামলা চালাতে পারে। ভারতীয় সামরিক বাহিনী সমর্থিত কোনো ঘাঁটিও হতে পারে তাদের টার্গেট। ঘ. পশ্চিম পাকিস্তানিরা ভারতীয় দৃষ্টি অন্য খাতে প্রবাহিত করতে অথবা ভারতীয় ভঙ্গুরত্ব প্রদর্শনে ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে অথবা কাশ্মীর সন্নিহিত যুদ্ধবিরতি রেখা বরাবর হাঙ্গামা সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে পারে। যেমনটা ঘটেছিল ১৯৬৫ সালে। পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটার মধ্য দিয়ে যুদ্ধে গড়াল। পাকিস্তানিরা মনে করে কাশ্মীর ভারতের সবচেয়ে সংবেদনশীল বিষয়।

২০ আগস্ট, ১৯৭১

১৯ আগস্ট ৭১ ইসলামাবাদে এম এম আহমাদ, রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড ও মরিচ উইলিয়ামসের (যিনি ১৭-২৩ আগস্ট পাকিস্তান সফর করেন) সঙ্গে ইয়াহিয়া এক বৈঠকে মিলিত হন। ইয়াহিয়া বৈঠকে ১৪ আগস্টে তার কাছে লেখা নিক্সনের চিঠিটি পাঠ করে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন। বলেন, তিনি নিক্সনের অব্যাহত সহানুভূতি, উষ্ণ সমর্থন ও বন্ধুত্বে বিমোহিত। উইলিয়াম সংক্ষেপে উল্লেখ করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সম্ভাব্য গুরুতর খাদ্য সংকট নিয়ে নিক্সন উদ্বিগ্ন। কারণ তার আশঙ্কা, এ

রকম সংকট দেখা দিলে ভারতে উদ্বাস্তুর স্রোত নতুন করে বেগবান হবে এবং এটা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে এই সমস্যাই পরিস্থিতিকে বিস্ফোরণোন্মুখ করার জন্য যথেষ্ট। এমনকি ভারত এই পরিস্থিতির অজুহাতে অবতীর্ণ হতে পারে যুদ্ধে। প্রেসিডেন্ট নিক্সন ভারতকে সংযম দেখাতে ক্রমাগত ও চাপের মুখে রেখেছেন। এক্ষেত্রে আরো অনেক ব্যবস্থা তিনি নেবেন। জাতিসংঘ এবং প্রত্যক্ষভাবে ত্রাণ সরবরাহে যুক্তরাষ্ট্র আগ্রহী। ইয়াহিয়া বলেন, তিনি পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে সজাগ রয়েছেন। এমনকি যারা বিপদ ঘণ্টা বাজিয়েছে তিনি তাদের অন্যতম। তিনি একটি বিষয়ে স্পষ্ট করতে চান, এই মুহূর্তে কিন্তু উদ্বাস্তু স্রোত বন্ধ রয়েছে। ভারতীয়রা অনেক ভ্রান্তিপূর্ণ অভিযোগ আনছে, তা সেনাবাহিনী সীমান্তে রয়েছে এবং তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে নিশ্চয়তা দিতে চান যে, কোনো উদ্বাস্তু দেশ ত্যাগ করছে না। ভারতীয়রা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আক্রমণ তীব্র করছে। উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তন প্রতিহত করছে, অস্ত্রে সজ্জিত করছে গেরিলাদের। আর উদ্বাস্তু পরিস্থিতির প্রকৃতি নিয়ে বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করছে। উইলিয়ামস এ পর্যায়ে উদ্বাস্তু প্রবাহ রোধে পাকিস্তানি প্রয়াসে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং গুরুত্ব আরোপ করেন যে, ভবিষ্যতের ব্যাপকভিত্তিক উদ্বাস্তু প্রবাহ বন্ধে খাদ্য সংকট মোকাবেলা গুরুত্বপূর্ণ। গত দুদিনের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, দুর্ভিক্ষ নিয়ে আমরা যেভাবে বিচলিত তিনিও ঠিক একই ধরনের আশঙ্কা প্রকাশ করেন। ইয়াহিয়া উল্লেখ করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্য খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে তিনি এক বিরাট কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন। ফারল্যান্ড উল্লেখ করেন, আমরা পূর্ব পাকিস্তানে মাঠপর্যায়ে জাতিসংঘের টিমকে কাজ করতে অনুমতি দেয়ার সিদ্ধান্তকে রাষ্ট্রনায়কোচিত পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেছি।

ইয়াহিয়া বলেছেন, আন্তর্জাতিক ত্রাণ সাহায্য চেয়ে তিনি যে আবেদন করেছেন তার প্রতি তেমন সাড়া এখনো মেলেনি। কিন্তু এটা সৌভাগ্যের যে, পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্য মজুদের অবস্থা সন্তোষজনক। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ নৌপথে খাদ্য পরিবহনের জন্য জাহাজ দিতে রাজি হয়েছে, কিন্তু হাতে এসে পৌঁছেছে মাত্র কয়েকটি। উইলিয়ামস উল্লেখ করেন যে, যদি খাদ্য মজুদ গত চার সপ্তাহের চাহিদা মেটাতে না পারত যুক্তরাষ্ট্র সেক্ষেত্রে বিমান থেকে খাদ্য নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আর বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক ভিত্তিতে মার্কিন খাদ্য সাহায্য পৌঁছানোর প্রক্রিয়া বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। পাকিস্তান অবশ্য নিজেও প্রেসিডেন্টের তদারকিতে যে ত্রাণ কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে তা অসাধারণ। উইলিয়ামস গুরুত্ব আরোপ করেন যে, পাকিস্তান যদি ত্রাণ কর্মসূচি জোরদার করে তাহলে পূর্ব পাকিস্তানে ইয়াহিয়া প্রশাসনের অবস্থান দৃঢ় হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মনে করবেন, পাকিস্তানকে তারা ভুল বুঝেছিলেন। বর্ধিত ত্রাণ বিতরণের ফলে তাদের মন থেকে এই ধারণা প্রশমিত হবে যে, পাকিস্তান কেবল সামরিক পদক্ষেপ নিতেই উদগ্রীব নয়; আন্তর্জাতিকভাবে এই

ধারণা রয়েছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে প্রধানত সামরিক ও অংশত উদ্বাস্তু ইস্যু মোকাবেলায় তাদের তৎপরতা সীমিত রয়েছে। ইয়াহিয়া বলেন, এ পর্যন্ত তিনি যেসব গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন সে সম্পর্কে কভারেজ দিতে আন্তর্জাতিক প্রেস অনীহা প্রকাশ করে চলেছে। সরকার এসব তথ্য নিউইয়র্ক টাইমসের কাছে সরবরাহ করা সত্ত্বেও তারা তা ছাপেনি। তাই ইয়াহিয়া ভাবছেন, পূর্ব পাকিস্তানে তার সরকারের কর্মতৎপরতার ফিরিস্তি তুলে ধরতে তিনি আমেরিকান সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেবেন। উইলিয়ামস উল্লেখ করেন যে, ইয়াহিয়ার এখন উচিত হবে পাঁচটি নির্দিষ্ট বিষয়ে অধিকতর মনোযোগ দেয়া। এম এম আহমাদের সঙ্গে আলোচনায় তিনি এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রথম কাজ হবে বন্দরগুলো থেকে খাদ্য স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা। সরকার এজন্য অবশ্য খাদ্য ও পরিবহন বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের উপদেষ্টা হিসেবে কমোডর বাজোয়াকে নিয়োগ করেছেন। ইয়াহিয়া উল্লেখ করেন যে, নৌপরিবহন ব্যবস্থা অবশ্যই কার্যকরভাবে সংগঠিত করতে হবে। কারণ রেল ও সড়কপথে খাদ্য সরবরাহ তেমন অনুকূল বলে গণ্য হওয়ার নয়। ইয়াহিয়া অনুশোচনা প্রকাশ করেন যে, অতীতে পূর্ব পাকিস্তানের নৌপরিবহন ব্যবস্থায় একেবারেই কম মনোযোগ দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় উদ্বেগ হলো– বন্দরগুলো থেকে মূল কেন্দ্রগুলোতে খাদ্য পৌঁছে দেয়া। ইয়াহিয়া উপলব্ধি করেন যে, এজন্য সরকারকে ছোট নৌকা ও ট্রাকের ব্যবস্থা করতে হবে। এ পর্যন্ত ক্ষুদ্র দেশী নৌকাও যথেষ্টসংখ্যক সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে উইলিয়ামস নয়া চিফ সেক্রেটারি হিসেবে মুজাফফর হোসেনের নিয়োগ এবং বেশি টাকা দিয়ে ছোট নৌকা ও বাণিজ্যিক ট্রাক সংগ্রহে তার পরিকল্পনার প্রশংসা করেন। উইলিয়ামস বলেন, খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে তিনি এই প্রথম এমন বুদ্ধিদীপ্ত প্রস্তাবের বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করতে যাচ্ছেন। ইয়াহিয়া মন্তব্য করেন, মুজাফফর হোসেন এ কাজের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি। সাবেক চিফ সেক্রেটারি একজন বাঙালি (ফুটনোট : প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ফারল্যান্ডের সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনায় মার্কিন প্রস্তাব অনুযায়ী জেনারেল টিক্কা খানকে সরিয়ে একজন বাঙালি গভর্নর নিয়োগে সম্মতি জানান। ফারল্যান্ড তাকে চেপে ধরেন যে, আপনাকে বলতে হবে টিক্কা খানের পরিবর্তে কে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হবে। ইয়াহিয়া ইঙ্গিত দেন যে, বেসামরিক গভর্নর হিসেবে তিনি ড. এ এম মালিকের কথা ভাবছেন। ১ সেপ্টেম্বরে তিনি তার নাম ঘোষণা করবেন। উইলিয়ামস সরেজমিনে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। ২১ আগস্ট ঢাকায় জেনারেল টিক্কা ও এ এম মালিকের সঙ্গে তিনি বৈঠক করেন। ইয়াহিয়া এ সময় আরো উল্লেখ করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনে তিনি বাঙালিদের সম্পৃক্ত করার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এ লক্ষ্যে তিনি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির ৮৮ জন সাবেক আওয়ামী লীগ প্রতিনিধির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এ সময় তার কাছে জানতে চাওয়া হয় যে, ৮৮ জনের বেশি আওয়ামী লীগারকে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব কি না? জবাবে

ইয়াহিয়া বলেন, অন্য আর সবার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের সুনির্দিষ্ট চার্জ আনা হয়েছে। তবে এই আওয়ামী লীগাররা নিজেদের অভিযোগ মুক্ত করার মাধ্যমে পরবর্তী ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে আসন লাভ করতে পারে। ইয়াহিয়া তথ্য দেন যে, এই ৮৮ জন আওয়ামী লীগারের মধ্যে ১৫ অথবা ১৬ জন বর্তমানে ঢাকায় অবস্থান করছেন। তাদের নিরাপত্তায় সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে, কারণ তারা তাদের জীবনের জন্য শঙ্কিত। ৮৮ জনের অবশিষ্টরা হয় প্রত্যন্ত অঞ্চলে অথবা ভারতে অবস্থান করছে। ইয়াহিয়া নিশ্চিত করে বলতে পারেননি যে, তাদের মধ্যে কত জন আসন গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসবেন। তবে তিনি এক্ষেত্রে একটা ডেডলাইন বেঁধে দিতে পারেন বলে উল্লেখ করেন। উইলিয়ামস বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, আওয়ামী লীগ যেখানে একটি নিষিদ্ধ দল হিসেবে ঘোষিত, সেখানে এই দলের নামে কী করে অ্যাসেম্বলি সদস্য পদ বহাল রাখতে সক্ষম হবে। সম্ভবত প্রেসিডেন্ট এক্ষেত্রে এটা ভেবে দেখতে পারেন যে, আওয়ামী লীগ থেকে পুরানো নেতৃত্ব ছাঁটাই করা সাপেক্ষে দলটির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা যায় কি না। এটা সম্ভব হলে পুনর্গঠিত আওয়ামী লীগের ব্যানারে ৮৮ সদস্যের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট আলোচনায় বসতে পারেন। এ বিষয়টি এ সময় আরো অন্যান্য দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা হয়। এতে স্পষ্ট হয় যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কোনো সদস্য তা সে যতই পরিশুদ্ধ হোক না কেন, আওয়ামী লীগের ব্যানারে তিনি কারো সঙ্গেই আলোচনা করবেন না।

৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল স্টাফ হ্যারল্ড স্যান্ডার্স ও স্যামুয়েল হস্কিনসন একটি সার-সংক্ষেপ তৈরি করেন। এতে বলা হয়, আমরা পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতিকে এখনো পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে দেখছি। যদিও যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন যুক্ত হয়ে পড়ায় এই সঙ্কটের একটি আন্তর্জাতিক মাত্রা তৈরি হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ২৫ ফেব্রুয়ারি '৭১ কংগ্রেসে পেশকৃত তার পররাষ্ট্রনীতি-বিষয়ক রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন যে, দক্ষিণ এশিয়ায় চীন অথবা সোভিয়েতের যে বৈধ স্বার্থ রয়েছে তার জন্য ক্ষতিকর কোনো কিছুই আমরা করব না। কোনো বহিঃশক্তি এই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের দাবি করতে পারবে না। ডিপার্টমেন্ট অব স্টেটের এক সমীক্ষায় বলা হয়, দক্ষিণ এশীয় সংকটের সুরাহা যেভাবেই হোক না কেন, বৈরিতা অবসানের পরপরই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। চীনের প্রভাব যাতে বৃদ্ধি না পায় তার লাগাম টেনে ধরতে হবে। এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক নিষ্পত্তি যেভাবেই অর্জিত হোক না কেন, তা তাদের মানতে হবে। চীনারা যেন তা নস্যাৎ করতে না পারে।

দক্ষিণাঞ্চলের মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ কৌশলের প্রশংসা

একাত্তরের ৮ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধবিষয়ক ওয়াশিংটন স্পেশাল গ্রুপের বৈঠকের দলিল থেকে জানা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা চিহ্নিত করতে একটি মানচিত্র তৈরি করেছিল। এ বৈঠকে নির্দিষ্টভাবে দক্ষিণাঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ কৌশলের প্রশংসা করেন মোরিস জে উইলিয়ামস। তিনি ছিলেন এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের ডেপুটি এডমিনিস্ট্রেটর এবং ইন্টারডিপার্টমেন্টাল ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ইস্ট পাকিস্তান ডিজেস্টার রিলিফের চেয়ারম্যান। ১৭ থেকে ২৩ আগস্ট তিনি ঢাকা ও ইসলামাবাদ সফর করেন।

কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, যুক্তরাষ্ট্র সামরিক তৎপরতার বিষয়ে ভারতকে আবারো সতর্ক করে দেবে। তবে মনে রাখতে হবে, আমরা ভারতে সম্ভাব্য চীনা আক্রমণে ভারতীয়দের পাশে দাঁড়ানোর নিশ্চয়তা দেয়ার বিষয়টি এড়িয়ে চলব। আবার তাদের প্রতি কোনো হুমকি দেয়া থেকেও বিরত থাকব।

কিসিঞ্জার : আমার ধারণা আমরা ত্রাণ পরিস্থিতি বিষয়ে মোরি উইলিয়ামসকে একটি রিপোর্ট পেশ করতে অনুরোধ জানাতে পারি। আমি এটা ভেবে অবাক হচ্ছি, আমাদের যদি পারমাণবিক যুদ্ধযাত্রার জন্য একটি বেসবল ব্যাট ব্যবহার করতে বলা হয়, তখন আমাদের করণীয় কী হবে?

উইলিয়ামস : আপনি জানেন ১৭ থেকে ২৩ আগস্ট পর্যন্ত ইসলামাবাদ ও ঢাকায় আমি আলাপ-আলোচনা করেছি। ইয়াহিয়ার কাছ থেকে আমরা এই সবুজ সংকেত পেয়েছি যে, তিনি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ত্রাণ সরবরাহের বিষয়টি দেখবেন। তিনি একমত হয়েছেন, পূর্ব পাকিস্তানে সরকারের ভাবমূর্তি বজায় রাখার জন্য দক্ষতার সঙ্গে ত্রাণ সরবরাহ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া ইয়াহিয়া মনের ভেতরে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত রেখেও রাজি হয়েছেন, জাতিসংঘের প্রথম মাঠ পর্যায়ের মিশনে ৪০ জন লোক থাকবে। ইয়াহিয়া অবশ্য বলেছেন, তার নীতি হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বেসামরিকীকরণ। এর অর্থ হচ্ছে, তিনি সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রভাব হ্রাস করতে চান। তিনি এখন বাঙালি ড. এম মালিককে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেছেন। রাজনৈতিক সমঝোতার প্রশ্নে ইয়াহিয়া যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন তা

আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। জেনারেল এসেম্বলির নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে শুধু ৮৮ জন এবং প্রাদেশিক এসেম্বলির ৯৪ জন লীগ সদস্যের নাম তিনি অপরাধীদের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে, তারা সাধারণ ক্ষমার সুযোগ লাভ করেছেন। তবে জেনারেল এসেম্বলির ৮৮ সদস্যের মধ্যে মাত্র ১৬ জন ঢাকায় অবস্থান করছেন। অবশিষ্ট জেনারেল এসেম্বলির ৭৯ সদস্য, প্রাদেশিক এসেম্বলির ৬০ জন সদস্য বিচারের সম্মুখীন হবেন। পাকিস্তানের সঙ্গে দাতাগোষ্ঠী কনসোর্টিয়ামের প্রশ্নে আমরা এমন মতৈক্যে পৌঁছেছি যে, অক্টোবরের গোড়ায় এ বৈঠক অনুষ্ঠানে উদ্যোগ নেয়া হবে। এ সময় ওয়াশিংটনে আইবিআরডি'র নির্বাহী পরিচালকদের বৈঠকও হবে। আমরা পাকিস্তানিদের স্বার্থে প্রস্তাব দিয়েছি যে, (ক) পূর্ব পাকিস্তানিদের ত্রাণ সুবিধাসহ অধিকতর আন্তর্জাতিক সাহায্য প্রদান; (খ) সাধারণ দাতাদের কর্তৃক ঋণ মওকুফ, (গ) কৃষির জন্য দীর্ঘমেয়াদি ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ। গতকাল পর্যন্ত এসব ব্যাপারে ম্যাকনামারাকে সম্মত থাকতেই দেখা গেছে।

কিসিঞ্জার : পাকিস্তানিরা কি খুশি?

সিসকো : হ্যাঁ, তারা আমাদের সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেছে এবং তারা এটা ভেবে সন্তুষ্ট যে, আমরা তাদের হয়ে বোঝা লাঘবের চেষ্টা করছি।

উইলিয়ামস : তারা রীতিমতো উৎফুল্ল। তাদের জন্য এ বছরে ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের পরিমাণ ৭৫ মিলিয়ন ডলার। পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বলতে হয়, পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তে গেরিলা তৎপরতা সবচেয়ে বেশি। আর এসবই মূলত পরিবহন ব্যবস্থাকে ধ্বংসের জন্য পরিচালিত হচ্ছে।

কিসিঞ্জার : এটা কি ভারতীয় সীমান্তের সমান্তরাল?

উইলিয়ামস : হ্যাঁ, এটা আসলে লাইফ লাইনের জন্য লড়াই। গেরিলাদের সাহায্যে তারা রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করছে। ব্রিজ দিচ্ছে উড়িয়ে। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানিরা নৌপথের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। উত্তরাঞ্চলে অবশ্য গেরিলারা দৃশ্যত স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দক্ষিণাঞ্চলে গেরিলা গ্রুপের সংখ্যা ৩০০ থেকে ৬০০টি হবে। তারা বেশ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এবং তারা নৈপুণ্য প্রদর্শন করছে। সাধারণভাবে তাদের টার্গেট হচ্ছে পরিবহন ব্যবস্থা, ব্রিজ, পুলিশ স্টেশন ও প্রশাসনিক কাঠামো। উর্দুভাষী বিহারি মন্ত্রী হত্যার মধ্য দিয়ে সম্ভবত সাম্প্রদায়িক সহিংসতার প্রথম সূচনা ঘটে। আর পাকিস্তানি সৈন্যরা সেখানে পৌঁছলে পরিস্থিতি রূপ নেয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। এতে কতজন হতাহত হয়েছে তার সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। কিন্তু মৃতের সংখ্যা যে কয়েক হাজার হবে, তা ধারণা করা যায়। ...

কিসিঞ্জার : অনুপ্রবেশকারীদের অধিকাংশই কি হিন্দু?

উইলিয়ামস : না, ঠিক তা নয়। তবে উর্দুভাষী এবং গোড়া মুসলিমরা পাকিস্তান সরকারের প্রতি অধিকতর অনুগত। গ্রাম পর্যায়ে তাদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ চলছে। এর দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে 'শান্তি কমিটি'। নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা বলতে তাদের কিছুই

নেই। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তারাই সবচেয়ে বিশ্বস্ত। এসব লোকজন হিন্দু-বিরোধী হিসেবে পরিচিত। সে কারণেই হিন্দুদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার ঘটেছে এবং তারা অধিক মাত্রায় দেশ ছাড়ছে। ত্রাণ সরবরাহের ক্ষেত্রে পরিবহন ব্যবস্থাই মুখ্য। আমরা এজন্য ২৫টি কোস্টাল স্টিমার দিয়েছি। ইয়াহিয়া এতে খুবই খুশি হয়েছেন। এগুলো পৌঁছামাত্রই খাদ্য সরবরাহের কাজে লাগানো হবে। তবে এসব স্টিমারের নিরাপত্তা এক বিরাট প্রশ্ন। কারণ, গেরিলারা খাদ্য ও ত্রাণ বোঝাই জাহাজে আক্রমণ পরিচালনা করছে। পাকিস্তানিরা এসব জাহাজের নিরাপত্তা সশস্ত্র লোকদের দ্বারা নিশ্চিত করতে চাইছে। আমরা জাতিসংঘ এবং ঢাকার সামরিক অধিকর্তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছি, যাতে এসব জাহাজে তারা জাতিসংঘের প্রতীক ব্যবহার করে। তারা এ প্রস্তাবে খুব একটা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তবে মুখে বলেছে, আচ্ছা তা-ই হবে। তারা স্পষ্ট করেছে, খাদ্যের অবস্থান যুদ্ধের ওপরে। কিন্তু জাতিসংঘ যদি এ ব্যাপারে ভালোভাবে মোকাবেলা করতে না পারে, তাহলে এই অপারেশন ব্যর্থ হবে।

কিসিঞ্জার : (সিসকোর দিকে তাকিয়ে) আপনি কি ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ঝা'কে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা সংক্রান্ত মানচিত্র দেখিয়েছেন? আমরা কিন্তু এই ম্যাপ নিউইয়র্ক টাইমসকেও সরবরাহ করতে পারি। কিন্তু মুশকিল হলো তারা এটা ছাপবে না।

উইলিয়ামস : জাতিসংঘের সঙ্গে ত্রাণ কর্মসূচির সমন্বয় কোনো পিকনিক ইস্যু নয়। তবে নিরাপত্তা পরিস্থিতি ওকে থাকলেই শুধু এটা মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। সাহায্যের প্রশ্নে ইয়াহিয়া ২৫০-৩১৫ মিলিয়ন ডলার চেয়েছেন। এর সঙ্গে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত ৭৫ শতাংশ হিস্যা। অর্থাৎ ১৬০-২৩৫ মিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে পিএল-৪৮০-এর আওতায় ১১৫ মিলিয়ন ডলার। মার্কিন মালিকানাধীন ২৫ মিলিয়ন ডলারের অতিরিক্ত রুপি এবং ১০০ মিলিয়ন ডলারের স্পেশাল কনটেনজেন্সি ফান্ড। (কিসিঞ্জারের প্রতি) আপনি জানতে চেয়েছিলেন, ১০০ মিলিয়ন ডলার যথেষ্ট কিনা? জবাব হলো, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য এটাই যথেষ্ট। এক্ষেত্রে আমার দুটো নির্দিষ্ট সুপারিশ রয়েছে। প্রথমত, আমাদের উচিত হবে ভারতীদের সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে কথা বলা। এর উদ্দেশ্য হবে, পূর্ব পাকিস্তানে দুর্ভিক্ষ ঠেকানোর অভিন্ন স্বার্থ অর্জন। এছাড়া উদ্বাস্তুদের চাহিদা নিরূপণ করতে তাদের সঙ্গে বসে উদ্বাস্তুদের সঠিক সংখ্যা ঠিক করতে হবে। ভারতীয়দের দাবি এই সংখ্যাটি হবে ৮০ লাখ। পাকিস্তানিরা বলছে ২০ লাখের বেশি। আমাদের দরকার তৃতীয় কোনো পক্ষের দ্বারা নিরপেক্ষভাবে এ সংখ্যা যাচাই করে নেয়া।

কিসিঞ্জার : আপনি কী ভেবেছেন?

উইলিয়ামস : সম্ভবত ৬০ লাখের কাছাকাছি হবে। প্রশ্ন হলো, উদ্বাস্তুদের প্রবাহ কিভাবে বন্ধ করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, বিশেষ করে ভারতে অবস্থানরত উদ্বাস্তুদের জন্য কংগ্রেসের কাছে কিভাবে আমরা সাহায্যের আবেদন জানাব। যদি সত্যিই উদ্বাস্তুর সংখ্যা ৮০ লাখ হয় তাহলে তাদের সাহায্যের দরকার হবে ৮৩০ মিলিয়ন ডলার।

কিসিঞ্জার : আমরা ভারতীয়দের কিভাবে এ নিয়ে প্রস্তাব দিতে পারি?

আরউইন : আমরা এটা দুভাবে পারি। এখানে রাষ্ট্রদূত ঝা'র সঙ্গে আমি কিংবা নয়াদিল্লিতে আমাদের রাষ্ট্রদূত কিটিং ভারত সরকারের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

কিসিঞ্জার : সবচেয়ে ভালো হয় আপনি যদি এখানেই ঝা'র সঙ্গে কথা বলেন।

আরউইন : আমি একমত। হয়তো আমরা উভয়মুখী পদক্ষেপ নিতে পারি।

কিসিঞ্জার : আমরা কিভাবে নিরপেক্ষতার সঙ্গে উদ্বাস্তু সংখ্যা নির্ণয় করতে পারি? ভারত কি আবার তাতে রাজি হবে?

আরউইন : জাতিসংঘের উপস্থিতি তারা মানবে না। আমরা এটা সীমান্তে করতে পারি। শিবিরে সরজমিনে সংখ্যা গণনা উত্তম পদক্ষেপ।

কিসিঞ্জার : কিটিং জানিয়েছেন ভারতীয়রা ভ্রাম্যমাণ টিমের সঙ্গে থাকতে রাজি হয়েছে।

উইলিয়ামস : হ্যাঁ, কিন্তু তারা তো খুব দূরে যেতে পারবে না।

কিসিঞ্জার : আমরা সংখ্যা গণনা করে যা নির্ধারণ করব তা তারা নাকচ করে দেবে কোন যুক্তিতে? তারা কি শিবিরগুলো লোকজন দিয়ে ভরে ফেলবে? আমরা কিভাবে বুঝব কারা প্রকৃত পূর্ব পাকিস্তানি উদ্বাস্তু?

হান্না : ২০ লাখ এবং ৮০ লাখের মধ্যবর্তী কোনো একটি সংখ্যা আমরা ঠিকই পেয়ে যাব।

কিসিঞ্জার : আচ্ছা আমরা ভারতের সঙ্গেই আগে কথা বলি। ভারতে যাতে উদ্বাস্তুরা আরো ভিড় না জমায় সে জন্য তাদের সঙ্গে কথা বলে আমরা একটা অভিন্ন কর্মপন্থা বের করি। তারপর একবার নিরপেক্ষ গণনা। ভারতে অবস্থানরত উদ্বাস্তুদের সহায়তা দিতে ভারত যখন অনুরোধ জানিয়ে চলেছে; আচ্ছা ভালো কথা, আমরা কেন গেরিলা তৎপরতা বিষয়ক মানচিত্র তাদের দেখাচ্ছি না? আমরা তো এটা বলতে পারি, যেসব গেরিলা যোদ্ধা একেবারে পূর্ব পাকিস্তানের পেটের ভেতরে অবস্থান করে তৎপরতা চালাচ্ছে তাদের ব্যাপারে তোমাদের হয়তো তেমন কিছু করণীয় নেই। কিন্তু যারা ভারতের সীমান্তের কাছে রয়েছে তাদের কেন নিয়ন্ত্রণ করছ না? আপনাদের কি মনে হয় এতে কোনো কাজ হবে?

আরউইন : ঠিক এভাবে আমরা কিন্তু তাদের আংশিকভাবে হলেও বলেছি। কিন্তু লাভ হয়নি। আমরা অবশ্য আবার চেষ্টা করতে পারি।

কিসিঞ্জার : আমরা যদি দৃঢ়তার সঙ্গে কথা না বলি তাহলে ভারতীয়রা আমাদের প্রতারণাপূর্বক মরণ ফাঁদেও ফেলতে পারে।

সিসকো : কথা বলতে হবে দৃঢ়তার সঙ্গে ও নির্দিষ্টভাবে। আমরা ঝা'কে বলতে পারি, আমরা ৭০ লাখ ডলার সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আমরা তা দিতেও চাই। কিন্তু আমাদের ভারতের কাছ থেকে অন্তত ন্যূনতম সহযোগিতার আশ্বাস পেতে হবে। আমাদের যদি সহযোগিতা দানে কোনো নিশ্চয়তাই না দেয়া হয়, তাহলে

আমরা একতরফাভাবে কিভাবে সক্রিয় হতে পারি। আমাদের তো এমন দায় ঠেকেনি যে, খামোখা টাকা জলে ফেলে দেব।

হান্না : কংগ্রেস বর্তমানে আবন্টনের পর্যায়ে। তাদের বলা হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ১০০ মিলিয়ন ডলারই চলবে। কিন্তু এখন তো দেখছি ভারতের পূর্ব পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের জন্য আরো বেশি দরকার। ৮০ লাখ উদ্বাস্তুর জন্য প্রতিদিন ২৫ সেন্ট ধরেও দৈনিক প্রয়োজন ২০ লাখ ডলার।

কিসিঞ্জার : যদি উদ্বাস্তুদের ব্যাপক প্রবাহ অব্যাহত থাকে তাহলে ভারত কিন্তু যুদ্ধে যাওয়ার অজুহাত হিসেবে এটা ব্যবহার করবেই। আর সেক্ষেত্রে আমাদের চীনা নীতি হবে ধ্বংস। তারা ইতোমধ্যেই প্রেসের মাধ্যমে আমাদের জবাই করছে এবং লবি করছে কংগ্রেসের সঙ্গে। আমাদের অবশ্যই দৃঢ়চিত্ত থাকতে হবে। আমরা নিজ থেকে এটা দেখাতে পারি, তবে এটা তো ঠিক যে এ বিষয়টা স্টেট ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

আরউইন : আপনি ঠিকই বলেছেন।

কিসিঞ্জার : আমরা তাদের বলছি না যে, আবশ্যকীয় কিছু বিসর্জন দিতে।

সিসকো : এটা কিন্তু একটা আশার আলো সৃষ্টি করতে পারে। ধারণা হতে পারে, পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে একত্রে আমরা বাংলাদেশকেও পেতে পারি।

লিবারেশন ফ্রন্টে যেভাবে মস্কোপন্থি কমিউনিস্ট

৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

ওয়াশিংটনে স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠক।

আরউইন : এই ক্ষেত্রে আমরা ভারতীয়দের হিট করব এবং জাতিসংঘের দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করব।

কিসিঞ্জার : ভারতীয়রা নিরঙ্কুশভাবে একটি নিষ্ঠুর খেলা খেলছে। ...

আরউইন : পূর্ব পাকিস্তানে ত্রাণ বিতরণ প্রশ্নে জাতিসংঘের নিরপেক্ষতা প্রশ্নে আমি কি একটা কথা বলতে পারি?

উইলিয়ামস : একটা বিষয় বুঝতে হবে, আমরা খাদ্য বোঝাই জাহাজের সঙ্গে অন্য কোনো জাহাজের নিরাপত্তা গুলিয়ে ফেলতে পারি না। আমরা ঢাকায় এ নিয়ে আলোচনা করেছি। খাদ্যবাহী যেসব নৌকা বা কার্গো নৌপথ অতিক্রম করবে তাদের জন্য ঝুঁকি থাকবেই। হয় যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করে অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে অথবা জাতিসংঘের প্রতীক ব্যবহারে ভরসা করতে হবে। তবে জাতিসংঘের ক্ষেত্রে তারা কিন্তু সশস্ত্র প্রহরী নিয়োগ করতে পারবে না। সে কারণেই গেরিলাদের সঙ্গে একটা চুক্তিতে পৌঁছা দরকার। আর সেজন্য প্রয়োজন ভারতীয় সমর্থন। পাকিস্তানের সঙ্গেও একটা চুক্তি করতে হবে যে, এসব জাহাজে কিন্তু কোনো অবস্থাতেই পাট বহন করা যাবে না।

কিসিঞ্জার : পাকিস্তান কি এতে রাজি হয়েছে?

উইলিয়ামস : হ্যাঁ, ঢাকায় তারা তেমন মতই দিয়েছে।

কিসিঞ্জার : তাহলে এখন ভারতীয়দের সঙ্গে কথা বলা যাক।

আরউইন : ১. আমরা ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে ডাকব, ২. ত্রাণ পরিস্থিতি নিয়ে অগ্রসর হব, ৩. (কিসিঞ্জারের প্রতি) আপনি নিশ্চিত জানবেন, এ ব্যাপারে আপনাকে অবহিত করা হবে।

কিসিঞ্জার : সামরিক তৎপরতার বিরুদ্ধে আমাদের কিন্তু অবশ্যই উচিত হবে ভারতকে হুঁশিয়ার করে দেয়া। (ফুটনোট : নয়েস কর্তৃক গৃহীত এই বৈঠকের বিবরণে কিসিঞ্জারের এই মন্তব্যের আগে হেলমস বলেছিলেন, অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই বর্ষাকাল যেহেতু শেষ হচ্ছে, তাই আমরা শুষ্ক ভূমিতে যুদ্ধ শুরুর সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাব।)

হেলমস (সিআইএ পরিচালক) : হুঁশিয়ারি পুনর্ব্যক্ত করার এখনই ভালো সময়।

আরউইন : ডবরিনিনের (সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত) সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্সের বৈঠককালে ডবরিনিন বলেছেন, তারা ভারতকে সংযত রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু আসলে তারা কোনো ইতিবাচক ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তারা জাতিসংঘে নেতিবাচক ভূমিকা রাখছে। তারা কিছুটা কাজে আসতে পারে, তবে তা হবে খুবই সীমিত।

কিসিঞ্জার : এটা নির্ভর করছে তারা সহযোগিতা না করলে ঠিক কী ধরনের মাসুল তাকে দিতে হবে এটা ধরে নেয়ার ওপর। চীনারা এমন কোনো নীতি প্রতিষ্ঠা করতে চায় না, যাতে একটি দেশের কোনো অংশে গণ্ডগোল সৃষ্টি হতে পারে। ভারতকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে চীনাভীতি কি অন্যতম ফ্যাক্টর?

হেলমস : ভারতকে প্রতিহত করার সেটাই সবকিছু।

কিসিঞ্জার : তাহলে কি আমাদের তেমনভাবে তাদের উদ্বেগ প্রশমন করা ঠিক হবে? সিসকো না।

হেলমস : সেটা আমাদের গেম প্লানের অংশ হওয়া উচিত। চীন কিছু একটা করে ফেলতে পারে। এমন একটা বিস্ময়ে রাখতে হবে ভারতকে।

সিসকো : আমাদের কেন এই বিষয়ে ভারতীয়দের পুনঃআশ্বাস দিতে হবে, আমি কিন্তু তার কারণ দেখি না। ...

আরউইন : ডবরিনিন দুই সপ্তাহের মধ্যে ফিরে আসবে। তিনি না আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা উচিত।

কিসিঞ্জার : সংবাদপত্র যা-ই বলুক, কিছু আসে যায় না। ভারত যদি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, প্রেসিডেন্ট সেক্ষেত্রে সাহায্য বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন।

সিসকো : সেটা হবে তার পক্ষে একটা ন্যূনতম ব্যবস্থা।

হান্না : যদি একটি যুদ্ধ পরিস্থিতির উদ্রেক ঘটে, তাহলে আপত্তি উঠবে না।

সিসকো : আমরা সাহায্যের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। বর্তমানে ভারতের যে আচরণ তাতে আমরা এই সম্ভাবনা বাদ দিতে পারি না। ভারতীয়রা গেরিলাদের সমর্থন দিচ্ছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করছে না। ভারতে অবস্থানরত উদ্বাস্তুদের জন্য ৭০ লাখ ডলারের সাহায্য প্রদানে আমরা কি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি? আমরা যদি অত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত না নিতাম তাহলে কি ভারতের আচরণ ভিন্ন হতো? বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এটা খতিয়ে দেখা উচিত।

উইলিয়ামস : ত্রাণ বণ্টন সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা আমাদের তত্ত্ব ঝালাই করে নিতে পারি। আমরা যদি কিছুটা প্রভাব খাটাতে সক্ষম হই, তাহলে আমাদের তা-ই করা উচিত। হুমকি দিয়ে নয়, গঠনমূলক উপায়ে।

সিসকো : আমাদের বলা উচিত, দেখ, এখন এটাই করা প্রয়োজন এবং তা করতে হবে একত্রে। আমরা এক্ষেত্রে শর্ত দিচ্ছি না। কিন্তু কিছু স্থিতিশীলতা সৃষ্টি

করতে তুমি আমাদের সাহায্য করতে পার।

কিসিঞ্জার : ভারতীয়রা তেমন কোমল হৃদয়ের লোক নয়। ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের ত্রাণ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে আন্ডার সেক্রেটারি আরউইন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ঝাকে ডেকে পাঠান। পূর্ব পাকিস্তানের সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষ এড়াতে তারা মতবিনিময় করেন। আরউইন উল্লেখ করেন যে, উদ্বাস্তুদের ত্রাণ সরবরাহে ভারত চমৎকার ভূমিকা পালন করছে। যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, এই মুহূর্তের বড় ইস্যু হচ্ছে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করা। এ ব্যাপারে যথেষ্ট কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়া হলে এটা ঠেকানো কঠিন হয়ে পড়বে। যদি ত্রাণ বন্টন বিঘ্নিত হয়, দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে উদ্বাস্তু প্রবাহ আরো তীব্র হবে। এই মুহূর্তের ভয়ঙ্করতম বিপদ হচ্ছে গেরিলা তৎপরতা। কারণ তারা ত্রাণ সহায়তায় বাধা দিচ্ছে। ভারতের পূর্ব সীমান্তের পুরো এলাকায় গেরিলারা সবচেয়ে সক্রিয়। এই এলাকায় তারা সাফল্যের সঙ্গে রেল ব্যবস্থা বেহাল করে দিতে সক্ষম হয়েছে। নৌপথ এখনো কিছুটা ভরসা। কিন্তু সেখানেও যদি তারা বাধা দেয় তাহলে যুক্তরাষ্ট্র যত পদক্ষেই নিক না কেন, তা সব ভণ্ডুল হবে। আন্ডার সেক্রেটারি উল্লেখ করেন যে, পররাষ্ট্র সচিব কাউল রাষ্ট্রদূত কিটিং ও অধ্যাপক গ্যালব্রিথের সঙ্গে আলোচনায় স্বীকার করেছেন যে, পাক সেনাবাহিনী কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে ত্রাণ সরবরাহ অব্যাহত থাকা উচিত। আমরাও বিশ্বাস করি যে, ত্রাণ থাকা উচিত যুদ্ধের বাইরে। আমরা মনে করি, ত্রাণ তৎপরতা থেকে পাক সামরিক বাহিনীকে দূরে রাখা যাবে। একই সঙ্গে আমরা আশা করি, ত্রাণ বন্টনে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে ভারত সরকারও সহায়তা দেবে। আমরা আশা করব, সত্যিকারের স্বাধীনভাবে পরিচালিত জাতিসংঘের ত্রাণ তৎপরতায় বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দ সমর্থন দেবেন। ভারতের কাছ থেকে আমরা আশা করি, তারা যেন ত্রাণ সরবরাহে বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করতে চাপ প্রয়োগ না করেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, ভারত সরকারের কাছে বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দের ওপর প্রভাব খাটাতে বলা সেভাবে কার্যকর নাও হতে পারে। কারণ, গেরিলা আন্দোলনের প্রতি ভারতের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ না-ও থাকতে পারে। আবার একইভাবে বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দ হয়তো তাদের নিজস্ব সামরিক বাহিনীর ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারছেন না। তার পরেও বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দ যদি জাতিসংঘের ত্রাণ কর্মসূচির প্রতি সমর্থন দিতে বাংলাদেশ রেডিওকে ব্যবহার করে তাহলে তা গঠনমূলক হিসেবে বিবেচ্য হবে। এইড ডেপুটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর উইলিয়ামস তখন তার সাম্প্রতিক পাকিস্তান সফরের সাফল্যের বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, পাকিস্তান সরকার জাতিসংঘের কার্যক্রম মেনে নিয়েছে। তারা এমন নিশ্চয়তা দিয়েছে যে, ত্রাণ সরবরাহ ব্যবস্থা জাতিসংঘ কর্তৃক তদারকির প্রয়োজন আছে এবং বন্টনের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম বৈষম্য সৃষ্টি করা হবে না। উইলিয়ামস উল্লেখ করেন যে, ত্রাণ বন্টনে ৮০০ টন পর্যন্ত ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১৭টি কোস্টাল ভেসেল ও ৯টি মিনি-বার্জার্স ব্যবহার করা হবে। এর নাবিকরা হবেন সবাই

বিদেশী। এসব জাহাজ একান্তভাবেই ত্রাণ বিতরণে নিয়োজিত থাকবে। কোনো অবস্থাতেই সামরিক কিংবা শিল্পজাত পণ্য আনা-নেয়ার কাজে ব্যবহার করা হবে না। জাহাজগুলো জাতিসংঘের প্রতীক ব্যবহার করবে। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ঝা উল্লেখ করেন যে, অনাহারে মৃত্যু নিয়ে ভারতের উদ্বেগ রয়েছে। তবে ত্রাণ বিতরণে যে সমীক্ষা চালানো হয়েছে তার ফলাফল গ্রহণযোগ্য। তিনি প্রশ্ন রাখেন, ভারত সরকার এক্ষেত্রে কিভাবে সাহায্য করতে পারে। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, এই ইস্যুতে বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বললে তা আদৌ কাজে আসবে কি না? তিনি উল্লেখ করেন যে, ত্রাণ কার্যক্রম অধিকতর ইতিবাচক উপায়ে প্রদর্শিত হওয়া উচিত। পূর্ব পাকিস্তানি জনগণ ধীর গতির ঘূর্ণিঝড় ত্রাণের সঙ্গে পরিচিত। ঝা বলেন, বরিশালের মতো এলাকায় ত্রাণ বিরতণ শুরু হওয়া উচিত। কারণ, সেখানে লজিস্টিকস গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি সুপারিশ রাখেন যে, সীমান্তের উভয় দিকের ত্রাণ কর্মকর্তাদের উচিত হবে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ রক্ষা করা। ঝা বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের যেসব বিষয়ে উদ্বেগ তা ভারত সরকারের মাধ্যমে না গিয়ে সরাসরি বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের কাছে পৌঁছে দেয়াই যুক্তিযুক্ত। উইলিয়ামস বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জাতিসংঘ মিশন বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে না। কিন্তু জাতিসংঘ অন্য কোথাও তাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেতে পারে। তবে যেখানেই হোক না কেন, বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভারত সরকারের ভালো সম্পর্ক এবং জাতিসংঘের ত্রাণ তৎপরতায় জনগণের স্পষ্ট সমর্থন সহায়ক হতে পারে। যদিও জাতিসংঘের সরাসরি যোগাযোগের এটা বিকল্প নয়। তিনি মনে করেন, এটা নির্দিষ্টভাবে একটা সুফল বয়ে আনতে পারে। যদি বাংলাদেশ বেতার এ মর্মে ঘোষণা দেয় যে, ক্ষুধার্ত জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়। ভেন হোলেন এ সময় বলেন, ভারত সরকার জনসমক্ষে যে নীতি গ্রহণ করেছে তার সঙ্গে এটি হবে সঙ্গতিপূর্ণ। ভারত এটা পুনর্ব্যক্ত করতে পারে যে, কেউ যাতে না খেয়ে মারা না যায়, তা ভারত দেখতে চায়। সে কারণেই আন্তর্জাতিক ত্রাণ তৎপরতায় ভারতের রয়েছে সমর্থন। বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দের প্রতি ভারতের প্রভাব তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বেশি। সুতরাং ভারত সরকার যদি সন্তুষ্ট হয় যে, জাতিসংঘের কর্মসূচি নিরপেক্ষ তাহলে তারা তাদের ওপর যেন কার্যকর প্রভাব খাটায়। ঝা এ সময় উল্লেখ করেন, মানবিক ত্রাণ তৎপরতায় অন্যান্য দেশও যদি অংশ নেয় তবে তা সহায়ক হবে। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে তারাও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। এক্ষেত্রে ভারত সরকারের জন্য রাজনৈতিকভাবে বিষয়টি সহজতর হবে। কারণ ভারত এই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কোরাশের সঙ্গে সুর মেলাতে চায়। আন্ডার সেক্রেটারি বলেন, ভারত যা চাইবে ঠিক সেভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন সাড়া দেবে বলে তিনি মনে করেন। ঝা মন্তব্য করেন, জাতিসংঘ ভারত সরকারের সঙ্গে নিরাপত্তা ইস্যু নিয়ে নিউইয়র্কে কতদূর অগ্রসর হয়েছে তা তিনি জানেন না। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র

সচিব নিউইয়র্কে পৌঁছাবেন। তখন এ নিয়ে বিস্তারিত আলাপ হবে। ঝা উইলিয়ামসের কাছে প্রশ্ন রাখেন, বর্তমান উদ্বাস্তু প্রবাহের কারণ সম্পর্কে তার মূল্যায়ন কী? উইলিয়ামস উত্তর দেন, উদ্বাস্তু সংখ্যা নির্ধারণ নিয়ে তিনি বড়ই বিপাকে আছেন। ভারত ও পাকিস্তানের এক্ষেত্রে দাবি পরস্পর বিরোধী। দুর্ভিক্ষ উল্লেখযোগ্য ফ্যাক্টর হিসেবে আবির্ভূত হবে না বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। উদ্বাস্তুদের প্রথম স্রোত ছিল রাজনৈতিক। দ্বিতীয় পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতা ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা ও উত্তেজনার সঙ্গে উদ্বাস্তু স্রোত তৈরির সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বলেন, ড. মালিকের নিয়োগে আমরা উৎসাহিত বোধ করছি। কারণ, হিন্দু-মুসলমানের ব্যাপারে তার একটি মডারেট পরিচিতি রয়েছে। আন্ডার সেক্রেটারি বলেন, উইলিয়ামসের কাছে রাষ্ট্রদূতের একটি প্রশ্নের আলোকে তিনি আরেকটি ইস্যু আলোচনায় আনতে চান। আর তা হলো গেরিলাদের প্রতি ভারতের সমর্থন। তিনি মন্তব্য করেন যে, অব্যাহত লড়াইয়ের কারণে সাম্প্রদায়িক সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার ফলে উদ্বাস্তুদের সংখ্যাও বেড়ে গেছে। বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি ভারত সরকারের সমর্থন দানের বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্র বুঝতে পারে। কিন্তু যুদ্ধই উদ্বাস্তু সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এর পরে গেরিলাদের যদি সমর্থন দান অব্যাহত রাখা হয়, অথবা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া হয়, তাহলে উদ্বাস্তু বিপদ আরো ভয়ানক হবে এবং ভয়ানক রূপ নেবে রেডিকালাইজেশন বা চরমপন্থা। যুক্তরাষ্ট্র আশা করে, ভারত সরকার উত্তেজনা যাতে বৃদ্ধি না পায় সে লক্ষ্যে সম্ভব সব কিছুই করবে। ঝা বলেন, এটা যদি মনে করা হয় যে, উদ্বাস্তুদের সংখ্যা সীমিত করার লক্ষ্যে ভারত সরকার চাইলেই গেরিলা তৎপরতা নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করে দিতে পারে তাহলে তা হবে ভুল। গত মার্চে বিপুলসংখ্যক পূর্ব পাকিস্তানি সৈন্য স্বপক্ষ ত্যাগ করেছে এবং তারা এখন পূর্ব পাকিস্তানে কেবল বেসামরিক প্রশাসন পেলেই সন্তুষ্ট থাকবেন না। একইভাবে, লড়াই থেমে গেলেও বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তু স্বদেশে ফিরতে অনিচ্ছুকই থেকে যাবে। তবে যদি প্রকৃতই কোনো বাঙালি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, সেক্ষেত্রের কথা আলাদা। ভারত সরকার এই মর্মে অঙ্গীকারবদ্ধ যে, সে যতদূর সম্ভব লড়াই এড়াতে চায় এবং পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে কোনো না কোনো মাত্রায় বজায় রাখতে চায় সম্পর্ক। আলোচনা এ পর্যায়ে রূপ নেয় উদ্বাস্তুদের সংখ্যা নিরূপণে। আন্ডার সেক্রেটারি উল্লেখ করেন যে, 'পাকিস্তান সরকার উদ্বাস্তুর সংখ্যা ২০ লাখ দাবি করছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারত সরকারের প্রদত্ত ৮০ লাখ উদ্বাস্তুর সংখ্যা ধরেই সব ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আমাদের জন্য বড়ই উপকার হবে, যদি আমরা সংখ্যা গণনায় স্বাধীন কোনো সংস্থা বা জাতিসংঘকে সম্পৃক্ত করতে পারি। কংগ্রেসকে সেক্ষেত্রে অধিকতর আস্থায় নেয়া সম্ভব হবে।' ঝা জবাবে বলেন, ভারত সরকার উদ্বাস্তুদের সংখ্যা যথেষ্ট যত্নের সঙ্গে সম্পাদন করেছে। যদি এটা যাচাই করা কংগ্রেসের জন্য জরুরি হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে উদ্বাস্তু সাব-কমিটির

চেয়ারম্যান কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন। কারণ তিনিই সম্প্রতি ভারত সফর করেছেন। ঝা বলেন, ভারত সরকার কিন্তু অর্থ সহায়তা পেতে কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে না। তিনি উদ্বিগ্ন যে, মার্কিন সরকার পাকিস্তানিদের প্রদত্ত পরিসংখ্যানকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করছে। আন্ডার সেক্রেটারি এদিনের আলোচনার ইতি টানেন এই বলে যে, জাতিসংঘ কর্তৃক গণনার প্রস্তাবে ভারতের যে প্রবল আপত্তি তা তারা বিবেচনায় নিয়েছেন। ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল স্টাফ কিসিঞ্জারকে দেয়া এক স্মারকে উল্লেখ করেন, সম্প্রতি বহুদলীয় বাংলাদেশ 'ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট' গঠন করা হয়েছে ভারতের তদারকিতে। এই ফ্রন্টের মধ্যে রয়েছে মস্কোপন্থি কমিউনিস্টরা। ওয়াকিবহাল সূত্রগুলোর বিশ্বাস, ভারতীয় ও সোভিয়েত চাপের কারণেই এই মস্কোপন্থি কমিউনিস্টদের লিবারেশন ফ্রন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে অন্তত বাংলাদেশ আন্দোলনের ভিত্তি ব্যাপকতা পেয়েছে এবং অবশিষ্ট যেসব পশ্চিমাপন্থি মডারেটরা রয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধে কট্টর বামপন্থিদের হাত শক্তিশালী হয়েছে। টি এন কাউল একইসঙ্গে প্রকাশ্যে বলেছেন, খুব শিগগিরই ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। ঘরোয়াভাবে কাউল এবং বিদেশনীতি-বিষয়ক অন্য উল্লেখযোগ্য উপদেষ্টারা ইন্দিরা গান্ধীকে বলেছেন, যুদ্ধ অনিবার্য।

ভাবতেই পারি না মুজিব মৃত : কিসিঞ্জার

সিআইএ পরিচালক হেলমস ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ (বাংলাদেশ সময় ২৭ মার্চের প্রথম প্রহরে) ওয়াশিংটনে স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠকে তথ্য দেন যে, মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন এবং তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ২৭ মার্চ দুপুরে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব দিল্লিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত কিটিংকে তলব করেন; এবং বলেন, তিনি কিছুক্ষণ আগেই রেডিও পাকিস্তানে শুনলেন, মুজিবকে আটক করা হয়েছে। স্বাধীনবাংলা বেতার অবশ্য এই খবর অস্বীকার করে বলেছে, বর্ণিত সময়ে মুজিব বাড়িতেই ছিলেন না। ৩১ মার্চ ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান্ট ক্লিমেন্টে সিনিয়র রিভিউ গ্রুপের বৈঠক বসে। এতে কিসিঞ্জার প্রশ্ন করেন– মুজিব কোথায়? জবাবে সিআইএর ডেভিড ব্লি বলেন, তাকে আটক করা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে। সম্ভবত কোয়েটায়। ৮ এপ্রিল, ১৯৭১ পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড স্টেট ডিপার্টমেন্টকে জানান, মুজিবকে হয়তো পশ্চিম পাকিস্তানের আত্মক ফোর্টে অন্ত রীণ রাখা হয়েছে। ১৩ মে, ১৯৭১ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেন, সকল রাজনৈতিক দলসহ ভারতীয় জনগণ শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপারে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এ ব্যাপারে পাকিস্তানি প্রেসিডেন্টের কাছে আপনার পাঠানো যে কোনো বার্তা আমাদের ভরসা দেবে। ২২ মে, ১৯৭১ করাচিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে ইয়াহিয়া বলেন, তিনি মনে করেন, শেখ মুজিব মহা অপরাধ করেছেন। সাংবিধানিক আদালতে তার বিচার হবে। তবে তার বিচার হবে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ। রাষ্ট্রদূত উল্লেখ করেন, আমি এ পর্যায়ে বললাম, একজন আইনজীবী হিসেবে প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণ শুনে আমার মনে হয়েছে মুজিব ইতোমধ্যেই 'প্রিজাজড'। তাছাড়া শেখ মুজিবের প্রতি রয়েছে ব্যাপক মাত্রায় আন্তর্জাতিক সহানুভূতি। সুতরাং তাকে দণ্ড দেয়ার মতো একটি বিষয় বিবেচনার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের উচিত হবে, বিশ্ব জনমতকে গুরুত্ব দেয়া। আমার এ কথা শুনে ইয়াহিয়া হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না। তবে তার অভিব্যক্তি যে নেতিবাচক ছিল তা-ও নয়। তিনি ইঙ্গিত দেন যে, বিষয়টি ভেবে দেখবেন। ১৪ জুন, ১৯৭১ ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের হেরাল্ড স্যান্ডার্স ও স্যামুয়েল হসকিনসন কিসিঞ্জারকে ধারণা দেন যে, ভারতীয়রা আশা করে, পূর্ব পাকিস্তানে সরকার গঠনে ইয়াহিয়ার উচিত হবে মুজিবকে মুক্তি দেয়া। তাদের মতে, শুধু এক মুজিবকে ছেড়ে দিলে উদ্বাস্তু প্রত্যাগমনে

বিদ্যুৎ গতির প্রভাব পড়বে। ২৮ জুন, ১৯৭১ পাকিস্তান সফররত মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উদ্বাস্তু ও অভিবাসন-বিষয়ক বিশেষ সহকারী এল. কিলগকে ইয়াহিয়া বলেন, মিসেস গান্ধী মুজিবের সঙ্গে গোপন আঁতাতের মাধ্যমে বর্তমান সংকটের সৃষ্টি করেছেন। ৭ জুলাই, ১৯৭১ দিল্লিতে মুজিবকে বাদ দিয়ে সমাধান-সংক্রান্ত কিসিঞ্জার উত্থাপিত এক প্রশ্নের জবাব ইন্দিরা গান্ধী এড়িয়ে যান। এদিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং কিসিঞ্জারকে বলেন, ২৮ জুন মুজিবের ব্যাপারে ইয়াহিয়া যে মন্তব্য করেছেন তা পরিস্থিতির উন্নয়নে সহায়ক নয়। মি. সিং অবশ্য পরে একান্ত বৈঠকে উল্লেখ করেন যে, মুজিবকে অন্তর্ভুক্ত করেই সমঝোতায় পৌছাতে ভারতের কোনো চাপ নেই। দিল্লি শুধু এটুকু দেখতে চায় যে, সমাধানটি বেসামরিক ও অসাম্প্রদায়িক। এটা যেন হিন্দুবিরোধী না হয়। ১২ জুলাই, ১৯৭১ ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল প্রণীত পর্যালোচনামূলক এক দলিলে উল্লেখ করা হয় যে, আমরা ইয়াহিয়াকে এটা স্পষ্ট করতে পারি যে, আওয়ামী লীগই পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র দল, যার জনপ্রিয় ভিত্তি রয়েছে এবং মুজিবই একটা গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমঝোতায় বাঙালিদের রাজি করাতে সক্ষম। ২৩ জুলাই, ১৯৭১ ওয়াশিংটনে সিনিয়র রিভিউ গ্রুপের বৈঠকে অ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারি যোশেফ সিসকো উল্লেখ করেন যে, মুজিবের যাতে বিচার না হয়, সে ব্যাপারে আমরা কতটা কী করতে পারি তা খতিয়ে দেখা উচিত। আমি এ নিয়ে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত হিলালির সঙ্গে কথা বলব। এর আগের দিন ইসলামাবাদের মার্কিন দূতাবাস এক টেলিগ্রাম বার্তায় উল্লেখ করে যে, আমরা এ মর্মে গুজব শুনছি যে, সামরিক আইন প্রশাসন শেখ মুজিবের গোপন বিচারের তোড়জোড় চালাচ্ছে। উল্লেখ্য, এ সময়টাতে কলকাতায় মোশতাক-কাইউমের সঙ্গে মার্কিন মিশনের কথাবার্তা চলছিল। মার্কিন নথিপত্র অনুযায়ী এই আলোচনার সব পর্যায়ে উল্লেখ করা হয় যে, যে কোনো সমঝোতায় মুজিবকে রাখতেই হবে। ১১ আগস্ট, ১৯৭১ ওয়াশিংটনে ভারতের রাষ্ট্রদূত এল কে ঝা নিক্সনকে লেখা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর একটি সংক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত বার্তা পৌঁছে দেন। এতে উল্লেখ করা হয় 'ভারতের সরকার, জনসাধারণ, সংবাদপত্র ও পার্লামেন্ট কোনো প্রকারের বিদেশী আইনি সহায়তা ছাড়াই শেখ মুজিবের গোপন বিচার প্রশ্নে ইয়াহিয়ার কথিত বিবৃতিতে দারুণভাবে বিচলিত বোধ করছে। আমাদের আশঙ্কা তথাকথিত এই বিচার শেখ মুজিবের ফাঁসির দণ্ডের প্রচারকার্যেই ব্যবহার করা হবে। এতে পূর্ববাংলার পরিস্থিতি আরো নাজুক হবে। ভারতেও এর মারাত্মক প্রভাব পড়বে। কারণ মুজিবের প্রতি রয়েছে আমাদের জনগণ ও সকল রাজনৈতিক দলের তীব্র অনুভূতি। আমরা এই অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বৃহত্তর স্বার্থে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ওপর আপনার প্রভাব বিস্তারের জন্য আবেদন জানাই।' ২২ জুলাই সৈয়দ নজরুল ইসলামও নিক্সনের কাছে এক টেলিগ্রাম বার্তায় মুজিবের বিচার প্রশ্নে হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়। ১১ আগস্ট, ১৯৭১ নিক্সনের সভাপতিত্বে সিনিয়র রিভিউ গ্রুপের বৈঠকে সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিসকো অভিমত

দেন যে, কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সমাধানে আমাদের যে কোনো ব্লুপ্রিন্ট নেই তা জানিয়ে দিয়েও আমরা বন্ধুত্ব বজায় রাখতে পারি। তবে একটা সুপারিশ আমরা রাখতে পারি যে, পাকিস্তানিরা যেন রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে বিচারাধীন আওয়ামী লীগ নেতা মুজিবুর রহমানের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর না করে। নিক্সন মন্তব্য করেন, আমরা সাহায্য বন্ধ করিনি। ইয়াহিয়ার সঙ্গেও রয়েছে ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক। সুতরাং তিনি যদি পুরোপুরি ফাঁদে না পড়েন তাহলে এ কথাই তিনি হয়তো সায় দেবেন। ইয়াহিয়া মনে করেন, ফারল্যান্ড তার বন্ধু। 'মুজিবকে হত্যা করো না'– এমন সুপারিশ ইয়াহিয়ার কাছে ফারল্যান্ড রাখতে পারেন। নিক্সন আরো মন্তব্য করেন, আমাদের উচিত হবে, রাজনৈতিক সমঝোতা প্রশ্নে জনসমক্ষে নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখা। তবে ঘরোয়াভাবে আমরা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে বলতে পারি, মুজিবকে তার হত্যা করা উচিত হবে না। ১৭ আগস্ট ১৯৭১ ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠকে জন এন আরউইন উল্লেখ করেন যে, মুজিবকে ফাঁসিতে ঝোলানো হলে তা কিন্তু পরিস্থিতিতে বিরাট পরিবর্তন বয়ে আনতে পারে।

কিসিঞ্জার : আমরা কি জানতে পারি, বিচার নিয়ে কী চলছে?

অ্যাডমিরাল থমাস এইচ মুরার : আশা করা হচ্ছে দুমাস লাগবে।

হেলমস: অক্টোবর পর্যন্ত।

আরউইন : ভারতকে আমরা সংযত থাকতে এবং ভয় দেখাতে পারি। ভারতীয়রা যেসব কারণে অগ্রসর হতে পারে তার মধ্যে কিছু সামরিক ঘটনা, একটি দুর্ভিক্ষ অথবা মুজিবের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা।

২০ আগস্ট, ১৯৭১ পাকিস্তান দূতাবাস থেকে স্টেট ডিপার্টমেন্টে প্রেরিতে টেলিগ্রামের বিষয়বস্তু ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার। ফারল্যান্ড লিখেছেন, 'আমার ধারণা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আমার সঙ্গে একাকী কথা বলতে সাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। ১৯ আগস্ট, ১৯৭১ তার সঙ্গে কথা বলার এমন একটা সুযোগ এল'। আমি তাকে যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে বললাম– দেখুন, আমি আপনাকে এমন একটা কথা বলতে চাই যা একান্তভাবেই পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়। কিন্তু আমি খুব স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারছি যে, এই বিষয়টির সঙ্গে নিশ্চিতভাবে এবং নির্দিষ্টভাবে কার্যত মানবিক ও অর্থনৈতিক সব ধরনের সহায়তা যার সঙ্গে আমার সরকার সম্পৃক্ত রয়েছে, তাকে প্রভাবিত করবে। এছাড়াও এর সঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যারও সম্পর্ক রয়েছে, যা কিনা ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক চেহারা পেয়েছে। আমি ইয়াহিয়াকে বললাম, বিশ্বের সব না হলেও অধিকাংশ জাতি অধীর আগ্রহে এবং উদ্বেগের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার প্রক্রিয়ার দিকে নজর রাখছে। আর সবাই না হলেও তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই কিন্তু সেই বিচারের ফলাফল সম্পর্কে একটা ধারণা পোষণ করছে এবং তারা সে কারণে উদ্বিগ্ন।

(ফুটনোট : ১১ আগস্ট পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স ওয়াশিংটনের নিযুক্ত পাক রাষ্ট্রদূত

হিলালির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। মুজিবের বিচার প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে যে উদ্বেগ তা তিনি তাকে অবহিত করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে, এই বিচার প্রক্রিয়া বিলম্বিত হবে। হিলালি বলেছেন, তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই উদ্বেগ সম্পর্কে ইসলামাবাদের কাছে রিপোর্ট করবেন। এই বিষয়টি ২৪ আগস্ট নিক্সনকে দেয়া কিসিঞ্জারের এক স্মারকে উল্লেখিত হয়েছে।) ফারল্যান্ডের বর্ণনায়, আমি বিষয়টির ইতি টানলাম এই বলে যে, একজন বন্ধু হিসেবে আপনাকে এ কথাটা না জানিয়ে পারলাম না। আমার সুপারিশ হচ্ছে, শেখ মুজিবের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবেন না। এই ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হলে, আমার বিশ্বাস, এটা তার সরকারের যেমন, তেমনি ব্যক্তিগতভাবে নিজের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী হবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বললেন, তিনি আমাকে এবং আমার সরকারের উচ্চ পর্যায়কে আশ্বস্ত করতে চান। তিনি ইঙ্গিত দেন, এ প্রসঙ্গে আমার উদ্বেগের ভিত্তি নেই। তার কথায়, মুজিবের বিচার যাতে সুষ্ঠু হয়, সেজন্য ভাবনার কারণ নেই। তিনি পাকিস্তানের যোগ্যতম আইনজীবী এ কে ব্রোহিকে মুজিবের আইনজীবী হিসেবে পেয়েছেন। মিলিটারি ট্রাইবুনালকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মুজিবের বিচার অবশ্যই সর্বোচ্চ সতকর্তার সঙ্গে পরিচালনা করতে হবে। কোনো প্রকার পক্ষপাত অথবা আগাম মূল্যায়নের বশবর্তী হলে চলবে না এবং রায় সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত পৌছানো হোক না কেন, তার রেকর্ড অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ হতে হবে। ইয়াহিয়া আরো উল্লেখ করেন যে, যে অভিযোগে বিচারকার্য চলছে তাতে মৃত্যুদণ্ডের সম্ভাবনাই বেশি। তবে এ ব্যাপারে তার একটি পরিকল্পনা আছে। মুজিবের যদি মৃত্যুদণ্ড হয় তাহলে তার পক্ষে ক্ষমা প্রার্থনার একটি আবেদন জানানো হবে। আর সেক্ষেত্রে তিনি আবেদন মঞ্জুর করবেন। ইয়াহিয়া বলেন, আমি যখন মুজিবের তরফে ক্ষমা প্রার্থনার আবেদনটি পাব তখন সিদ্ধান্ত নেব না। ভাবনা-চিন্তার কথা বলে কাটিয়ে দেব কয়েক মাস। বেসামরিক সরকার ঘটনের আগ পর্যন্ত আমি এভাবেই কালক্ষেপণ করতে চাই। আর যখন মুজিবকে ক্ষমা করে দেয়ার প্রশ্নটি বেসামরিক সরকারের এজেন্ডা হবে তখন তার মৃত্যুদণ্ড লাভের তেমন কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না।

আমি প্রেসিডেন্টের কথা শুনে এ প্রসঙ্গে যবনিকাপাত ঘটালাম এই বলে যে, আপনি যা বলেছেন, সেটা ভালোই। তবে এই সমস্যার সমাধানে আপনি অধিকতর বিবেচনা করবেন বলে আমি আশা করি। জবাবে ইয়াহিয়া বলেন, আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি যে, এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হবেন না। আমি কারো মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করতে যাচ্ছি না, যদিও তিনি একজন বিশ্বাসঘাতক হয়েও থাকেন। (ফুটনোট : ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ ইয়াহিয়ার সঙ্গে মুজিবের বিচার প্রশ্নে ফারল্যান্ড আবারও কথা বললেন। ফারল্যান্ড সংবাদপত্রের রিপোর্টের বরাত দিয়ে জানতে চান যে, মুজিবের বিচার শেষ হয়েছে কি না? ট্রাইবুনাল কি ইয়াহিয়ার কাছে সুপারিশ পেশ করেছে? ইয়াহিয়া জবাব দিয়েছেন, বিচার চলছে। তবে তার ইচ্ছা রয়েছে, এই বিচারের পূর্ণ

বিবরণ তিনি জনসমক্ষে প্রকাশ করবেন, যাতে মানুষ বুঝতে পারে বিচার অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে। ফারল্যান্ড জানতে চান, বিচারের পরেও পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য তিনি কি মুজিবকে 'তুরুপের তাস' হিসেবে আগের মতোই গণ্য করার কথা কি বিবেচনায় রেখেছেন? ইয়াহিয়া ইঙ্গিত দেন, এই সম্ভাবনার বিষয়ে তিনি ভেবে দেখবেন। তবে তিনি এ কথা উল্লেখ করেন যে, মুজিবের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার সাক্ষ্যপ্রমাণ এতই অকাট্য যে, তাকে মুক্তি দেয়া হলে পশ্চিম পাকিস্তানে তার প্রতিক্রিয়া হতে পারে ভয়ানক।) ৩১ আগস্ট মুজিবের বিচার প্রশ্নে আরেকটি নির্দিষ্ট টেলিগ্রাম স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে ভারতীয় মার্কিন দূতাবাসে প্রেরণ করা হয়। এতে বলা হয়, 'ভারতীয়রা যেহেতু মুজিবের বিচার প্রশ্নে আমাদের কাছ থেকে লিখিত কোনো উত্তর চাইতে পারে, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রদূত কিটিং প্রেসিডেন্টের পক্ষে পররাষ্ট্র সচিব কাউলকে একটা মৌখিক বক্তব্য জনিয়ে দিতে পারেন। রাষ্ট্রদূত এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুসরণ করবেন : 'প্রেসিডেন্ট মিসেস গান্ধীর কাছ থেকে বার্তা গ্রহণ করেছেন এবং যত্নের সঙ্গে তা বিবেচনায় নিয়েছেন। মুজিবের বিচারপ্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গভীর আগ্রহ রয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স মুজিবের সংক্ষিপ্ত বিচার প্রশ্নে আমাদের উদ্বেগ পাকিস্তানকে জানিয়ে দিয়েছেন। ভবিষ্যতের যে কোনো উপযুক্ত উপলক্ষে আমরা আমাদের এই উদ্বেগ জানানো অব্যাহত রাখতে চাই, এটা শুধু মানবিক কারণে নয়। কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে, মুজিবের বিচার এবং তার সম্ভাব্য মৃত্যুদণ্ড দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ।' ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠকে কিসিঞ্জার হঠাৎ প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বললেন, সিনেটর কেনেডি আজ আমার সঙ্গে দেখা করেন। তার আশঙ্কা মুজিবরকে সম্ভবত ইতোমধ্যেই মেরে ফেলা হয়েছে। আপনাদের কী মনে হয় এটা সম্ভব?

সিসকো : ইয়াহিয়া রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে নির্দিষ্টভাবে বলেছেন, মুজিবকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে না।

হেলমস : মুজিব মৃত এই গুজবের স্বপক্ষে আমাদের কাছে কোনো তথ্য নেই।

কিসিঞ্জার : আমি এটা কেনেডিকে বলেছি এবং তিনি জানতে চেয়েছেন, তার কোনো ছবি কেন ছাপা হচ্ছে না। আমরা কি আসলেই নিশ্চিত যে মুজিব বেঁচে আছেন?

উইলিয়ামস : এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, তিনি বেঁচে থাকবেন না, আর তারা একটা বিচারের কথা ঘোষণা করবে, আরো বলবে মুজিবের জন্য খ্যাতিমান আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে।

কিসিঞ্জার : আমি কিন্তু কল্পনাও করতে পারি না যে, মুজিব মৃত।

উইলিয়ামস : তারা আমাকে নিশ্চয়তা দিয়েছিল মুজিবের বিচার করা হবে। মৃত মুজিবের চেয়ে তাদের কাছে জীবিত মুজিবের অনেক মূল্য। ৭ অক্টোবর, ১৯৭১

স্পেশাল গ্রুপের বৈঠকে সিআইএ পরিচালক হেলমস বলেন, দেশদ্রোহিতার অভিযোগে মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার পূর্ব পাকিস্তানকে বিক্ষুব্ধ করেছে। একটি বিশ্বস্ত সূত্র বলেছে, মুজিবকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। ইয়াহিয়া এই দণ্ড সমুন্নত, হ্রাস কিংবা ঝুলিয়ে রাখতে পারেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রশ্নে আসলেই কী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন তা এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে বোঝা যাবে। জনসন মন্তব্য করেন, মুজিবুর এখনো সমঝোতার চাবি। ইয়াহিয়া যদি তাকে মুক্তি দেন এবং তার সঙ্গেই যদি একটা আপোসে আসেন... কিসিঞ্জার তার কথা লুফে নিয়ে দ্রুত বললেন– আমি মনে করি এটা অসম্ভব। এমন কিছুর জন্য ইয়াহিয়াকে শতকরা একশ ভাগ বদলাতে হবে। গত জুলাইতে আমি তাকে যা দেখলাম!

জনসন : আমি একমত, যে এটা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা কিছু ইঙ্গিত পেয়েছি।

ভ্যান হোলেন : রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড সম্প্রতি ইয়াহিয়ার কাছে প্রস্তাব দিয়েছেন যে, তিনি মুজিবরের সঙ্গে একটি ডিল করবেন এবং মজার ব্যাপার হলো এ কথা শুনে ইয়াহিয়া তার স্বাভাবিক নেতিবাচক মনোভাব দেখাননি। এটা হয়তো ইঙ্গিতপূর্ণ যে, তারা মুজিবের সঙ্গে সমঝোতার পরিকল্পনা করছেন। তবে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ না পেলে এটা ভীষণভাবে অনুমাননির্ভরই থেকে যাবে।

হেলমস : মিসেস গান্ধী তার একটি দীর্ঘ তালিকা সোভিয়েতের কাছে হস্তান্তর করেছেন। তিনি তাদের বলেছেন, মুজিবের জন্য সহায়ক একটি উপযুক্ত উপায় খুঁজে বের করতে।

মুজিবের মুক্তিতে কিসিঞ্জারের হস্তক্ষেপ

৮ অক্টোবর, ১৯৭১

ওয়াশিংটনে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এল কে ঝা ড. হেনরি কিসিঞ্জারের সঙ্গে এদিন আলোচনা করেন, বিকেল ৪টা ১১ থেকে ৪টা ৫৮ মিনিট পর্যন্ত। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আসন্ন যুক্তরাষ্ট্র সফরকে সামনে রেখে ঝায়ের অনুরোধে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। হোয়াইট হাউসে কিসিঞ্জারের দপ্তরে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকের বিবরণ থেকে দেখা যায়, কিসিঞ্জার ঝাকে বলেছিলেন একটি রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য এক বছরের একটা বিরতি দরকার। ঝা এ কথার জের ধরে বলেন– ভারত কিন্তু এ বছরের শেষ নাগাদ কিছু একটা সামরিক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। ১ কোটি বাঙালি উদ্বাস্তু ভারতের রাজনৈতিক সংহতি ভেঙে দেবে। তারা সবাই বাঙালি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে কোথাও যাবে না। আর পশ্চিমবঙ্গে তারা ক্ষমতার ভারসাম্য সম্পূর্ণরূপে মাওবাদী ঘরানার দিকে নিয়ে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা, যুদ্ধের চেয়েও অর্থনৈতিক ক্ষতি ভারতকে নিয়ে যাবে দেউলিয়াত্বের দ্বারপ্রান্তে। ড. কিসিঞ্জার জবাবে বলেন, আপনাদের একটা কথা বলে দিতে চাই, আপনারা যদি যুদ্ধ শুরু করেন, আমরা তাহলে সব ধরনের অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করে দেব। সুতরাং যুদ্ধ শুরু করতে চাইলে এই খেসারতটা বিবেচনায় রাখবেন। এদিনের আলোচনার এক পর্যায়ে রাষ্ট্রদূত ঝা হঠাৎ প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলেন, আমি একটি বিষয়ে আপনার হস্তক্ষেপ কামনা করছি। আপনার পক্ষে যদি সম্ভব হয়, তাহলে মুজিবকে মুক্তি দিতে পাকিস্তানকে একটা আবেদন জানাবেন, মুজিব যাতে বাঙালির রাজনৈতিক জীবনে পুনঃপ্রত্যাবর্তন করতে পারেন। ঝা ব্যাখ্যা দেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি উদারপন্থিদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতেই এটা প্রয়োজন। কলকাতায় অবস্থানরত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী (খন্দকার মোশতাক আহমেদ) ইতোমধ্যেই মাওবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন।

১১ অক্টোবর, ১৯৭১ করাচির কনসাল জেনারেল ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনার বরাত দিয়ে জানাচ্ছেন, আমি প্রেসিডেন্টকে বললাম– রাজনৈতিক সমঝোতায় আপনার আগ্রহে আমি বেশ প্রীত বোধ করছি। কিন্তু 'নির্বাচিত পূর্ব পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ' এর সঙ্গে আলোচনার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মনে এই সম্ভাবনা এখনো উঁকি দেয় যে, বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের একটি সংলাপ সম্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে জটিল ও অব্যাহতভাবে আকর্ষণীয় তা হলো শেখ মুজিবুর রহমানের

অংশগ্রহণ। তিনি এখনো পূর্ব পাকিস্তানি জনগণের অনুপ্রেরণার উৎস। ইয়াহিয়া বললেন, তিনি কিন্তু এটা অস্বীকার করছেন না যে, মুজিব এখনো পর্যন্ত এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। তবে তিনি উল্লেখ করেন যে, গত বছরে নির্বাচনের সময় মুজিবের শক্তি সম্পর্কে তারা সম্ভবত খুব বেশি অনুমান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের একটি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ভোটার ডিসেম্বরের নির্বাচনে ভোট দেননি। যারা মুজিবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন, তাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের', অর্থাৎ তারা হিন্দু। যারা ভোট দেননি তাদের অনেকেই পরে নিগ্রহের শিকার হয়েছেন। আরেকটি পৃথক টেলিগ্রামে দেখা যায়, মার্কিনিরা পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি মুজিবকে রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য 'তুরুপের তাস' হিসেবে ব্যবহার করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। কনসাল জেনারেল লিখেছেন, আমি ইয়াহিয়ার কাছে নির্দিষ্টভাবে জানতে চাইলাম– মুজিবকে তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করার বিষয়ে তার নতুন কোনো পরিকল্পনা রয়েছে কি না? জবাবে ইয়াহিয়া বলেন, মুজিবের বিচার তো এখনো চলছে। তিনি যদি দোষী সাব্যস্ত হন, তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়াটাই স্বাভাবিক। বিষয়টি তখন তার কাছে আসবে এবং রাষ্ট্রপতি হিসেবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার তার থাকবে। ইয়াহিয়া এ কথা অবশ্য আমাদের আগেও জানিয়েছেন। তিনি পুনর্ব্যক্ত করলেন যে, মুজিবের মৃত্যু তিনি নিশ্চিত হতে দেবেন না। আর যখন বেসামরিক সরকার ক্ষমতায় আসবে অর্থাৎ ইয়াহিয়া রাজনৈতিক সমঝোতা সফল হওয়া সাপেক্ষে নতুন বেসামরিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন, সেই সরকারে সঙ্গত কারণে পূর্ব পাকিস্তানিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে। আর তারাই মুজিবের দণ্ডের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। ইয়াহিয়ার ইঙ্গিত স্পষ্ট যে, সেই বেসামরিক সরকার নিশ্চিতভাবেই মুজিবকে রক্ষা করবে। আমি বললাম, আপনি যেসব সময়ের কথা বলছেন, তা তো সুদূরপ্রসারী। কে জানে এমন দিন কত দূরে! কিন্তু আমার এখনই জানতে ইচ্ছা করছে, রাজনৈতিক সমঝোতা এবং মুজিবের ভূমিকার প্রশ্নে আপনার কাছে নতুন কিছু প্রকাশের মতো আছে কি না? আমি তাকে আরো স্মরণ করিয়ে দিলাম, আপনি বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করতে চান ভালো কথা। কিন্তু মুজিবের ভূমিকাই তো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ পাকিস্তান সরকার ও বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে কোনো প্রত্যক্ষ আলোচনা শুরুর জন্য মুজিব ছাড়া তো উপায় নেই। আমি ইয়াহিয়াকে আরো মনে করিয়ে দিলাম, এ ধরনের আলোচনায় পাকিস্তান সরকারের অংশগ্রহণ প্রশ্নে তার প্রস্তুতি রয়েছে বলে তিনি আমাদের ইতঃপূর্বে জানিয়েছেন। আমি তাকে বললাম, কলকাতায় বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দের ওপর এই মুহূর্তে বহুমুখী চাপ। আলোচনার উদ্যোগ নেয়ার ক্ষেত্রে তারা সক্ষম হতে পারছে না। এর মধ্যে একটি বড় কারণ হলো এ ধরনের সংলাপে মুজিবের ভূমিকা থাকতেই হবে।

ইয়াহিয়া আমার কথা শুনে বললেন, সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে তিনি তো স্বাধীন নন,

সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের জনমত মুজিবের অনুকূলে নয়। তারা মুজিবের নিন্দায় উচ্চকিত। আজ যদি মুজিবকে আমি মুক্ত করে দেই তাহলে একজন পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনৈতিক নেতাও পাওয়া যাবে না, যিনি এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাবেন। তার সঙ্গে তারা সংলাপেও বসবে না। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধানরাও মুজিবের সঙ্গে কথা বলতে নারাজ। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে তিনি এসব দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। ইয়াহিয়ার কথায় এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের শ্রদ্ধেয় প্রবীন নেতা নূরুল আমীনও রয়েছেন। ইয়াহিয়া বলেন– দেখুন, মুজিব নিয়ে আমার ভাবনা আপনাকে আমি বলতে পারি। আজ আমি যদি মুজিবকে ক্ষমা করে দেই তাহলে জনগণ আমাকে চেপে ধরবে। তারা বলবে, কেন তাহলে এত দুঃখ ও ডামাঢোল। তারা প্রশ্ন তুলবে, তাহলে ইয়াহিয়া কেন গদিতে টিকে থাকবে? যদিও ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমতার প্রতি আমার কোনো মোহ নেই, কিন্তু দেশ ও জাতির স্বার্থে জটিল সমস্যা মোকাবেলায় তার তো কর্তব্য রয়েছে। তিনি বলেন, আমি একজন নিষ্ঠুর লোক নই, একজন স্বাভাবিক আদম সন্তান। মুজিবের প্রতি আমার কোনো ব্যক্তিগত ক্ষোভ নেই। কিন্তু সাম্প্রতিক ইতিহাসের ঘটনাবলিকে আমি উপেক্ষা করতে পারি না।

কনসাল জেনারেল রেনল্ডস এ পর্যায়ে মন্তব্য করেন যে, 'যদিও বিশ্ব জনমতের দিক থেকে মুজিব প্রশ্নে ইয়াহিয়া সম্ভবত সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীলতা সহ্য করেছেন কিন্তু তিনি তার কথাবার্তায় কোনোভাবেই তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাননি। আমাদের আলোচনার এই অংশে তিনি কোনোভাবেই অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। বিপরীতক্রমে, তার ওপর এক্ষেত্রে যেসব চাপ এসেছে তিনি তা শান্তভাবে ব্যাখ্যা করেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি তার অবস্থানের যৌক্তিকতা তুলে ধরতেও ছিলেন উদগ্রীব। তিনি সম্ভবত আমাকে এমন ধারণা দিলেন যে, তিনি এখন যা করছেন তার সবটাতেই ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটছে না। তার সামনে বিকল্প সীমিত। কিন্তু তাকে চলতেই হচ্ছে।

১২ অক্টোবর, ১৯৭১

ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ কিটিং বৈঠক করেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং ও পররাষ্ট্র সচিব কাউলের সঙ্গে। কিটিং প্রেরিত টেলিগ্রামে বলা হয়, সিং দাবি করেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহ বাঙালি জাতীয়তাবাদের শেকড়ে প্রোথিত। এটি তার নিজস্ব গতিতে বেগবান, ভারতের ওপর নির্ভরশীল নয়। পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যেই বিদ্রোহ ব্যাপক ও গভীরভাবে ক্রিয়াশীল। আন্তঃসীমান্ত তৎপরতার বিষয়টি অতিরঞ্জন ছাড়া কিছুই নয়। তবে এটাই বাস্তবতা যে, যা কিছুই ঘটুক না কেন, ভারত সরকার কিছুতেই পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের ভারতে আগমণ বা প্রস্থানের সময় গুলি করে হত্যা করতে পারে না। সিং উল্লেখ করেন যে, বিদ্রোহ কতদিন ধরে চলবে এবং তা কালক্রমে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি আক্রমণ নিশ্চিত করে কি না তা নির্ভর

করছে পাকিস্তান সরকারের ওপর। তার কথায়, বিদ্রোহ বর্তমানে যে মাত্রায় চলছে তা কার্যত পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর নিপীড়নের প্রতি মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়া মাত্র। কিটিং লিখেছেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ভারত সরকার ভালোভাবেই অবগত রয়েছে যে, মার্কিন কর্মকর্তারা বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। তাদের কাছে এই খবরও রয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানি জেনারেল ও আওয়ামী লীগের কতিপয় লোকের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে ভারত সরকারের আরজি হচ্ছে, কোনো প্রকৃত রিকন্সিলিয়েশন চাইলে তা যুক্তরাষ্ট্রের উচিত জনসমক্ষে আনা। কিন্তু যদি তারা আওয়ামী লীগের মধ্যে ভাঙন ধরাতে চায় তাহলে তাদের পক্ষে তা হবে এক বিরাট ভুল। বর্তমান পরিস্থিতি খুবই সোজাসাপটা। ইয়াহিয়া চাইলেও মুজিব এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে উপেক্ষা করতে পারেন না। কারণ তাদের হাতেই পূর্ব পাকিস্তানের সত্যিকারের নেতৃত্ব।

কিন্তু পাকিস্তান যদি কোনো অজুহাতে ভারতের সঙ্গে ঝামেলা পাকাতে আসে তাহলে ভারত নিজেকে রক্ষা করবেই। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, এমন ঘটনাবলি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। সিং আরো উল্লেখ করেন, 'দয়া করে আপনার সরকারকে জানিয়ে দিন, আমরা কোনো প্রকার উত্তেজনা বা ভয়ের বশবর্তী হয়ে কথা বলছি না। আমরা এই প্রশ্ন রাখছি– কেন ওয়াশিংটন এমনটা ভাবতে বসেছে যে, পাকিস্তান যদি কিছু শুরু করে তাহলে তা কেন ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করবে? আমরা দুদেশের মধ্যে যে কোনো ধরনের ভুল বুঝাবুঝির অবসানের সম্ভব সব চেষ্টাই চালিয়ে যাব। এ বিষয়টি আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন যুক্তরাষ্ট্র সফরকে সামনে রেখে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছি। মিসেস গান্ধী যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভুল বুঝাবুঝির সম্পূর্ণ অবসান দেখতে আগ্রহী। কিন্তু তার পরেও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে তার বোঝা বহন করা তার জন্য হবে দুর্ভাগ্যজনক।'

কিটিং লিখেছেন– আমি তাকে বললাম, আমি কখনোই বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিনি। যদিও আমার কতিপয় জুনিয়র কর্মকর্তা কলকাতা ও দিল্লিতে অনানুষ্ঠানিকভাবে শ্রবণ করেছে তাদের কাহিনী। আমি এ সময় তার কাছে কমিউনিস্টপন্থি 'পেট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রকাশিত অভিযোগের দিকে তার মনোযোগ আকর্ষণ করি। অভিযোগ হচ্ছে– আমি মুক্তিবাহিনী ও আওয়ামী লীগের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও বিভেদ সৃষ্টি করতে চেয়েছি। আমি বললাম, আমাদের তো তেমন কিছু করার ক্ষমতা নেই। পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করলাম, আমরা তেমন কিছুই করিনি। তবে আমি স্বীকার করলাম যে, আমরা এই মর্মে কিছু বিরোধাত্মক কথাবার্তা জানতে পেরেছি। শুনেছি, বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দ ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কিন্তু এমন কিছুর অবনতি দেখা কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এটা জানা আছে যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং

আওয়ামী লীগের মধ্যে সংলাপের চেষ্টা চলছে। পেট্রিয়ট পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি জানার কোনো প্রয়োজন মনে করে না ভারত সরকার। আমি তাকে বললাম, একটা সংলাপ অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা দৃশ্যত এখনো বিরাজমান। কিন্তু উক্তরূপ মতবিরোধ থেকে ফায়দা লোটার কিছু নেই। যা হোক সিং বললেন, যুক্তরাষ্ট্র মুজিবকে বাইপাস করতে চাইছে। আমি তাকে বললাম, ওয়াশিংটনের নির্দেশনার ভিত্তিতে ইসলামাবাদের মার্কিন দূতাবাস সবেমাত্র প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সংলাপ অনুষ্ঠানের তাগিদ দিয়েছে। আমি স্পষ্টতই মুজিবের কথা ইঙ্গিত করলাম। এর পরে আমি নির্দিষ্ট করে বললাম, ইয়াহিয়া যদি মুজিবের সঙ্গে সংলাপে বসেন তাহলে যুক্তরাষ্ট্র হবে উৎফুল্ল।

মুজিবকে চ্যালেঞ্জ করবে মুক্তিযোদ্ধারাই

১২ অক্টোবর, ১৯৭১

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং দিল্লিতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ কিটিংকে আরো বললেন, পাকিস্তান যদি কোনো অজুহাতে ভারতের সঙ্গে ঝামেলা পাকাতে আসে, তাহলে ভারত নিজেকে রক্ষা করবেই। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, এমন ঘটনাবলি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। সিং আরো উল্লেখ করেন, 'দয়া করে আপনার সরকারকে জানিয়ে দিন, আমরা কোনো প্রকার উত্তেজনা বা ভয়ের বশবর্তী হয়ে কথা বলছি না। আমরা এই প্রশ্ন রাখছি– কেন ওয়াশিংটন এমনটা ভাবতে বসেছে যে, পাকিস্তান যদি কিছু শুরু করে তাহলে তা কেন ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করবে? আমরা দুদেশের মধ্যে যে কোনো ধরনের ভুল বোঝাবুঝির অবসানের সম্ভব সব চেষ্টাই চালিয়ে যাব। এ বিষয়টি আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন যুক্তরাষ্ট্র সফরকে সামনে রেখে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছি। মিসেস গান্ধী যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির সম্পূর্ণ অবসান দেখতে আগ্রহী। কিন্তু তারপরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে তার বোঝা বহন করা তার জন্য হবে দুর্ভাগ্যজনক।' কিটিং লিখেছেন– আমি তাকে বললাম, আমি কখনোই বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিনি। যদিও আমার কতিপয় জুনিয়র কর্মকর্তা কলকাতা ও দিল্লিতে অনানুষ্ঠানিকভাবে শ্রবণ করেছে তাদের কাহিনী। আমি এ সময় তার কাছে কমিউনিস্টপন্থি 'পেট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রকাশিত অভিযোগের দিকে তার মনোযোগ আকর্ষণ করি। অভিযোগ হচ্ছে, আমি মুক্তিবাহিনী ও আওয়ামী লীগের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও বিভেদ সৃষ্টি করতে চেয়েছি। আমি বললাম, আমাদের তো তেমন কিছু করার ক্ষমতা নেই। পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করলাম, আমরা তেমন কিছুই করিনি। তবে আমি স্বীকার করলাম যে, আমরা এই মর্মে কিছু বিরোধাত্মক কথাবার্তা জানতে পেরেছি। শুনেছি, বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দ ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কিন্তু এমন কিছুর অবনতি দেখা কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের এটা জানা আছে যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে সংলাপের চেষ্টা চলছে। পেট্রিয়ট পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি জানার কোনো প্রয়োজন মনে করে না ভারত সরকার। আমি তাকে বললাম, একটা সংলাপ অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা দৃশ্যত এখনো বিরাজমান। কিন্তু উক্তরূপ মতবিরোধ থেকে ফায়দা

লোটার কিছু নেই। যা হোক সিং বললেন, যুক্তরাষ্ট্র মুজিবকে বাইপাস করতে চাইছে। আমি তাকে বললাম, ওয়াশিংটনের নির্দেশনার ভিত্তিতে ইসলামাবাদের মার্কিন দূতাবাস সবেমাত্র প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সংলাপ অনুষ্ঠানের তাগিদ দিয়েছে। আমি স্পষ্টতই মুজিবের দিকে ইঙ্গিত করলাম। এরপরে আমি নির্দিষ্ট করে বললাম, ইয়াহিয়া যদি মুজিবের সঙ্গে সংলাপে বসেন তাহলে যুক্তরাষ্ট্র হবে উৎফুল্ল। ২০ অক্টোবর, ১৯৭১ ঢাকার কনসাল জেনারেল স্পিভাক স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাছে প্রেরিত এক টেলিগ্রামে উল্লেখ করেন, গত তিন মাসে পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা তীব্র হয়েছে। তারা আগের তুলনায় অনেক বেশি এলাকায় তাদের অভিযান বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছে। তারা গ্রামাঞ্চলেই নিজেদের ব্যস্ত রেখেছে। শহরে তাদের উপস্থিতি প্রতীকী। ব্যতিক্রমটাও পদ্ধতিগত প্রতীয়মান হয়। যেমন চট্টগ্রামে অব্যাহতভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। মুক্তিবাহিনী রাস্তাঘাট, ব্রিজ, রেল বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। এক্ষেত্রে তারা সারাদেশেই সফল। কিছু জেলায় যেমন ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর, নোয়াখালী, বাকেরগঞ্জে তারা তাদের খেয়ালখুশিমতো ঘুরে বেড়াতে পারে এবং কিছু স্থানে দৃশ্যত তারা ইতোমধ্যেই সমান্তরাল প্রশাসন তৈরি করে নিয়েছে। সাক্ষ্য-প্রমাণ মিলছে যে, বিদ্রোহীরা আগের তুলনায় আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র, মর্টার, শক্তিশালী বিস্ফোরক তাদের করায়ত্ত এবং ক্রমবর্ধমান হারে মাইন দিয়ে জাহাজ ও ব্রিজ উড়িয়ে দেয়ার মতো গেরিলা তৎপরতায় তারা সাফল্যের পরিচয় দিচ্ছে। মধ্য এবং দক্ষিণ অঞ্চলীয় জেলাগুলোতে মুক্তিবাহিনী বেপরোয়া মনোভাব প্রদর্শন করছেন। তারা দক্ষতার সঙ্গে রাজাকার (ভলান্টারি হোমগার্ডস) ও পাকসেনাদের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে। অনেক সময় এসব হামলায় হতাহতের সংখ্যাও হচ্ছে বিপুল। উল্লিখিত এলাকা বাদে দেশের অন্যত্র মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা বেশিরভাগই ব্রিজ, কালভার্ট, রেললাইন ইত্যাদি ধ্বংস করার মধ্যেই সীমিত এবং এসব কাজও তারা পাকসেনাদের অগোচরে সম্পাদনই অধিক আগ্রহী বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। স্পিভাক আরো লিখেছেন– গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও তৎপরতা প্রদর্শনের নেপথ্যে রয়েছে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রশিক্ষণ। তারা সবরকম সহযোগিতা পেয়ে পূর্ব পাকিস্তানে সহজেই অনুপ্রবেশ করতে পারে। ভারতীয়রা সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিপুলসংখ্যক নিয়মিত সেনাসদস্যকে ব্যস্ত রেখেছে। এর উদ্দেশ্য হলো মুক্তিবাহিনীর অপারেশনের বিরুদ্ধে যাতে পাকসেনারা অধিকমাত্রায় রাজাকার, পুলিশ ও অন্য আধা-সামরিক অথবা আধা-স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ওপর নির্ভারশীল থাকতে বাধ্য হয়। কারণ, এসব শক্তি নিয়মিত সৈন্যদের তুলনায় কম দক্ষ এবং তাদের ওপর তেমন আস্থাও রাখা যায় না। একাধিক রিপোর্ট আমরা পেয়েছি, যাতে দেখা যাচ্ছে স্বপক্ষ ত্যাগের ঘটনা ঘটছে। রাজাকাররা মুক্তিবাহিনীর কাছে কখনো ব্যক্তিগতভাবে, আবার কখনো গণহারে আত্মসমর্পণ

করছে। এটা করতে গিয়ে তারা তাদের অস্ত্রও তুলে দিচ্ছে মুক্তিবাহিনীর হাতে। একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, মুক্তিবাহিনীকে সহযোগিতা করার সন্দেহে পাকসেনারা একদল রাজাকারকে গুলি করে হত্যা করেছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কর্মকর্তারা অকপটভাবে এই ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছেন যে ভারতীয়রা সীমান্তে গোলাবর্ষণের তীব্রতা বৃদ্ধি করে চলেছে। এই সুযোগে তারা আসলে নতুনভাবে প্রশিক্ষিত মুক্তিবাহিনীকে ব্যাপক সংখ্যায় পূর্ব পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ করতে দিচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্রে নিয়মিতভাবে ভারত থেকে আসা অস্ত্র ও গোলাবারুদের উদ্ধার তৎপরতার খবর ছাপা হয়। সীমান্ত থেকে অনুপ্রবেশের পরে যাদের গ্রেফতার করা সম্ভব হচ্ছে তাদের বলা হচ্ছে, 'ভারতীয় এজেন্ট'। আসলে এখন প্রকাশ্যেই এবং স্বীকৃতভাবেই ভারতীয় সমর্থন ও সাহায্য পেয়ে চলেছে মুক্তিবাহিনী। এটা সন্দেহাতীতভাবে এখন গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর যে, মুক্তিবাহিনীর শক্তি খাটো করে দেখার উপায় নেই। আমরা বিশ্বাস করি যে, দেশের বহু এলাকায় মুক্তিবাহিনী তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে এবং তারা নিজেদের মধ্যে সংহতি এমন সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলেছে যে, এখন যদি ভারত তার প্রকাশ্য সমর্থন প্রত্যাহার বা হ্রাসও করে নেয় তাহলেও মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা টিকে থাকবে। বর্তমানে ভারতীয় সমর্থন যেভাবে বজায় রয়েছে তাতে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা অপারেশন চালানোর ক্ষমতা ও পরিধি যে আরো বৃদ্ধি পাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। স্পিভাক এ পর্যায়ে মন্তব্য করেন যে, এ পর্যন্ত এবং সঙ্গত অদূরভবিষ্যতে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জন্য ভয়ানক হুমকি হয়ে দাঁড়াবে না। যদিও তাদের সংখ্যা ও তৎপরতায় আরো বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। ভিয়েতনাম পরিস্থিতির সঙ্গে এক্ষেত্রে একটা ফারাক রয়েছে। ভিয়েতনামের মতো অস্থায়ীভাবে নির্মিত কোনো দুর্গে ঠাঁই নেয়ার সুযোগ নেই মুক্তিবাহিনীর। যেখানে তারা জনগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত অস্ত্র ও রসদ জমা করে রাখতে পারবে। অথবা তাদের সামনে কোনো সংরক্ষিত ট্রেইল বা চিহ্নরেখা নেই, যা ব্যবহার করে তারা কোনো সমুদ্র বন্দর থেকে ভারি অস্ত্রশস্ত্রের বিরাট কোনো চালান নিজেদের ঘাঁটিতে নিয়ে আসতে সক্ষম হবে। আরো বহু মাস কেটে গেলেও মুক্তিবাহিনীর তুলনায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অস্ত্র ও প্রশিক্ষণে এগিয়ে থাকবে। তবে বর্তমানে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা বিবেচনায় এটা বলা যায় যে, তারা সেনাবাহিনীর জন্য মারাত্মক কাঁটা। পাকসেনাদের হতাহতের সংখ্যা সম্পর্কে আমাদের কাছে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। তবে এমন ইঙ্গিত রয়েছে যে, নিহতের সংখ্যা দিনে গড়ে ১০ থেকে ১২ জন তো হবেই। একইসংখ্যক পাকসেনা কোনো না কোনোভাবে জখম হচ্ছে। যদিও পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত পাকসেনারা এখনো পঙ্গু হয়ে পড়েনি, তবে হতাহতের এই সংখ্যা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে পরিণামে তা তাদের গুরুতর নৈতিক সমস্যার কারণ হতে পারে। এমনিতেই তারা তাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে এবং বসবাস করছে বন্ধুহীন এক প্রতিকূল পরিবেশে। পাকিস্তান সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যেই উদ্বেগ অনুভব করছে। কারণ, তাদেরকে

শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় সংরক্ষণে সতর্কতা অবলম্বন করতে দেখা যাচ্ছে। বিমানবন্দর, বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রভৃতি স্থানে ইটের দেয়াল দিয়ে রাইফেল অথবা মেশিনগান তাক করে প্রহরীরা থাকছে সদাসতর্ক। প্রধান প্রধান সড়কেও বালুর বস্তা দিয়ে গড়ে তুলেছে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যূহ। গুলশান আবাসিক এলাকার উত্তরাংশে বেশ কিছু বাড়ির ছাদে সারাক্ষণ মোতায়েন থাকছে সশস্ত্র প্রহরী। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির সূচক ধীর হলেও নিচের দিকে নামছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের 'বেসামরিকীকরণ' এবং সাধারণ ক্ষমা কার্যত বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণে একেবারে অসার প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের মনে হচ্ছে, 'প্রায় যে কোনো মূল্যে শান্তি' প্রতিষ্ঠার প্রতি শহুরে মধ্যবিত্তদের কিছুটা সমর্থন লক্ষ্য করা গেলেও তরুণ বাঙালি প্রজন্ম বিশেষ করে যারা গ্রামাঞ্চলে বাস করে তারা ইসলামাবাদের প্রতি বিমুখ। পাকসেনাদের বিরুদ্ধে তাদের তিক্ততা প্রকট। এই ধরনের অবস্থার মধ্যে প্রধানত পাকসেনা কিংবা রাজাকারদের কর্তৃক নানা নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতার কাহিনী পরিস্থিতিকে আরো নাজুক করছে। এমনকি অনেক রক্ষণশীল বাঙালি ভাবতে শুরু করেছেন, জোরপূর্বক পাকসেনাদের বিতাড়ন করলেই সবার জন্য মঙ্গল। বেসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী হিসেবে মুক্তিবাহিনীর আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে আমরা সম্প্রতি কিছু রিপোর্ট পেয়েছি কিন্তু সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সমস্যা হচ্ছে সমন্বয় ও যোগাযোগের। দৃশ্যত মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন গ্রুপ বিভিন্ন ধরনের লাইন ও নীতি অনুসরণ করছেন। সাম্প্রতিক ক্যাস (কন্ট্রোলড আমেরিকান সোর্স) রিপোর্টে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, মুক্তিবাহিনী ভেতরে ভেতরে সামগ্রিক স্বাধীনতা আন্দোলন নকশালীদের মতো চরমপন্থিদের হাতে চলে যায় কি না তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। আবার অন্যান্য রিপোর্ট থেকে এ খবরও মিলছে যে, কলকাতায় বাংলাদেশ রাজনীতিকদের এক গ্রুপের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। আমরা অবশ্য এখনো বিশ্বাস করি যে, শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়া হবে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তিনি স্বাধীনভাবে অংশ নিতে পারবেন। আর এটা বাস্তব হলে মুজিব মুক্তিবাহিনীর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাও করতে পারবেন। মুজিব তার নীতির বাস্তবায়নের স্বার্থেও মুজিববাহিনীকে একটি নিয়মতান্ত্রিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে আগ্রহী থাকবেন। কিন্তু এতে যদি বেশি বিলম্ব ঘটে তাহলে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। আমাদের বিবেচনায় মুক্তিবাহিনীর ভেতর থেকেও নতুন নেতৃত্বের উত্থান ঘটতে পারে। যুদ্ধে অংশ নেয়ার মেজাজ থাকবে তাদের আর তার বশবর্তী হয়ে এমন একদিন আসতে পারে, যেদিন তারা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন কিংবা বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসনের জন্য মুজিব এবং পুরনো আওয়ামী লীগারদের নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জ করে বসতে পারে। তবে সম্ভাব্য সেই নতুন নেতৃত্বের ঝোঁক বাম কিংবা ডানঘেঁষা হবে তা এই মুহূর্তে বলা কঠিন।

মার্কিন কনসাল জেনারেল হার্বার্ট ডি. স্পিভাক ১৯৭১ সালের জুন থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৭২ পর্যন্ত ঢাকায় দায়িত্ব পালন করেন।

কিউবার উদ্বাস্তুদের সঙ্গে তুলনা দেন ইন্দিরা

২২ অক্টোবর, ১৯৭১

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে দেয়া এক স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রবল। কোন পক্ষ আগে শুরু করবে সে ব্যাপারে কোনো তথ্যই আমাদের হাতে নেই। ২৪ অক্টোবর থেকে তিন সপ্তাহব্যাপী প্রধানমন্ত্রী গান্ধীর প্রস্তাবিত সফর হতে পারে উত্তেজনার পর্যায় নির্ধারণী সম্ভাব্য সূচক। আমরা ভারত ও পাকিস্তান উভয়কে সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ জানিয়েছি। বিশেষ করে আমরা তাদের বলেছি, তারা যেন সীমান্ত থেকে নিজেদের সৈন্য সরিয়ে নেয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঘরোয়াভাবে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। ভারত বলেছে, তারাও প্রত্যাহারের কথা বিবেচনা করবে। তবে পাকিস্তানকে আগে শুরু করতে হবে। এখন আমরা চিন্তা করছি, যদি রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড রাজি হন তাহলে ইয়াহিয়াকে আমরা সুপারিশ করতে পারি। উত্তেজনা হ্রাস এবং ভারতের প্রস্তাবে ইয়াহিয়ার সাড়া নিশ্চিত করতে সীমিতভাবে একতরফা সৈন্য প্রত্যাহার কার্যকর করা যায় কি না। আমাদের বিশ্বাস, ইয়াহিয়া তার সামরিক অবস্থান ঝুঁকিপূর্ণ না করেই এতে সায় দিতে পারেন। এর ফলে ভারত তার সৈন্য প্রত্যাহার করতে একটা চাপ অনুভব করবে। এটা অনস্বীকার্য যে, গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমঝোতার অভাবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অব্যাহতভাবে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে বলেছি– তিনি যদি উপযুক্ত মনে করেন, তাহলে ইয়াহিয়াকে বলে দেয়া হচ্ছে যে রাজনৈতিক সমঝোতা চাইলে জরুরি ভিত্তিতে তাকে পদক্ষেপ নিতে হবে। আমরা এক্ষেত্রে যে বিষয়টির ওপর জোর দিচ্ছি তা হলো পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে ইয়াহিয়ার সংলাপ শুরু করা। কারণ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ইতোমধ্যেই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তিনি বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে চান। তবে এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ এটা স্পষ্ট করে চলেছেন যে, স্বাধীনতা ছাড়া সমঝোতা বৃথা এবং বাংলাদেশের কোনো প্রতিনিধি দলের পক্ষে শুধু মুজিবই কথা বলবেন। ৯ অক্টোবর জাতিসংঘ মহাসচিব ইউথান্ট ইয়াহিয়া ও গান্ধীর মধ্যে একটি সমঝোতার প্রস্তাব দিয়েছেন। আমরা এই উদ্যোগ সমর্থন করি। এই মুহূর্তে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে পাক-ভারতের বিরোধ যাতে আলোচিত না হয় সে লক্ষ্যে ব্যবস্থা নিতে হবে। নভেম্বর ৪ ও ৫ তারিখে গান্ধী যখন

নিউইর্য়ক সফর করবেন, তখন এবং এই সময়ের ভেতরে আমরা দুই পক্ষের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাব। মিসেস গান্ধীর সফরকালে কিছু ভুল বুঝাবুঝি নিরসনে আপনার উদ্যোগ কার্যকর হতে পারে বলেই আশা রাখি। তবে একই সঙ্গে বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দ ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মধ্যে সংলাপের ব্যাপারে আমরা তার সহযোগিতার জন্য চেষ্টা করে যাব। তাকে বোঝাতে হবে, পূর্ব পাকিস্তানের স্থিতিশীলতার জন্য তার সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বিশ্বাস করি, পূর্ব পাকিস্তানের স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে ভারতকে অবশ্যই ভূমিকা পালন করতে হবে। বিশেষ করে ভারতভিত্তিক গেরিলা তৎপরতা নিয়ন্ত্রণে দিল্লির কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার সুযোগ রয়েছে। (ফুটনোট : জাতীসংঘ মহাসচিব ইউথান্ট ১৯ অক্টোবর জাতিসংঘে নিযুক্ত ভারত ও পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী গান্ধী ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে তার লেখা চিঠি হস্তান্তর করেন। এই চিঠিতে জাতিসংঘ মহাসচিব দুদেশের সীমান্তে অবনতিশীল পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানে তার সেবা করার মনোভাব ব্যক্ত করেন।) ২৭ অক্টোবর ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের জন্য প্রস্তুত এক সার সংক্ষেপে বলা হয়– পূর্ব পাকিস্তানে একটি ব্যাপকভিত্তিক দুর্ভিক্ষ এড়ানো সম্ভব হয়েছে। ডেপুটি এইড এডমিনিস্ট্রেটর মরিস উইলিয়ামস পূর্ব পাকিস্তানে দুর্ভিক্ষের বিপদ সম্পর্কে তদন্ত করেছিলেন। তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন যে, দুর্ভিক্ষ এড়ানো সম্ভব হলেও আগামী মার্চ আবার বিপদ ডেকে আনতে পারে। পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি এখনো এমন পর্যায়ে যে, ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রাখার বিকল্প নেই। গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে খাদ্য সরবরাহ আরো জটিল হয়ে পড়বে। ৪ নভেম্বর, ১৯৭১ ওয়াশিংটনে নিক্সন ও ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে বৈঠক হয়। এ সময় ভারতীয় পক্ষে পরমেশ্বর নারায়ন হাকসার এবং যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ড. হেনরি কিসিঞ্জার উপস্থিত ছিলেন। এই আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা উল্লেখ করেন যে, ভারতকে গেরিলা তৎপরতায় সমর্থন দানের জন্য অভিযুক্ত করা হচ্ছে। কিন্তু পরিস্থিতি মোটেই পরিষ্কার নয়। তিনি এ প্রসঙ্গে ফ্লোরিডাভিত্তিক কিউবার উদ্বাস্তুদর মার্কিন সরকারের সহায়তা দানের কথা উল্লেখ করেন। কিউবার মেইনল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওই উদ্বাস্তুরা এক সময় আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল।

ইন্দিরাকে নিক্সন : পাকিস্তান ভাঙায় লাভ নেই

১৯৭১ সালের ৪ নভেম্বরে ইন্দিরা গান্ধী নিক্সনকে আরো বলেন, সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ের কারণে আমাদের আরো বাড়তি জটিল পরিস্থিতির মোকবেলা করতে হয়েছে। উদ্বাস্তুদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্রের সঙ্গে স্থানীয় ভারতীয়দের ধর্মীয় তফাৎ পরিস্থিতিকে নাজুক করতেই সহায়তা করেছে। ভারতীয় জনগণের ওপর উদ্বাস্তুদের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এ কারণে ভারত সরকার সম্ভাব্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও রক্তপাত এড়াতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। প্রেসিডেন্ট নিক্সন এ সময় উল্লেখ করেন, উদ্বাস্তুরা যাতে দেশে ফিরে যায় সেটা যুক্তরাষ্ট্র সরকারেরও নীতি। ইন্দিরা এ সময় জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে বলেন, এতে তার সরকারের আপত্তি নেই। কিন্তু মুশকিল হলো, তারা কী ভূমিকা রাখবে সে সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট নয়। তিনি বলেন, বর্তমানে যে কোনো বিদেশী পর্যবেক্ষক যে কোনো স্থান পরিদর্শন করতে পারছেন। নিক্সন উল্লেখ করেন, যুক্তরাষ্ট্র ভারতের এই উভয় সংকট অবস্থার প্রতি সহানুভূতিশীল। শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, অন্যান্য দেশও পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু প্রবাহে সংখ্যাধিক্যে উদ্বেগ প্রকাশ করছে। নিক্সন উল্লেখ করেন, সম্ভবত বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এমন কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে, যার ফলে সার্বিক পরিস্থিতির নাটকীয়তা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ চট্টগ্রাম বন্দরে মানবিক ত্রাণ বোঝাই জাহাজ চলাচলে বাধা দানের মাধ্যমে তারা কী অর্জন করতে চায় তা উপলব্ধি করা কঠিন। এটাও ঠিক যে, এ ধরনের গেরিলা তৎপরতার জন্য যে ধরনের প্রশিক্ষণ ও আধুনিক মারণাস্ত্রের যোগান দরকার তা তাদের রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গান্ধী এ পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানে পাক সেনাদের বর্বরতার বিবরণ দেন। তিনি বলেন, নিষ্ঠুর নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা সত্ত্বেও পাক সেনারা এলাকায় কোনো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না। এই অভিযোগ অব্যাহত রয়েছে যে, ভারত গেরিলা আন্দোলন উস্কে দিয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে সমর্থন দিয়ে চলেছে। কিন্তু আমাদের সত্য উপলব্ধি করতে হবে। আর তা হলো পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিমের সঙ্গে একত্রিত থাকবে, এটা আর আশা করা বৃথা। স্বায়ত্তশাসনের জন্য চাপ সর্বব্যাপী। নিক্সন বলেন, এটা ঠিক যে, পাল্টাপাল্টি দোষারোপের ঘটনা পরিস্থিতিকে কোনো আপোষের দিকে নিয়ে যেতে বাধাগ্রস্ত করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো উদ্যোগকে কার্যকর করার ক্ষেত্রেও এমন পরিবেশ প্রতিকূল অবস্থাই সৃষ্টি করছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ঘটাতে চাইলে পাকিস্তানকে শেষ পর্যন্ত অনেক

কিছুই কবুল করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া অব্যাহতভাবে একটি পবিত্র যুদ্ধের কথা বলছেন। এটা উল্লেখ করতে হবে যে, পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকায় ভারতীয় সৈন্যের উপস্থিতিতে পাক-সেনাদের হামলা প্রতিরোধে ভারসাম্যমূলক ভূমিকা রাখছে। আর এ ধরনের উত্তেজনাকর পরিস্থিতির কারণেই ভারত অতিরিক্ত রক্ষাকবচ হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদনে প্রভাবিত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে ভারতের স্থিতিশীলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর সে কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি রাজনৈতিক সমাধানের জন্য চাপ দিচ্ছিল। ভারতে কিন্তু অনেকেই সোভিয়েতের সঙ্গে চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন। পার্লামেন্টেও সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এ নিয়ে উদ্বেগে ছিলেন। নিক্সন এ সময় প্রধানমন্ত্রীর কাছে সমাধানের সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি কামনা করেন। জবাবে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, ভারতের সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, পাকিস্তানের পরিস্থিতি ভারতের ওপর কতটা কী প্রভাব বিস্তার করে। নিক্সন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য হচ্ছে, পরিস্থিতি মোকাবেলায় পাকিস্তানকে গঠনমূলক লাইনে নিয়ে আসা। যুক্তরাষ্ট্র সরকার সর্বদায়ই ভারতীয় জনগণের প্রশংসা করে থাকে এবং তাদের উদ্বেগ অনুধাবন করতে চায়। পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক সহায়তা দান প্রশ্নে আমরা যে, বিধিনিষেধ আরোপ করে চলেছি তা কিন্তু নিশ্চিতভাবেই ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক মনে রেখেই। ইন্দিরা বলেন, গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু কিন্তু এখনো মুজিবের ভবিষ্যৎ। কারণ তিনি স্বায়ত্তশাসনের প্রতীক। প্রেসিডেন্ট ইন্দিরা গান্ধীকে আশ্বস্ত করেন যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার সে কারণেই পাকিস্তানের ওপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে আমরা অনুরোধ করেছি তিনি যেন একতরফাভাবে ভারত সীমান্ত থেকে সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে আসে। তবে যুক্তরাষ্ট্র এটা যদিও মনে করে যে, ভারত তার জাতীয় স্বার্থের জন্য যা ভালো মনে করে তা-ই করবে। তবে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য তার পক্ষে হয়তো কিছু পদক্ষেপ নেয়ার সুযোগ রয়েছে। পিএন হাকসার এ সময় উল্লেখ করেন যে, ভারতীয় সৈন্যদের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা ভারতের জন্য জটিলতার সৃষ্টি করেছে। নিক্সন এ সময় বলেন, সৈন্যদের স্থানান্তরের ফলে সৃষ্ট অসুবিধা তিনি বুঝতে পারেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কিছু সৈন্য প্রত্যাহারে ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং তিনি তা একতরফাভাবে করতে রাজি হয়েছেন। বাস্তবে তিনি যদি এটা করে দেখান তাহলে ভারতের পক্ষ থেকেও একইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ যুক্তরাষ্ট্র আশা করবে। তবে ভারতই এ ব্যাপারে তার সিদ্ধান্ত নেবে। নিক্সন ইন্দিরাকে আশ্বাস দেন যে, পরিস্থিতির উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট সম্ভব সব ধরনের পদক্ষেপ নেবে। যুক্তরাষ্ট্রও মানবিক ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রাখবে। পাকিস্তান সরকারকে সংযম প্রদর্শনে উৎসাহিত করবে এবং সর্বোপরি একটি রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছতে সব পক্ষকে সংশ্লিষ্ট করতে তৎপরতা অব্যাহত রাখবে। নিক্সন এ সময়ে উল্লেখ করেন, একটি কথা আপনাকে বলে রাখি, পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার মধ্য দিয়ে কিন্তু কিছুই অর্জিত হবে না। ভারত যদি যুদ্ধ শুরু করে তাহলে তার কারণ

কিন্তু কিছুতেই বোধগম্য হওয়ার নয়। এক্ষেত্রে পরিস্থিতির সঙ্গে কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে। কারণ যুক্তরাষ্ট্র সরকার ইসরায়েল সরকারকে বলছে, তার সরকার যদি বৈরিতা শুরু করে তাহলে তারা তা সমর্থন করতে পারবেন না। যদিও ইসরায়েলের সঙ্গে তাদের রয়েছে দীর্ঘমেয়াদি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। ভারত যদি বৈরিতা শুরুই করে তাহলে অন্যান্য পরাশক্তি কার্যত ঠিক কী ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখায় তা এখনই আন্দাজ করা কঠিন। বৈঠক শেষে প্রেসিডেন্ট নিক্সন ভারত সরকারের বর্তমান ক্রান্তিকালে যুক্তরাষ্ট্রের সহানুভূতি ব্যক্ত করেন। এই বৈঠকের পরদিন ৫ নভেম্বর, ১৯৭১ নিক্সন ও কিসিঞ্জার হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে বৈঠকে মিলিত হন। ইন্দিরার সঙ্গে নিক্সনের আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে কিসিঞ্জার তার মূল্যায়ন দিতে গিয়ে বলেন, আমার সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন হচ্ছে, যে কোনো বিচারেই হোক ভারতীয়রা বেজন্মা। তারা সেখানে একটি যুদ্ধ শুরু করেছে... তাদের কাছে পূর্ব পাকিস্তান আর কোনো ইস্যু নয়, আমি গতকাল শুধু দেখছিলাম, ইন্দিরা কিভাবে আপনাকে পশ্চিম পাকিস্তান প্রশ্নে নিয়ে যায়? কিসিঞ্জার অবশ্য মত দেন যে, তবে এটাও ঠিক যে, ইন্দিরার সঙ্গে আলোচনায় নিক্সন অন্তত কিছু অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। 'যেহেতু তিনি একজন বেজন্মা, তাই আমরা যা চেয়েছিলাম সেটুকু তো পেয়েছি...। এখন তিনি আর দেশে ফিরে গিয়ে বলতে সক্ষম হবেন না যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে উষ্ণ সংবর্ধনা দেয়নি। আর সে কারণেই তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি নেবেন। কিসিঞ্জার আরো উল্লেখ করেন, ইন্দিরা নিজের জালে নিজে বন্দি হয়ে পড়েছেন। তিনি আশা করেছিলেন, আপনি তাকে একটা শীতল সংবর্ধনা দেবেন। আর সেটাকে তিনি অজুহাত হিসেবে কাজে লাগাতে পারবেন। বলতে পারতেন, যুক্তরাষ্ট্র তো আমাকে পাত্তাই দিল না। কিসিঞ্জারের এই পর্যবেক্ষণ কবুল করেন নিক্সন। বলেন, 'আমরা ডাইনি বুড়িটাকে সত্যি পরাস্ত করতে পেরেছি।' এ কথার পিঠে কিসিঞ্জার উল্লেখ করেন, সত্যি বলতে কী, ইন্দিরার সঙ্গে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে বটে, কিন্তু আমরা কিছুই ছাড় দেইনি। 'আপনি যেসব ক্ষেত্রে নরম হয়েছেন, তাতে কিছুই আসে যায় না। আপনি তাকে এক ইঞ্চিও ছেড়ে দেননি।'

এই আলোচনার ২ ঘণ্টা পরে নিক্সন ও ইন্দিরা সকাল ১১টা ২০ মিনিটে ওভাল অফিসে পুনরায় মুখোমুখি হন। এ সময় কিসিঞ্জার ও হাকসার উপস্থিত ছিলেন। নিক্সন আলোচনার শুরুতেই তার আসন্ন চীন সফরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। আলোচনা এক ঘণ্টা চলে। এ সময় বিশ্বের বহু গোলযোগপূর্ণ অঞ্চলের রাজনীতি ও কূটনীতি নিয়ে মতবিনিময় চলে। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার প্রসঙ্গ এসেছিল সামান্যই। পাক-ভারত সীমান্ত থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারে ইন্দিরার মনোভাব জানতে আরেক দফা চেষ্টা চলে। কিন্তু নিক্সনের সে প্রস্তাব সম্পর্কে ইন্দিরা কোনো কথাই বলেননি।

মুজিব-ইয়াহিয়া সংলাপে ভারতের সম্মতি

পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক করেন। এ বৈঠক হয় ৫ নভেম্বর, ১৯৭১। রজার্স বৈঠকের শুরুতে পূর্ব পাকিস্তান সমস্যা নিয়ে ইন্দিরার দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চান। ইন্দিরা বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলির কারণে ভারতীয় নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন। এই হুমকি কেবল ভারতের সীমান্তে পাক-সেনাবাহিনীর উপস্থিতির কারণে নয়, এটা ব্যাপকভিত্তিক উদ্বাস্তু স্রোত এবং এটা যাতে আরো তীব্র হয়, সে লক্ষ্যে পাকিস্তান সরকারের দমন-পীড়ন থেকে উদ্ভূত। এটা শুধু ভারতের ওপর অর্থনৈতিক বোঝা সৃষ্টি করেনি। এটা রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যারও জন্ম দিয়েছে। এটা এমনকি ভারতীয় স্থিতিশীলতা ও অখণ্ডতার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেছে। ইন্দিরা উল্লেখ করেন যে, এই সংকট তার ওপর এক বিরাট চাপ বয়ে এনেছে। এমনকি তার মন্ত্রিসভার মধ্যেও এই অনুভূতি রয়েছে যে, দুর্বল নীতি অনুসরণের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ভারতের নিরাপত্তাকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে। ইন্দিরা স্মৃতিচারণ করে বলেন, যুদ্ধের কিছু অভিজ্ঞতা আমারও রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে খারাপ মুহূর্তগুলোতে তিনি লন্ডনে ছিলেন। সুতরাং তিনি অনুধাবন করতে পারেন কোনো সংঘাতের বৃহত্তর প্রভাব কী হতে পারে। কিন্তু ভারতকে সংঘাতের দিকে ধাপের পর ধাপ ঠেলে দেয়া হয়েছে। তার অধিকাংশ সহকর্মী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারাও এই অভিমত দিয়েছেন যে, এই মুহূর্তে তার যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাওয়া উচিত নয়। তিনি বলেন, তিনি যদি এই সফর বাতিল করতেন তাহলে উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পেত। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সফর তিনি সম্পন্ন করবেন। তিনি তার সেনাবাহিনীকে বলে এসেছেন, যদি হতাহতের ঘটনা ঘটে তাহলে যেন পাল্টা ব্যবস্থা নেয়া থেকে তারা বিরত থাকে। কিন্তু এ কথা পার্লামেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাখ্যা করা কঠিন। তিনি দিল্লিতে প্রতিদিন বার্তা পাঠাচ্ছেন। ইন্দিরা বলেন, পার্লামেন্টে যদিও তার বিরাট সংখ্যা গরিষ্ঠতা, কিন্তু এই ইস্যুতে সবকিছুই তার নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণে নেই। রজার্স জবাবে বলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একমত যে, উত্তেজনা প্রশমন ঘটাতে হবে। যদি পাক-ভারতের মধ্যে যুদ্ধ বাধে, তাহলে তা হবে বিশ্বের জন্য এক ট্রাজেডি। আমরা ভারতের সমস্যা বুঝি। এ সমস্যা আসলে অন্যের দ্বারা সৃষ্ট। আমরা সত্যিই কিছু পদক্ষেপ নিতে চাই। আশা করি, তাতে ভারতের সম্মতি থাকবে। প্রথমত, পাকিস্তানকে আমরা অস্ত্রের সরবরাহ বন্ধ করে দেব। পাকিস্তানের জন্য ১

লাখ ৬০ হাজার ডলারের অস্ত্র এখন নিউইয়র্কের ডকে পড়ে আছে। তাদের অস্ত্র দেয়ার কথা আমরা ভাবছি না। এ বিষয়ে আমরা আগামী সপ্তাহে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে এবং পরে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে চাই। দ্বিতীয়ত, আমরা এই অবস্থান গ্রহণ করছি যে, ভারত ও পাকিস্তানকে একপাল্লায় ওজন দেয়া ঠিক হবে না। সত্যি বলতে কী, এটা আমরা কখনো করিওনি। আর এটা বিবেচনায় নিয়ে আমরা ইয়াহিয়াকে বলেছি, তার পক্ষে একতরফা সৈন্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হবে কি না? তিনি বলেছেন, তিনি এটা করবেন। তৃতীয়ত, আমরা এটাও স্বীকার করি যে, এটা নেহাৎ কোনো সামরিক সমস্যা নয়, এটি একটি রাজনৈতিক সমস্যা। আমরা ইয়াহিয়া এবং আওয়ামী লীগারদের সঙ্গে রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে সক্রিয় আলোচনায় নিয়োজিত রয়েছি। ইয়াহিয়া এই মর্মে সম্মতি জানিয়েছেন যে, মুজিব কর্তৃক নির্দিষ্ট করে দেয়া বাংলাদেশের কোনো নেতার সঙ্গে তিনি বৈঠকে বসবেন। আমরা মনে করি, এটা একটা উৎসাহব্যঞ্জক ইঙ্গিত। এ রকমের আলোচনার প্রক্রিয়ায় সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার এবং রাজনৈতিক সমঝোতার প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। এই প্রক্রিয়া যাতে শুরু হয়, সে লক্ষ্যে আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। আপনাকে এতক্ষণ যা বললাম, তা-ই শুধু আমরা করতে পারি। আমরা ইয়াহিয়াকে এটা বলতে পারি না যে মুজিবকে মুক্তি দিন। এটা বললেও কাজ হবে না। আমরা আশা করি, ইয়াহিয়া যদি সত্যি একতরফাভাবে সৈন্য প্রত্যাহার কার্যকর করেন তাহলে ভারত যেন সমরূপ সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা বিবেচনা করে। ইন্দিরা জবাবে বলেন, ইয়াহিয়া হয়তো পশ্চিম সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেবে। কিন্তু ভারতের ওপর প্রচণ্ড চাপ কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে। হাকসার এই সময় ব্যাখ্যা করেন যে, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস থেকে স্বপক্ষ ত্যাগের ঘটনায় পাকিস্তান সরকার সীমান্তে নিয়মিত সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছে। আর এটা স্পষ্টভাবেই বিধির লঙ্ঘন। এই সৈন্যবাহিনী ক্রমাগতভাবে ভারতীয় ভূখণ্ডে হামলা চালাচ্ছে। কাউল উল্লেখ করেন, পাকিস্তানের ঘাঁটিগুলো সীমান্তের কাছাকাছি এবং সে কারণেই তাদের পক্ষে অধিকতর সহজে প্রত্যাহার করে নেয়া সম্ভব। রজার্স ও সিসকো ইঙ্গিত দেন যে, সৈন্য প্রত্যাহার প্রশ্নে আমরা কিন্তু ইয়াহিয়ার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনায় যাইনি। তবে আপনারা যে প্রশ্ন তুলেছেন, তা বোধগম্য। আমরা আশা করি, ভারতীয়রা এ ব্যাপারে পাকিস্তানের কাছে সহযোগিতা পাবেন। উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া নিয়েও আলোচনা হতে পারে। এ পর্যায়ে আরো কিছুক্ষণ সমঝোতার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। সিসকো ইতি টানেন এই বলে, আমরা যে প্রস্তাব রেখেছি ভারতীয়রা যদি তা গ্রহণযোগ্য মনে হয়, তাহলে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে পরে আলোচনা করা যেতে পারে। সৈন্য প্রত্যাহার প্রশ্নে কাউল অবশ্য উল্লেখ করেন যে, রাজনৈতিক সমঝোতা ছাড়া প্রত্যাহারের ঘটনা ঘটলে এই ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, সংকট বুঝি নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে। রজার্স উল্লেখ করেন, আসন্ন যুদ্ধের হুমকির মুখে রাজনৈতিক সমঝোতায়

পৌঁছা কঠিন। যদি যুদ্ধ শুরু হয়, তাহলে রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব না-ও হতে পারে। উপরন্তু রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া যুদ্ধের সূচনা ঘটতে পারে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা ও ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, ইয়াহিয়া আসলেই রাজনৈতিক সমাধান চান কি না? রজার্স ও সিসকো উল্লেখ করেন যে, আমাদের বিশ্বাস, ইয়াহিয়া এ ধরনের একটি সমাধানে সত্যিই আন্তরিক। এ সময় ইয়াহিয়ার তরফে যে সমাধানের কোনো ইচ্ছা নেই এটা বোঝাতে ভারতীয় প্রতিনিধি দল পূর্ব পকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি বিস্তারিত উল্লেখ করেন। তারা প্রশ্ন রাখেন, আচ্ছা বলুন তো, আপনাদের হাতে কি এমন প্রমাণ আছে, যা থেকে বোঝা সম্ভব ইয়াহিয়া সত্যিই রাজনৈতিক সমাধান চান? মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জবাবে বলেন, আমরা আপনাদের এটা স্পষ্ট করে বলতে পারি, এ প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যেই যা করার তা সম্পন্ন করেছে। হাকসার এই সময় উল্লেখ করেন, এটা কিন্তু এমন কোনো বিরোধ নয় যে, যার দুই পক্ষ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত। ইয়াহিয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভারতের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়া কিন্তু অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত নয়। বরং এ প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার জন্য এ বিষয়টা স্পষ্ট হওয়ার দাবি রাখে। এল কে ঝা বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন না যে, এমন কেউ আছেন, যিনি বলবেন– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আরো বেশি কিছু করা উচিত। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলোচনার শেষ পর্যায়ে উল্লেখ করেন, প্রেসিডেন্ট নিক্সন বিশ্বের বহু স্থানে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় নানা পদক্ষেপ নিয়েছেন। আমরা এটা বুঝতে পারছি যে, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমস্যার কারণে ভারতের ঘাড়ে বিপদ চেপেছে। যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের বিপদ এড়াতে সম্ভব সব চেষ্টা করছে। এই আলোচনার বিবরণী ৮ নভেম্বর, ১৯৭১ এক টেলিগ্রামের মাধ্যমে ভারতের মার্কিন দূতাবাসে প্রেরণ করে স্টেট ডিপার্টমেন্ট। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স স্বাক্ষরিত এই টেলিগ্রামের শেষ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়– প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে কাউল সিসকোকে বলেন, ভারত সরকার যদি এ মর্মে নিশ্চয়তা পায় যে মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং মুজিব কোনো প্রকারের চাপ ছাড়াই ইয়াহিয়ার সঙ্গে সমঝোতার জন্য একজনকে নিয়োগ করেছেন, তাহলে তেমন প্রস্তাবের প্রতি ভারত তার সতর্ক সমর্থন ব্যক্ত করতে পারে।

আমার দেখা অন্যতম নিষ্ঠুর অপারেশন : কিসিঞ্জার

১১ নভেম্বর, ১৯৭১

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স একটি টেলিগ্রাম পাঠান দিল্লি, মস্কো, কলকাতা, ঢাকা ও ইসলামাবাদে। এতে উল্লেখ করা হয়, সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিসকো ১০ নভেম্বর পাকিস্তান ও ভারতের রাষ্ট্রদূতকে তলব করেন। এ সময় পূর্ব পাকিস্তান/ভারতীয় সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অব্যাহত সংঘর্ষের খবরে আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এ সময় উল্লেখ করা হয় যে, আমরা খবর পেয়েছি কামালপুরে ভারতীয় গোলাবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। সুতরাং পাকিস্তান এখন পাল্টা আক্রমণ করতে পারে। সিসকো পাক রাষ্ট্রদূত রাজাকে বলেছেন, ইয়াহিয়া আমাদের জানিয়েছিলেন, উত্তেজনা প্রশমনে তিনি সৈন্য প্রত্যাহারের একতরফা সিদ্ধান্ত নেবেন। আমরা এটা বাস্তবে দেখতে আগ্রহী। আমরা একই সঙ্গে বৈরিতা প্রতিরোধে জাতিসংঘকে যে কোনো সহযোগিতা দেয়া হলে, আমরা তাকে স্বাগত জানাব। সিসকো স্মরণ করিয়ে দেন, পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু করবে না মর্মে ইয়াহিয়া তাদের আশ্বস্ত করেছেন। তবে যা-ই ঘটুক না কেন, কামালপুরের ঘটনা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গভীরভাবে উদ্বিগ্ন, আর সে কারণেই দুদেশের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে আমরা জানিয়ে দিয়েছি, কোনো ধরনের উস্কানিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে উভয় পক্ষের কাছ থেকে সংযম প্রত্যাশিত। সিসকো বলেছেন, আমরা আশা করব যে, পাকিস্তান অব্যাহতভাবে এই সচেতনতা প্রদর্শন করে চলবে যে, তাদের তরফে যে কোনো সামরিক অথবা পাল্টা ব্যবস্থা ভারতীয়রা বড় ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করবে। রাজা উল্লেখ করেছেন, পাকিস্তান সরকার বর্তমান পরিস্থিতিতে খুবই সজাগ; এবং যাতে যুদ্ধ শুরু না হয় , সে ব্যাপারে তাদের সর্বাত্মক সতর্কতা রয়েছে। কিন্তু ভারতের কৌশল পরিষ্কার। তারা ওত পেতে আছে, আমাদের যে কোনো তৎপরতাকে অজুহাত হিসেবে লুফে নেবে। তিনি মনে করেন, পাকিস্তান সরকার ধৈর্যশীল থাকবে। কিন্তু এটাও সত্য যে, ধৈর্যেরও তো একটা সীমা থাকবে। টেলিগ্রামে উল্লেখ করা হয়, ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ঝা এসেছিলেন, রাসগোত্র ও ভার্মাকে সঙ্গে নিয়ে। সিসকো আলোচনার শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্র সফর সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। সিসকো উল্লেখ করেন, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা শান্তি রক্ষায় যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন, তাতে তিনি মুগ্ধ। ইন্দিরা যুদ্ধ এড়াতে চেয়েছেন। সিসকো বলেন, আমরা একে বাস্ত

বে দেখতে চাই। তিনি একই সঙ্গে উল্লেখ করেন, রাজনৈতিক সমঝোতার বিষয়টিও সমান্তরাল। একে এগিয়ে যেতে দিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র ভারতের এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত যে, ওয়াশিংটন শুধুই সংকট নিরসনে পদক্ষেপ নেবে না। একই সঙ্গে রাজনৈতিক ফ্রন্টেও চেষ্টা চালাবে। সিসকো এ পর্যায়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সফরের পরে আমরা এমন খবর পেয়ে উদ্বেগ অনুভব করছি, ভারতীয় সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকে পড়েছে। আমরা উদ্বিগ্ন এ কারণে যে, এ ধরনের অনুপ্রবেশ পাকিস্তানকে পাল্টা আক্রমণ পরিচালনায় উস্কে দিতে পারে। এবং সে কারণেই আমরা আশা করি যে, এই পরিস্থিতির অবসানে ভারত কিছু পদক্ষেপ নেবে। সিসকো ঝাকে এ কথাও অবহিত করেন যে, পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা যে উদ্বিগ্ন সে কথা আমরা পাকিস্তানকে অবহিত করেছি। আমরা আপনার কাছেও এই আশাবাদ পুনর্ব্যক্ত করতে চাই যে, যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক সমঝোতায় যে উদ্যোগ নিয়েছে তাকে নস্যাৎ করে দিতে কোনো পক্ষই কোনো পদক্ষেপ নেবে না। আমরা এ কথাই জানি যে, রাজনৈতিক সংলাপের ব্যাপারে ভারত সরকারের সতর্ক স্বার্থ রয়েছে। ঝা এ সময় প্রশ্ন করেন যে, কামালপুরের কাছে সংঘটিত যে ঘটনার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, সে ব্যাপারে তার কাছে নিরপেক্ষ সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য রয়েছে কি না? জবাবে সিসকো বলেন, আমরা যে রিপোর্ট পেয়েছি তাতে প্রয়োজনীয় বস্তুনিষ্ঠতা রয়েছে। ভ্যান হোলেন এ সময় বলেন, গত সপ্তাহে ভারতের নিয়মিত সৈন্যবাহিনী কিছু মাত্রায় সীমান্ত অতিক্রম করেছে। রাসগোত্র বলেন, এ সংক্রান্ত যে তথ্য সংবাদপত্রে বেরিয়েছে ভারত সরকারের মুখপাত্র ইতোমধ্যেই তা দু'দফায় নাকচ করে দিয়েছে। কিন্তু দুতাবাসের কাছে এ ব্যাপারে আর কোনো তথ্য জানা নেই। ১২ নভেম্বর, ১৯৭১ হেনরি কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠক। এই বৈঠকে সিআইএর প্রতিনিধি লে. জেনারেল রবার্ট ই. কুশম্যান তথ্য দেন যে, আমাদের কাছে খবর রয়েছে ভারত এবং পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তে বিপুলসংখ্যক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এখন সামান্য হুঁশিয়ারিতেই যে কোনো মুহূর্তে বড় ধরনের সংঘাত ছড়িয়ে পড়তে পারে। পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তি বাহিনী গেরিলারা ক্রমবর্ধমানভাবে সক্রিয় কার্যকর হয়ে উঠেছে। কুশম্যান ধারণা দেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলের ৩০ ভাগ পর্যন্ত এলাকার ইতোমধ্যেই মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা টগবগিয়ে ফুটছে। কারণ ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী ও ভারতের নিয়মিত সৈন্য যৌথভাবে পাক সেনা ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে লড়াইয়ে সীমান্ত সন্নিহিত অঞ্চলে যোগ দিয়েছে। কুশম্যান উল্লেখ করেন, এদিকে পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তের উভয় দিকে দুদেশের সৈন্যরা যুদ্ধকালীন সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়েছেন। তবে সিআইএর মূল্যায়ন হচ্ছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে নিবৃত্ত করতে এখনো হাল ছেড়ে দেয়নি। তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া যুদ্ধ শুরু হলে চীন খুব সক্রিয়ভাবে পাকিস্তানকে যে সাহায্য করবে তা মনে হয় না। কিসিঞ্জার প্রশ্ন রাখেন, মি. কুশম্যান

আপনি যখন বলছেন যে, পাক সেনাদের নিহতের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়েছে তখন আমরা ঠিক কী বুঝব?

কুশম্যান : এখন দিনে পাঁচ বা ছয় জন সৈন্য নিহত হচ্ছে। অক্টবরের আগে দৈনিক মৃতের সংখ্যা ছিল তিন।

কিসিঞ্জার : আপনি পাকিস্তান নৌবাহিনীর কথা বলছিলেন, তারা এখন কোথায়?

কুশম্যান : তারা অতটা সামর্থ্যবান নয়। কিন্তু চট্টগ্রামে তাদের কিছু জাহাজ রয়েছে।

কিসিঞ্জার : পররাষ্ট্র দপ্তরের কী চিন্তা?

সিসকো : আমি দুটো দিক নিয়ে কথা বলব। এক. আমরা যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্পর্কে তখনই নিশ্চিত হব যখন মিসেস গান্ধী দেশে ফিরবেন। এবং আমরা দেখতে চাই, তিনি কিভাবে তার যুক্তরাষ্ট্র সফরকে ব্যবহার করেন। সোমবার ১৫ নভেম্বর পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরু হবে। আমরা দেখতে চাই, ইন্দিরা বিদ্যমান পরিস্থিতিকে তিনি পার্লামেন্টে কিভাবে খেলেন। দুই. আমাদের এটা খতিয়ে দেখা উচিত, সোমবারের আগে ইন্দিরাকে উৎসাহিত করতে আমরা আর কোনোভাবেই কোনো দিক থেকে কিছু করতে পারি কি না? প্রয়োজনে তিনি যদি অনুকূল পদক্ষেপ নেন, তাহলে তো তার হাত আমাদের শক্তিশালী করতে হবে।

কিসিঞ্জার : কিন্তু তিনি কি তেমন কোনো পদক্ষেপ নেবেন?

সিসকো : আমি একমত। সেটাই প্রকৃত প্রশ্ন। তবে তিনি যাতে সে ধরনের পদক্ষেপ নেন সে লক্ষ্যে কিন্তু আমরা তাকে যথেষ্ট মালমশলা দিয়েছি। আমরা জানি না, তিনি তা পছন্দ করবেন কি না। কিন্তু আমি মনে করি পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টায় পরিস্থিতির জন্য সহায়ক আর কোনো কূটনৈতিক পদক্ষেপ নেয়া যায় কি না তা আমরা আলোচনা করতে পারি।

কিসিঞ্জার : আপনি কি মনে করেন যে, সোমবার পার্লামেন্টে যদি তিনি ভুল বার্তাটিই আকড়ে ধরেন, তাহলে যুদ্ধ এসে যাবে খুব তাড়াতাড়ি।

সিসকো : ইন্দিরা যদি ইয়াহিয়ার ওপর চাপ অব্যাহত রাখতে চান, তাহলে আমার বিবেচনায় তা বর্তমান পরিস্থিতিতে উত্তেজনা বাড়াবে। ভারতের কৌশল হচ্ছে ইয়াহিয়ার ওপর চাপ অব্যাহত রাখা। এবং সামরিকভাবে পাকিস্তানকে শুষে নেয়া। এক্ষেত্রে নীতি হচ্ছে, যুদ্ধ শুরু করার দোষটা যাতে পাকিস্তানের কাঁধেই পড়ে। কোনো একটি মাত্র দুর্ঘটনা যাতে পাকিস্তান পাল্টা ব্যবস্থা নিতে পারে তা সৃষ্টি করবে একটি 'কজাজ বেলি'। পাকিস্তানিরা এটা জানে। পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতের কথা শুনে মনে হলো, ভারত তাদের ফাঁদে ফেলতে চাইছে।

কিসিঞ্জার : ভারত দাবি করেছে, এটা পাকিস্তানি সমস্যা। কিন্তু তারা পরিকল্পিতভাবে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে, যাতে কোনো সুরাহা না ঘটে। আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে নিষ্ঠুর অপারেশনগুলোর এটি অন্যতম।

ইয়াহিয়ার মুজিব বরণে ভুট্টোর বাগড়া

১২ নভেম্বর, ১৯৭১ ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা দৃশ্যত দ্বিধান্বিত ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী তার যুক্তরাষ্ট্র সফরের পরে তার অবস্থানে কোনো মৌলিক পরিবর্তন আনেন কি না। সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিসকো উল্লেখ করেন, এই পরিস্থিতিকে দুটো দিক থেকে বিশ্লেষণ করা চলে। উদ্দেশ্যের দিক থেকে আমাদের এটা ধরে নিতে হবে যে, মিসেস গান্ধী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে চান। প্রেসিডেন্ট তার ওপর সত্যিই প্রকৃত প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি তাকে এমন কিছু ভরসা দিয়েছেন যা তিনি চাইলে কাজে লাগাতে পারেন। কিন্তু আমার এই নিয়ে কোনো দ্বিধা নেই যে অগ্রগতির যে কোনো ইঙ্গিত অথবা রাজনৈতিক সমঝোতার দিক থেকে কোনো ঘাটতি বজায় থাকলে তা কিন্তু যুদ্ধ প্রতিহত করার ক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারণী সূচক হিসেবেই কাজ করবে।

কিসিঞ্জার : তিনি যদি চান ভারত কিন্তু এ ধরনের দুর্বল অবস্থায় পাকিস্তানকে ভবিষ্যতে আর কখনো বাগে পাবে না। আমরা তাদের সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছি, অন্যান্য দেশও নিয়েছে একই সিদ্ধান্ত। এমনকি ভারতীয়দের সবচেয়ে মডারেট লোকটিও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাবেন যে, তারা এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তান সমস্যা চিরতরে সমাধান করে নিতে পারেন; এবং তারা যদি পূর্ব পাকিস্তানকে ভেঙে দিতেই সক্ষম হয়, তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানও সম্ভবত ভেঙে পড়বে। মিসেস গান্ধীকে যদি আমাদের পথে চলতে গিয়ে রাজনৈতিকভাবে মাশুল দিতে হয়, তাহলে কিন্তু আমাদের তা অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। কিন্তু আমি নিশ্চিত প্রেসিডেন্ট সেভাবে ঝুঁকবেন না। আমাদের নীতি এটা নয় যে, ভারতকে উৎসাহিত অথবা ভারতের কাজ সম্পন্ন করে দেয়া। এই বিষয়ে আগামী সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের বৈঠক ডাকবেন। আমরা ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের এই বৈঠক ডেকেছি এজন্য যে, আপনাদের এ কথা বলার জন্য, যা ইতোমধ্যেই তিনি আপনাদের বলেছেন। আমরা রাজনৈতিক মূল্যায়নকে উৎসাহিত করব। তবে আমরা ভারতের এমন স্ট্র্যাটেজি সমর্থন করব না, যাতে পশ্চিম পাকিস্তানের টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। (সিসকোর দিকে তাকিয়ে) আপনি যখন বাংলাদেশের প্রতি আপনার মুভমেন্ট শুরু করেছেন, ভারত অনতিবিলম্বে তাদের চাহিদা বাড়িয়ে দিল। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, পাকিস্তানিরা যাতে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে

তা পূরণে অক্ষম থাকে। ঝুঁকে পড়ার এই নীতি শুধুই প্রেসিডেন্টের মনে কী ছিল তা বিবেচনাপ্রসূত নয়। প্রেসিডেন্ট ভেবেছেন, ভারতকে যাতে আমরা নিরুৎসাহিত করি। ভারত যেন খুব বেশি দূরে না যায়। সোমবার অর্থাৎ ৫ নভেম্বর ভারতীয় পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরুর আগে প্রেসিডেন্ট এ ব্যাপারে কোনো কিছুই করতে নারাজ যদি না এই কক্ষের মধ্যে প্রবলভাবে অনুভূত হয় যে, আমাদের কিছু একটা করা অবশ্যই উচিত।

সিসকো : আমি মনে করি, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে জিজ্ঞেস করা উচিত, বেলুনটি যাতে ওপরের দিকে না উড়তে পারে সে জন্য আমাদের কী করা উচিত।

কিসিঞ্জার : ভারতীয়দের চাহিদা পূরণের চেয়ে আর কি কোনো পথ খোলা নেই।

সিসকো : ভারত একটি দাবির ব্যাপারে স্থির। আর তা হলো মুজিবের মুক্তি। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ইয়াহিয়ার সঙ্গে সমঝোতা করতে পারেন।

কিসিঞ্জার : না, তারা বলতে শুরু করেছিল, ইয়াহিয়ার অবশ্যই উচিত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলা এবং ইয়াহিয়া যেন কোনো অবস্থাতেই মুজিবকে হত্যা না করে। এরপর যখন তারা দেখল, পাকিস্তান এতে রাজি হয়েছে তখন তারা তাদের সুর পাল্টে ফেলল। আওয়াজ তুলল, ইয়াহিয়াকে অবশ্যই মুজিবের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

সিসকো : আমার ধারণা মিসেস গান্ধীকে দেয়া প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব খুবই অর্থপূর্ণ। গান্ধী যদি বেছে নিতে চান, তাহলে এটা হবে এক মধুর আপোস।

কিসিঞ্জার : আপনার ধারণায় সে প্রস্তাবটি কী হতে পারে।

সিসকো : তিনটি বিকল্পের মধ্যে ইন্দিরাকে মনে হলো, ইয়াহিয়া মুজিব কর্তৃক নির্দিষ্ট করে দেয়া প্রতিনিধির সঙ্গে ইয়াহিয়ার বৈঠকে বসার আগ্রহের বিষয়টি নিয়ে তিনি বেশি উৎসাহ বোধ করছেন।

কিসিঞ্জার : আপনার কী ধারণা, সেটাই প্রকৃত অবস্থা? সেটাই কি ভারতকে অবদমিত রাখতে যথেষ্ট? আমার অনুমান সোমবারেই আমরা এটা জেনে যাব।

ভ্যান হোলেন : এটা কিন্তু আমাদের তরফে ভারতীয় দাবি মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে নতুন করে কোনো চাপ সৃষ্টি নয়। কিন্তু ইয়াহিয়াকে এমন একটি ফর্মূলা দেয়া যা ভারতের আসল দাবি পূরণের পরিবর্তে কম কিছু।

সিসকো : প্রেসিডেন্ট তো তেমন সুপারিশই রেখেছেন।

কিসিঞ্জার : আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু আমার মন বলছে, ইয়াহিয়া এই বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হিসেবে বিবেচনা করবেন না। বরং তিনি এটাকে শেষ অস্ত্র হিসেবে দেখতে অধিকতর আগ্রহী হতে পারেন।

সিসকো : আমি একমত, অন্য দুটি বিকল্পের সঙ্গে এই বিষয়টির স্পষ্ট তফাৎ রয়েছে। তিনি শুধু ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তিনি এটা বিবেচনা করতে রাজি হতে পারেন। কিন্তু এটা শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর চাপ বাড়ছে বলেই নয়, পূর্ব

পাকিস্তানে বিদ্রোহ চরম রূপ নেয়ার পরিপ্রেক্ষিতেও তিনি এক্ষেত্রে তাগিদ অনুভব করছেন।

কিসিঞ্জার : আমরা এখন ও আগামী সোমবারের মধ্যে আর কী করতে পারি বলে আপনি সুপারিশ রাখতে পারেন।

সিসকো : আমরা কিছুই করতে পারি না। অথবা আমরা ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এল কে ঝাকে ডাকতে পারি এবং আবার তাদের বলতে পারি, কেন তাদের সংযম প্রদর্শন করা উচিত। আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, ভারত সরকারের বিবেচনার জন্য আমরা কিছু নির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করেছি। এসব প্রস্তাব বিবেচনায় নিতে তারা ব্যর্থ হলে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যাবে। আর সে কারণেই তাদের বক্তব্য জানতে আমরা অপেক্ষা করছি।

কিসিঞ্জার : আপনার কী ধারণা, আপনি তো এসব তাদের আগেই বলেছেন। এখন আবার বলে কী ফায়দা।

সিসকো : তা ঠিকই বলেছেন, তেমন কিছু হয়তো হবে না।

কিসিঞ্জার : পাকিস্তানিদের আমরা কী বলব।

সিসকো : আমার মনে হয়, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ইন্দিরার বৈঠকের ফলাফল ইয়াহিয়াকে সরাসরি জানিয়ে দেয়া উচিত। তাকে আমাদের বলা উচিত, ভারত দৃশ্যত তৃতীয় বিকল্পের ব্যাপারে আগ্রহী। এটা জানিয়ে আমরা তাকে প্রশ্ন করতে পারি, এবার বলুন আপনি কি ভাবছেন?

কিসিঞ্জার : মিসেস গান্ধী কিন্তু প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনায় কোনো কিছুতেই তেমন আগ্রহ দেখাননি। তিনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনায় বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন এটা বলতে যে, বেলুচিস্তানের কখনোই পাকিস্তানের অংশে পরিণত হওয়া উচিত হয়নি। প্রেসিডেন্ট যখন তার কাছে সেনা প্রত্যাহারের কথা জানতে চেয়েছেন তখন তিনি বলেছেন, তিনি তাকে তা পরদিন জানাবেন। অথচ শিষ্টাচারের মাথা খেয়ে তিনি এ প্রসঙ্গে আর কিছু উল্লেখই করেননি।

সিসকো : অন্যদিকে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে আমরা যদি এখন আবার ডাকি তাহলে আমাদের দিক থেকে তাতে এক ধরনের হতাশার প্রতিফলন ঘটতে পারে। আমি মনে করি না যে, আমরা যদি আমাদের অবস্থান আবার পুনর্ব্যক্ত করি তাহলে আগামী ৪৮ ঘণ্টায় তা তেমন কোনো তাৎপর্য বয়ে আনবে না। তবে আমি বিশ্বাস করি যে, আলোচনার বিষয়ে ইয়াহিয়াকে অবহিত করা উচিত। আমি এটা পুনর্ব্যক্ত করতে চাই যে, রাজনৈতিক সমঝোতার দিকে যদি কোনো অগ্রগতির সূচনা ঘটে তাহলে এটাই ভবিষ্যৎ তৈরিতে সবচেয়ে সহায়ক হবে।

কিসিঞ্জার : আপনি কিন্তু এভাবে যুক্তি পেশ করতে পারেন যে, যুদ্ধ প্রতিহত করার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে পাকিস্তানকে অব্যাহতভাবে সামরিক সরবরাহ দেয়া। আমরা কিন্তু গত কয়েকবছর ধরে এক্ষেত্রে ভারতকেই শ্রেষ্ঠ অবস্থানে রেখেছি।

সিসকো : কিন্তু আপনি যে বিকল্পের কথা বললেন, তার সঙ্গে আমি একমত নই। কারণ পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ দেয়া হলে তা সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়ার পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। এমনটা হলে?

কিসিঞ্জার : বড্ড দেরি হয়ে গেছে। আমরা তো পাকিস্তানের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করতে চাইনি। তৃতীয় বিকল্প বেছে নিয়ে ইয়াহিয়া যদি এটা করতে রাজি হন, তাহলে শুভস্য শীঘ্রম। আমরা এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো পন্থা বেছে নিতে পারি, পাক পররাষ্ট্র সচিব সুলতান খানের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে। আগামী সপ্তাহে তিনি আসছেন।

ভ্যান হোলেন : সুলতান খান শুধুই একজন সিনিয়র বেসামরিক আমলা। এ ধরনের আলোচনার চ্যানেল হচ্ছে ইয়াহিয়া ও ফারল্যান্ড। আমরা যদি এখন সুলতান খানকে ব্যবহার করতে চাই তাহলে তা শুধু জটিলতাই বাড়াবে। কিসিঞ্জার : সোভিয়েতরা কি সহায়ক হতে পারে?

সিসকো : সোভিয়েতদের সঙ্গে কথা বলতে পারলে তো খুবই ভালো হয়। আমরা এক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে গ্রোমিকোর আলাপ-আলোচনা স্মরণে আনতে পারি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আপনার (কিসিঞ্জারের প্রতি) সঙ্গেও তো আলোচনা হয়েছে। রাশানরা এই ইঙ্গিতই দিয়েছিল যে, দক্ষিণ এশিয়ায় তারা একটি বিস্ফোরণ দেখতে নারাজ। যদিও এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই যে, ভারতে তাদের অস্ত্র সরবরাহ বাড়ছে। আমরা এখন বলতে পারি দেখুন, পরিস্থিতির কিন্তু অবনতিই ঘটছে। আমরা তাদের জানাতে পারি, বিরাজমান সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে ভারতকে আমরা যে পথ দেখিয়েছি।

কিসিঞ্জার : কিন্তু আমরা তৃতীয় বিকল্পের জন্য তাদের চাপ দেব না।

সিসকো : কেউ কিন্তু আমাদের বলছে না, আমরা তৃতীয় বিকল্প এগিয়ে নেই। অথবা ইয়াহিয়ার প্রতি চাপ সৃষ্টি করি।

ভ্যান হোলেন : রাজনৈতিক সমঝোতার পন্থাই একমাত্র উপায়। আমরা শুধুই তৃতীয় বিকল্পের প্রসঙ্গ তুলতে এবং তা খতিয়ে দেখতে বলতে পারি।

কিসিঞ্জার : (সিসকোর প্রতি) আমি কিন্তু আপনার বার্তা অনুমোদন করেছি। (ফুটনোট : কিসিঞ্জার ১২ নভেম্বরে ইসলামাবাদে প্রেরিত টেলিগ্রামের (নং ২০৬৬৬১) উল্লেখ করেন। এতে ফারল্যান্ডকে ইয়াহিয়ার সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। বার্তা পৌঁছে দিতে বলা হয় যে, গান্ধী ওয়াশিংটন সফরকালে প্রেসিডেন্টের কাছে এ মর্মে 'সতর্ক সমর্থন' ব্যক্ত করেন যে, সম্ভাব্য রাজনৈতিক সমাধানে ইয়াহিয়া মুজিব মনোনীত প্রতিনিধির সঙ্গে সংলাপের সূচনা ঘটাতে পারেন।)

সিসকো : এ সংক্রান্ত মূল বার্তাটি ছিল খুবই জটিল। তাই আমি সংক্ষেপ করে এটুকুই উল্লেখ করেছি যে, আমরা এই মুহূর্তে ইয়াহিয়ার কাছে গিয়ে শুধু এটুকু বলতে পারি যে, ভারত তৃতীয় বিকল্পের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছে। সুতরাং এখন আপনার

মতামত দিন। এর চেয়ে বেশি কিছু বলা ঠিক হবে বলে মনে হয় না।

কিসিঞ্জার : (সেলডেনের প্রতি) প্রতিরক্ষা দপ্তরের কী মত?

নয়েস : আমি মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব খাটো করে দেখতে চাই না। কিন্তু পাকিস্তানে আমাদের সমরাস্ত্র সরবরাহনীতির বাস্তব প্রভাব নির্দিষ্টকরণ-যোগ্য বলে মনে হয় না।

কিসিঞ্জার : কিন্তু ভারত অস্ত্র সরবরাহ পাচ্ছে, পাকিস্তান পাচ্ছে না।

নয়েস : আমাদের দিক থেকে নিশ্চয়ই নয়। ভারত সম্ভবত চীনের কাছ থেকে অস্ত্র পাচ্ছে।

সিসকো : (নয়েসের প্রতি) আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে, আমাদের সমরাস্ত্র সরবরাহনীতি পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করেনি?

নয়েস : তারা নিষ্ক্রিয় নয়।

কিসিঞ্জার : জেনারেল রায়ান, আপনি কী মনে করেন?

রায়ান : আমার এক্ষেত্রে কিছুই বলার নেই। তবে এটা মনে হচ্ছে যে, ভারত এই মুহূর্তে চালকের আসনে বসে আছে।

কিসিঞ্জার : যদি যুদ্ধ বাধে তাহলে আমাদের কী করা উচিত হবে?

সিসকো : আগামী দুই-তিন দিনের মধ্যে অন্যান্য কিছু প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ আমরা নিতে পারি। আমরা এখনো ইয়াহিয়া ও মিসেস গান্ধীর ব্যক্তিগত বৃত্তে বিচরণ করছি। এখন আমাদের দেখতে হবে ইন্দিরা গান্ধীর ওয়াশিংটন সফর-পরবর্তী বিবৃতিতে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠার দিন-ক্ষণ আসন্ন হিসেবে অনুমিত হয় কি না। আমি মনে করি, আমাদের উচিত হবে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হওয়া। পরিষদের কাছ থেকে সংযমের একটা বার্তা নিশ্চিত করা যেতে পারে। আমার অবশ্য কোনো ধারণা নেই যে, নিরাপত্তা পরিষদের এ ধরনের প্রস্তাব বাস্তবে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে। অথবা প্রস্তাবকে বাস্তবযোগ্য করা আদৌ সম্ভব কি না? আমার মনে হয়, বেলুন উপরে উঠার আগেই এই ইস্যুতে জনসমক্ষে যাওয়া আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে একটা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে যে কোনো উপায়ে হোক আমাদের নিরাপত্তা পরিষদে যেতে হবে। এ কথা মনে রেখে কিছু বিষয় সম্পর্কে আগাম ধারণা নিতে চাই। আমরা একটি প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করার কাজ শুরু করেছি। এবং নিরাপত্তা পরিষদে বিষয়টি উত্থাপনের প্রস্তুতিও নিয়ে রাখছি। এটা অবশ্যই চীনা কমিউনিস্টদের জন্য হবে প্রথম পরীক্ষা। আমি আশা করব, তারা উপকারে আসবেন। এই উদ্যোগ অবশ্যই সোভিয়েতদের জন্য উল্লেখযোগ্য অবস্থান তৈরি করবে। তারা নিরাপত্তা পরিষদে আমাদের মতো একই বাস্তবতার মুখোমুখি হবেন। আমার বিবেচনায় এটা একটা আগাম নিবারণমূলক ব্যবস্থা।

কিসিঞ্জার : আপনার সেই প্রস্তাবে কী বলা হবে?

সিসকো : এটা হবে খুবই সহজ। এতে পরিস্থিতির বর্ণনা থাকবে। উভয়পক্ষের প্রতি পরিস্থিতির অবনতি না ঘটাতে থাকবে সংযম প্রদর্শনের আহ্বান। আমরা

সতর্কতার সঙ্গে গুলিবর্ষণ বন্ধ করতে উভয়পক্ষের প্রতি আহ্বান জানাতে পারি। একটি যুদ্ধবিরতি অবশ্য খুবই জটিল হবে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ইস্যু নির্ধারণ সহজ হবে। আমাদের যুক্তি থাকবে পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটছে তা আসলে একটি স্বাধীনতার আন্দোলন। সুতরাং আমাদের খুবই সতর্ক থাকতে হবে। কিন্তু আমার বিবেচনায় এই ইস্যু প্রকাশ্যে আনার প্রক্রিয়াটি হবে গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের অবহিত রাখতে হবে। ...

জেনারেল রায়ান : আমরা পাকিস্তানের কাছ থেকে এমন কী নিশ্চয়তা পেয়েছি যে, তারা ভারতের বিরুদ্ধে সর্বাগ্রে কোনোই ব্যবস্থা নেবে না।

সিসকো : এটাই কিন্তু মস্তবড় বিপদের কথা।

কিসিঞ্জার : যে কোনোভাবেই হোক, তারা যদি পূর্ব পাকিস্তানকে রাজনৈতিকভাবেই হারাবে, তাহলে তারা সেই পরাজয় কেন যুদ্ধের মাধ্যমে নিশ্চিত করবে না?

ভ্যান হোলেন : আসলে পূর্ব পাকিস্তানকে যুদ্ধের মাধ্যমেই বিসর্জন দেয়া পাকিস্তানের জন্য সহজতর।

কুশম্যান : পাকিস্তানিরা জানে মুক্তিযোদ্ধাদের তারা মুছে ফেলতে পারবে না। এটা করতে হলে তাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি ও সরবরাহের উৎস উচ্ছেদ করতে হবে।

কিসিঞ্জার : ভারত যদি বিষয়টি নিষ্পত্তি না চায় তাহলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারি। ভারতীয়রা সেক্ষেত্রে নতুন নতুন দাবি নিয়ে আসবে। আর সেক্ষেত্রে আমরা ভারতীয়দের জন্য মধ্যস্ততাকারী হিসেবে গণ্য হব।

ভ্যান হোলেন : কিন্তু এটাও সম্ভব যে, যুদ্ধের চেয়ে কম কিছুর ক্ষেত্রে আমরা ইয়াহিয়াকে সাহায্য করতে পারি।

সিসকো : ইয়াহিয়া ভাবতেই পারেন না, আমরা তাকে চাপ দিয়ে চলেছি। তিনি একজন গোঁয়ার। ফারল্যান্ডের সঙ্গে তার আলাপ-আলোচনার বৃত্তান্ত জেনে আমি বরং একটু বিস্মিত হয়েছি।

ভ্যান হোলেন : ইয়াহিয়া ফারল্যান্ডের কাছ থেকে সমস্যা সমাধানে রাজনৈতিক পরামর্শ চেয়েছিলেন।

সিসকো : আমি অবশ্য বলছি না যে, ইয়াহিয়াকে আমাদের চাপ দেয়া উচিত। আমি চেয়েছি মিসেস গান্ধীর সঙ্গে আলোচনার বিবরণ ইয়াহিয়াকে জানিয়ে দিক ফারল্যান্ড।

কিসিঞ্জার : আমি বুঝতে পেরেছি। আর সে কারণেই আমি আপনার বার্তা অনুমোদন করেছি।

সিসকো : আমাদের ভালো বন্ধু ভুট্টো এখন কমিউনিস্ট চীন সফরে। গোড়াতেই

গণ্ডগোল পাকানোর জন্য যারা প্রধানত দায়ী তিনি তাদের অন্যতম। মুজিবকে বরন না করতে তিনিই ইয়াহিয়াকে মন্ত্রণা দেন। আর এখন কিনা তিনি বলছেন, ইয়াহিয়ার উচিত মুজিবের সঙ্গে আপোস করা। তিনি আসলে ইয়াহিয়ার অবস্থানকে জটিল করে দিয়েছেন।

ভ্যান হোলেন : অথবা বলতে পারেন, সম্ভবত ইয়াহিয়ার অবস্থান মসৃণ করেছেন।

মুজিবের ভূমিকা নিয়ে বিবৃতি চান কিসিঞ্জার

১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব সুলতান হোসেন খান ওয়াশিংটনে হেনরি কিসিঞ্জারের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন। পাকিস্তানের পক্ষে পাক রাষ্ট্রদূত (ডেজিগনেটেড) আগা মোহাম্মদ রাজা ও যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে হেরাল্ড এইচ স্যান্ডার্স উপস্থিত। পাক পররাষ্ট্র সচিব বলেন, সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের কাছে জানতে চাওয়া যেতে পারে যে, সেনা প্রত্যাহারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে তারা কোথায় গলদ দেখতে পাচ্ছেন। উত্তরে ড. কিসিঞ্জার বলেন, তার জানা আছে যে, ভারত কী জবাব দিতে পারে। তারা বলবে, পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নিক। পররাষ্ট্র সচিব খান বলেন, সেটা কিন্তু উত্তম; ভারত যদি পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত থেকে তার সেনা সরিয়ে গেরিলাদের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। কিসিঞ্জার বলেন, ঠিক আছে আমি এই ইস্যুটি তুলব। তিনি এ পর্যায়ে মুজিব ইস্যুতে চলে আসেন। বলেন, পররাষ্ট্র সচিবকে তিনি কোনোভাবে চাপ দিচ্ছেন না, কিন্তু মুজিবকে নিয়ে তাদের ভাবনাটা আসলে কী, তা তিনি যতদূর সম্ভব অনুধাবন করতে চান। কিসিঞ্জার বলেন, পররাষ্ট্র সচিবের মুখে আগের রাতে যা তিনি শুনেছেন, তা যদি ঠিকভাবে বুঝতে পারেন তাহলে ব্যাপারটি এই দাঁড়াচ্ছে যে, পাকিস্তান সরকার আগামী কয়েকমাস ধরে মুজিবের প্রতি অধিকতর নমনীয়তা প্রদর্শন করতে সক্ষম হবে। পররাষ্ট্র সচিব বলেন, প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে দিকনির্দেশনা ব্যতিরেকে তিনি এখন শুধু এটুকু বলতে পারেন, যদি একটি বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারা যদি লক্ষ্য করে যে তারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছ থেকে সহযোগিতা লাভ করতে পারছে না, তখন কিন্তু তাদের সেই সমর্থন আদায়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতেই হবে। সুতরাং সেই সরকার এই ইস্যু মোকাবেলা করবেই। যদি প্রাদেশিক সরকার উল্লেখ করে, জনগণের কাছ থেকে উপযুক্ত সাড়া পাচ্ছে না তখন তারা এই প্রশ্ন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করবে। তবে তিনি বলেন, এটা উল্লেখ করতে হবে যে, মুজিবের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর অনুভূতি খুবই নেতিবাচক। সুতরাং মুজিব প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করবে বলেই আশা করা যায়। কিসিঞ্জার বলেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করেন যে, যে ধরনের দাবি পূরণ করা হউক না কেন, ভারতের পক্ষ থেকে নতুন করে দাবি তোলা হবে। কিন্তু এটাও সত্য যে, একটা সম্পূর্ণ

নেতিবাচক অবস্থার মধ্যে যাতে আমাদের না পড়তে হয় সেজন্য 'আমাদের' একটি প্লাটফরম প্রয়োজন। ভারতীয়রা মুজিবকে আলোচনার মুখ্য হিসেবে ধরে নিয়েছেন এই বিচেনায় যে, তিনি পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করবেন। কিসিঞ্জার বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, মুজিবকে যদি মুক্তি দেয়া হয়, তাহলে তিনি কলকাতায় 'সমঝোতা প্রক্রিয়া গোগ্রাসে গিলবেন'। কিন্তু এখনো পর্যন্ত অনেকের কাছেই তিনি একটি সমাধানের জন্য সেন্ট্রাল হিসেবে গণ্য হচ্ছেন। ড. কিসিঞ্জার এ পর্যায়ে উল্লেখ করেন, তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছ থেকে দারুণভাবে একটি বিবৃতি পেতে উদগ্রীব। এই বিবৃতিতে আগামী ছয় মাসে মুজিবের জন্য ভূমিকা নির্দিষ্ট করা থাকবে। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার অবস্থান নিয়ে তিনি মাঝে-মধ্যেই বিপাকে পড়েন। তার উদ্দেশ্যের নানা ব্যাখ্যা তাকে বিব্রত অবস্থায় ফেলে। সুতরাং ইয়াহিয়ার সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তার পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। পাক পররাষ্ট্র সচিবের এক প্রশ্নের জবাবে কিসিঞ্জার বলেন, এটা তার জানা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণেও যে, পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে তা কালক্রমে একটি নির্দিষ্ট প্রস্তাবে রূপ পেতে পারে। পররাষ্ট্র সচিব বলেন, পাকিস্তানের অবস্থানের বিষয়ে ভারতকে কোনো কিছু না জানানো কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে বিব্রত করতে তারা তা লিক করে দিতে পারে। তিনি এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাম্প্রতিক সমঝোতা নিয়ে ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত নিবন্ধের কথা উল্লেখ করেন। আলোচনার এই পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য পাক পররাষ্ট্র সচিবকে নিয়ে যান কিসিঞ্জার। সাত-আট মিনিট পরে ফিরে আসেন। ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের স্টাফ হেরাল্ড এইচ. স্যান্ডার্স স্বাক্ষরিত এই দলিলে উল্লেখ করা হয়, তারা ফিরে এসে একমত হন যে, এই বিষয়টি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে অবহিত করা হবে। পররাষ্ট্র সচিব ইয়াহিয়ার সঙ্গে কথা বলবেন এবং মুজিবের বিষয়ে তার ব্যক্তিগত মূল্যায়ন ব্যাক' চ্যানেলে কিসিঞ্জারের কাছে পাঠাবেন। কিসিঞ্জার উল্লেখ করেন, এক্ষেত্রে যদি মিলিটিরি অ্যাকশনের ঘটনা ঘটে তাহলে এই ইস্যু প্রাসঙ্গিকতা হারাতে পারে। পাক পররাষ্ট্র সচিব মুজিব সম্পর্কে কিসিঞ্জারের আগ্রহের আতিশয্য দেখে তার জানার বিষয় সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করে নেন। বলেন, আপনি আমাদের কাছে জানতে চাইছেন, পরিস্থিতি স্থিতিশীল করতে মুজিবের ভূমিকা এবং তার ব্যক্তিত্বকে কতটা কিভাবে কাজে লাগানো যায় এবং তা কতটা সময় পর্যন্ত? কিসিঞ্জার আলোচনার সমাপ্তি টানেন এই বলে যে, পররাষ্ট্র সচিবের জবাব পেতে দিনপাঁচেক অপেক্ষা করতে পারেন। কিসিঞ্জার এদিন জুলাই মাসে ইসলামাবাদে তাকে দেয়া অভ্যর্থনা এবং তার পিকিং সফরে ইয়াহিয়া দয়ালু ভূমিকার কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা জানান। ১৬ নভেম্বর, ১৯৭১ কিসিঞ্জার নিক্সনকে দেয়া এক স্মারকে উল্লেখ করেন, মারি উইলিয়ামস রিপোর্ট দিয়েছেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার দুজন উল্লেখযোগ্য উপদেষ্টা নিশ্চিত করেছেন যে, ইয়াহিয়া ক্রমশ পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলি থেকে

বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। বহু ক্ষেত্রেই পাক সেনাবাহিনী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছ থেকে নির্দেশনা ছাড়াই স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। সম্প্রতি যে নতুন বেসামরিক সরকার নিয়োগ করা হয়েছে তা আসলে কোনো কাজের নয়। গভর্নরের সামরিক উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনরত একজন মেজর জেনারেল এই সরকার পরিচালনা করছেন। ইসলামাবাদের হাতে এখন শুধুই পররাষ্ট্রনীতি রয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে আমেরিকা সরকারিভাবে যেসব সুপারিশ ও পরামর্শ দিচ্ছে তা ইসলামাবাদ গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে ঠিকই। তাই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও তার নীতি নির্ধারণী বিবৃতিতে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। কিন্তু এসবের বাস্তবায়নের ভার থাকে সেনা অধিনায়কদের হাতেই। যারা আবার বিদেশী প্রভাবের উর্ধ্বে। পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তবতা হচ্ছে, বেসামরিক গর্ভনরের ছদ্মাবরণে যেসব তৎপরতা সেনাবাহিনী চালাচ্ছে, তাতে বাঙালিরা ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। ইসলামাবাদ সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিল যে, বেসামরিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তারা যেন সন্ত্রাসী তৎপরতা চালানো থেকে বিরত থাকে। এ ব্যাপারে মার্কিন কর্মকর্তাদের পুনঃপুন আশ্বস্তও করা হয়। কিন্তু পাকিস্তানি সেনা অধিনায়করা বেসামরিক লোকজন ও গ্রামে তাদের সন্ত্রাসী হামলা অব্যাহত রেখেছে। নিরীহ গ্রামবাসী একদিকে সেনাবাহিনী ও তাদের স্থানীয় মিত্র এবং অন্যদিকে গেরিলাদের চাপের মধ্যে পড়ে খাবি খাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অব্যাহতভাবে অবনতিশীল। সামরিক বাহিনী এসেম্বলি মেম্বারদের শূন্যপদে উপনির্বাচনের জন্য পছন্দের প্রার্থী তালিকা তৈরি করছে। ৭০ ভাগের বেশি প্রার্থীকে ইতোমধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া হিন্দুদের বিরুদ্ধে অভিযান আরো জোরদার করা হয়েছে। এই পর্যবেক্ষণ ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, পাকিস্তানের প্রতি মার্কিন নীতি পরিবর্তনের সময় বুঝি এসে গেছে। আগস্টে নির্ধারিত আমাদের নীতিতে উল্লিখিত ছিল যে, আমরা উদ্বাস্তু প্রবাহ হ্রাসে উদ্যোগ নেব। মানবিক সহায়তা দেব, এতে আমরা সফলও হয়েছি। উল্লেখযোগ্য দুর্ভিক্ষ ঠেকানো সম্ভব হয়েছে। নতুন করে উদ্বাস্তু স্রোত তৈরি হয়নি। বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে বলা যায়, বাঙালিদের দেশ ত্যাগের কারণ অনাহারজনিত নয়। আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি ভেঙেপড়ার কারণে তারা নিরাপত্তার অভাববোধ করছে। সে কারণে হয় তারা শহরে কিংবা ভারতে ছুটছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বর্তমানে তার নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে এবং তার সেনারা আক্রমণ পরিচালনায় ব্যস্ত। এর ফলে যদি গেরিলা তৎপরতার লাগাম টানা সম্ভব না হয়, তাহলে প্রশ্ন উঠবে গেলিরাদের স্বাধীনতার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ইয়াহিয়ার পক্ষে আর অন্য কী রাজনৈতিক বিকল্প খোলা থাকবে? তিনি যদি তা এখনই নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে তিনি এমন এক যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানকে হারাবেন যার প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানের অখণ্ডতাও হুমকির সম্মুখীন হবে। ১৬ নভেম্বর, ১৯৭১ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিক্সনকে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেন যে, গতকাল আমাদের পার্লামেন্টে শীতকালীন অধিবেশন শুরু

হয়েছে। এবং আমি সেখানে একটি বিবৃতি দিয়েছি। আমি আশা করি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার প্রজ্ঞা যা কিনা এখন আপনার ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে স্ফুরিত হচ্ছে, তা একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে পেতে ব্যবহার করা হবে। তবে এই রাজনৈতিক সমাধান পূর্ববাংলার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং তাদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। আমার দিক থেকে আমাদের জনগণের ধৈর্য ও সংযম রক্ষায় সর্বাত্মক উদ্যোগ নেব। তবে আমি এই প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ জেনে কিছুটা উদ্বেগ অনুভব করছি। যতই সুবিবেচনাপ্রসূত হোক না কেন, আমি মনে করি, এই ইস্যুতে এখন জনসমক্ষে বিতর্ক শুরু হলে তা রিকন্সিলিয়েশনের প্রক্রিয়াকে চরমভাবে জটিল করবে। বহু দেশই কিন্তু এ রকমের অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করেছে। আমরা যৌথভাবে যে সমাধান চাচ্ছি তাতে এই পদক্ষেপ প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে। ভারতে এই ধারণাই সৃষ্টি হবে যে, এই প্রস্তাবের অংশগ্রহণকারীরা কার্যত একটি টেকসই সমাধান চান না। তারা পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর নিপীড়নের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণের বিদ্রোহকে পাশ কাটাতে চান। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা প্রথমত তাদের উন্নয়নের সুফল থেকে বঞ্চিত করেছে। এবং অতঃপর গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি তাদের বৈধ আকাঙ্ক্ষাকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছে। আমি আশা করব, যুক্তরাষ্ট্র তার প্রভাব খাটিয়ে এ ধরনের একটি ধারণা তৈরির সুযোগ হতে দেবে না।

মুজিব নয়, ইন্দিরার কাছেই তালা-চাবি : ইয়াহিয়া

১৯ নভেম্বর, ১৯৭১

নিক্সনের জন্য প্রস্তুত এক স্মারকে উল্লেখ করা হয়, ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ কিটিং জানিয়েছেন, মিসেস গান্ধী যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে দেশে ফিরে রাজনৈতিক তাপমাত্রা অন্তত অল্প সময়ের জন্য হলেও কিছুটা কমাতে চাইছেন বলেই অধিকাংশ পর্যবেক্ষকের ধারণা। মনে হচ্ছে তিনি ভারতীয় জনগণ এবং বিশ্ববাসীকে এই মুহূর্তে এ ধারণা দিতে চান যে, তিনি একটা অনির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এই সময় দিতে চান যে, তারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে ইয়াহিয়াকে আলোচনায় আনতে সক্ষম হন কি না। এটা দেখেই তিনি পরবর্তী নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত নিতে চান। তবে তার আগে সীমান্ত থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করে পাকিস্তানের ওপর থেকে তিনি চাপ হ্রাস কিংবা গেরিলাদের সমর্থন প্রদান করা থেকে নিবৃত্ত হতে নারাজ। ভারতীয় এবং বিদেশী পর্যবেক্ষকরা ক্রমাগতভাবে এই মন্তব্য করে চলেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র সফরের পরে দৃশ্যত ইন্দিরার মনোভঙ্গিতে একটা পরিবর্তনের ছোঁয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পুরো দেশে যে মনোভাব তা থেকে তার অবস্থান কিছুটা হলেও ভিন্ন। এবং তিনি একটি বড় ধরনের যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে চাইছেন বলেও প্রতীয়মান হচ্ছে। দৃশ্যপটের এটুকু হচ্ছে ইতিবাচক দিক। তবে আমাদের গোয়েন্দা তথ্য হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক হস্তক্ষেপের জন্য ভারতীয় পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি ভারতের সমর্থন আরো বেপরোয়া। পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র সীমান্ত জুড়ে এটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটা উল্লেখ করা দরকার যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কতিপয় পর্যবেক্ষক বিশ্বাস করেন, ভারতীয় সৈন্য এবং মুক্তিবাহিনী সংঘাতকে এমন চরমে পৌঁছে দিচ্ছে যে, পাকিস্তান যাতে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়। আর তার পরিণতিতে একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

১৯ নভেম্বরেই ইসলামাবাদ থেকে হেনরি কিসিঞ্জারের কাছে একটি ব্যাক চ্যানেল বার্তা প্রেরণ করেন পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড। এতে উল্লেখ করা হয়, ইয়াহিয়া একটি রাজনৈতিক সমাধানের উদ্দেশ্যে দারুণভাবে উদগ্রীব। তিনি মনে করেন, তার কাছে একটি ভায়াবেল পরিকল্পনা রয়েছে। তবে তিনি মুজিব মনোনীত প্রতিনিধির সঙ্গে সংলাপে আগ্রহী নন বলেই জানিয়ে দিয়েছেন।

২০ নভেম্বর, ১৯৭১

কিসিঞ্জার নিক্সনকে দেয়া এক স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেন, ইয়াহিয়া ফারল্যান্ডের কাছে নিম্নোক্ত মনোভাব প্রকাশ করেছেন, উত্তেজনা যা প্রতিদিনই ব্যাপকতা পাচ্ছে, তা প্রশমনে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। তবে ইয়াহিয়া বলেছেন, রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য মুজিব মুখ্য ব্যক্তি নন। বরং তালা এবং চাবি দুটোই রয়েছে ইন্দিরার কাছে। মুজিব মনোনীত ব্যক্তির সঙ্গে সংলাপে তিনি তার অনাগ্রহ ব্যক্ত করে বলেছেন, আগে যা উল্লেখ করেছেন সেই সব শর্তের আওতায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে পারলে তিনি খুশি হবেন। মধ্য ডিসেম্বরে একটি সংবিধান প্রণয়নে তিনি তার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেন ২৭ ডিসেম্বরে ন্যাশনাল এসেম্বলি ডেকে তার 'কয়েক সপ্তাহ' পর ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। সেই নতুন বেসামরিক সরকার যদি তাদের মনে চায় তা হলে মুজিব ও বাংলাদেশের সঙ্গে সমঝোতা করবেন। যদি একান্তই দায় না ঠেকেন তাহলে তিনি যুদ্ধ এড়াতে চান এবং বলেন, তিনি যুদ্ধ শুরু করবেন না। এছাড়া উদ্বাস্তু প্রত্যাবাসনে সম্পূর্ণ দায়িত্ব তিনি জাতিসংঘের কাছে হস্তান্তরের আগ্রহ ব্যক্ত করেন। তবে ফারল্যান্ডের বর্ণনায় ইয়াহিয়াকে তিনি এই প্রথম উত্তেজিত হতে দেখলেন।

২২ নভেম্বর, ১৯৭১

ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠকে সিআইএ'র প্রতিনিধি জেনারেল কুশম্যান তথ্য দেন, পাকিস্তান থেকে প্রাপ্ত খবরে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানের যশোর সীমান্তে ভারতীয় বাহিনী এক বিশাল আক্রমণ পরিচালনা করেছে। এ আক্রমণে দুই ডিভিশন পদাতিক সৈন্য অংশ নেয়। সিআইএ'র মূল্যায়ন হচ্ছে, এই খবর যদি অতিরঞ্জিতও হয়ে থাকে তাহলেও এটা ধরে নিতে হবে, পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় অনুপ্রবেশের মাত্রা দৃশ্যত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া একটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চান না। কারণ তিনি জানেন পাকিস্তান সম্ভবত হেরে যাবে। কিন্তু কুশম্যান মন্তব্য করেন, তবে ইয়াহিয়া শিগগিরই হয়তো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন যে, যুদ্ধ ছাড়া তার সামনে আর কোনো বিকল্প নেই। এ মন্তব্য শুনে কিসিঞ্জার স্টেট ডিপার্টমেন্টের আরউইনের কাছে প্রশ্ন রাখেন– আপনার কী মত? তিনি উত্তর দেন– আমাদের মনে হয়, পাকিস্তানিরা সম্ভবত পরিস্থিতিতে ওভার প্লে এবং ভারতীয়রা আন্ডার প্লে করছে। আমাদের ধারণা, ভারতীয় নিয়মিত সৈন্যদের বর্ধিত অংশগ্রহণ অধিকতর অনুকূল রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য ইয়াহিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে পরিচালনা করা হয়েছে। অথবা ভারতের ওপর একটি পাকিস্তানি আক্রমণ উল্টে দেয়া হচ্ছে। যাতে পাকিস্তান এ ফাঁদে পা দিয়ে বিশ্বের চোখে আরেক দফা নাস্তানাবুদ হতে পারে। আমাদের বিশ্বাস, দ্বিতীয় সম্ভাবনার চেয়ে প্রথমটিই হয়তো ভারতীয়দের ভাবনায় থাকবে। আমরা এ পর্যায়ে দুটো দিকে যেতে পারি। প্রথমত,

ফারল্যান্ডের সঙ্গে ইয়াহিয়ার সর্বশেষ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অগ্রসর হতে পারি। তবে সেক্ষেত্রে মুজিব প্রসঙ্গে ইয়াহিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি হতাশাব্যঞ্জক বটে। দ্বিতীয়ত, আমরা যেতে পারি জাতিসংঘে।

কিসিঞ্জার : কারণ ইয়াহিয়া আক্রান্ত। এখন আপনি ইয়াহিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করবেন?

আরউইন : না। জাতিসংঘে যেতে চাই– ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে। আমার মনে হয়, মুজিব সম্পর্কে আমরাও আবার ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারি।

কিসিঞ্জার : কিন্তু আমরা যদি সে ধরনের উদ্যোগ নিই এবং ইয়াহিয়া মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় অনাগ্রহী থাকেন, তাহলে ইয়াহিয়াকে আমরা একটা ভুল জায়গায় নিয়ে যেতে ভূমিকা রাখব। তবে এসব কিছু প্রেসিডেন্টের বিবেচনার জন্য ছেড়ে দেয়াই উচিত হবে।

আরউইন : আসলে আমি কিন্তু সর্বশেষ বৈঠকের আলোচনার সূত্রেই এ কথাটা বলেছি।

কিসিঞ্জার : আপনি কী ভাবছেন প্যাকার্ড (প্রতিরক্ষা দফতরের প্রতিনিধি)?

প্যাকার্ড : কী ঘটছে তা তো বুঝতেই পারছি না। সর্বাগ্রে আমাদের তথ্য জানা দরকার।

আরউইন : যুদ্ধ এড়াতে হলে একটি পথ খোলা। কোনো না কোনোভাবে রাজনৈতিক আপোস।

কিসিঞ্জার : সেটা ঠিকই আছে। যদি আমরা ধরে নিই যে, ভারতীয়দের কাজ আমরা সম্পন্ন করতে চাইছি।

আরউইন : আমি কিন্তু মনে করি না যে, সেটা করার মাধ্যমে ভারতীয়দের কাজ করে দেয়া হবে। এটা যুদ্ধ এড়ানোর একটি উপায়।

কিসিঞ্জার : হ্যাঁ। আমরা আসলে ধাপে ধাপে এমন একটা পথের দিকে এগিয়ে চলেছি যে পথে না যেতে প্রেসিডেন্ট অনেক আগেই তার অনাগ্রহ ব্যক্ত করেছেন। আপনি সর্বশেষ পদক্ষেপটি ব্যবহার করতে পারেন না। যে পদক্ষেপ প্রেসিডেন্ট শুধুই গা-ছাড়া মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করেছেন। উপরন্তু আমরা যাকে শেষ পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করেছি তা ভ্রান্ত। আমরা ধরে নিয়েছিলাম ইয়াহিয়া আমাদের কাছে সুপারিশ চেয়েছেন। তিনি রাজনৈতিকভাবে কী করতে পারেন, তা তিনি জানতে চেয়েছেন। কিন্তু আমি যদি ফারল্যান্ডের বার্তা বুঝতে পারি তা হলে এটাই স্পষ্ট যে, এটা ভুল। আপনার কী ধারণা, টম (জয়েন্ট চিফ অব স্টাফের এডমিরাল মুরারের দিকে তাকিয়ে)?

মুরার : আমরা সর্বত্র বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছি। কী ঘটে চলেছে, আমরা তা জানতে চেয়েছি। এটা নিয়ে কোনো প্রশ্নই নেই যে, ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব সব ক্ষেত্রে স্পষ্ট।

উদাহরণস্বরূপ পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে ভারতের ১৫৭টি এয়ারক্রাফটের বিপরীতে পাকিস্তানের রয়েছে ১৮টি। ভারতীয়রা পশ্চিম সীমান্তজুড়ে সেনা মোতায়েন করেছে এবং তাদের যাতে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাই তাদের তিনটি সেক্টরে পুনর্গঠিত করেছে। এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই যে, একটি সংঘাত ঘটতে চলেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, ভারত পাকিস্তানিদের পশ্চিম সীমান্তে ব্যস্ত রাখতে উস্কানি দেয়ার চেষ্টা করছে। জ্বালানি ও রসদের ব্যাপারে আমার কাছে এমন কিছু তথ্য রয়েছে যা কৌতূহলোদ্দীপক বলে মনে হতে পারে। ভারতীয়দের কাছে ৩০ দিনের মতো যুদ্ধ করার জ্বালানি, হালকা অস্ত্র, গোলাবারুদ রয়েছে। স্থানীয়ভাবে তৈরি কার্তুজের সরবরাহ তাদের নিয়ন্ত্রণে। উপরন্তু তাদের কাছে রয়েছে অতিরিক্ত ৯০ দিনের জ্বালানি মজুদ। তবে এটা আসতে হবে ইরান হয়ে এবং যুদ্ধ অবস্থায় এটা বাধাগ্রস্ত হতে পারে। পাকিস্তানের রয়েছে ৭০ দিনের জ্বালানি মজুদ। কিন্তু এর চার-পঞ্চমাংশ রয়েছে করাচিতে। সুতরাং একক আক্রমণের ক্ষেত্রে তাদের এ অবস্থা নাজুক বটে। পশ্চিমে পাকিস্তানের ৩৪ দিনের বিমান জ্বালানি রয়েছে এবং বাস্তবে পূর্ব পাকিস্তানের আকাশে তাদের কোনো অবস্থান নেই। আমি মনে করি সর্বাগ্রে আমাদের তথ্য পেতে হবে।...

সিসকো : সংঘাতের ব্যাপকতা এড়াতে হলে জাতিসংঘের মাধ্যমে একটা সংলাপ পরিচালনা করতে পারলে ভালো হয়।

কিসিঞ্জার : সংলাপ হবে কার সঙ্গে কার?

সিসকো : সেটাই একটা প্রশ্ন। ভারতীয়রা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে সংলাপের জন্য চাপ দেবে। অথচ তাদের যদি 'পার্টি' করার উদ্যোগ নেয়া হয়, তাহলে তারা তার প্রবল বিরোধিতা করবে। নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনার ভিত্তি হতে পারে বহিঃস্থ সম্পৃক্ততা। সে কারণেই ভারতীয় সৈন্যদের কোনো সম্পৃক্ততার বিষয় তারা এত জোরের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করছে। এ কারণেই তারা বলছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে শুধু মুক্তিবাহিনী জড়িত।

কিসিঞ্জার : এবং আমরা সেক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তান এবং তার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ সোভিয়েত ও চীনের মধ্যে আটকা পড়ে যাব। আমি এটা ভালোই বুঝতে পারি, এই ভবন থেকে জাতিসংঘে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রশ্নে কোনো অনুমোদন পাওয়া যাবে না। কারণ আমরা কী চাই সে ব্যাপারে আমাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। আমাদের এমন একটি চিত্র দরকার যেখানে একটি খসড়া প্রস্তাব থাকবে এবং এ ধরনের উদ্যোগের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য কী কী পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে সে ব্যাপারে ধারণা থাকবে। একটি প্রস্তাব যদি নেয়া সম্ভব হয় তা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যাবে কিনা...।

ভুট্টো নয় ইয়াহিয়ার সঙ্গেই আপোস চেয়েছে বাঙালি

২২ নভেম্বর, ১৯৭১

ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠকে সিসকো যখন বলছিলেন, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে উপমহাদেশে যুদ্ধ নিরুৎসাহিত করা, জবাবে কিসিঞ্জার বলেন : এটা একটা সাধারণ কথা। আমরা তো সেটা পারি। ভারত যা চায় সেটা পূরণ করে দিলেই হলো। আমরা এটাও পারি, পাকিস্তান ভাঙতে সামরিক শক্তি ব্যবহারে ভারতকে নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে। ভারতীয়রা পূর্ব পাকিস্তানকে এমন ফ্যাশনে ভেঙে দিতে চায়, যাতে পশ্চিম পাকিস্তানও ভেঙে পড়ে। মিসেস গান্ধী প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনায় একটা উল্লেখযোগ্য সময় ব্যয় করেছেন এ কথা বোঝাতে যে, কেন বেলুচিস্তানের কখনো পাকিস্তানের অংশে পরিণত হওয়া উচিত হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানে যদি একটি নতুন টিমের কাছে পাকিস্তানিরা সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করে, তখন কী হবে? তারা হয়তো সম্পূর্ণভাবে প্রতিনিধিত্বশীল হবেন না কিন্তু নতুন টিমের কাছে অন্তত এটা আশা করা যায় যে, তারা সাবেক শাসনের সঙ্গে নিজেদের বাঁধবেন না। ভারতকে এটা বলা কি অসঙ্গত হবে যে, আমাদের চার সপ্তাহ সময় দিন। দেখি আমরা কী করতে পারি। আমরা যদি একটি রাজনৈতিক সমাধানে এখনই জবরদস্তি করি তাহলে আপনি একটি ভিন্ন ধরনের জাতিসংঘ প্রস্তাব দেখতে পাবেন। প্রেসিডেন্ট এই ইস্যুতে তার দৃষ্টিভঙ্গি খুব ভালোভাবেই স্পষ্ট করেছেন।

২৩ নভেম্বর, ১৯৭১

ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠকে তিনটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সংক্ষেপে এগুলো নিম্নরূপ : রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড, কিটিং ও বিমের কাছে টেলিগ্রাম পাঠানো হবে। সংশ্লিষ্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে তারা কূটনৈতিক স্মারক পেশের মাধ্যমে সব পক্ষকে সংযত হতে বলবেন। দ্বিতীয়ত, পররাষ্ট্র দপ্তর সাহায্য বন্ধ করে দেয়া মর্মে একটি স্মারক তৈরি করবে। তৃতীয়ত, নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থাপনের জন্য একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরি করা। এদিন আলোচনা শুরু হয় এভাবে :

কিসিঞ্জার : (কুশম্যানের প্রতি) আমরা এখন কোথায় দাঁড়িয়ে? জেনারেল কুশম্যান পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতের সীমান্ত সন্নিহিত এলাকায় যুদ্ধের পরিস্থিতি বর্ণনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন– পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেন, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী

যশোর সীমান্ত দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের আট মাইল গভীরে অনুপ্রবেশ করেছে। অন্যান্য রিপোর্ট থেকে ইঙ্গিত মিলেছে যে, ভারতীয় সৈন্য ও মুক্তিবাহিনী যৌথভাবে আক্রমণ চালালেও পাকিস্তানি সৈন্যদের যশোর থেকে পুশব্যাক করতে পারেনি।

আরউইন : আমরা মাঠপর্যায় থেকে ফিডব্যাক পেতে আর কয়দিন সময় লাগবে?

কুশম্যান : একদিনের মধ্যেই আমাদের এটা পাওয়া উচিত।

প্যাকার্ড : আমরা কি সেখানে ভালো কাভারেজ রেখেছি?

কুশম্যান : (দুই লাইন সোর্স টেক্সট অবমুক্ত করা হয়নি)

কিসিঞ্জার : এটা কি তাহলে সীমিত অপারেশন মনে হচ্ছে? নাকি তাদের যাওয়া অব্যাহত থাকবে?

কুশম্যান : তাদের থামিয়ে দিতে বিকল্প আছে, অথবা চাইলে আরো ঢোকাতে পারে। আমাদের জন্য এটা সীমিত অপারেশন বলেই প্রতীয়মান হয়।

আরউইন : একটি বার্তা বলছে যে, চালনা ও চট্টগ্রামের দিকে অগ্রবর্তী সৈন্যরা এগিয়ে আসছে। কিন্তু সেখানে কি তাদের পক্ষে অবস্থান নেয়া সম্ভব? (ফুটনোট : ২৩ নভেম্বর, ১১৫৫৭ নম্বর টেলিগ্রামে ইসলামাবাদ থেকে জানানো হয়েছে ফারল্যান্ড এদিন ইয়াহিয়ার সঙ্গে কথা বলেছেন। ইয়াহিয়া তাকে জানিয়েছেন, ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করেছে। ভারতের অগ্রবর্তী সৈন্য চালনা ও চট্টগ্রামের দিকে লক্ষ্য করেই অবস্থান নিচ্ছে। ইয়াহিয়া বলেছেন, চট্টগ্রাম সেক্টরে ভারতীয় সৈন্য পাকিস্তানি ভূখণ্ডের ২০ মাইলের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। এ ঘটনার প্রেক্ষাপটে ইয়াহিয়া জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।)

কুশম্যান : তাদের সে সামর্থ্য রয়েছে।

এডমিরাল মুরার : ভারতীয় নৌবাহিনী সম্পর্কে কোনো তথ্য আছে কি? এমন রিপোর্ট পাওয়া গেছে যাতে বলা হয়েছে, ভারতীয়রা একটি ব্রিটিশ জাহাজে গোলাবর্ষণ করেছে।

কুশম্যান : এ ব্যাপারে আমাদের কিছু জানা নেই।

কিসিঞ্জার : (আরউইনের প্রতি) আপনার কী ধারণা?

আরউইন : আমার বলার কিছু নেই। আমরা বার্তায় যা পেয়েছি জেনারেল কুশম্যান তা ইতোমধ্যেই তুলে ধরেছেন।

কিসিঞ্জার : আমরা ইয়াহিয়ার কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। এতে নতুন কিছুই নেই। (ফুটনোট : ইয়াহিয়া এই তারিখবিহীন চিঠিতে নিক্সনকে জানিয়েছেন, ভারত বিনা উস্কানিতে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপকভিত্তিক আক্রমণ পরিচালনা করেছে। পাকিস্তানও তার ভূখণ্ডে প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তুলেছে। ইয়াহিয়া এর পরেও ভারতের সঙ্গে একট সাধারণ যুদ্ধ এড়াতে চান। একই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের ভারত যেভাবে হামলা করছে তাতে অবস্থা ক্রমেই 'পয়েন্ট অব নো রিটার্নে' পৌঁছাচ্ছে।) আপনারা কি প্রত্যেকে নয়াদিল্লি, ইসলামাবাদ ও মস্কোর জন্য

প্রস্তুত বার্তার খসড়া দেখেছেন?

স্যান্ডার্স : হ্যাঁ। এটা প্রত্যেকের সামনেই রাখা আছে।

কিসিঞ্জার : প্রেসিডেন্ট গত রাতে তিনটি বার্তা পাঠাতে বলেছেন। সোভিয়েত, ভারত ও পাকিস্তানের কাছে। খসড়াগুলো ভালোই লেখা হয়েছে। তবে প্রেসিডেন্ট ইন্দিরার জন্য প্রস্তুত বার্তায় সামান্য পরিবর্তন আনতে চান। তিনি তাকে বলতে চান, আমরা উদ্বাস্তু পরিস্থিতির জন্য সহানুভূতিশীল। কিন্তু যুদ্ধ শুরু করা হলে 'তা কিন্তু বোধগম্য হবে না।' (ফুটনোট : ২৩ নভেম্বর প্রেরিত বার্তায় ফারল্যান্ডকে বলা হয়, ইয়াহিয়াকে এটা জানিয়ে দিতে যে, যুক্তরাষ্ট্র ভারতের কাছে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নকেও তা জানিয়েছে। ফারল্যান্ডকে বলা হয়, ইয়াহিয়ার কাছে এই আবেদন রাখতে যে, তিনি যেন সামরিক সংযমের ক্ষেত্রে বৃহত্তম মাত্রা প্রদর্শন করেন। মস্কোতে রাষ্ট্রদূত বিনকে বলা হয়, পাক-ভারত যুদ্ধে ভয়াবহতা ব্যাখ্যা করতে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রোমিকোর সঙ্গে বৈঠক করতে। বিনকে বলা হয়, এ কথা উল্লেখ করতে যে, পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় ও মুক্তিবাহিনী আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনা করছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন যেন ভারতকে সংযত রাখতে তার প্রভাব খাটাতে সচেষ্ট হয়। দিল্লিতে রাষ্ট্রদূত কিটিংকে বলা হয়, পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণসিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি শরণসিংকে জানিয়ে দেবেন যে, পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে সাম্প্রতিক সামরিক সংঘর্ষের ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। কিটিংকে আরো বলা হয়, তিনি যেন স্মরণ করিয়ে দেন যে, ইন্দিরা গান্ধী, নিক্সন আশ্বস্ত করেন, ভারত যুদ্ধ শুরু করবে না।

আরউইন : আমরা যদি বার্তায় প্রেসিডেন্টের বরাতের উল্লেখ করি, তাহলে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পরিবর্তে সম্ভবত স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর শরণাপন্ন হওয়া উচিত। আমার সুপারিশ হচ্ছে, প্রথমে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে যাওয়া। এর পরে যদি আরো তথ্য পাই তাহলে আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে যেতে পারি।

কিসিঞ্জার : আমরা কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে প্রেসিডেন্টের কথা উল্লেখ করতে পারি। আমরা কি তা পারি না? এতে কি কোনো ভুল হবে?

মুরার : আমরা যদি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে যাই এবং ততক্ষণে সামরিক তৎপরতা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায় তখন যুদ্ধ শুরু নিয়ে মিসেস গান্ধীর সঙ্গে কথা বলার আর সুযোগ থাকবে না। সুতরাং আমাদের উচিত হবে সেনা প্রত্যাহার নিয়ে কথা বলা। ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি, ভারতীয় নিয়মিত সৈন্যরা যে জড়িত এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কিসিঞ্জার : মুক্তিযোদ্ধারা ট্যাঙ্ক ও এয়ারক্রাফট কিভাবে ব্যবহার করতে পারে? সেখানে তারা ব্রিগেডও গড়ে তুলেছে। আমরা আসলে কেমন পৃথিবীতে বাস করছি? যেখানে দেশগুলো দাবি করতে পারবে, এসবই গেরিলা তৎপরতা। এর কোনো মানে হয় না এবং আমাদেরও এমন খেলা প্রত্যক্ষ করার প্রশ্ন আসে না। আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী না প্রধানমন্ত্রী এ নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। আমি কি প্রেসিডেন্টের কাছে

এ বিষয়টি তুলব?

প্যাকার্ড : পরিস্থিতির যদি অবনতি ঘটে তাহলে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে আমাদের সতর্কতার সঙ্গে ভাবতে হবে।

কিসিঞ্জার : আমি জানি প্রেসিডেন্ট কী করবেন? তিনি সাহায্য বন্ধ করে দেবেন।

২৪ নভেম্বর, ১৯৭১

ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠকে আরউইন প্রশ্ন রাখেন, পূর্ব পাকিস্তানে কি আমাদের যোগাযোগ রয়েছে?

কুশম্যান : হ্যাঁ।

কিসিঞ্জার : তাদের বলুন পরিস্থিতির ব্যাপারে আমাদের বস্তুনিষ্ঠ তথ্য দরকার।

কুশম্যান : আমাদের হাতে তা রয়েছে।

ওয়ালার (সিআইএ) : তিন লাইন সোর্স টেক্সট অবমুক্ত করা হয়নি।

কুশম্যান : তিন লাইন সোর্স টেক্সট অবমুক্ত করা হয়নি।

আরউইন : এক লাইন সোর্স টেক্সট অবমুক্ত করা হয়নি।

কুশম্যান : হ্যাঁ।

কিসিঞ্জার : এই কক্ষে যারা আছেন, তাদের মনে কারো কি সন্দেহ আছে যে, ভারতীয়রা তার নিয়মিত সৈন্যবাহিনী দিয়ে পাকিস্তান সীমান্তে আক্রমণ পরিচালনা করেছে? আর যদি কারো তা থেকেও থাকে, তার কি আসলে কোনো মানে আছে? আমরা কি এটা বিশ্বাস করতে পারি, মুক্তিযোদ্ধারাই সীমান্তের কয়েক শত মাইল বিস্তৃত এলাকায় আক্রমণ রচনা করেছে। এবং তার ট্যাঙ্ক ও এয়ারক্রাফট নিয়ে। এরপরও কি আমরা একে ইন্ডিজেনাস মুভমেন্ট হিসেবে আখ্যা দেব?

ডিপালমা (স্টেট ডিপার্টমেন্ট) : এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই যে, মুক্তিযোদ্ধারা সশস্ত্র। এবং তাদের বাহির থেকেই অস্ত্র দেয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাতিসংঘে এটা আমরা সুনির্দিষ্টভাবে উত্থাপন করতে পারি না।

কিসিঞ্জার : প্রশ্ন হলো আমরা যে পদক্ষেপ নিতে চাই তার স্বপক্ষে কী ধরনের নিরেট তথ্য থাকা দরকার। আমদের কোনো সন্দেহ নেই যে, ভারত জড়িত এবং তারা সম্ভবত সীমান্ত অতিক্রম করেছে। কিন্তু তাদের তৎপরতা সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য চাই এবং তা এক বা দুদিনের মধ্যেই।

মুরার : তারা সম্ভবত তাদের নিয়মিত সৈন্য ও তাদের সীমান্ত নিরাপত্তারক্ষীদের মাধ্যে একটা পার্থক্য দেখাতে চাইছে। (ফুটনোট : আড়াই লাইন সোর্স টেক্সট অবমুক্ত করা হয়নি।)

আরউইন : (মুরারের প্রতি) তাদের উদ্দেশ্য কী বলে মনে হচ্ছে। তারা কি সরবরাহ বিচ্ছিন্নের চেষ্টা করছে? তারা কি প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ গেরিলাদের সমর্থন দিচ্ছে? কিংবা এর পরেও অনেক দূর যেতে চায়। তারা কি তাদের সৈন্যবাহিনীকে পাকিস্তানের

ভূখণ্ড জবরদখলে ফন্দি আঁটছে? নাকি রক্ষা করতে চাইছে বাংলাদেশকে?

মুরার : প্রাথমিকভাবে তারা বাংলাদেশকে সমর্থন দিচ্ছে এবং পরবর্তী লক্ষ্য হচ্ছে পাকিস্তানিদের জীবন ছারখার করা। বাংলাদেশ গেরিলারা সীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, যেখানে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আক্রমণে ভারতীয়রা তাদের সহায়তা দিতে পারে।

কিসিঞ্জার : সুতরাং আমাদের অবস্থা হচ্ছে এখন এমন যে, আমাদের কী করতে হবে তা আমরা জানি না। আর আরো সময় পার হলে তারা পৌঁছে যাবে ঢাকায়। তখন কিছু করার উদ্যোগ নিতে বড্ড দেরি হয়ে যাবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিলম্বের চেয়ে আমাদের দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া উচিত। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়ে গেলে তা অকার্যকর হয়ে পড়বে। সেটাই আমাদের উভয় সংকট।...

মুরার : ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি যে, ভারতীয় সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে অবস্থান করছে। কিন্তু তারা খুব ভেতরে ঢুকেনি।

আরউইন : তবে তারা সামান্য একটু অনুপ্রবেশ করে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ রুট বিচ্ছিন্ন করতে পারে। যদিও এখনো তারা তা কিন্তু করেনি।

মুরার : খুব ভেতরে অনুপ্রবেশের জন্য তাদের পর্যাপ্ত সৈন্য নেই। আমার মনে হবে তারা পাকিস্তানিদের সক্রিয় করছে, যাতে মুক্তিযোদ্ধারাই তাদের পরাজিত করতে পারে। পাকিস্তানিদের পুন সৈন্যসমাবেশ ঘটানোর সামর্থ্য খুবই কম। ভারতীয় নৌবাহিনী এটা প্রতিহত করতে সক্ষম।

কিসিঞ্জার : (সিসকোর প্রতি) আপনি কী মনে করেন?

সিসকো : ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এই ঘটনা রাজনৈতিক ও সামরিক লক্ষ্যের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক লক্ষ্য হচ্ছে, মুজিবের সঙ্গে সমঝোতার জন্য ইয়াহিয়ার ওপর চাপ বৃদ্ধি। আর সামরিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুক্তিবাহিনীর বিদ্রোহের তেজ বাড়ানো। ইয়াহিয়ার দিক থেকে দেখলে ব্যাপারটি এই দাঁড়ায় যে, পরিস্থিতি থেকে হাত গুটাতে তিনি তার আগ্রহের প্রমাণ সব ক্ষেত্রেই রাখছেন। আমার ধারণা, তার এই মুহূর্তের লক্ষ্য হচ্ছে নির্বাচনের দিকে অগ্রসর হওয়া। এবং তারপর পরিস্থিতিকে ভুট্টোর দিকে ঠেলে দেয়া। ভুট্টো যদি একবার ক্ষমতায় বসতে পারে তাহলে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ঐক্যের সম্ভাবনা এখন যতটুকু আছে তখন তা আরো হ্রাস পাবে। বাঙালিরা সর্বদাই ইয়াহিয়ার সঙ্গে সমঝোতায় আগ্রহী থেকেছে, ভুট্টোর সঙ্গে নয়। ভুট্টোই কিন্তু মার্চের গণ্ডগোলের জন্য মুখ্য সমস্যা। ভুট্টোর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষমতা দখল। পারলে সমস্ত পাকিস্তানের আর না হলে খণ্ডিত পশ্চিম পাকিস্তানের। কিন্তু ক্ষমতা তার চাই।

কিসিঞ্জার : কিন্তু তা তো তার আছে।

সিসকো : আমি আক্ষরিক অর্থে ক্ষমতা বুঝিয়েছি। যদি নির্বাচনী তফসিল এগিয়ে যায় তাহলে ক্ষমতা তার দিকেই যাবে। ইয়াহিয়া অগ্রসর হতে চান, কারণ তিনি বিরাজমান সমস্যা ভুট্টোর কাঁধেই চাপাতে আগ্রহী। এটা যদি ঘটে তাহলে রিকন্সিলিয়েশনের সম্ভাবনা আরো হ্রাস পাবে।

মুজিব বিচ্ছিন্নতাই বেছে নিতেন

২৪ নভেম্বর, ১৯৭১

ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠকে কিসিঞ্জারের প্রশ্ন ছিল, আপনি কি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন ভারত একটি রিকন্সিলিয়েশন চাইছে? তারা কি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না?

সিসকো : আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাব হলো– না, আমি তা বিশ্বাস করি না। আমি শুধু একটি বিকল্পের কথাই বলব। সমস্যা ইয়াহিয়ার কাছ থেকে ভুট্টোর কাছে হস্তান্তর। আর অন্য যে বিকল্প আছে তা হলো– মুজিবের সঙ্গে ইয়াহিয়ার সরাসরি সমঝোতা।

কিসিঞ্জার : ভুট্টো কেন মুজিবের সঙ্গে সমঝোতা করতে পারেন না?

সিসকো : তিনি পারেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে সম্ভাবনা তেমন উজ্জ্বল নয়। বাঙালিরা শুধু যে ভুট্টোর সঙ্গে কথা বলতে অনাগ্রহী তা-ই নয়। ভুট্টো ও মুজিব দুই শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। মুজিব ও ভুট্টোর মধ্যে আপোসের সম্ভাবনার চেয়ে বাঙালিরা ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনাতেই বেশি আগ্রহী।

কিসিঞ্জার : কিন্তু সেক্ষেত্রে ধারণা করা যায়, জটিলতা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে। ভারত এমনকিছুই করেনি যাতে ইঙ্গিত মেলে যে, তারা পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একটি সমঝোতা চাইছে।

সিসকো : আমি মনে করি না যে, মার্চে মুজিবের লক্ষ্য ছিল পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা বা স্বাধীনতা অর্জন। এমনকি এখনো আমি মনে করি না যে, ইয়াহিয়া ও মুজিবের মধ্যে এক ধরনের কনফেডারেশন থাকা অসম্ভব।

কিসিঞ্জার : সুতরাং ভারত পাকিস্তানকে আক্রমণ করলে তার যৌক্তিক উপসংহার হবে, মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় ইয়াহিয়ার ওপর চাপ বাড়াব। অর্থাৎ ভারতীয় সৈন্যরা যা অর্জনে অপারগ আমরা তাদের জন্য তা উসুল করে দেব। আপনি যা বলতে চাইছেন, তার ফল কিন্তু এমনই দাঁড়াচ্ছে।

সিসকো : আমি নিজের কাছেই প্রশ্ন রাখি, কেন পাকিস্তানিরা ইতোমধ্যেই জাতিসংঘে যায়নি। তাদের কাছে এটা তো খুব আকর্ষণীয় হওয়ার কথা। বিশেষ করে তারা যখন শক্তিতে দুর্বল এবং একটা সম্ভাবনা তো আছে যে, জাতিসংঘ অনতিবিলম্বে সামরিক পরিস্থিতির লাগাম টানতে পারে। তবে এটাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে

নিরাপত্তা পরিষদের উচিত হবে পরিস্থিতি বাগে আনা এবং একই সঙ্গে রাজনৈতিক আপোসের প্রশ্নটিও সুরাহা করতে হবে। ইয়াহিয়া যদি মুজিবের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে সক্ষম না হন, তাহলে তিনি কেন জাতিসংঘকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন না।

কিসিঞ্জার : যদি তিনি এসবের কিছুই না করতে চান?

সিসকো : আমি একমত। তার তিনটি বিকল্প রয়েছে। মুজিবের সঙ্গে সরাসরি আপোস, জাতিসংঘের মাধ্যমে ও তৃতীয়ত কোনো কিছুই না করা। যদি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান একসঙ্গে না-ই থাকতে পারে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র একটি স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে।

কিসিঞ্জার : কিন্তু এমন একটা বাজে ব্যাপার আমরা হতে দিতে পারি না। সিসকো যা হোক ইয়াহিয়া জাতিসংঘে গেলে পরিস্থিতি একটি আন্তর্জাতিক চেহারা পাবে, যা তিনি এখনো পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে বর্ণনা করছেন। এমন পরিস্থিতিতে তিনি মুজিবের সঙ্গে আপোস করতে বাধ্য হবেন।

কিসিঞ্জার : কেউ কি সত্যি বিশ্বাস করে যে ভারত পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে সমঝোতা চাইছে?

সিসকো : আমি বিশ্বাস করি, ভারত রাজি হবে। যদি শান্তিপূর্ণভাবে মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। সেক্ষেত্রে মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে একটি সরকার গঠন করবেন এবং তা পৃথক সত্তা অথবা স্বাধীনতা লাভ থেকে তা খুব দীর্ঘ হবে না। মুজিব যদি পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে একটি কনফেডারেল সম্পর্ক স্থাপন করেন, তাহলে একটি স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের মতোই 'ওয়েস্ট বেঙ্গলি'দের কাছে আকর্ষণীয় মনে হবে।

কিসিঞ্জার : আপনি বলছেন, সমঝোতার সম্ভাবনা ভুট্টোর চেয়ে ইয়াহিয়ার সঙ্গে ঘটার সুযোগ বেশি। সুতরাং ভুট্টোর শরণাপন্ন হতে ইয়াহিয়ার হাতে যে চার সপ্তাহ সময় আছে তা আমাদের কাজে লাগানো উচিত।

সিসকো : আমি বলেছি তাদের ব্যবহার করা যেতে পারে। ক্ষমতা যদি ভুট্টোর কাছে হস্তান্তর করা হয়, তাহলে উপমহাদেশে আমরা আরো যুদ্ধ পাব। ভারতীয়রা বিরাট মওকা পাবে। তারা একভাবে না হোক অন্যভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে পাবেই। আমরা জড়িয়ে পড়তে চাই না এবং আমি মনে করি না যে, রাশান কিংবা চীনারা এই বিরোধে জড়িয়ে পড়বে। কিন্তু এই এলাকায় আমরা কোনো একটি শক্তির আধিপত্য দেখতে চাই না এবং পাকিস্তানের পরাজয় ঘটলে তা সোভিয়েত অবস্থানকে নিশ্চিয়ই শক্তিশালী করবে।

কিসিঞ্জার : আপনি বলছেন রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য ইয়াহিয়াকে ব্যবহার করার সুযোগ এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। কিন্তু আমরা এটা তো জানি, কোনো সমঝোতাই টিকবে না। কারণ যা কিছুই ঘটুক না কেন, মুজিব বিচ্ছিন্নতার দিকেই

যাবেন। আমরা পাকিস্তানিদের বলছি, একটা রাজনৈতিক সমঝোতা করে নিন। এর পর আমরা ভারতীয়দের বলেছি কেন যুদ্ধে যাচ্ছেন? আপনাদের স্বার্থসিদ্ধি তো হয়েই যাচ্ছে। এ অবস্থায় ইয়াহিয়া বলতে পারেন, যখন আমরা পূর্ব পাকিস্তানকে হারাতেই যাচ্ছি তখন আমি কেন? দায়িত্বটা ভুট্টোর ঘাড়েই চাপুক।

সিসকো : আমার মনে হয় না এর মধ্যে ফারাক বলতে কিছু আছে। আমরা যদি সরেও দাঁড়াই, শান্তিপূর্ণ পথে নয়, পরিস্থিতির পরিণতি ঘটবে সামরিক পন্থার মধ্য দিয়ে।

কিসিঞ্জার : এটা কল্পনাপ্রসূত। প্রত্যেকেই শান্তিপূর্ণ পথের কথা বলছে। কিন্তু আপনি কি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে ভারতকে সামরিকভাবে নিবৃত্ত করার আদৌ কোনো পথ খোলা আছে? পরিস্থিতি যদি উল্টে যায়, পাকিস্তানি সৈন্যরা ভারতের দিকে যাত্রা শুরু করে, তাহলে নিউইর্য়ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট এবং সিনেট ফরেন রিলেশন কমিটি গণ আত্মহত্যা নিশ্চিত করবে। শুধু তা-ই নয়, ওয়াশিংটন অভিমুখে মার্চও শুরু হবে। যখন আপনি বলেন, আমাদের একটি শান্তিপূর্ণ সুরাহার জন্য কাজ করা উচিত, তখন কি এতে ভারত যা চাইছে, প্রকারন্তরে তা তার হাতে তুলে দেয়ার কথাই আমরা বলছি না? তবে আর যাই হোক, এ কথা যেন বলবেন না, আমাদের শান্তি অথবা যুদ্ধ বেছে নিতে হবে।

সিসকো : কিন্তু ভারত তো অনেক এগিয়ে। তারা পাকিস্তানের চেয়ে শক্তিশালী। সুতরাং আমার পছন্দ করা না করায় কিছু আসে যায় না।

কিসিঞ্জার : তাহলে আপনি আমাদের কী করা উচিত, তা বলুন।

সিসকো : এই মহূর্তে আমাদের কিছুই করা উচিত নয়।

কিসিঞ্জার : প্রেসিডেন্ট, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আমি ভারতীয়দের জানিয়ে দিয়েছি, তারা যদি যুদ্ধ শুরু করে তাহলে তার পরিণাম ভোগ করতে হবে।

প্যাকার্ড : কিন্তু আমরা করতেটা কী পারি? আমরা ভারতের ওপর কার্যকর প্রভাব খাটাতে পারি, এমন তো কিছুই দেখছি না।

কিসিঞ্জার : আমরা সাহায্য বন্ধ করে দিতে পারি। আমরা কূটনৈতিকভাবে অগ্রসর হতে পারি।

প্যাকার্ড : উত্তম। তা-ই করা উচিত। কিন্তু তাদের সাফল্যের সম্ভাবনা কতটুকু, আমরা তা জানি না। একটি বিকল্প হতে পারে, আমরা পাকিস্তানিদের মদদ দিতে পারি। কিন্তু সেক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে হবে। একই সঙ্গে নিরূপণ করতে হবে ব্যর্থতার মূল্যও।

কিসিঞ্জার : পাকিস্তানিদের সমর্থন দিতেই হবে এমনটা কিন্তু নয়। ইয়াহিয়াকে এটা বলা মারাত্মক হবে না যে, পূর্ব পাকিস্তানে একটি রাজনৈতিক সমাধানের উপায় খুঁজতে তাকে চার সপ্তাহ সময় দেয়া হলো। ভারত কী করছে, তা-ও আমাদের দেখতে হবে। তারা পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আক্রমণ না চালিয়ে ভিন্ন কিছু অর্জনের ফন্দি

ঘাটছে। তারা চাইছে, পশ্চিম পাকিস্তানেও যেন তারা তালগোল পাকিয়ে ফেলে।

সিসকো : আমি একমত।

কিসিঞ্জার : আমরা কিন্তু এখনো চীনের উল্লেখ করিনি। এই প্রথম আমরা এমন একটা ঘটনা মোকাবেলা করছি, যেখানে চীন জড়িত। যুক্তরাষ্ট্র যদি কোনো পদক্ষেপ না নেয় সেক্ষেত্রে প্রভাবটা কী হবে? আপনি বলছেন, (সিসকোর প্রতি) আমাদের রয়েছে দুটো বিকল্প। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা অথবা মুজিবকে মুক্তি দিতে ইয়াহিয়াকে চাপ দেয়া।

সিসকো : না। ভারতকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের হাতে এখনো একটি ভারী কামান রয়েছে।

ভারত চেয়েছে পূর্ব পাকিস্তান হবে ভুটান

২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

দুপুর সাড়ে ১২টা

নিক্সন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স ও কিসিঞ্জার পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় করেন। রজার্স আলোচনার শুরুতেই দক্ষিণ এশীয় প্রশ্নে হোয়াইট হাউস এবং পররাষ্ট্র দফতরের মধ্যে মতবিরোধের কথা অস্বীকার করেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে এই সংকট মোকাবিলা করতে পারে সে ব্যাপারে তিনি তার মত দেন। প্রথমত, উভয় পক্ষের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সংযম প্রদর্শনের জন্য কূটনৈতিকভাবে যতদূর করা সম্ভব আমাদের তা করেই যেতে হবে। দ্বিতীয়ত, আমি মনে করি, ইয়াহিয়ার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভালো; এই সম্পর্ক ধরে রাখতে হবে, আমাদের তার ঘনিষ্ঠ হতে হবে। তৃতীয়ত, আমি মনে করি না যে, একটি রাজনৈতিক সমাধানের কোনো মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের চেষ্টা করা উচিত। আমি এটা কখনোই ভাবি না। আমি মনে করি না, এটা সম্ভব এবং আমার ধারণা, ইয়াহিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, রাজনৈতিকভাবে কিছু একটা করা বাঞ্ছনীয়। রজার্স বলেন, ইয়াহিয়া কিছু একটা করতে বাধ্য হতে যাচ্ছেন। হয় তিনি এটা করবেন, না হয় তাকে চলে যেতে হবে। একটা হতে পারে, তিনি ভুট্টোর কাছে সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে দেবেন। কিন্তু তাকে ভালো অগ্রগতি বলা যাবে না। আমার নিজের ধারণা, পরিস্থিতি আরো অবনতি হতে যাচ্ছে। আমি সমাধানের কোনো পথ দেখি না। সুতরাং আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়াকে আমরা কিভাবে প্রতিহত করতে পারি। নিক্সন এই পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধ সম্পর্কে খবরের কাগজের রিপোর্টের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, ভারতীয়রা কি এখনো এটা অস্বীকার করছে যে, তাদের ডিভিশন পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধে লিপ্ত। রজার্স বলেন, তারা এখনো তা প্রত্যাখ্যান করছে। তবে তারা সেখানে ডিভিশন পর্যায়ে না থাকলেও ব্রিগেড পর্যায়ে অবশ্যই সক্রিয়। কিসিঞ্জার উল্লেখ করেন যে, ভারতীয় ব্রিগেডগুলো– পদাতিক, বিমান এবং ট্যাঙ্কবাহিনী সমর্থিত। রজার্স বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের লড়াইয়ে ভারত আরো সক্রিয়ভাবে অংশ নেবে। এর ফলে পাকিস্তানের অবস্থান আরো গুরুতরভাবে নাজুক হয়ে পড়বে। 'আমি মনে করি, আমাদের এই সত্যের মুখোমুখি হতে হবে, সামরিকভাবে ইয়াহিয়ার অবস্থান খুবই দুর্বল। পূর্ব পাকিস্তানে তার লোকের সংখ্যা ৬০ থেকে ৮০ হাজার।' নিক্সন এ কথার পিঠে আরো

বলেন, ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানে ধ্বংস হবেন। রজার্স এ সময় পাকিস্তান বাহিনীর লজিস্টিক সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের সৈন্যদের কোনো কিছু পুনরায় সরবরাহ করতে হলে কোনো বিমানকে আড়াই হাজার মাইল পাড়ি দিতে হবে। আর আপনি জানেন, তাদের লজিস্টিক দেয়া একটি অসম্ভব বিষয়। আমার নিজের মত হচ্ছে, এটা সম্ভবত আরো অবনতি ঘটাবে। এ ছাড়া আমি স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছি তারা যেন ভারতের প্রতি অর্থনৈতিক সহায়তার অস্বীকার ও কোনো রফতানির প্রক্রিয়া বিলম্ব ঘটায়। কিন্তু তিনি মত দেন যে, এসবই কিছু প্রতীকী পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে ভারতকে নিবৃত্ত করা যাবে না। 'ভারতের প্রতি আমাদের প্রভাব খাটানোর সম্ভাবনা একেবারেই সীমিত, আমরা যদি তাদের বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা নেই, যে ব্যাপারে আপনি সিদ্ধান্ত অবশ্য নিতে পারেন, তা কিন্তু প্রতীকী হিসেবেই গণ্য হবে। উল্লেখযোগ্যভাবে কার্যকর হবে না। এ দিনের আলোচনায় পূর্ব পাকিস্তান ইস্যু জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে নিয়ে গেলে কী ধরনের ফায়দা পাওয়া যেতে পারে, সে ব্যাপারে কোনো মতৈক্যে পৌছানো সম্ভব হয়নি। নিক্সন এ পর্যায়ে রজার্সের এই পর্যবেক্ষণ খণ্ডন করেন যে, ভারতকে সংযত করার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র শুধুই প্রতীকী পদক্ষেপ নিতে পারে। প্রেসিডেন্ট বলেন, আমি জানি এটা বলা যেতে পারে যে, এটা কোনো সুফল বয়ে আনবে না এবং ভারতের প্রতি আমাদের কোনো প্রভাব নেই; এবং এটা শুধুই প্রতীকী। কিন্তু অন্যদিক থেকে দেখলে আমাদের সেই প্রতীকীটাই কিন্তু ভালোভাবে কার্যকর করা উচিত। কারণ আমি বিশ্বাস করি, আমাদের কিছু প্রতীকীবাদের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি অবশ্য পরিস্থিতির বাস্তবতা স্বীকার করেন। 'সামরিক ভারসাম্যের দিক থেকে দেখলে, ভারতীয়রা জয়লাভ করতে যাচ্ছে। পাকিস্তান ভেঙে যাবে।' নিক্সন আরো বলেন, এ ধরনের একটা পরিস্থিতি ধরে নিয়েও আমার কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আমাদের নীতি যে কোনো বিচারেই পাকিস্তান ঘেঁষাই হওয়া উচিত। ভারতঘেঁষা নয়। তবে এটা এই বিবেচনায় নয় যে, ইন্দিরা গান্ধীর চেয়ে ইয়াহিয়া আমাদের প্রতি অধিকতর বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব দেখাচ্ছেন। আমি মনে করি, ভারতের অবস্থান অধিকতর ত্রুটিপূর্ণ। আমার ধারণা, আমাদের পুরো খেলাটাই খেলতে হবে। সুতরাং আপনি যদি কিছু প্রতীকীও করতে পারেন, তাহলে তা সত্যি আমাদের ... (নিক্সন তার এই বাক্যটি শেষ করেননি)। এরপর বলেন, ইন্দিরা গান্দী জানতেন, তিনি যখন এখানে আমরা ফাঁকা গুলি ছুড়িনি। হতে পারে তা কোনো অর্থই বহন করেনি... পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুসারে আমরা পাকিস্তানের দিকেই ঝুঁকতে পারি। আমি তেমন খেলাকেই অগ্রাধিকার দেব। সেই বিবেচনাতেই জাতিসংঘের খেলাটা আসবে। রজার্স ধারণা দেন যে, এই ইস্যু যদি জাতিসংঘে তোলা হয়, তাহলে ভারতের চেয়ে পাকিস্তানই উপকৃত হবে। রজার্স 'সম্পূর্ণরূপে একমত' হন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তানের দিকেই ঝোঁকা উচিত। তবে প্রশ্ন ছিল, এটা কিভাবে করতে হবে? তিনি অনুভব করেন যে, এর বহু উপায়

রয়েছে। 'একটি হতে পারে এই, এই মুহূর্তে আমরা আর কোনো রফতানি ছাড়পত্র মঞ্জুর করব না। ভারতে প্রেরণে যা কিছু পাইপলাইনে রয়েছে, আমরা তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারি। বর্তমানে পাইপলাইনে হয়তো ১০ থেকে ১৫ মিলিয়ন ডলারের সামরিক সরঞ্জাম রয়েছে। আমরা এটাও বলতে পারি, আমরা প্রতিশ্রুত অর্থনৈতিক সহায়তা রক্ষা করতে পারব না। এই প্রতিশ্রুতির আওতায় ১১ মিলিয়ন ডলারের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এটা অনুল্লেখযোগ্য। আমি মনে করি, এমন পদক্ষেপ ঠিক হবে না। কারণ যেভাবেই হোক আমরা তো উদ্বাস্তুদের সাহায্য দিতে যাচ্ছি। নিক্সন বলেন, আমি এক্ষেত্রে একটি শক্ত অবস্থান নিতে চাই। কিসিঞ্জার অবশ্য রজার্সের সঙ্গে একমত হন যে, যেসব ঋণপত্র ইতোমধ্যে খোলা হয়েছে তা নিষ্পন্ন করা কঠিন হবে। কিন্তু নিক্সন পুনর্ব্যক্ত করেন যে, যত প্রতিকূলতাই হোক না কেন, তিনি এমন কিছু পদক্ষেপ নিতে চান, যা ভারতকে সংযত করতে পারে। 'আমি মনে করি, আমাদের এমন কিছু করা উচিত যা প্রতীকী। আমি প্রকৃতই বিশ্বাস করি, এমন প্রতীকী পদক্ষেপ নিলেও তা ভারতকে কিছুটা হলেও সংযত করতে পারে। রজার্স সুপারিশ রাখেন যে, ২৬ নভেম্বর নতুন করে রফতানি লাইসেন্স ইস্যুর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা দেয়া যেতে পারে। নিক্সন ইঙ্গিত দেন যে, ২৬ নভেম্বরের বৈঠকের আগেই তিনি তার নীতির বিকল্পগুলো পর্যালোচনা করতে আগ্রহী। তিনি এটা ভেবে চিন্তিত যে, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা অকার্যকর বলে প্রমাণিত হতে পারে। তিনি বলেন, তিনি এমনকিছু একটা করতে চান যা খুবই সুদৃঢ়। তবে একইসঙ্গে খুবই ইতিবাচক বিবৃতি থাকবে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উদ্বাস্তুদের সাহায্যদানে অঙ্গীকারবদ্ধ। তারা ক্ষুধার্ত জনগণের পাশে দাঁড়াবেই। তবে তিনি বলেন, ভারতকে যে কোনো সামরিক সহায়তা দানের প্রক্রিয়ায় অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। আমেরিকার অবমুক্তকৃত এসব দলিলের সম্পাদকীয় নোটে উল্লেখ করা হয় যে, এরপর আলোচনা কিসিঞ্জার এগিয়ে নেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, এই সংকট থেকে ভারতের স্বার্থ কিভাবে উদ্ধার হতে পারে। তার কথায়, ভারত পাকিস্তানের দুই অংশকে যেভাবে খণ্ডিত করতে চাইছে তাতে পশ্চিম পাকিস্তান কালক্রমে আফগানিস্তানের মর্যাদা লাভ করবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের মর্যাদা ভুটানের পরিণতি পাবে। এ দিনের আলোচনায় নিক্সনের এই মন্তব্যের সঙ্গে সাধারণভাবে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, ইয়াহিয়া একজন চমৎকার এবং বোধসম্পন্ন মানুষ। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে তিনি সব সময় চৌকস নন। তিনজনই একমত হন যে, ইয়াহিয়া তার ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়ার কারণেই ভুট্টোর দিকে ঝুঁকেছেন। ভুট্টো সম্পর্কে নিক্সনের মূল্যায়ন হচ্ছে, তিনি সম্পূর্ণরূপে বক্তৃতাবাগীশ। নিক্সন রজার্স ও কিসিঞ্জারের দিকে তাকিয়ে আলোচনার সমাপ্তি টানেন এই বলে যে, 'আমি এমন একটি অবস্থার মধ্যে ধরা পড়তে চাই না, যেখানে আমাদের একটি শোচনীয় যুদ্ধের উত্তাপ অনুভব করতে হয় এবং যে যুদ্ধে আমাদের কিছুই করার নেই।'

সেনা প্রত্যাহারে নভেম্বরে সম্মতি ইয়াহিয়ার

২৯ নভেম্বর, ১৯৭১

ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধ পরিস্থিতি বিস্তারিত আলোচনা হয়। কিসিঞ্জার এডমিরাল মুরারকে লক্ষ্য করে বলেন, সামরিক দিক সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? এডমিরাল মুরার বলেন, আমরা এমনও রিপোর্ট পেয়েছি যে, ইয়াহিয়া এক পার্টিতে মন্তব্য করেছেন, 'আপনারা আমাকে এক-দুদিনের জন্য দেখবেন না । আমি আমাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি তদারকি করতে সীমান্তে যাচ্ছি।' পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি বাহিনীর রসদপত্রের অবস্থা এমনই যে, তারা সরবরাহ সংকটে পড়বেই। কার্তুজের মজুদ খুবই সামান্য। উপরন্তু ইয়াহিয়া পশ্চিমে নজর তীব্র করতে বাধ্য হতে পারেন। গত সপ্তাহে পরিস্থিতি সত্যিই উল্লেখযোগ্য অবনতি ঘটেছে।

আরউইন : পাকিস্তানি সরবরাহের দিক থেকে তারা কতটা সক্ষম?

মুরার : ৩০ দিনের চেয়েও কম।

কিসিঞ্জার : (সিসকোর প্রতি) কূটনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে আপনি আমাদের ধারণা দিন।

সিসকো : সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট গান্ধী, কোসিগিন ও ইয়াহিয়ার কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন। এই বার্তার মুখ্য কথা হচ্ছে উভয় সীমান্ত থেকে নিজ নিজ সৈন্যদের প্রত্যাহার এবং সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন। পূর্ব পাকিস্তানে ইয়াহিয়া একতরফাভাবে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক নিয়োগে রাজি হয়েছেন। রাষ্ট্রদূত কিটিংয়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত টেলিগ্রাম পড়ে মনে হচ্ছে, ভারতের কাছ থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাবে না। আমি বিশ্বাস করি, ভারত তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে তার বর্তমান সামরিক অবস্থান থেকে একচুলও নড়বে না।

কিসিঞ্জার : আপনি কি মনে করেন যে, এই পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল ইন্দিরার সফরের আগেই।

সিসকো : সামরিকভাবে অবশ্যই। কিছু মোতায়েনের ঘটনা আগেই ঘটেছিল। কিন্তু ওয়াশিংটন সফরের পরে সবচেয়ে কার্যকর সামরিক পদক্ষেপ নেয়া হয়।

মুরার : তাদের অবশ্যই কোনো কনটিনজেন্সি প্লান ছিল।

কিসিঞ্জার : আমার নিজের জানার জন্য এ ব্যাপারে প্রশ্ন করছি। আমরা কিন্তু গোটা গ্রীষ্মকালজুড়ে বিতর্ক করেছি যে, ভারতকে সংযত করা যাবে কী যাবে না।

তাদের পরিকল্পনা যদি আগেই থেকে থাকে তাহলে সৈন্য মোতায়েনের দিকের কথা বিবেচনায় রেখে এটা কি বলা যায় যে, তারা বর্ষকাল আসার আগেই আক্রমণ করে বসতে পারে? সিদ্ধান্ত যদি গত জুনে নেয়া হয়ে থাকে তাহলে আক্রমণের জন্য কোন সময়টা তাদের জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক?

মুরার : চার বা পাঁচ সপ্তাহ।

উইলিয়ামস : এই সময়টা বাঁধা হয় বাঙালিদের প্রশিক্ষণদানের বিবেচনায়।

কিসিঞ্জার : আমি মানুষের মুখে কথা বসিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছি না। কিন্তু কেউ একজন যুক্তি দিতে পারেন যে, ভারতীয়রা গত জুন থেকে যা কিছু করেছে তার সব কিছুর উদ্দেশ্য ছিল এটাই। পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিং এবং মিসেস গান্ধীর সফর সবটাই শুধু ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়েছে। অথবা কেউ একজন বলতে পারেন ভারতীয়রা সমস্যার সমাধানের সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত তারা বেপরোয়া পদক্ষেপ বেছে নিয়েছেন।

মুরার : আমি মনে করি, বাঙালিদের প্রস্তুতি সময় নির্ধারণ করেছে। ভারতীয়রা অনেক আগেই তাদের নিয়মিত সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হতে পারত। ভারতীয় লক্ষ্য হচ্ছে, পাকিস্তানি এবং গেরিলাদের আপেক্ষিক শক্তিতে পরিবর্তন সাধন করা।

কিসিঞ্জার : (উইলিয়ামের প্রতি) আপনি কী ভাবছেন?

উইলিয়ামস : আমার মনে হয়, ভারতীয়রা দুই অথবা তিন সপ্তাহ আগে অগ্রসর হতে পারত। এ সময়ের মধ্যে তারা বাঙালিদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে পারত। তারা আগ্রাসন চালানোর আগে প্রায় তিন সপ্তাহের সময় নিতে চেয়েছে, যা কিনা মিসেস গান্ধীর সফরের সঙ্গে এক হয়ে যায়। আমি মনে করি, তারা শুধুই গান্ধীর ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছিল।

মুরার : তারা অবশ্যই গেরিলাদের প্রশিক্ষণ ও সরবরাহ সুবিধা দিয়ে যাচ্ছে।

উইলিয়ামস : আমি মনে করি, তারা আশা করেছিল যে, গেরিলারা তাদের অভ্যন্তরীণ অপারেশনে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। কিন্তু তারা লক্ষ্য করেছে, গেরিলারা কেবল কার্যকর হতে পারে তখনই যখন তারা ভারতীয়দের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। এটা ছিল তাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের রণকৌশল। তারা কিন্তু অভ্যন্তরীণ অপারেশনগুলো কেবল মুক্তিবাহিনী দিয়েই সম্পন্ন করাকে অগ্রাধিকার দিতে পারত।

কিসিঞ্জার : কিন্তু এটা কি ত্রাণ সরবরাহ বন্ধ করে দিচ্ছে? সেখানে কি দুর্ভিক্ষ আসবে?

উইলিয়ামস : ত্রাণ-তৎপরতা শেষ পর্যায়ে। জাতিসংঘ কর্মীদের প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। পরিস্থিতি অবনতিশীল। শস্য উৎপাদনের অবস্থা ভালোই। কিন্তু আমদানিকৃত খাদ্যশস্য মজুদ অবস্থায় আছে, বণ্টন করা সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং কোথাও কোথাও দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে।

আরউইন : মজুদের কিছু ঘটনা ঘটবেই।

মুরার : এবং গেরিলারা নৌকাগুলো ধ্বংস করছে।

উইলিয়ামস : হ্যাঁ। কয়েক সপ্তাহ ধরে যেসব নৌকা একত্র করা হয়েছিল তা তারা কয়েকদিনের মধ্যে সাফ করে দিয়েছে। চট্টগ্রামে ২২ জন লোক এখন অবশিষ্ট রয়েছে। সব জাহাজ প্রত্যাহার করা হয়েছে। ট্রাকগুলো দাঁড়িয়ে আছে।

কিসিঞ্জার : (প্যাকার্ডের প্রতি) আপনি কী ভাবছেন?

প্যাকার্ড : আমার যোগ করার তেমন কিছু নেই। ভারত এমন কিছুই করেনি, যাকে গঠনমূলক বলা যেতে পারে। এমন কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই যে, এখন যেখানে আছে সে অবস্থা থেকে সরে দাঁড়াতে কোনোকিছুই তারা করেছে।

কিসিঞ্জার : প্রেসিডেন্টের সঙ্গে গান্ধী তার আলোচনায় পূর্ব পাকিস্তান নিয়ে কোনো কথাই বলেননি। অথচ তিনি দিব্যি অভিযোগ করেছেন, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে।

প্যাকার্ড : ইয়াহিয়া তার নমনীয়তা দেখিয়েছেন। আমরা সেনাপ্রত্যাহারে তার আগ্রহের কথা ভারতকে জানিয়েছি। কিন্তু কোনো সাড়া পাইনি।

কিসিঞ্জার : ভারত কিন্তু ইয়াহিয়া ও বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনার সূত্রপাত ঘটাতে কোনো তৎপরতাই প্রদর্শন করেনি। অথচ এই প্রক্রিয়ার পেছনে গত গ্রীষ্ম থেকে অবিরাম কাজ করেছেন জো সিসকো। সেটাই হতে পারত সূচনা। ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনায় বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দ যদি মুজিবের মুক্তি দাবি করতেন, তাহলে আমরা হয়তো কিছু মুভমেন্ট লক্ষ্য করতাম। সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি স্থিতিশীল হতে পারত। আমাদের হাতে তিনটি সমস্যা রয়েছে, যা আলোচিত হওয়া দরকার। ১. সামরিক সহায়তা। ২. জাতিসংঘের কাছে প্রস্তাব। ৩. অর্থনৈতিক সহায়তা বন্ধ করে দেয়া। আপনারা প্রত্যেকে স্টেট ও ডিফেন্সের দলিলপত্রে দেখেছেন সামরিক সাহায্য বন্ধ করে দেয়া। গত বুধবার প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নেন যে, সামরিক সাহায্য বন্ধের সিদ্ধান্ত শুক্রবার ঘোষণা করা হবে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের সুপারিশ হচ্ছে– ইয়াহিয়া কোসিগিন ও গান্ধীর কাছ থেকে জবাব পাওয়া সাপেক্ষে এই ঘোষণা দেয়ার কথা ভাবা হয়েছিল। এখন আমরা জবাব পেয়েছি। প্রেসিডেন্ট এগিয়ে যেতে চান। আমি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। তিনিও একমত। সুতরাং কেউ যদি শক্তিশালী কোনো যুক্তির অবতারণা না করেন তাহলে সামরিক সহায়তা স্থগিতের প্রশ্ন মীমাংসিত। এখন প্রশ্ন হলো, আমরা কী উপায়ে এটা বন্ধ করব? দুটো উপায় খোলা আছে। প্রথমত, আমরা নতুন লাইসেন্স প্রদান স্থগিত করতে পারি। দ্বিতীয়ত, নতুন লাইসেন্স বন্ধের পাশাপাশি বিদ্যমান সব লাইসেন্স বাতিল করতে পারি।

আরউইন : আপনার প্রশ্ন রয়েছে যে, কখন এটা বন্ধ করা হবে এবং তার পরিমাণ কী হবে?

কিসিঞ্জার : এই দুয়ের মধ্যে তেমন কী আসে যায়?

আরউইন : আমি ঠিক জানি না, পরিমাণ কী?

পাকসেনাদের পঙ্গুত্ব শুরু যশোরের পতনে

৩০ নভেম্বর, ১৯৭১

পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড কিসিঞ্জারের কাছে পাঠানো এক ব্যাক চ্যানেল বার্তায় উল্লেখ করেন, আমরা এমন কোনো তথ্য পাইনি যে, যাতে মনে হতে পারে পাকিস্তান কাশ্মীরে হামলা চালাতে যাচ্ছে, অথবা এমন কিছু তাদের সক্রিয় বিবেচনাধীন। তবে বোঝাই যাচ্ছে, এটা তাদের কনটিনজেন্সি প্লানে নিশ্চয়ই থাকবে। ইয়াহিয়া অব্যাহতভাবে আমাকে নিশ্চিত করছেন যে, তিনি যুদ্ধ চান না এবং যুদ্ধ এখান থেকে শুরু করতেও চান না। তিনি যে কট্টর মনোভাব পোষণ করে চলেছেন, তা পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের অব্যাহত অনুপ্রবেশের মুখে কতদূর পর্যন্ত বজায় রাখতে পারেন তা অনিশ্চিত। পাকিস্তানিরা প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছে এবং তারা যদি চূড়ান্তভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌছায় যে, তাদের শেষ পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিম দুই সীমান্তেই লড়াই করতে হবে, তাহলে কাশ্মীর আবেগগত দিক থেকে আকর্ষণীয় টার্গেট। এছাড়া আমরা সাধারণভাবে মনে করছি যে, তারা দক্ষিণে অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে অধিকতর উৎসাহিত হতে পারে। আপনি কি এ ব্যাপারে অনতিবিলম্বে আপনার পরামর্শ জানাবেন ফুটনোট : ৩০ নভেম্বর ফারল্যান্ড কিসিঞ্জারের কাছ থেকে একটি বার্তা পান। এতে কিসিঞ্জার তার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানে চাপ কমাতে পাকিস্তান কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্যদের ওপর হামলা চালাতে পারে কি না?

১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

কিসিঞ্জার নিক্সনকে দেয়া এক স্মারকে উল্লেখ করেছেন, আজ সকালে রাষ্ট্রদূত কিটিং মিসেস গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। আপনার বার্তা পেয়ে ইন্দিরা দ্রুত তা পাঠ করেন এবং বলেন, তিনি দ্রুততার সঙ্গে উত্তর দেবেন। তিনি কিটিংকে যেসব ধারণা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ। এক. যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ভারতের অগাধ ভালোবাসা রয়েছে। কিন্তু প্রতিটি দেশকেই সর্বাগ্রে তার জাতীয় স্বার্থ দেখতে হবে। এটা তার কর্তব্য, তার দেশের জন্য তার দেশের স্বার্থের জন্য কোন পন্থা সমীচীন? দুই. পাকিস্তানই সর্বাগ্রে সীমান্তে তার সৈন্য পাঠিয়েছে এবং কেউ তাদের প্রত্যাহার করে নিতে বলেনি। ভারত সীমান্তে সৈন্য মোতায়েনের পরই প্রত্যাহারের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে। তিন. ইয়াহিয়ার সমস্যা নিজস্ব সৃষ্টি এবং 'আমরা এমন অবস্থানে নেই যে, সেই সমস্যা তার

জন্য সহজ করে দেব।' ভারত কেন তার সৈন্যদের প্রত্যাহার করছে না, তার অন্যতম কারণ এটি। ভারতের প্রতি ইয়াহিয়ার অপকর্ম অনুমোদনের আহ্বান জানানো হয়েছে। কিন্তু 'আমরা তা মেনে নিতে পারি না।' চার. ভারতে তার মতো আর কেউ যুদ্ধের অধিকতর বিরোধী নয়। 'আমি এই দেশকে যুদ্ধে নিয়ে যেতে চাই না।' কিন্তু 'এই যুদ্ধ এবং এই পরিস্থিতি আমাদের সৃষ্ট নয়।' পাঁচ. অনেক দেশ বলেছে, তারা ইয়াহিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। কিন্তু তিনি প্রশ্ন রাখেন, কী ফল মিলল? ইন্দিরা জবাব দেন, কিছুই নয়। আমাদের এমন পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবেলায় ভারত শক্তিশালী হয়। ছয়. একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরুর নামে তিনি 'প্রহসনের নির্বাচন' সম্পন্ন করেছেন, যা পরিস্থিতিকে ভ্রান্ত পথে চালিত করছে। এসব তথাকথিত নির্বাচন পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে কোনোভাবেই সহায়ক হবে না। সাত. কিটিং যখন উল্লেখ করে যে,তার অবস্থান খুবই সুদৃঢ়, জবাবে গান্ধী বলেন, আগের চেয়ে তার অবস্থান কিছুটা কঠোর বটে। তিনি এমনকি এই মন্তব্যও করেন যে, তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ছে। তিনি জানেন না, কিভাবে তিনি ভারতকে বলবেন। তাকে অপেক্ষার প্রহর আরো গুনতে হবে। আট. কিটিং যখন উল্লেখ করেন যে, ভারতীয় সামরিক বাহিনী সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানে আগ্রাসন চালিয়েছে তখন তিনি তাদের থামিয়ে দেন। ইন্দিরা মন্তব্য করেন, 'আমরা সত্যিই আর এমন উপদেশ শুনতে অক্ষম, যা আমাদের দুর্বল করে দেয়।' রাষ্ট্রদূত কিটিংয়ের মন্তব্য হচ্ছে, মিসেস গান্ধীকে তিনি এর আগে এমন স্পষ্ট করে কথা বলতে দেখেননি। তার কণ্ঠে বেদনার আভাস ছিল স্পষ্ট।

১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, জাতিসংঘে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত বুশ (বর্তমান প্রেসিডেন্ট বুশের পিতা সাবেক প্রেসিডেন্ট সিনিয়র বুশ) জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধির সঙ্গে একটি সম্ভাব্য প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করবেন, এর সুবিধা-অসুবিধা খতিয়ে দেখবেন। কিন্তু পাকিস্তানকে কোনো নির্দিষ্ট দিক অনুসরণে অনুরোধ জানাবেন না। এদিনের সংলাপ ছিল নিম্নরূপ :

কিসিঞ্জার : (সিআইএ'র কুশম্যানের প্রতি) বব, এখন আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে?

কুশম্যান : (কুশম্যান এ সময় একটি ব্রিফিং নোট পড়ে শোনান। কিন্তু এটি ছাপা হয়নি। কুশম্যান এতে উল্লেখ করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা ক্রমবর্ধমান। ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত শান্ত রয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানি কর্মকর্তারা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তান রক্ষণাত্মক নয়, আক্রমণাত্মক ভূমিকা পালন করবে)।

কিসিঞ্জার : মিসেস গান্ধী কি পাকিস্তানিদের পশ্চিম পাকিস্তানে কিছুটা সময়ের জন্য হলেও টিকতে দেবেন (কিসিঞ্জার এ সময় সভাকক্ষ ত্যাগ করেন)?

আরউইন : (কুশম্যানের প্রতি) পশ্চিম ফ্রন্টে যদি আক্রমণ হয় তাহলে তার ফলাফল কী হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

কুশম্যান : ভারতীয়দের সর্বক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, সুতরাং তারাই জিতবে। পাকিস্তানিদের অধিকাংশ ট্যাঙ্ক বাহিনী অবশ্য সেখানেই। তাদের বেশিরভাগ ডিভিশনও সেখানে। কিন্তু তবুও তারা টিকবে না।

এডমিরাল মুরার : পাকিস্তানিরা প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা সাফল্য দেখাতে পারে। কিন্তু তারা শিগগিরই লজিস্টিক সংকটে পড়বে।

আরউইন : কতদিন?

মুরার : ৩০ দিন। ভারতীয়দের শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে ৪ : ১।

আরউইন : সরবরাহের দিক থেকেও?

মুরার : হ্যাঁ।

প্যাকার্ড : এটা তাহলে কেমন দেশ?

কুশম্যান : বেশ শুকনো। বিস্তীর্ণ অঞ্চল কার্যত মরুভূমি।

প্যাকার্ড : সেখানে কি কোনো প্রাকৃতিক সীমান্ত অর্থাৎ পর্বত রয়েছে?

ওয়ালার (সিআইএ) : উত্তর-পূর্বে কিছু পর্বত রয়েছে, কিন্তু অবশিষ্ট অঞ্চল মরুভূমি।

আরউইন : পাকিস্তানিদের প্রাথমিক সামর্থ্য কেমন?

কুশম্যান : আমি জানি না। ওয়ালার : ১৯৬৫ সালে শিয়ালকোট ছিল একটি 'ন্যাচারাল ডিভিশন'।

আরউইন : ভারতীয় ট্যাঙ্ক বাহিনীর অবস্থান কি কাছাকাছি নয়?

ওয়ালার : কারো জানা নেই। আম্বালায় সম্ভবত কিছু থাকবে।

কুশম্যান : পাকিস্তানিরা হয়তো প্রাথমিকভাবে উত্তর দিক থেকে ঢুকে পড়তে পারে। কিন্তু অন্যতম বড় উদ্বেগ হচ্ছে, ভারত যদি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে বসে। ইয়াহিয়া তার পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ভারতীয় এয়ারক্রাফট ও সৈন্যদের অবস্থানে হামলা চালাতে পারে। যদিও তার জানা থাকবে যে, তিনি না-ও জয়ী হতে পারেন।

আরউইন : সুতরাং আপনি মনে করছেন যে, এক মাসের মধ্যেই সবকিছু সাঙ্গ হবে।

জেনারেল কুশম্যান ও এডমিরাল মুরার : হ্যাঁ ।

কুশম্যান : একটি প্রশ্ন হচ্ছে, রাশিয়া ভারতকে কতটা সহায়তা দেয়? এটাও দেখার বিষয় যে, চীন পাকিস্তানের পাশে দাঁড়ানোর চেয়ে রাশিয়া কতটা দ্রুততায় ভারতের পাশে দাঁড়ায়?

মুরার : এমন কিছু রিপোর্ট পাওয়া গেছে যে, চীন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, সে পাকিস্তানকে ট্যাঙ্ক সহায়তা দেবে।

কুশম্যান : এমন রিপোর্টও রয়েছে যে, গেরিলারা সমুদ্র বন্দরগুলোতে মাইন

পুঁতছে। ভারতীয় নাবিকরা রাতে সাদা পোশাকে গানবোট নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে টহল দিচ্ছে।

মুরার : পূর্ব পাকিস্তানে পাকসেনারা তাদের কার্তুজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে রেশনিং শুরু করেছে। বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে তাদের প্রতি টিউবের অনুকূলে ১০ রাউন্ড গুলি দেয়া হচ্ছে। তারা অনুভব করতে শুরু করেছে যে, তারা কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। (কিসিঞ্জারের প্রত্যাবর্তন)

কিসিঞ্জার : সামরিক সহায়তা বন্ধের পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য আমাদের নির্দিষ্টভাবে অবস্থা উপলব্ধিতে নিতে হবে। আমরা এটা অনতিবিলম্বে করতে চাই না। পাকিস্তান আর কতটা সময় টিকতে পারবে?

মুরার : দুই অথবা তিন সপ্তাহ। ভারত সীমান্তে চাপ বৃদ্ধি করে চলেছে এবং পাকিস্তানিদের রুখে দাঁড়াতে বাধ্য করছে। এর ফলে মুক্তিযোদ্ধারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারছে। পাকিস্তানি গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাবারুদে টান পড়েছে। সে কারণে তাদের সৈন্য বাহিনী প্রতিস্থাপনের চিন্তা করছে। চার হাজার সৈন্যের একটি দল এ লক্ষ্যে পথে রয়েছে। পাকিস্তানিদের শক্তি ফুরিয়ে আসতে শুরু করেছে। যশোরের পতনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী মারাত্মকভাবে পঙ্গু হতে পারে।

জেনারেল কুশম্যান : কেউ একজন অনুমান করতে পারেন যে, ভারতীয়রা হয়তো যশোর দখল এবং সেখানে বাংলাদেশের রাজধানী স্থাপনের চেষ্টা করছে।

ডিসেম্বরেও নিজ নিরাপত্তায় হুমকি দেখেনি চীন

১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ওয়াশিংটন স্পেশাল গ্রুপের বৈঠকে কিসিঞ্জার প্রশ্ন রাখেন আমি কি এটা ধরে নেব যে, পাকিস্তান উদ্যোগী না হলে আমরা জাতিসংঘে যাব না?

ডিপালমা : পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আমাদের বলেছেন, এই সময় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া তিনি আর কাউকে অনুরোধ করবেন না। নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকের জন্যও তার কোনো আগ্রহ নেই। কিন্তু তিনি মনে করেন, তার সরকার হয়তো এটা চাইবে। ভুট্টোর জন্য তাকে একটি ভাষণের খসড়া লিখতে বলা হয়েছে। তার অনুমান তারা শুক্রবার ৩ ডিসেম্বর বা সোমবারে বৈঠকের জন্য আহ্বান জানাবে। যে কোনো প্রস্তাবে সৈন্য প্রত্যাহারের, যুদ্ধবিরতির এবং সম্ভবত উভয়পক্ষে পর্যবেক্ষক নিয়োগের কথা উল্লেখ থাকবে। পাকিস্তানিরা চীনাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তারা ইঙ্গিত দিয়েছে, পাকিস্তানের কাছে অগ্রহণযোগ্য যে কোনো প্রস্তাবে তারা ভেটো দেবে। তার ধারণা ভারতের কাছে অগ্রহণযোগ্য কোনো প্রস্তাবে সোভিয়েতের কাছ থেকে ভেটো আসবে।

কিসিঞ্জার : জাতিসংঘে এরকমের উদ্যোগে কেউ ভরসা পাবে বলে মনে হয় না। কারণ, নিরাপত্তা পরিষদই যেখানে একটি অনিবার্য সামরিক পরিস্থিতিতে বৈঠকে বসতে ভীত।

ডিপালমা : এটা বিগ বয়দের দ্বারা সম্পাদন করতে হবে।

কিসিঞ্জার : অর্থনৈতিক সহায়তার কথাই বলা যাক। এই মুহূর্তে অর্থনৈতিক সহায়তা বন্ধের কোনো পরিকল্পনা নেই। প্রেসিডেন্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা পিএল-৪৮০ এর অর্থ এবং পরবর্তী ঋণদান থেকে বিরত থাকব। আমরা এটা প্রশাসনিকভাবে বিলম্বিত করতে পারি এবং এ ধরনের বিলম্বের জন্য আমলাতান্ত্রিক অদক্ষতাকে দায়ী করতে পারি। অন্য কথায় তিনি আরো অগ্রসর হতে চাইলে আমাদের পক্ষে আর কি করা সম্ভব?

ম্যাকডোনাল্ড : তিনটি ক্যাটাগরি রয়েছে। দেড়শ' থেকে দু'শ' মিলিয়ন ডলারের উন্নয়ন ঋণ এবং ৭২ মিলিয়ন ডলার রয়েছে পিএল-৪৮০ খাতে। ...

কিসিঞ্জার : আমার এটা ভাবার কারণ নেই যে, প্রেসিডেন্ট তাড়াতাড়ি করতে চাইছেন। তিনি ৯৯ মিলিয়ন ডলারের বিষয়টি সামনে আনতে পারেন। যা হোক ভারতীয়রা ঢাকায় পৌঁছালে আমরা যদি কঠোর পদক্ষেপ নিই তাহলে এটা হবে এক

ইচ্ছার প্রতিযোগিতা। আমরা যদি তাদের সংকেত দিতে চাই তাহলে আমাদের তা দিতে হবে এক্ষুণি। কিন্তু আমরা কোনো বড় সময়ের চাপে নেই। পিএল-৪৮০ ব্যাপারে কতদূর?

ম্যাকডোনাল্ড : আমাদের বাধ্যবাধকতাপূর্ণ চুক্তি রয়েছে। কিন্তু আমরা এ নিয়ে বসেও থাকতে পারি। আমাদের একটি বিশেষ সমস্যা রয়েছে। আমাদের ১৮ মিলিয়ন ডলারের ভেজিটেবল অয়েল রয়েছে। মার্কিন বাজার স্থিতিশীল করতে কৃষি বিভাগ এই তেল ভারতে পাঠাতে চাইছে। এটা অভ্যন্তরীণ বিষয়। যদিও আমাদের ভারতের জন্য ১২ মিলিয়ন ডলারের ৫০ হাজার বেল তুলা রয়েছে।

কিসিঞ্জার : আমরা তো মিসেস গান্ধীর কাছ থেকে এখনো জবাব পাইনি?

সিসকো : না। কোসিগিনের কাছ থেকেও কিছু নয়। আমরা বিষয়টি সোভিয়েত পররাষ্ট্র দফতরের আমেরিকান ডেস্ক প্রধানের গোচরে নিয়েছি। তিনি বলেছেন, তিনি মনে করেন শিগগিরই আমরা জবাব পেয়ে যাব।

কিসিঞ্জার : যদি কোনো বাড়তি পদক্ষেপ নেয়া হয়ে থাকে আমরা একত্রে হয়তো জবাব পাব। অন্তত ফোনে হলেও।

আরউইন : বাড়তি পদক্ষেপের লক্ষ্য কি হতে পারে?

কিসিঞ্জার : পরিস্থিতি ভেঙে পড়ার পরে আমরা কিছু করতে কম উৎসাহিত থাকব। তার চেয়ে বরং এটাই উত্তম প্রকাশ্যে এটা দেখানো যে, তারা কাজ করেনি।

সিসকো : আমরা সামরিক দিক থেকে একটা দৃশ্যপট তৈরি করব।

প্যাকার্ড : কিন্তু এসব কিছু করলেও দাতাদের সামরিক সামর্থ্যে কোনো প্রভাব ফেলবে না।

আরউইন : কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যদি কোনো ফলই না পাওয়া যায়, তাহলে এ ধরনের পদক্ষেপ আমরা আর কতটা নেব?

প্যাকার্ড : কিন্তু আমরা যদি একটি বার্তা পাঠাতে চাই তাহলে একটি ভালো বার্তাই পাঠানো উচিত।

সিসকো : আপনি কি মনে করেন যে, রাষ্ট্রদূত বুশের পক্ষে পাকিস্তানি স্থায়ী প্রতিনিধি শাহীর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলা ঠিক হবে? এটা একটা সংবেদনশীল পরিস্থিতি এবং এ নিয়ে আমার রয়েছে দুটো মন। আমার মনে হয়, পাকিস্তানিদের আমার এটা জানিয়ে দেয়া উচিত যে, জাতিসংঘে গেলে তার সুবিধা-অসুবিধা দু-ই আছে।

কিসিঞ্জার : এ নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই। কারণ, আমরা তো আর তাদেরকে কোনো দিকে যেতে বলছি না।

সিসকো : যথেষ্ট ভালো। আমি বুশকে ডাকছি এবং তাকে পাকিস্তানিদের সঙ্গে আলাপের প্লাস-মাইনাস বুঝিয়ে দিচ্ছি।

কিসিঞ্জার : ওকে।

২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

কিসিঞ্জার নিক্সনকে দেয়া এক স্মারকে উল্লেখ করেন, সর্বশেষ রিপোর্ট থেকে ধারণা মিলছে যে, ভারতীয় এবং মুক্তিযোদ্ধারা পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তজুড়ে আক্রমণাত্মক অভিযান তীব্র করেছে। জনশক্তি ও সরবরাহের দিক থেকে ঘাটতি থাকার মাশুল দিচ্ছে পাক বাহিনী এবং তারা কথিত মতে একাধিক প্রতিযোগিতাপূর্ণ অবস্থান থেকে সরে এসেছে। এসব এলাকায় অব্যাহতভাবে আশপাশের উল্লেখযোগ্য প্রাদেশিক শহরগুলো থেকে চাপ বাড়ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা গ্রামাঞ্চলে অধিকতর প্রকাশ্যে তৎপরতায় মেতে উঠেছে। সে কারণেই অধিকাংশ পাকিস্তানি সৈন্য প্রত্যাহার করে এখন সীমান্ত সামলাতে ব্যস্ত রাখা হয়েছে। ঢাকার ১৭ মাইল দূরবর্তী বেশ কিছু শহর পাকসেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে সমর্পণ করেছেন এবং এমন খবর মিলছে যে, প্রত্যন্ত এলাকার শহরগুলোতে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। ভারতীয়রা তাদের নিজেদের সৈন্য দিয়ে একটি 'মুক্তিবাহিনী নেভি' গঠন করেছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে কোনো জাহাজের আগমন প্রতিহত করা। জাতিসংঘে এই মুহূর্তে পাকিস্তান পরিস্থিতি নিয়ে অপেক্ষাকৃত স্থিতি অবস্থা বিরাজ করছে। জাপানি ও বেলজীয়রা নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠানে তাদের উদ্যোগ স্থগিত করেছেন। কারণ, স্থায়ী প্রতিনিধিদের কাছ থেকে তারা কোনো উৎসাহ পাননি। এই মুহূর্তে সোভিয়েত ও ভারতীয়রা নিষ্ক্রিয় রয়েছে। কিন্তু জাতিসংঘে পাক রাষ্ট্রদূত ভাবছেন, তিনি নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠানে শুক্রবারের মধ্যে ইসলামাবাদের কাছ থেকে নির্দেশ পেতে পারেন। তিনি রিপোর্ট দিয়েছেন যে, পাকিস্তানিরা চাইলে চীন তাদের ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। ধারণা করা হচ্ছে, ভারতের জন্য সোভিয়েতরাও একই ভূমিকা পালন করবেন। হংকংয়ে আমাদের চীনা পর্যবেক্ষকরা রিপোর্ট দিয়েছেন যে, গত ১০ দিনে চীনা গণমাধ্যমে পাক-ভারতের সংকট হঠাৎ করেই ব্যাপকতা পেয়েছে। ভারতের তৎপরতাকে চীনা গণমাধ্যম 'আগ্রাসন' হিসেবে বর্ণনা করছে এবং সামরিক ব্যবস্থাকে 'উস্কানি' আখ্যা দেয়া হচ্ছে। একজন উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার বরাতে 'সশস্ত্র আগ্রাসন' কথাটিও ছাপা হয়েছে। সোভিয়েত সম্পৃক্ততার বিষয়টি উল্লেখযোগ্যভাবে কভারেজ পাচ্ছে। কিন্তু একই সময়ে চীনারা তাদের নিজেদের নিরাপত্তার প্রতি কোনো হুমকি হিসেবে পাক-ভারতের সংকটকে মূল্যায়ন করতে যায়নি। চীনা জনগণের সমর্থনের বিষয়টি সাধারণ প্রবণতা হিসেবেই রয়ে গেছে এবং অন্তত একবার তারা পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত দিয়েছে যে, পাকিস্তানিদের সহায়তার প্রয়োজন নেই। তারা অবশ্য একই সঙ্গে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তিপূর্ণ আলোচনার আহ্বান জানাচ্ছে। আমরা আমাদের সামরিক সাহায্য বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সরকারের কাছ থেকে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া পেয়েছি। পররাষ্ট্র সচিব কাউল ভারতে আমাদের নতুন সামরিক সহায়তা নীতি তুলনামূলকভাবে ভালোভাবেই নিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, যুক্তরাষ্ট্র যা ভালো মনে করে তেমন পদক্ষেপ নেয়ার

অধিকার তার রয়েছে। তিনি খুব বন্ধুপূর্ণ উপায়ে রাষ্ট্রদূত কিটিংকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, কোনো দেশেরই ভাবা উচিত নয়, কোনো ধরনের চাপজনিত কৌশল প্রয়োগ করে ভারতকে তার পদ থেকে সরানো যাবে। কাউল আশা প্রকাশ করেন যে, উভয় দেশ অভিন্ন মূল্যবোধ ও আদর্শ অনুসরণ করছে। এটা যেন যুক্তরাষ্ট্র ভুলে না যায়।

সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রশ্নে ইয়াহিয়া

মুক্তিযুদ্ধে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে হিন্দুরা অধিকতর নিপীড়নের শিকার হন। ১৯৭১ এর ১৪ মে পাকিস্তানের দূতাবাস থেকে স্টেট ডিপার্টমেন্টে পাঠানো এক টেলিগ্রামে উল্লেখ করা হয় যে, আমাদের সন্দেহ পাকিস্তান সরকারের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়কে পূর্ব পাকিস্তান থেকে উৎখাতে। বলাবাহুল্য, পশ্চিম পাকিস্তানে বিশেষ করে পাঞ্জাবিদের মধ্যে হিন্দুবিরোধী একটি আবেগপূর্ণ পক্ষপাত রয়েছে। এটা আরো তীব্র হয়েছে সাম্প্রতিক পাকিস্তানি প্রচারণায়। তারা প্রপাগাণ্ডা চালাচ্ছে যে, হিন্দুরা সংকট সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। আওয়ামী লীগের নেপথ্যে হিন্দুদের ভূমিকাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানো হচ্ছে। সরকারিভাবে হিন্দুবিরোধী প্রপাগাণ্ডা সেনা নিষ্ঠুরতাকে তীব্র করছে। আর তার পরিণতিতে হিন্দুদের দেশ ত্যাগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা দেখছে, পূর্ব পাকিস্তানে তাদের উপস্থিতি অনিশ্চিত এবং শারীরিকভাবে অনিরাপদ। অনেক হিন্দু তাই ধরে নিচ্ছে তার চেয়ে বরং ভারতে পালিয়ে যাওয়াই শ্রেয়। পাকিস্তান সরকার সরকারিভাবে হিন্দুদের দেশ ত্যাগ উৎসাহিত না করলেও আমাদের সন্দেহ হিন্দুরা দেশ ছাড়ছে। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী সম্ভবত হিন্দুদের দেশ ত্যাগে আশীর্বাদ হিসেবে দেখছে। কারণ, তারা মনে করছে এর ফলে অবিশ্বস্ত এবং নাশকতার কাজে জড়িত হতে পারে এমন লোকের সংখ্যা হ্রাস পাবে। এ প্রসঙ্গে আমরা বিস্মিত হব না যে, পাকিস্তান সরকার যদি শিক্ষকতা পেশার মতো সংবেদনশীল চাকরি থেকে হিন্দুদের অপসারণ করার নীতি গ্রহণ করে। তারা অব্যাহতভাবে অভিযোগ করছে, পাকিস্তানি তরুণদের বিভ্রান্ত করতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রচারণায় হিন্দু শিক্ষকরা সক্রিয়ভাবে জড়িত। এ ধরনের নীতি গ্রহণের আরেকটি উদ্দেশ্য হতে পারে হিন্দু ও মুসলিম ভোটারদের পৃথক ভোটদান পদ্ধতি পুনরায় প্রবর্তন করা। তাদের ধারণা এর মাধ্যমে ভবিষ্যতের নির্বাচনে হিন্দুদের প্রভাব কমানো সম্ভব হবে (ফুটনোট : পররাষ্ট্র সচিব কাউল ৭ মে চার্জ দ্য এফেয়ার্স স্টোনকে তলব করেছেন। তিনি জাতিসংঘে উদ্বাস্তু ইস্যু তোলা হলে ভারতকে সমর্থন দিতে যুক্তরাষ্ট্রের সহানুভূতি কামনা করছেন। অন্যদিকে ১৪ মে ঢাকার কনসাল জেনারেল রিপোর্ট দিয়েছেন যে, পাকিস্তানি আর্মি পদ্ধতিগতভাবে হিন্দুদের তল্লাশি এবং তাদের হত্যা করছে।)।

ফারল্যান্ড আরো লিখেছেন, এমএম আহমেদের সফর সম্ভবত এই সুযোগ এনে

দেবে যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার অব্যাহত হিন্দু শরণার্থীদের প্রশ্নে উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারবে। আমরা এখানে ইতোমধ্যেই উদ্বাস্তু পরিস্থিতি নিয়ে সাধারণভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছি। এখন স্টেট ডিপার্টমেন্টকে আমাদের এই অবস্থায় এগিয়ে নিতে হবে যে, পাকিস্তান সরকারের উচিত হত্যা বন্ধ করা এবং পাকিস্তানের পুনর্গঠনে মনোযোগী হওয়া।

২২ মে, ১৯৭১ করাচির কনসাল জেনারেল স্টেট ডিপার্টমেন্টকে জানাচ্ছেন, সাধারণ আলোচনা শেষে আমি ইয়াহিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু স্রোতের কারণ দুটো। প্রথমত, মানবিক কারণ। দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতায় হুমকি। আমি আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ হিসেবে বললাম, পূর্ব পাকিস্তানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না করলে হিন্দু সম্প্রদায় তাদের দৈহিক নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বিগ্ন হতে পারে (ফুটনোট : ২২ মে ফারল্যান্ড ইয়াহিয়ার কাছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক হিন্দুদের ওপর কথিত অত্যাচার সম্পর্কিত 'সংবেদনশীল ইস্যু' ইয়াহিয়ার নজরে আনেন। ফারল্যান্ড সতর্ক করে দেন যে, যদি এই রিপোর্ট সত্য হয়ে থাকে, বিশেষ করে যেসব বিবরণ ইতোমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে তা সত্য হলে পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখা নিক্সন প্রশাসনের জন্য কঠিন হয়ে পড়বে। ফারল্যান্ড বলেছেন, বৃহত্তর বিপদ হচ্ছে, সংক্ষুব্ধ হিন্দু শরণার্থীদের দুর্দশার বৃত্তান্ত পশ্চিম বঙ্গে ধূমায়িত হচ্ছে। ফারল্যান্ড সতর্ক করে দিয়েছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের প্রতি অবিচার করা হলে তা ভারতে সেই মহলের হাত শক্তিশালী করবে। যারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণে উদগ্রীব। ইয়াহিয়া তার মন্তব্য শুনে বলেছেন, আপনি সম্ভবত অধিকতর উস্কানিমূল্যক মন্তব্য শুনে থাকবেন, যা কিনা ভয়েস অব আমেরিকা এবং বিবিসি প্রচার করে থাকবে। ফারল্যান্ড তাকে জানিয়েছে, তিনি যেসব তথ্য জেনেছেন তা এসেছে ঢাকার কনসাল জেনারেলের কাছ থেকে এবং তারা নির্ভরযোগ্য সূত্রেই খবর পেয়েছে। ইয়াহিয়া ফারল্যান্ডকে নিশ্চিত করেছেন যে, হিন্দুরা যদি নিগৃহীত হয়ে থাকে তা হলে তা কিন্তু সরকারি নীতি বা সরকারি কোনো প্রশ্রয়ে তা ঘটেনি এবং তিনি এটা খতিয়ে দেখবেন)।

করাচি থেকে প্রেরিত বার্তায় আরো উল্লেখ করা হয়, আমি ইয়াহিয়াকে বললাম উদ্বাস্তু প্রশ্নকে রাজনীতি থেকে পৃথক করতে হবে, এবং এটা আমাদের ধারণা যে, ভারতীয়রা চাইছে উদ্বাস্তুরা তাদের দেশে ফিরে যাক। ২৬ মে, ১৯৭১ রজার্স প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে জানাচ্ছেন, ইয়াহিয়াকে বলা হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে শান্তিপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টিতে উদ্যোগ নিতে। তাকে বলা হয়েছে, হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা যেন বন্ধ করা হয়। ২৬ মে, ১৯৭১ ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুফের বৈঠকে সিআইএ পরিচালক হেলমস তথ্য দেন যে, পাকিস্তানিরা যেভাবে সংখ্যালঘুদের প্রহার করছে তাতে শরণার্থীরা অন্তত এটুকু বুঝতে পারবে যে,

তাদের মাথায় গুলি করা হবে না! জনসন বলেন, উদ্বাস্তুদের ৮০ শতাংশ সংখ্যালঘু। রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড ইয়াহিয়ার কাছে এ কথা বলতেই তার কাছ থেকে ইমোশনাল প্রতিক্রিয়া পেয়েছেন। তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে সে কথা তিনি মানতেই নারাজ। তবে বলেছেন, তিনি এটা খতিয়ে দেখবেন। ভ্যান হোলেন বলেন, ইয়াহিয়ার প্রকাশ্য বিবৃতি সহায়ক। কিন্তু রাজনৈতিক সমঝোতা ছাড়া উদ্বাস্তুরা ফিরবে না এবং তারা নিশ্চিত হতে চাইবে যে হিন্দুরা টার্গেটে পরিণত হবে না। আমাদের ভাবা উচিত নয় যে, তারা শিগগিরই ফিরবে। ১৯৭১ এ ৩ জুন ওয়াশিংটনে ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ কিটিং, কিসিঞ্জার ও ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের হেরাল্ড স্যান্ডার্স দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। কিটিং উল্লেখ করেন, পূর্ব পাকিস্তানে যতক্ষণ হত্যালীলা অব্যাহত থাকবে ততক্ষণ সামরিক সহায়তা দেয়া চিন্তা করাও ভুল হবে। ঢাকা তুলনামূলকভাবে শান্ত রয়েছে। যদিও মাত্র অর্ধেক বাসিন্দা আছে সেখানে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এখন হিন্দু জনসংখ্যার দিকে নজর দিয়েছে। ভারতে যেসব শরণার্থী এখন যাচ্ছে তাদের ৯০ শতাংশই হিন্দু। ৫ জুন, ১৯৭১ পাকিস্তান দূতাবাস থেকে একটি টেলিগ্রাম যায় স্টেট ডিপার্টমেন্টে। এতে ফারল্যান্ড লিখেছেন, আমি রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি ৫ জুন দুপুর ১২টায়। ৫০ মিনিট ধরে আলোচনায় উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল উদ্বাস্তু ইস্যু। আমি বললাম, পূর্ব পাকিস্তানে শরণার্থী অভ্যর্থনা কেন্দ্র স্থাপনের খবরে ওয়াশিংটন উৎসাহিত। আমরা আশা করি যে এটা শিগগিরই চালু হবে। বললাম, আমি বিশ্বাস করি যে, আপনি যদি নির্দিষ্টভাবে এই নির্দেশনা দেন যে হিন্দুদের স্বাগত জানানো হবে তাহলে তা কার্যকর হবে। আমি তাকে এও বললাম, এটা খুবই ফলপ্রসূ হবে যদি আপনি প্রকাশ্যে এই ঘোষণা দেন যে, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে উদ্বাস্তুদের দেশে ফিরিয়ে আনা হবে। এ ধরনের ঘোষণা ভারত সরকার সুনজরে দেখবে এবং আন্তর্জাতিক জনমতের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক সাড়া মিলবে। আমার কথা শুনে ইয়াহিয়া বললেন, ২৪ মে তিনি যে বিবৃতি দিয়েছেন সেটা বস্তুনিষ্ঠ। মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করা হবে না। তবে তিনি বললেন, আপনি যেভাবে নির্দিষ্ট করে বলতে বলছেন, তেমন করে বলতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে তিনি কয়েক মুহূর্ত ভেবে উল্লেখ করলেন যে, আমি শিগগিরই জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে যাচ্ছি। তখন না হয় এ বিষয়টি বিশদভাবে তুলে ধরা হবে। আমি তাকে জানালাম উদ্বাস্তু স্রোত কিন্তু অব্যাহত। আর সেটাই পূর্ব পাকিস্তানের গুরুতর পরিস্থিতির ইঙ্গিতবহ। আমাদের দূতাবাস অব্যাহতভাবে রিপোর্ট পাচ্ছে যে, হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে সেনাবাহিনী আক্রমণ চালাচ্ছে। ভীতি ছড়িয়ে পড়ছে ভয়ানকভাবে। এমন অবস্থা যদি চলতে থাকে, তাহলে কিছুতেই উদ্বাস্তু স্রোত বন্ধ হবে না। আমি তাকে এ কথাও সাফ জানিয়ে দিলাম, হিন্দুদের দেশ ত্যাগ যদি কোনো পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে ভারতের সঙ্গে একটি সামরিক সংঘাত অনিবার্য হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমি বললাম, ব্যাপক

ভিত্তিতে দেশ ত্যাগের অর্থ হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে বিস্ফোরণোন্মুখ অবস্থা বিরাজমান। এসব দেখে শুনে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারত সরকারকে ইতোমধ্যেই সংযম প্রদর্শনে অনুরোধ করেছে। কিন্তু এই পরিস্থিতি সামাল দেয়ার আসল দায়িত্ব যে পাকিস্তানের, আমি তাকে তাও জানিয়ে দিলাম। বাস্তব অর্থেই বলছি, আমি মনে করি, পাকিস্তানি সামরিক তৎপরতা যদি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে স্থানীয় জনগণ বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের দেশ ত্যাগ রোধ করা প্রশ্নই আসে না। ইয়াহিয়া কিন্তু কিছুতেই নির্দিষ্টভাবে সংখ্যালঘু নিপীড়নের বিষয়টি স্বীকার করলেন না। বরং এমন ভাব দেখালেন, তিনি উদ্বাস্তু পরিস্থিতি নিয়ে সত্যিই উদ্বিগ্ন।

সিআইএ যে কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র দেয়নি

ভারত সরকারের পক্ষে সিআইএর মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সরবরাহে কি কোনো অনুরোধ করা হয়েছিল? সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গোপন মার্কিন নথি থেকে ইঙ্গিত মিলছে যে, ভারত মুক্তিযোদ্ধাদের স্মল আর্মস সরবরাহে অনুরোধ করেছিল, কিন্তু নানা বিবেচনায় তা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

৯ এপ্রিল, ১৯৭১

বিষয় : ৪০ কমিটি বৈঠক, এপ্রিল ৯, অংশগ্রহণকারীগণ : প্রেসিডেন্টের সহকারী হেনরি এ কিসিঞ্জার, আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট জন আরউইন, জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ চেয়ারম্যান এডমিরাল থমাস মুরার, সিআইএর উপ-পরিচালক রবার্ট কুশম্যান, সহকারী প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওয়ারেন্ট নাটার, সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী যোশেফ সিসকো, সিআইএর ডেভিড ব্লি এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল স্টাফ হেরাল্ড এইচ. স্যান্ডার্স।

শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান-সংক্রান্ত সিনিয়র রিভিউ গ্রুপের বৈঠকের পটভূমিতে সিআইএ সদস্যদের অনুরোধে 'ফোরটি কমিটির' জন্য উপর্যুক্ত একটি বিষয় নিয়ে আলোচনার সূচনা ঘটে। জেনারেল কুশম্যান উল্লেখ করেন যে, একটি অনুরোধ পাওয়া গেছে। [একটি বাক্যের কিছু অংশ (সোর্স টেক্সট) অবমুক্ত না করায় বোঝা যাচ্ছে না, এই অনুরোধের সূত্র কী ছিল] তবে বৈঠকের আগে বিষয়বস্তু সম্পর্কে এক সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু এটি মুদ্রিত হয়নি। বলা হয়েছে, সিআইএ অন্যান্য ক্ষেত্রে যেভাবে অচিহ্নিত ক্ষুদ্র অস্ত্র দিয়ে থাকে তা পূর্ব পাকিস্তানের 'মুক্তিযোদ্ধাদের' জন্য সরবরাহ করতে। এ ক্ষেত্রেও সোর্স টেক্সস অবমুক্ত করা হয়নি। জেনারেল কুশম্যান মন্তব্য করেন যে, তাদের এজেন্সির কাছে নিরাপদ চ্যানেল রয়েছে, যার মাধ্যমে উক্তরূপ অস্ত্র সরবরাহ করা যেতে পারে। কিন্তু তার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, এ সংক্রান্ত তাদের গোপন অপারেশন খুব বেশিদিন গোপন থাকবে না। তিনি একইসঙ্গে উল্লেখ করেন, সিআইএর পরিচালক হেলোমস মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রদানের প্রস্তাবিত প্রকল্প সমর্থন করেন না। ড. কিসিঞ্জার এ ব্যাপারে অনেকের কাছে মতামত জানতে চান। উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই পরিকল্পনার ব্যাপারে আরউইন ছিলেন শিথিল। এডমিরাল মুরার অনুভব করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিতে উভয় পক্ষে সক্রিয় থাকা 'খুবই ভুল' সিদ্ধান্ত হবে। জেনারেল কুশম্যান অভিমত দেন যে, এ মুহূর্তে

সিনিয়র রিভিউ গ্রুপ পূর্ব পাকিস্তান প্রশ্নে একটি বৃহত্তর নীতি প্রণয়নে চিন্তা-ভাবনা করছেন। এখন যদি ইতিবাচক কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তাহলে সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে তার প্রভাব ফেলবে। সবার কথা শুনে ড. কিসিঞ্জার মত দেন, আমি মনে করি যে, প্রেসিডেন্ট কখনোই এই প্রকল্প সমর্থন করবে না। সিসকো উল্লেখ করেন যে, তিনি মনে করেন, ভারতীয়রা আমাদের পরীক্ষা করছে। একটি বিষয় হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রকে পূর্ব পাকিস্তানি প্রতিরোধ আন্দোলনে ভারতের গোপন সমর্থন সংক্রান্ত রিপোর্টগুলোর প্রতি চোখ বন্ধ করে রাখা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সরবরাহ করার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের গোপন মিশনে জড়িত হওয়া ভিন্ন বিষয়। কিসিঞ্জার বলেন, তার ধারণা, পর্যাপ্ত অস্ত্র সরবরাহ করেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানের সম্ভাব্য ফলাফলে কোনো পরিবর্তন সূচিত করতে সক্ষম নয়।তিনি এটাও ধরে নিয়েছেন যে, যে কোনো পরিস্থিতিতে ভারতের হাতে পর্যাপ্ত অস্ত্রের মজুদ রয়েছে এবং তারা মুক্তিযোদ্ধাদের চাহিদা মেটাতে পারবে। তিনি উল্লেখ করেন, পূর্ব পাকিস্তানিদের কিন্তু যথেষ্টসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন, আর ভারতের কাছে অচিহ্নিত অস্ত্রের পরিমাণ কিন্তু ততটা বেশি পরিমাণে নেই। সুতরাং সেখানে কিন্তু প্রয়োজন পড়তেই পারে। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় বামপন্থি ও উদারপন্থিদের প্রতিযোগিতায় ভারতীয় অস্ত্র সরবরাহ কিভাবে ফারাক সৃষ্টি করতে পারে তা এখনো স্পষ্ট নয়। তিনি মনে করেন, শেষ পর্যন্ত বামপন্থিরাই সাফল্যমন্ডিত হবে এমনটা ভাবা হবে এক আগাম সিদ্ধান্ত। ড. কিসিঞ্জার বলেন, বিষয়টি কিন্তু আমাদের নীতি-নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি মনে করি যে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে চরমপন্থিরা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে, তাহলে গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটানোর প্রশ্নে আমাদের মূল্যায়নে তা প্রভাব ফেলতে পারে। কিসিঞ্জার এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করেন যে, ২৫ মার্চ যদি যুক্তরাষ্ট্রকে কোনো বিকল্প বেছে নিতে সুযোগ দেয়া হতো তাহলে ওয়াশিংটন নিশ্চয়ই সামরিক ব্যবস্থা না নিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে অনুরোধ জানাত। কিন্তু তিনি স্মরণ করেন যে, ঢাকায় আলোচনা যখন ভেঙে গেল এবং ইয়াহিয়া সামরিক ব্যবস্থা নিলেন, তখন তা কিন্তু আমাদের সবাইকে বিস্মিত করল। সিসকো উল্লেখ করেন, পূর্ব পাকিস্তানে মডারেট নেতৃত্ব বজায় রাখার প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া উভয়ের বিরাট স্বার্থ নিহিত। তিনি উল্লেখ করেন, তিনি পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আগা হিলালিকে ব্যক্তিগতভাবে বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানে একটি মডারেট নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কারাবন্দি কতিপয় নেতাকে ভূমিকা পালনের সুযোগ দিতে হবে। কিসিঞ্জারের এক প্রশ্নের জবাবে সিসকো মত প্রকাশ করেন যে, স্টেট ডিপার্টমেন্টের অনেক আগেই সিআইএ ইয়াহিয়ার সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণের সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিল। স্টেট ডিপার্টমেন্ট আপোসমূলক সমঝোতার ব্যাপারে অধিকতর আগ্রহী ছিল। আর সে কারণেই ২৫ মার্চের আগে তারা এই নিয়ে তেমন উদ্বেগ অনুভব করেনি। রি উল্লেখ করেন, মুজিবুর রহমানের প্রধান বিরোধী ছিল বামপন্থিরা। বর্তমানে

মডারেট নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই হয় কারাগারে, না হয় মৃত। তিনি এ কথা বলে বক্তব্য শেষ করেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এখন কিভাবে পূর্ব পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দের কাছে ছয়দফা মেনে নিতে পরিকল্পনা করছেন, তা ব্যাখ্যা করেছেন রাষ্ট্রদূত হিলালি। এ কথা শুনে কিসিঞ্জার বিস্ময় প্রকাশ করেন। বলেন, ইয়াহিয়া যদি যে কোনোভাবেই ছয়দফাই মেনে নেয়ার কথা ভাববেন তাহলে তিনি কেন সামরিক সমাধানের চেষ্টা করলেন। তিনি উল্লেখ করেন, পূর্ব পাকিস্তানকে দ্রুত বাগে আনার ক্ষেত্রে পাক সেনারা তাদের সামর্থ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেছিল।

আলোচনায় এই পর্যায়ে মোড় নেয় ভারতীয়রা কী চাইছে তা মূল্যায়নে। ড. কিসিঞ্জার উল্লেখ করেন, সিনিয়র রিভিউ গ্রুপের পূর্ববর্তী বৈঠকে ধরে নেয়া হয়েছিল যে, ভারতীয়রা একটি অখণ্ড পাকিস্তান চেয়েছে। ব্রি জবাবে বলেন, তার ধারণা, ভারতীয়রা প্রকৃতপক্ষে চেয়েছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একটি অত্যন্ত শিথিল কনফেডারেল সম্পর্ক। এই নথির শেষ অংশে মন্তব্য কলামে লেখা আছে : 'ভারতীয় অনুরোধের ব্যাপারে ড. কিসিঞ্জার প্রত্যেকের কাছ থেকে মতামত জেনে নিয়ে এই ধারণাই নিশ্চিত করেন যে, এটা অনুমোদনের প্রশ্নই আসে না।' এরপর সম্পাদকীয় নোটে উল্লেখ করা হয়, প্রেসিডেন্ট নিক্সন হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে ১২ এপ্রিল, ১৯৭১ কিসিঞ্জার ও হেল্ডম্যানের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। কিসিঞ্জার শুরুতেই প্রেসিডেন্টকে জানান, 'আমাদের ঢাকা কন্সুলেট এখন প্রকাশ্য বিদ্রোহে অবতীর্ণ। নিক্সন ও কিসিঞ্জার পাকিস্তানের আসন্ন গৃহযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য জড়িয়ে পড়া সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কিসিঞ্জারের মূল্যায়ন হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহীদের সমর্থন দেয় তাহলে পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াবে। আর বাঙালিরা যে কোনোভাবেই হোক শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করবে বামপন্থা। নিক্সন একমত প্রকাশ করে বলেন, আমরা যদি মধ্যপন্থা অনুসরণ করি, তাহলে এটা হবে এক নরকতুল্য ভ্রান্তি। তিনি মত প্রকাশ করেন, 'যেসব বেজন্মা ভিয়েতনাম প্রশ্নে আমাদের বিরোধিতা করেছিল, সেসব বেজন্মার কেউ কেউ পূর্ব পাকিস্তান ইস্যুতে বিপরীতমুখী নাক গলাচ্ছে। ভিয়েতনামে গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করায় এসব বেজন্মা আমাদের বিরোধিতা করে। অথচ এখন তারাই চাইছে আমরা পূর্ব পাকিস্তানে হস্তক্ষেপ করি। অথচ দুটোই গৃহযুদ্ধ।' কিসিঞ্জার বলেন, এই লোকজনই চেয়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানে অর্থনৈতিক সহায়তা যেন বন্ধ করে দেয়। তার মতে, তাদের যুক্তি ছিল, পুরোদস্তুর মতবাদকেন্দ্রিক। এবং পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে ভারতের কাছ থেকে অভিযোগ আসছিল চড়া সুরে। ভারত এখন কাঁদছে, কারণ তারা ভীত হয়ে পড়েছে যে, তাদের নিজেদের বাঙালিরা মারা যেতে পারে। ভারত প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান চায় না। কারণ ১০ বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ স্বায়ত্তশাসনের জন্য চাপ দিতে শুরু করবে। তিনি মন্তব্য করেন, এই পরিস্থিতি থেকে দূরে থাকতে এটা আমাদের জন্য এক 'ক্লাসিক সিচুয়েশন'।

ইতিহাসের ধূসর পর্বে আলো

সম্প্রতি প্রকাশিত আমেরিকার গোপন দলিল ইতিহাসের কিছু ধূসর অধ্যায়ে নতুন করে আলো ফেলেছে। গত ৬১ পর্বে যেসব বিষয় আমাদের কাছে কৌতূহলোদ্দীপক মনে হয়েছে, তা হলো যুক্তরাষ্ট্রের বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূমিকা। একটা দীর্ঘ সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র সাধারণভাবে ঘোরতর শত্রু হিসেবেই চিত্রিত হয়েছে। তবে এটা বলা হয়েছে, নিক্সন প্রশাসন বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের বিরোধিতা করলেও সে দেশের জনগণ ও সংবাদ মাধ্যম সহানুভূতিশীল ছিল। কিন্তু এবারে বেশ কিছু দলিল ও নথিপত্রের মূল কপি অবলোকনের সুযোগ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে '৭১ এর 'অফিসিয়াল ওয়াশিংটনের' অন্দরমহলের দৃশ্যপট উপলব্ধি করা অন্তত কিছুটা হলেও আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। ইতিহাস সম্ভবত এমনই, নাড়া দিলেই নতুন হয়ে ওঠে। দ্যুতি ছড়ায় নতুন করে। এসব মূল দলিল থেকে বাংলাদেশ ও বাঙালির অনেক কিছুই গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। সবচেয়ে বড় সত্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এ দেশের মাটি ও মানুষের আবেগ এবং অনুভূতির মধ্য দিয়ে নিবিড়ভাবে বিকশিত হয়েছে। এর শুরুটা কবে কোথায় কিভাবে হয়েছিল তা হলফ করে কারো পক্ষে বলা কঠিন। বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় কোনো অর্থেই দুর্ঘটনা কিংবা কোনো নাটকীয় সিদ্ধান্তের পর্ব ছিল না। কারো মনে এমন ধারণা হয়তো এখনো প্রবল যে, ভারত তার জাতীয় স্বার্থে খণ্ডিত পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছে। কারো মতে ১৯৪৭ থেকে, কেউ বলেন, ষাটের দশকে ভারতীয়রা নানা কূটকৌশলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের আন্দোলনকে শানিত করতে নেপথ্যে ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু এমন বিশ্বাস পোক্ত হতে পারে, তেমন কিছু পাওয়া যায়নি, অবমুক্তকৃত যুক্তরাষ্ট্রের আলোচ্য গোপন দলিলে। বরং ১৯৬৯ থেকে একাত্তরের মার্চের আগ পর্যন্ত সিআইএ কিংবা স্টেট ডিপার্টমেন্টের মূল্যায়ন বা সমীক্ষাধর্মী রিপোর্টে অভিন্ন বক্তব্য এসেছে যে, অখণ্ড পাকিস্তানের অস্তিত্ব দিল্লি ও ওয়াশিংটনের স্বার্থের পরিপূরক। আবার এ কথাও ঠিক যে, ভারত একাত্তরে ওয়াশিংটনের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তারা কোনো পর্যায়ে এমন ধারণা স্পষ্ট করেনি যে, পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করা ভারতীয় স্বার্থের জন্য জরুরি। ভারত পাকিস্তানের অখণ্ডতা কেন চেয়েছে, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিভিন্নভাবে এসেছে। তবে তা কখনো সিআইএ রিপোর্টে, কখনো কিসিঞ্জারের জবানিতে। আমেরিকার গোপন দলিল থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও মূল্যায়ন, আমাকে যেসব কারণে আন্দোলিত করেছে তা সংক্ষেপে এ রকম :

১. যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন– প্রত্যেকে নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষা দিতে গিয়ে বাংলাদেশ যুদ্ধে নিজেদের অবস্থান তৈরি করেছে। বাংলাদেশের পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান তৈরিতে উল্লেখযোগ্য কোনো নীতিগত বা আদর্শিক কারণ অনুপস্থিত ছিল।

২. ওয়াটার গেট-খ্যাত সিআইএ'র তৎকালীন পরিচালক রিচার্ড হেলমস ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সময় ২৬ মার্চ মধ্যরাতের একটু পরে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে তথ্য প্রকাশ করেন যে, গোপন বেতারে প্রচারিত হয়েছে, শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন।

৩. নিক্সন প্রশাসন বলতে যা বুঝায় তা ছিল দারুণভাবে বিভক্ত। বিশেষ করে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের একটি বড় অংশ পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বনে নারাজ ছিল। পাক সেনাদের বর্বরতার নিন্দা জানাতে নিক্সন-কিসিঞ্জার ব্যর্থ হলেও ঢাকার মার্কিন মিশন রীতিমতো বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সুতরাং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধী শক্তি হিসেবে 'যুক্তরাষ্ট্রকে' চিহ্নিত করা দুরূহ। বরং নিক্সন-কিসিঞ্জার জুটিকে দায়ী করাই সঙ্গত। তবে চমকপ্রদ এই তথ্য মনে রাখতে হবে যে, নিক্সন ও কিসিঞ্জার কিন্তু কখনো কখনো দোদুল্যমান ছিলেন। মুজিব যথাসম্ভব সাংবিধানিক চৌহদ্দির মধ্যে থাকবেন, একান্ত না পারলে স্বাধীনতার দিকে যাবেন, আর সেক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে না, এমন একটা বোঝাপড়ায় মুজিব, নিক্সন ও কিসিঞ্জারের আগাম আপোসের তথ্য লক্ষণীয়।

৪. মুজিব যদি তথাকথিত প্রো-আমেরিকান হিসেবে গণ্য না হতেন বা অন্য কথায়, স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী শক্তি যদি চীনকেন্দ্রিক হতো, তাহলে সেক্ষেত্রে সম্ভাব্য মুক্তিযুদ্ধে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা সম্ভবত ছিল অনিবার্য।

৫. বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধশালী ও স্থিতিশীল দেশে পরিণত হবে, এমন ভবিষ্যদ্বাণী মার্কিন মহল থেকে একেবারেই উচ্চারিত হয়নি। নিক্সন, কিসিঞ্জার, তৎকালীন অর্থমন্ত্রী কোনালি, পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড– এই চরিত্রগুলোর কাছ থেকে নেতিবাচক মন্তব্যই এসেছে।

৬. স্নায়ুযুদ্ধের পটভূমি এবং চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে ইয়াহিয়ার ভূমিকার প্রতি কৃতজ্ঞতাজনিত কারণও নিক্সন-কিসিঞ্জার অনেকটা ব্যক্তিগতভাবে পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করেছেন। তারা দুজনেই গোড়া থেকে জানতেন, দক্ষিণ এশিয়া সংকটের পরিণতি যা-ই ঘটুক না কেন, যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে জড়ানো সম্ভব হবে না। কিন্তু তারা কেউ এই দুর্বলতা প্রকাশ করেননি। সত্যিকার অর্থেই, সাজানো যুদ্ধের মহড়া দিয়েছেন।

৭. বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠানোর প্রধান লক্ষ্য ছিল, পশ্চিম পাকিস্তানকে বাঁচানো। নিক্সন ও কিসিঞ্জারের সন্দেহ ছিল, ভারত সুযোগ পেলে অন্তত পাক-অধিকৃত কাশ্মীর দখল করে নেবে। গোয়েন্দা সূত্রে ভারতের কোনো এক নেতৃস্থানীয়

ব্যক্তির মন্তব্য ছিল, সুযোগ পেলে তারা পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধিতার ইস্যুটি চিরকালের জন্য ফয়সালা করে নেবেন। সে কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিশ্চিত হওয়ার পরে নিক্সন, কিসিঞ্জার কিংবা ভুট্টো ঘরোয়াভাবে হতাশাব্যঞ্জক মন্তব্য করেননি। তারা বরং পরস্পরকে মোবারকবাদ জানিয়েছেন। ভারতের যুদ্ধবিরতি ঘোষণার আগ পর্যন্ত নিক্সন ও কিসিঞ্জারের রুদ্ধশ্বাস সংলাপগুলো এই সাক্ষ্য বহন করে যে, ঢাকার পতন নিয়ে নয়, পশ্চিম পাকিস্তান বাঁচানো ছিল তাদের পরম আকাঙ্ক্ষা।

৮. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বহুল আলোচিত মৈত্রী চুক্তির মডেল তৈরি হয় মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসেই । আগস্ট মাসে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি সইয়ের পর ভারত চেয়েছে বাংলাদেশও এমন একটি চুক্তি সই করুক। সম্ভবত সে কারণেই স্বাধীনতার স্বীকৃতি শর্তে সোভিয়েতকে বাংলাদেশের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তির পরামর্শ দেয় ভারত।

৯. মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহ ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান সুরক্ষায় বিরাট ভূমিকা পালন করেছে– কমবেশি এমন ধারণার বিপরীতে বরং এই সত্য উদ্ভাসিত যে, তারা কার্যত কেউ যথাসময়ে পাকিস্তানকে সমরাস্ত্র সরবরাহের ঝুঁকি নেয়নি। যুক্তরাষ্ট্র নিজেও কিন্তু কংগ্রেসের কারণে কার্যকর অর্থে সরবরাহ দিতে পারেনি।

১০. পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রশ্নে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, নিক্সন-কিসিঞ্জারসহ তাদের প্রশাসনের সব মহল থেকে এই ইস্যুতে অভিন্ন উদ্বেগ ছিল। বিশ্ব জনমতের চাপ থাকার পাশাপাশি তার অন্যতম কারণ, নিক্সন ও ইয়াহিয়া শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এমন আশায় হাল ছাড়েননি যে, একটা রাজনৈতিক আপোস হবে। আর সেক্ষেত্রে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে মুজিবই তুরুপের তাস।

১১. বাংলাদেশ যাতে কোনোভাবেই বামপন্থিদের প্রভাব বাড়তে না পারে, সে লক্ষে দিল্লি-ওয়াশিংটনের সংবেদনশীলতা লক্ষণীয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রলম্বিত যাতে না হয়, সে ব্যাপারে ভারতের গরজ ও তাড়না ছিল সবচেয়ে বেশি। এমনটা বলা সম্ভবত অত্যুক্তি হবে না যে, মুক্তিযুদ্ধের কোনো এক পর্যায়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব কার্যকরভাবে আওয়ামী লীগের হাতছাড়া হয়ে গেলে, ভারতের অবস্থান নাটকীয়ভাবে বদলে যাওয়া সম্ভব ছিল। দিল্লি অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে সম্ভাব্য এ ধরনের পরিস্থিতিতে ওয়াশিংটনের সঙ্গে হাত মেলানোর পথ যেন খোলা রেখেছিল।

১২. খন্দকার মোশতাক আহমেদ ও মাহবুব আলম চাষীর কলকাতার মার্কিন মিশনের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ এবং তারা শুধুই কনফেডারেশন চেয়েছিলেন মর্মে যে ধারণা সাধারণভাবে প্রচলিত রয়েছে, তা প্রকাশিত দলিল কিন্তু সন্দেহাতীত করেনি। এছাড়া এই যোগাযোগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত ছিল বলেও মনে হয় না। এমনকি ইয়াহিয়াও এই প্রক্রিয়ার সাফল্য নিয়ে খুব বেশি উদগ্রীব ছিলেন বলেও প্রমাণ মিলছে না। বরং বলা চলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মোশতাকই ছিলেন এর উদ্যোক্তা। তিনি

তার এই গোপন মিশন প্রবাসী সরকারের মন্ত্রিসভায় অনুমোদন করে নেননি। তবে তিনি স্বশরীরে নন, কাজী আবদুল কাইউমকে এ প্রক্রিয়ায় যুক্ত রাখেন। আবার এও সত্য যে, এই সংলাপের প্রতিটি পর্বের অভিন্ন অবস্থান হচ্ছে, রাজনৈতিক আপোস হতে পারে তবে মুজিবকে বাদ দিয়ে নয়।

১৩. হিন্দুদের ওপর বাড়তি বর্বরতার অন্যতম কারণ শুধু যে পশ্চিম পাকিস্তানিদের একটা সাধারণ ভারতবিরোধী মনোভাবের ধারাবাহিকতা তাই নয়। সম্ভবত এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এই কারণ যে, পূর্ব পাকিস্তানে মোতায়েনকৃত সৈন্যদের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল পাঞ্জাবি। আর 'পাঞ্জাবিরা ঐতিহ্যগতভাবে হিন্দুবিদ্বেষী।'

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের বিজয় দরজায় কড়া নাড়ে

আজ ১ ডিসেম্বর। একাত্তরের এই দিনে বাংলাদেশের বিজয় দরজায় কড়া নাড়ছে। অথচ পাকিস্তান সরকার রাজাকারসমর্থিত অখণ্ডতা রক্ষার প্রচারণায় নিজকে ব্যস্ত রাখে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্র নিজেরা নিশ্চিত যে, মুক্তিযোদ্ধারা ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে। ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলেও পাকিস্তান পরাজিত হবে। কিন্তু মিত্র পাকিস্তানের মর্যাদা রক্ষায় তারা প্রকাশ্যে নানা তৎপরতা প্রদর্শন করে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও ছিল স্নায়ুযুদ্ধ যুগের জটিল সমীকরণে বিভক্ত। পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষা ও কনফেডারেশন গঠনে নিক্সন-কিসিঞ্জার সর্বাত্মক পদক্ষেপ নেন। এদিন কিসিঞ্জার তার সহকর্মীদের কাছে জানতে চান ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে জবাব মিলেছে কি না? তাকে বলা হয়, শুধু ইন্দিরা নয়, সোভিয়েত নেতা কসিগিনের কাছে দেয়া পত্রেরও কোনো উত্তর নেই।

এদিন জাতিসংঘ থেকে দি গার্ডিয়ানের সংবাদদাতা ম্যালকম ডিন প্রেরিত রিপোর্টে বলা হয়, ১৬ সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল প্রায় ১০০টি দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। কিন্তু জাতিসংঘের ১৩১টি সদস্য দেশের একটিও এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি।

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বিচারপতি চৌধুরী বলেন, বর্তমানে জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ অনুচিত। মার্চে হত্যাযজ্ঞ শুরুর পর তাদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ছিল।

মুক্তিবাহিনী এ দিন কুষ্টিয়ার দর্শনা ও সিলেটের শমশেরনগর আক্রমণ করে। ছাতকে মুক্তিবাহিনী ও পাকসেনাদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষে ৫০ জনের বেশি নিহত হয়। পাকসেনাদের পক্ষে এই যুদ্ধে লিপ্ত ৬৫ জন রাজাকারও খতম হয়।

আবদুস সালাম সম্পাদিত পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় এদিন পাঁচ কলামজুড়ে শিরোনাম ছিল 'শুধু সিলেটেই ১৬৮ জন ভারতীয় নিহত। ২৮টি স্থানে গুলিবর্ষণ ও হামলা। প্রথম পাতায় দুই কলামজুড়ে প্রকাশিত ছবির ক্যাপশন 'নিহত ভারতীয় সৈন্যদের কাছ থেকে উদ্ধারকৃত গোলাবারুদ ও ব্যাজ প্রত্যক্ষ করছেন একদল বিদেশী সাংবাদিক।' ৩ ডিসেম্বরে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ শুরুর আগ পর্যন্ত পাক প্রচারণার অন্যতম লক্ষ্য ছিল পূর্ববাংলায় ভারতীয় সৈন্যদের উপস্থিতি প্রমাণ করা।

রাওয়ালপিন্ডিতে একজন সরকারি মুখপাত্র আজ ঘোষণা করেন, মুজিবের বিচার

শেষ হয়নি। রয়টারের এক রিপোর্ট : ওয়াশিংটনে সরকারি মুখপাত্র চার্লস ব্রে ঘোষণা করেছেন, ভারতীয় সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত অতিক্রমের কারণে যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে দেয়া অস্ত্রের ছাড়পত্র স্থগিত করেছে। গত মাসে পাকিস্তানকে প্রদত্ত খুচরা যন্ত্রাংশ সংক্রান্ত সব ছাড়পত্র স্থগিতের প্রেক্ষাপটে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিবিসির সংবাদদাতা রোনাল্ড রবহন যশোরে গুলিবিদ্ধ একজন ভারতীয় সেকশন কমান্ডারের সাক্ষাৎ পান এবং পাকিস্তানিদের হেফাজতে তিনি চিকিৎসাধীন রায়েছেন বলে উল্লেখ করেন।

জাতিসংঘ মহাসচিব ইউথান্ট আজ জানিয়ে দিয়েছেন ইয়াহিয়ার অনুরোধ অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানে পর্যবেক্ষক পাঠাতে হলে নিরাপত্তা পরিষদের আগাম আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত ও অনুমোদন অপরিহার্য। রাওয়ালপিন্ডিতে আজ এক সরকারি মুখপাত্র দাবি করেন বিভিন্ন স্থানে আজকের সংঘর্ষে ১৩০ জন ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়েছে। শিয়ালকোটে ভারতীয় বিমানের আকাশসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগও আনে তারা। ভারত তা নাকচ করে দেয়। ওই মুখপাত্র বলেন, নবনিযুক্ত রাজাকাররা এক নিবেদিত প্রাণশক্তি। তারা সুপ্রশিক্ষিত ও আত্মনিবেদিত। ঢাকার কাছে তারা এক অভিযানে ১১ জন শত্রুসেনা খতম করেছে।

হেনরি কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে ওয়াশিংটন স্পেশাল গ্রুপের বৈঠকে উল্লেখ করা হয়, বড় উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে ভারত যদি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় তাহলে ইয়াহিয়া পরাজয় নিশ্চিত জেনেও ভারতীয় বিমান ও সৈন্যদের অবস্থানে হামলার নির্দেশ দিতে পারেন। লক্ষণীয়, এই বৈঠকে জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ ও সিআইএ দপ্তর নিশ্চিত করে যে, দুই পক্ষের মধ্যে সংঘাত হলে তার নিষ্পত্তি এক মাসের মধ্যেই ঘটবে। পাকিস্তানি সৈন্যরা ইতোমধ্যেই গোলাবারুদের ব্যবহার সঙ্কুচিত করেছে। বিশেষ অনুমতি ছাড়া টিউবপ্রতি মাত্র ১০ রাউন্ড কার্তুজ বিলি করা হচ্ছে। সীমান্তে ভারতের চাপ বৃদ্ধির কারণে পাকিস্তানিরা রক্ষণশীল হয়ে পড়ছে। আর এর ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধারা অবাধে বিচরণ করতে পারছে। এদিন নিউইয়র্ক টাইমসের এক রিপোর্টেও এ তথ্য দেয়া হয়। ওই বৈঠকে অ্যাডমিরাল মুরার মন্তব্য করেন, পাকিস্তানিরা কার্যত পিছু হটছে। যশোরকে হারিয়ে তারা মারাত্মকভাবে নিজেদের পঙ্গু ভাবছে। সিআইএর লে. জেনারেল কুশম্যান বলেন, কারো অনুমান ভারতীয়রা যশোর করায়ত্তের চেষ্টা করছে। তাদের লক্ষ্য সেখানে বাংলাদেশের রাজধানী প্রতিষ্ঠা।

বৈঠকে তথ্য দেয়া হয় যে, পাকিস্তান সরকার নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক আহ্বানে উদ্যোগী হচ্ছে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতকে ভুট্টোর জন্য একটি ভাষণের খসড়া লিখতে বলা হয়েছে। চীন পাকিস্তানকে ইঙ্গিত দিয়েছে যে, পাকিস্তানের কাছে অগ্রহণযোগ্য যে কোনো প্রস্তাবে তারা ভেটো দেবে। তবে তারা এটাও জানে যে, ভারতের অপছন্দের কোনো প্রস্তাবেও ভেটো দেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন। সব শুনে কিসিঞ্জার মন্তব্য করেন–একটি অনিবার্য সামরিক পরিস্থিতিতেও নিরাপত্তা পরিষদ যেখানে

বৈঠকে বসতে কুণ্ঠিত, সেখানে জাতিসংঘে কেউ এ নিয়ে প্রস্তাব আনতে ভরসা না পাওয়াই স্বাভাবিক। কুশম্যান পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা তৎপরতা ক্রমবর্ধমান।

এদিন পিপিআইর এক রিপোর্টে বলা হয়, পিকিং বলেছে মস্কো আগুনে ঘি ঢালছে। পাকিস্তান অবজারভার উইকলি ফ্রন্টিয়ার অব ক্যালকাটার রাজনৈতিক সংবাদদাতা কর্তৃক ২৩ অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধ থেকে নির্বাচিত অংশ পুনঃমুদ্রিত করে। এতে বলা হয়, প্রত্যেকেই যুদ্ধের কথা বলছে। যেন এর মাধ্যমেই তথাকথিত বাংলাদেশ সমস্যা চিরকালের জন্য সুরাহা হবে। আসলে জেনারেল ইয়াহিয়া যুদ্ধ ছাড়া পূর্ববাংলার হাতছাড়া হওয়া হজম করতে অপারগ। ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় লি লাসকেজের একটি রিপোর্টের বরাতে অবজারভার লিখেছে, আখাউড়া ডেটলাইনে এই সংবাদদাতা খবর দিয়েছেন যে, এক পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার তাকে বলেছেন, তারা যেখানেই যাচ্ছেন, সেখানেই গ্রামবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের স্বাগত জানাচ্ছে। তাদের কণ্ঠে স্লোগান–পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

করাচি ডেটলাইনে আরেকটি রিপোর্টে বলা হয়, চীনের মন্ত্রী লি শুই-চিং ইয়াহিয়ার সঙ্গে বৈঠককালে 'পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও বিদেশী আগ্রাসন প্রতিরোধে জনগণের প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি দেখে অভিভূত।' ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় মার্কিন কলামিস্ট জোশেফ আলসোপের বরাতে পাকিস্তান অবজারভার জানায়, প্রমাণ না থাকলেও এমন ইঙ্গিত মিলছে যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে আগেভাগেই ভারত সব রকম সহযোগিতা দিতে নিশ্চয়তা দিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে হামলা শুরুর আগেই পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে ভারতের ৬ ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করা হয়। ফেব্রুয়ারিতে এই পদক্ষেপ নেয়ার অজুহাত ছিল পশ্চিমবঙ্গের নিরস্ত্র বামপন্থিদের নিয়ন্ত্রণ করা। ওই মার্কিন নিবন্ধকারের মতে, পাকিস্তানকে আংশিকভাবে ধ্বংস করার সম্ভাব্য ফল হচ্ছে, ডুবে যাওয়ার মুহূর্তে একজন মানুষকে লাথি মারা। আর সুদূরপ্রসারী রণকৌশলগত তাৎপর্য হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য ভারতকে উল্লেখযোগ্য সামরিক ঘাঁটিতে রূপান্তরিত করা। আন্দামান দ্বীপ ও মুম্বায়ে হবে সোভিয়েতের নৌঘাঁটি।

রাওয়ালপিন্ডিতে গোলাম আযম পিপিআইকে বলেন, 'মনে হয় যেন ইন্দিরা শেখ মুজিবের কৌসুলি হিসেবে কাজ করছেন। যদি কিছুসংখ্যক আওয়ামী লিগার ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে থাকে তার অর্থ এই নয় যে, পূর্ব পাকিস্তানি জনগণ ইন্দিরাকে তাদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে বলেছে। যখন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক সমাধান এবং শেখ মুজিবের মুক্তির কথা বলেন, তখন আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠি। পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষায় অবিলম্বে ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা উচিত। (*ইত্তেফাক*, ২ ডিসেম্বর, ১৯৭১)

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স আজ দিল্লিতে মার্কিন দূতাবাসে প্রেরিত এক টেলিগ্রাম বার্তায় উল্লেখ করেন, ভারতীয় বাহিনী ক্রমেই পাকিস্তানি ভূখণ্ডে পাকিস্তানের সঙ্গে

বিরোধে জড়িয়ে পড়ছে। আর সে কারণেই ভারতের কাছে আমাদের অস্ত্র বিক্রির নীতি নিয়ে আমরা কিছুটা উদ্বিগ্ন। পূর্ব পাকিস্তানে সমস্যা সৃষ্টির সূচনায় আমরা পাকিস্তানের কাছে অস্ত্র বিক্রি সীমিত করি এবং শেষ পর্যন্ত তা বন্ধ হয়ে যায়। এখন ভারতের বিরুদ্ধেও আমরা অনুরূপ সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। প্রায় ২০ লাখ ডলারের একটি ক্রয় চুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তবে সাড়ে ১১ মিলিয়ন ডলারের অবশিষ্ট লাইসেন্সের বৈধতা বহাল থাকবে। আজই এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে। এবং আশা করা যায় ভারতে এর প্রতিক্রিয়া হবে তীব্র। রজার্স রাষ্ট্রদূতকে লিখেছেন, ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে আপনি এটা জানিয়ে দেবেন যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও আমেরিকান জনগণ দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করে যে, যুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান সংকটের সুরাহা হবে না।

আজ ওয়াশিংটন সময় বিকেল ৪টা ১৭ থেকে ৪টা ৫০ পর্যন্ত কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্পেশাল গ্রুপের ওই বৈঠকে সিআইএর লে. জে. রবার্ট ই. কুশম্যান অবহিত করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তেও ভারতীয় শক্তির কাছে পাকিস্তান দুর্বল। তাদের অধিকাংশ ডিভিশনই অবশ্য সেখানে মোতায়েন রাখা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংঘাত হলে তারা ভারতের সঙ্গে টিকবে না। তাদের হাতে বড়জোর ৩০ দিনের রসদ আছে। জেনারেল নিয়াজি আজ সিলেটের এক সমাবেশে বলেন, আমরা সবসময় সংখ্যায় কম ছিলাম। কিন্তু আমাদের ইতিহাস হচ্ছে বিজয় ছিনিয়ে নেয়া। আমরা সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাব।

চীনের ভূমিকায় কিসিঞ্জারের সংশয়

আজ ২ ডিসেম্বর। মার্ক টালি সম্পাদিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, 'আজ পাক সামরিক সূত্র ৫১৫ গুর্খা রেজিমেন্টের দুই ভারতীয় সৈন্যের শনাক্তকরণ নম্বরসহ আলোকচিত্র প্রকাশ করে। এই দুই সৈন্য পাকিস্তানি ভূখণ্ড জৈন্তাপুরে নিহত হন। বর্তমান যুদ্ধে ভারতীয় সম্পৃক্ততা প্রমাণের উদ্দেশ্যেই এ উদ্যোগ। গত ২৪ ঘণ্টায় বিদ্রোহীরা, সরকারি মতে দুর্বৃত্তরা রাজধানীর বিভিন্ন অংশে পাঁচটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। একটি বামপন্থি দলের দপ্তরে একটি বোমা ফাটে, যখন দক্ষিণপন্থি নেতা প্রফেসর গোলাম আযম ইঙ্গিত দেন, অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানে একটি জাতীয় সরকার গঠন করা হতে পারে। এতে ভুট্টো থাকবেন। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মন জয় করতে প্রস্তাবিত জাতীয় সরকারে প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র ও অর্থমন্ত্রী পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের মধ্য থেকে নির্বাচন করতে হবে।'

কিসিঞ্জার আজ প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে দেয়া এক স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেন, "জনশক্তি ও সরবরাহে ভারতের তুলনায় বহুগুণ বেশি পিছিয়ে থাকা পাকিস্তানি বাহিনী ক্রমেই পিছু হটছে। তারা ভারতীয় বাহিনীর চাপের মুখে ইতোমধ্যেই উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রাদেশিক শহর হাতছাড়া করেছে। গেরিলারা দেশের অভ্যন্তরের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেছে। তারা অবাধে ঘুরছে। পাকসেনাদের এখন মূলত সীমান্ত মোকাবিলায় জড়ো করা হচ্ছে। বহু শহরে বাংলাদেশী পতাকা উড়ছে। এমনকি ঢাকা থেকে ১৭ মাইল দূরবর্তী শহরের নিয়ন্ত্রণভারও গেরিলাদের হাতে। পূর্ব পাকিস্তানে জাহাজ চলাচল রোধে নিজেদের বাহিনীর অংশগ্রহণে ভারতীয়রা 'মুক্তিবাহিনী নেভি' গঠন করেছে। জাতিসংঘে আপাতত স্থিতাবস্থা বিরাজ করছে। জাপান ও বেলজিয়াম নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক আহ্বানে আগ্রহ হারিয়েছে। সোভিয়েত ও ভারতীয়রা এ মুহূর্তে নিষ্ক্রিয় থেকে নিজেদের পন্থা খুঁজছে। জাতিসংঘে পাক রাষ্ট্রদূত অবশ্য ভাবছেন ৩ ডিসেম্বরের মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠানে পিন্ডির কাছ থেকে তিনি নির্দেশ পেতে পারেন।"

টোকিও ডেটলাইনে রয়টার্স বলেছে, জাপান সরকার ২৭ নভেম্বর মিসেস গান্ধীর একটি চিঠি পেয়েছে। চিঠিতে বিরোধ মীমাংসার জন্য জাপানি সহযোগিতা চাওয়া হয়নি। এ ব্যাপারে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপের প্রস্তাবও নাকচ করা হয়েছে। জাপান সরকার মনে করে, পাক-ভারত সংঘর্ষে টোকিও বৃহৎ শক্তিবর্গের মতো গভীরভাবে

জড়িত না থাকায় তার পক্ষে সমঝোতার উদ্যোগ নেয়া সহজ হবে।

লক্ষণীয় যে, কিসিঞ্জার চীনের ভূমিকা সম্পর্কে নিক্সনকে আজ সতর্ক করে দেন। তিনি মন্তব্য করেন, গত দশ দিনে চীনা গণমাধ্যমে পাক-ভারত সংকট ফলাও করে ছাপা হচ্ছে। ভারতীয় তৎপরতাকে 'আগ্রাসন' এবং 'উসকানি' হিসেবেও চিহ্নিত করা হচ্ছে। সোভিয়েত সম্পৃক্ততাকে সরাসরি টার্গেট করা হচ্ছে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান সংকটকে তার নিরাপত্তার জন্য কোনো হুমকি বিবেচনার বিষয়টি তুলে ধরছে না। কিসিঞ্জারের কথায় পাকিস্তানের প্রতি চীনা প্রকাশ্য সমর্থনের বিষয়টি এখনো সাধারণই রয়ে গেছে। এমনকি অন্তত একবার তারা পরোক্ষভাবে এ ইঙ্গিতও দিয়েছে যে, পাকিস্তানের সহায়তার কোনো দরকার নেই। তারা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তিপূর্ণ 'আলাপ-আলোচনা' চাইছে।

রয়টার্স এদিনই পিকিং ডেটলাইনে খবর দেয়, চীনের সহকারী প্রধানমন্ত্রী লি সিয়েন নিয়েন এক অনুষ্ঠানে পাক-ভারত সীমান্তে যুদ্ধ শুরুর জন্য দিল্লি ও মস্কোর কঠোর সমালোচনা করেন। এ সময় ভারতের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স মিশ্র ও ভারতীয় সামরিক অ্যাটাচে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দিল্লিতে বলেন, আমরা আমাদের জাতীয় স্বার্থে যা ভালো তা-ই করব। বিপুলসংখ্যক সিনেটর, বিদেশী মন্ত্রী প্রমুখ পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত ঘুরে গেছেন। কিন্তু তা কি বাংলাদেশের সমস্যা সমাধান করতে পেরেছে? এসব বৃহৎ জাতি গণহত্যা বন্ধে পাকিস্তানের প্রতি কি আহ্বান জানিয়েছে? না, তারা তা করবে না। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অভিযোগ খণ্ডন করে গান্ধী বলেন, তাদের জন্য উপযুক্ত মনে হলে তারা কিন্তু অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে। চীনের মতো দেশও অন্য জাতির বিষয়ে নাক গলিয়েছে। বলা হচ্ছে, আমরা ভারতের মাটি মুক্তিবাহিনীকে ব্যবহার করতে দিয়েছি। আমরা কীভাবে এটা প্রতিরোধ করব। পূর্ব বাংলার সঙ্গে ভারতের সীমান্ত এতই দীর্ঘ যে, পুরো সেনাবাহিনী মোতায়েন করলেও তাদের রোধ করা সম্ভব হবে না। জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মোতায়েন করে তারা মুক্তিবাহিনীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। কিন্তু তারা কি ভুলে গেছেন, সব বিধিনিষেধের দেয়াল ভিয়েতনামের গেরিলারা ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। তিনি ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকায় পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় আক্রমণের সমালোচনার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, 'দেহ-বর্ণের গর্বে তিন হাজার মাইল দূরে বসে ভারতকে তার ইচ্ছেমতো কাজ করার হুকুম চালানোর দিন আর নেই। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় ভারতকে আক্রমণকারী বলে ব্রিটেন ভুল করেছিল।'

ডেইলি টেলিগ্রাফে ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থ ঢাকা থেকে লিখেছেন–মনে হচ্ছে, ভারতীয় কোনো অভিযানেই এ পর্যন্ত ব্যাটালিয়ন পর্যায়ের (৬০০ থেকে ৮০০) সৈন্য অংশ নেয়নি। অধিকাংশ অভিযানেই শুধু এক কোম্পানি (১২০ জন) সৈন্য অংশ নিয়েছে। ভারতীয়রা রংপুরের কাছে গতকালই ভারী গোলাবর্ষণ শুরু করে। লন্ডনের

ডেইলি টেলিগ্রাফে কলকাতা ডেটলাইনে ডেভিড লোশক লিখেছেন, ভারতীয় হাইকমান্ডের পরিকল্পনা হলো, যদি একবার যশোরকে মুক্ত করা যায় তাহলে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। এপিপির এক রিপোর্টে বলা হয়, আম্মানের দুটি শীর্ষস্থানীয় দৈনিক আল রাই ও আল দোস্তুর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় হামলার কঠোর নিন্দা করেছে।

ইন্দিরা গান্ধীর অভিযোগের জবাবে ইসলামাবাদে মার্কিন দূতাবাসে পাকিস্তান অভিযোগ করে, কাশ্মীর সীমান্তে ভারতীয় বিমানবাহিনী আগ্রাসীভাবে তৎপরতা চালিয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের আকাশসীমায় তিন-চার দিনের তৎপরতার পর আজ বিভিন্ন চৌকিতে হামলা চালায়। এদিন পাক মুখপাত্র ভারতে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি স্থগিতের মার্কিন সিদ্ধান্তকে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাবের প্রসংশনীয় পরিবর্তন হিসেবে উল্লেখ করা হয়। পিন্ডিতে সফররত মার্কিন সিনেটর উইলিয়াম স্যাক্সবে মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুরোধ জানালেও তা রক্ষা করা হয়নি। ইয়াহিয়াকে তিনি বলেছিলেন, মুজিব জীবিত আছেন কি না তিনি তা দেখতে চান। মুজিবের স্বাস্থ্য চমৎকার আছে–এ মর্মে প্রেসিডেন্ট তাকে অবহিত করেন। তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওসমান ওলকে আজ রাতে পিন্ডিতে এক টিভি সাক্ষাৎকারে বলেন, উপমহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সেন্টোর উদ্যোগী হওয়া উচিত।

রয়টার্স ত্রিপলি ডেটলাইনে এক রিপোর্টে বলেছে, জাতিসংঘে পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলের নেতা মাহমুদ আলী লিবিয়ার গাদ্দাফির কাছে ইয়াহিয়ার চিঠি হস্তান্তর করেন। কিন্তু তার বিষয়বস্তু তিনি প্রকাশ করেননি। জানা গেছে, এই বাঙালি মাহমুদ আলী বিশেষ প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আজও মন্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করছেন। সরকার আসে যায়, কিন্তু মাহমুদ আলী গাড়িতে পাকিস্তানি পতাকা উড়িয়েই চলাফেরা করেন।

পশ্চিম পাকিস্তান ফ্রন্টে হামলা নিয়ে বিভ্রান্তি

আজ তিন ডিসেম্বর। কলকাতায় এক জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। নানা জল্পনা। তিনি কি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন? যুদ্ধ ঘোষণা করছেন? একটি চিরকুট এল। নতুন কোনো ঘোষণা এল না। সভা শেষ হলো। তিনি দ্রুত ফিরে গেলেন দিল্লি।

পাকিস্তান আজ প্রথম কাশ্মীর সীমান্তে ভারতীয় ভূখণ্ডে বিমান হামলা চালায়। আনুষ্ঠানিক যুদ্ধের শুরু। এ জন্যই বলা হয়, একাত্তরে পাক-ভারতের যুদ্ধের মেয়াদ ১৪ দিন। ইন্দিরা এদিন জাতির উদ্দেশে দেয়া বেতার ভাষণে বলেন, আজ বাংলাদেশের যুদ্ধ ভারতের যুদ্ধে পরিণত হলো। এদিন ভারতে জরুরি 'অবস্থাও জারি হয়। পিআইএর সব ফ্লাইট বাতিল করা হয়। ঢাকায় কার্ফ্যু জারি করা হয় রাতে। ভুট্টো এই প্রথম বলেন, তার দল একজন পূর্ব পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি সহকারী প্রধানমন্ত্রী হতে রাজি আছেন। তবে তাকে পূর্ণ ক্ষমতা দিতে হবে।

পশ্চিম পাকিস্তান ফ্রন্টে কে কার বিরুদ্ধে প্রথম হামলা চালিয়েছে, তা নিয়ে ছিল পরস্পরবিরোধী বক্তব্য। দৈনিক আজাদে ৪ ডিসেম্বরে প্রথম পাতায় ৮ কলামজুড়ে শিরোনাম : 'সারা পাকিস্তানে ভারতীয় হামলা শুরু'। দৈনিক পাকিস্তানের ৭ কলামজুড়ে ব্যানার হেডলাইন 'এযাবৎকালের বৃহত্তম হামলা'। এপিপির রিপোর্টে বলা হয়, ভারতীয় বাহিনী আজ পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্ত আক্রমণ করেছে। পাকিস্তান বিকেলে ভারতের অগ্রবর্তী এলাকার বিমানক্ষেত্র অমৃতসর পাঠানকোট, অবন্তিপুরা ও শ্রীনগরে বোমাবর্ষণ করে। ওয়াশিংটনের কাছে হামলার কথা স্বীকার করে পাকিস্তান। কিন্তু ওয়াশিংটন সেদিন তা প্রকাশ করেনি। এদিন ওয়াশিংটন সময় সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে দুজনের টেলিসংলাপ : কিসিঞ্জার নিক্সনকে বলছেন, মনে হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের পতন ঘটছে। আর সে কারণেই পশ্চিম পাকিস্তান আক্রান্ত হলো। পররাষ্ট্র দপ্তর ভারতকে সামরিক সহায়তা বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘোষণা না দিতে এ ঘটনাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহারে আগ্রহী। কিন্তু আমি মনে করি, এ ঘটনার পর ভারতকে সহায়তাদান কর্মসূচি একেবারেই বাতিল করা সঙ্গত। কিসিঞ্জার আরো বললেন, পাকিস্তান যদি যুদ্ধ ছাড়াই তাদের দেশের অর্ধেক হারায় তাহলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। এভাবেও হয়তো তাদের বিনাশ ঘটবে। কিন্তু তারা তো যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে। জবাবে নিক্সন : পাকিস্তানের ঘটনাবলি আপনার চিত্তকে অস্থির করে তুলছে।... ভারতকে আমাদের

অবশ্যই অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হবে। কেন আমরা তা করব না। পশ্চিম পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করেছে? তাদের বলে দিন, ভারত যখন দাবি করে যে, পশ্চিম পাকিস্তানই তাদের আক্রমণ করেছে। তখন মনে হয়, এ যেন রাশিয়ার দাবি, ফিনল্যান্ড তাদের আক্রমণ করেছে!

১০টা ৫৫ মিনিটে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্সের ফোন আসে। কিসিঞ্জার রজার্সকে বলেন, প্রেসিডেন্ট আজ দুপুরের মধ্যেই অস্ত্র সহায়তা বন্ধ সংক্রান্ত বিবৃতি প্রকাশে বেপরোয়া। তিনি চাইছেন, আমরা যেন পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে থাকি। রজার্স বলেন, আমিও তা-ই চাইছি। তবে ভারতকে নিন্দা জানিয়ে কোনো বিবৃতি প্রকাশে আমি কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে। প্রশ্ন হলো, কে দোষী তা নির্ধারণ করে কোনো বিচার বিভাগীয় ভূমিকা পালন কি আমাদের ঠিক হবে? আমার তো মনে হয়, বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে পেশ করাই সমীচীন হবে। কিসিঞ্জার বলেন, প্রেসিডেন্ট কিন্তু ভারতকে অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করে দেয়ার কথাও ভাবছেন।

জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি (পরে জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব) ইকবাল আখুন্দ ১৯৯৭ সালে তার 'মেমোয়ার্স অব এ বাইস্টান্ডার : এ লাইফ ইন ডিপ্লোম্যাসি' বইয়ে নিশ্চিত করেন যে, পাকিস্তানই এদিন কাশ্মীরের চম্ব সেক্টরে হামলা চালায়। এ হলো সেই 'সাধারণ যুদ্ধ', যার হুমকি গোটা বছরজুড়ে দিয়ে আসছিলেন ইয়াহিয়া। ১৯৮৯ সালে মার্কিন সামরিক বাহিনীর গবেষণামূলক গ্রন্থ 'বাংলাদেশ : এ কান্ট্রি স্টাডি'তে তথ্য দেয়া হয়, শেষ নভেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় বাহিনীর অভিযানের পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ বিমান হামলা চালায়। (পৃষ্ঠা-২১০)

কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে এদিন সকাল ১১টা ১৯ থেকে ১১টা ৫৫ মিনিট পর্যন্ত ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠক হয়। এতে সিদ্ধান্ত হয় যে, এক. পাক-রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলাপের পরে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকের দিনক্ষণ নির্ধারণ। দুই. আমাদের প্রস্তাবিত রেজুলেশনসহ রাষ্ট্রদূত বুশের জন্য ভাষণের খসড়া তৈরি। তিন. সোমবার পর্যন্ত ভারতকে অতিরিক্ত কোনো ঋণপত্র ইস্যু না করতে ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দান। চার. কিসিঞ্জার প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে এটা জেনে নেবেন যে, পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ২২ মিলিয়ন ডলারের ভাগ্যে কী জুটবে। কারণ যে ক্যাটাগরিতে ভারতকে বন্ধ করা হচ্ছে, তাতে পাকিস্তানের বিষয়েও একই সিদ্ধান্তে নিতে হয়। পাঁচ. পররাষ্ট্র দপ্তর প্রেসিডেন্টকে লেখা ইয়াহিয়ার ২ ডিসেম্বরের চিঠির জবাব তৈরি করবে।

কিসিঞ্জার বৈঠকের শুরুতেই চাপা উত্তেজনায় বলতে শুরু করেন, আমি প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে প্রত্যেক আধ ঘণ্টা অন্তর গুঁতো খেয়ে চলেছি। তিনি বলছেন, আমরা যথেষ্ট কঠোর হচ্ছি না। তার ধারণা, পররাষ্ট্র দপ্তর কঠোর হতে চাপ দিচ্ছে, কিন্তু আমিই বাগড়া দিচ্ছি। তিনি সত্যিই বিশ্বাস করছেন না যে, আমরা তার ইচ্ছাই পূরণ করে চলেছি। তিনি চাইছেন, আমাদের নীতি ও কাজ হবে পাকিস্তানঘেঁষা। কিন্তু

তা না হয়ে প্রত্যেক ব্রিফিং বা বিবৃতি প্রবাহিত হচ্ছে ভিন্নখাতে।

কিসিঞ্জারের এ বক্তব্যে এটা স্পষ্ট যে, তিনি অন্যদের ওপর চাপ সৃষ্টির কৌশল গ্রহণ করেন। নিক্সন-কিসিঞ্জার দুজনেই জানতেন স্টেট ডিপার্টমেন্টসহ প্রশাসনের একটি প্রভাবশালী অংশ বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ ছিলেন। একাত্তরে নিউইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক জ্যাক এন্ডারসন এই বৈঠকের বিবরণীসহ বেশ কিছু দলিল প্রকাশ করতে পেরেছিলেন এদের কল্যাণেই। এ ক্ষেত্রের 'ডিপ্থ্রট' ছিলেন কিসিঞ্জারেরই সহকারী চার্লস রেডফোর্ড। তবে সেই দলিল, যা এন্ডারসন পেপারস ও ২০০২ সালে এফ এস আইযাজুদ্দিন সম্পাদিত 'দি হোয়াইট হাউস অ্যান্ড পাকিস্তান' (অক্সফোর্ড) এ মুদ্রিত হয়েছে, তার সঙ্গে ৬ মে, ২০০৫ প্রকাশিত নথিপত্রের সঙ্গে কিছু পার্থক্য লক্ষণীয়। যেমন ৩ ডিসেম্বরের বৈঠকে কিসিঞ্জারের প্রশ্ন : ভারত কি পাক ভূখণ্ড জবরদখল করছে? জবাবে সিআইএ পরিচালক রিচার্ড হেলমস বলছেন, হ্যাঁ, ভারত নিশ্চিতভাবেই ক্ষুদ্র হলেও পাকিস্তানের ভূখণ্ড দখল করে নিয়েছে। (আইযাজুদ্দিন, পৃষ্ঠা-৪০০)। গত ৬ মে সরকারিভাবে অবমুক্তকৃত দলিল মতে হেলমস বলেন, 'না, তাদের দ্বারা সামান্য অংশ ব্যতিরেকে পাক ভূখণ্ড গ্রাস বা অপদখলের কোনো প্রশ্নই আসে না।'

এই নথি থেকে দেখা যাচ্ছে, সিআইএ জানত পাকিস্তানিরাই শ্রীনগর, অমৃতসর ও পাঠানকোটে হামলা চালিয়েছে। অ্যাডমিরাল মুরার এ মর্মে আক্ষেপও করেন, পাকিস্তানিদের এ পদক্ষেপ একেবারেই কাঁচা কাজ। '৬৫-র যুদ্ধের মতো দক্ষতাও তারা দেখাতে পারেনি।

এ দিনের আলোচনা থেকে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার যে, যুক্তরাষ্ট্র তার পররাষ্ট্রনীতির স্বার্থে কখনো জাতিসংঘকে ব্যবহারে উদগ্রীব। বৈঠকে কিসিঞ্জারের একটি মন্তব্য, প্রেসিডেন্টের বিশ্বাস এই ইস্যুতে জাতিসংঘ যদি কিছু না করতে পারে তাহলে তার টিকে থাকা অর্থহীন।

সামরিক চুক্তি : কাগুজে দলিল

সাম্প্রতিক মার্কিন গোপন নথি সন্দেহাতীতভাবে এক অর্থে পুনঃপ্রমাণ করেছে যে, নিজের শক্তি না থাকলে বৃহৎশক্তির সঙ্গে প্রকাশ্য কিংবা গোপন আঁতাত প্রয়োজন মুহূর্তে অর্থহীন মনে হতে পারে। '৬৫-র যুদ্ধের পরে ভুট্টো বলেছিলেন, ভারতের সঙ্গে এ যুদ্ধ চলবে হাজার বছর। ইয়াহিয়া ২ ডিসেম্বরে নিক্সনকে ১৯৫৯ সালের চুক্তির দোহাই দিয়ে মরিয়া হয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেন। পরিহাস হচ্ছে, ৩ ডিসেম্বরে ওয়াশিংটন স্পেশাল গ্রুপের বৈঠকে শীর্ষস্থানীয় নীতিনির্ধারকরা এই চুক্তি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। কিন্তু এটা কেউ কবুল করেননি যে, এটা পালনে তাদের কোনো বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বাংলাদেশ সংকটের ৯ মাস পর স্বয়ং কিসিঞ্জারও বলছেন, আজকের আগে এ চুক্তির কথা আমি কখনো গুরুত্ব দিয়ে ভাবিনি। দুই দেশেরই দুটো

রক্ষাকবচ ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে। ভারতের সঙ্গে ১৯৬৩-তে সই হয় গোপন আকাশ প্রতিরক্ষা চুক্তি। তবে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি ছিল সুনির্দিষ্ট। ১৯৫৯ সালের ৫ মার্চ স্বাক্ষরিত এই চুক্তিতে বলা হয়, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আগ্রাসন হলে দুই দেশের সম্মত উপায়ে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক সহায়তা দেবে।

আজ দিনের শেষভাগে ফ্লোরিডায় অবস্থানরত নিক্সনের সঙ্গে কিসিঞ্জারের টেলিসংলাপ চলে। কিসিঞ্জার দিব্যি নিক্সনকে বললেন, এতে আর কোনো সন্দেহ নেই যে, পাকিস্তান নয়, ভারতই হামলা করেছে।

এদিকে আজ এপিপির এক রিপোর্টে বলা হয়, জর্ডানের বাদশা হোসেন ইয়াহিয়াকে লেখা এক বার্তায় বলেন, বিশ্বের বৃহত্তম ইসলামি রাষ্ট্রের কোনো ক্ষতির প্রতি কোনো মতেই আমরা চোখ বুজে থাকতে পারি না। ডা. চৌহান লন্ডনে বলেন, স্বাধীন শিখ রাষ্ট্র গঠনে পাকিস্তানের কাছ থেকে সহায়তার আশ্বাস মিলেছে।

ইয়াহিয়া-ভুট্টোর মনোভাব রহস্যঘেরা

আজ ৪ ডিসেম্বর। পিন্ডিতে সরকারি মুখপাত্রের দাবি, পশ্চিম ফ্রন্টে ভারতীয় আক্রমণ স্তব্ধ করে দেয়া হয়েছে। হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টে ৩ ডিসেম্বরের পাকিস্তানি 'প্রি-এম্পটিভ' হামলা অবশ্য 'ডি-ডে' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ভারতীয় বোমারু বিমান আজ তেজগাঁও ও কুর্মিটোলায় সর্বাত্মক হামলা চালায়। ভারতের ৯টি ও পাকিস্তানের ৩টি বিমান ভূপাতিত হয়। ভারত বিশাখাপত্তমে পাক সাবমেরিন গাজী ডুবিয়ে দিয়েছে। পাক সশস্ত্র বাহিনীর ওপর থেকে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা আজ প্রত্যাহার করা হয়। কিসিংস আরকাইভস লিখেছে, ভারত আজ বলেছে, সে ইন্দো-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির ৯ নম্বর অনুচ্ছেদ (আগ্রাসনের হুমকি সংক্রান্ত) প্রয়োগের সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখছে।

নিরাপত্তা পরিষদে আজ বাংলাদেশ প্রসঙ্গে জরুরি বৈঠক হয়। তবে বাদানুবাদের কারণে প্রস্তাব গ্রহণ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু এ নিয়ে পাক-ভারতের একটা উভয় সংকট অবস্থা চোখে পড়ে। ভারত পাক হামলার ব্যাপারে জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে অভিযোগ করে। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদে কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ উত্থাপন করবে না বলে জানিয়ে দেয়। দিল্লিতে একজন মুখপাত্র বলেন, এর কারণ ভারত কাশ্মীর প্রশ্নে ইতঃপূর্বে এক দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

তৎকালীন পাক পররাষ্ট্র সচিব সুলতান হোসেন খান তার 'মেমোরিজ অ্যান্ড রিফ্লেকশনস' (১৯৯৭) বইয়ে লিখেছেন, নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক নিয়ে আজ প্রত্যুষে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড দেখা করেন। কিন্তু তিনি বারবার ঘড়ি দেখছিলেন। আমি জানতে চাইলে বলেন, 'দ্রুত ফিরতে হবে। আমাদের এয়ার এটাশের নিশ্চিত ধারণা, কিছুক্ষণের মধ্যেই ভারত বিমান হামলা শুরু করবে।' দেখলাম তাঁর কথাই সত্য হলো। সাইরেন বাজল। ইয়াহিয়া ও ভুট্টো এদিন আমাকে বোঝালেন, 'নিরাপত্তা পরিষদে কালক্ষেপণেই লাভ। যা খুশি প্রস্তাব পাস হোক, আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য না হলে মানব না। তাই এ উদ্যোগ থেকে দূরে থাকাই ভালো।' এই দুই নেতা তাদের এমন মনোভাব যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রকাশ করেছেন বলে জানা যায় না। লক্ষণীয় হচ্ছে সুলতানের একটি মন্তব্য। তার কথায় সূক্ষ্ম আভাস মেলে যে, ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর কোনো রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছিল অথবা সুলতান অন্তত এমনও বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিলেন। সুলতান লিখেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও চীন কেউ আমাদের কোনো ভরসা দেয়নি যে,

তারা সামরিক সহায়তা দেবে। তাহলে কেন এ দুজন নিরাপত্তা পরিষদ এড়াতে চান? পূর্বের অবস্থা বেগতিক ও পশ্চিম ফ্রন্টে সাফল্যের সম্ভাবনা ক্ষীণ। ইয়াহিয়া তাহলে কোন অজ্ঞাত জিনিসের ভরসা করছেন? '৬৫-র কায়দায় আমরা এখনো ধরাশায়ী হইনি–ইয়াহিয়া খোঁচা দেন আইয়ুব খানকে। তাদের এ মনোভাবে আমি হতাশ হলাম। সুলতান এরপর মন্তব্য করেন, এই উপসংহার অকাট্য যে, হয় তারা বাস্তবতা বুঝতে অপারগ কিংবা তাদের মনে কিছু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে, যা শুধু তারাই জানেন। (পৃষ্ঠা ৩৬৪-৩৬৫) মার্কিন নথিপত্র পর্যালোচনায় সুলতানের এ বক্তব্য সঠিক প্রমাণিত হচ্ছে যে, যুক্তরাষ্ট্র ও চীন কেউ পাকিস্তানকে কোনো কথা দেয়নি। তবে নির্দিষ্ট সামরিক সহায়তা না দিলেও নৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থনের ঘাটতি ছিল না। যেমন চীনের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী চি-পেং ফি আজ বলেন, সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের (রাশিয়া) সমর্থনপুষ্ট হয়েই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত তার আক্রমণ তীব্র করছে। চীন আজ ভারতীয় আক্রমণের নিন্দা করে। এবং পাকিস্তানের প্রতি 'দৃঢ় সমর্থন' দেয়া সংক্রান্ত একটি খবর এপিপি প্রচার করে। জেনারেল অরোরা কলকাতায় সাংবাদিকদের বলেন, ভারতের পূর্ব সীমান্তে চীনা হস্তক্ষেপের আশঙ্কায় তিনি উদ্বেগ বোধ করছেন।

আজ ফারল্যান্ড কিসিঞ্জারকে এক ব্যাক চ্যানেল বার্তায় জানান, 'গতকাল ইয়াহিয়া তার কাছে আকুল আকুতি জানিয়ে বলেছেন, আপনারা যখন সরাসরি আমাদের অস্ত্র দিতে পারছেন না, তখন তৃতীয় কোনো বন্ধু দেশের মাধ্যমে পেতে সাহায্য করুন। আল্লাহর দোহাই, কোনো বাধা সৃষ্টি করবেন না। আমি বলেছি বটে বিষয়টি আপনার নজরে নেব। কিন্তু তাকে এটাও বুঝিয়ে দিলাম যে, 'পাকিস্তানকে মার্কিন অস্ত্র সহায়তা দেয়ার অতীত ইতিহাসের নিরিখে আপনি যা চাইছেন তা পূরণ করা কঠিন।'

নিক্সন ও কিসিঞ্জার এদিন আলাপ করে ঠিক করেন যে, ইরানের শাহকে বলা হবে অস্ত্র দিতে। আমরা তাদের পরে পুষিয়ে দেব। নিক্সন বলেন, এ তথ্য যদি ফাঁস হয় তাহলে আমরা অস্বীকার করব। এদিন এ দুজন এক দীর্ঘ টেলিসংলাপ পাকিস্তানকে সহায়তাদানে নিরাপত্তা পরিষদকে ব্যবহার ও ভারতকে সব রকম সাহায্য বন্ধের মধ্যেই সীমিত রাখেন। কিসিঞ্জার নিক্সনকে আশ্বস্ত করেন যে, রাষ্ট্রদূত বুশ কঠোর বক্তব্য রাখবেন। নিউইয়র্ক টাইমস ও ওয়াশিংটন পোস্টের সম্পাদকীয় অবস্থান সম্পর্কে নিক্সন খোঁজ নেন। কিসিঞ্জার তাকে বলেন, টাইমস এখনো কিছু বলেনি। পোস্টের তাগিদ নিরাপত্তা পরিষদে তুলতে। নিক্সনের প্রশ্ন, তারা কি ভারত বা পাকিস্তান বা উভয়কে দোষারোপ বা অন্য কিছু বলছে। কিসিঞ্জারের উত্তর : তারা ভারসাম্য বজায় রাখছে। সামরিক পদক্ষেপের জন্য তারা ভারতকে দুষছে। আবার উদ্বাস্তুদের দুঃখ-দুর্দশার কথাও বলছে। তবে গোড়াতে ঝোঁক ছিল ভারতের বিপক্ষে। কিসিঞ্জার আরো বলেন, মি. প্রেসিডেন্ট, পাকিস্তান কিন্তু আমাদের সব প্রস্তাবই কবুল করেছে। আমি ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে বললাম এক বছরের মধ্যে রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করতে আমরা একটি পূর্ণ কর্মসূচি একসঙ্গে প্রণয়ন করতে পারি।

যদি তারা... আসলে ভারতকে সাহায্য বন্ধ করে দিলে দেখা যাবে তাদের দৌড়। তাদের উন্নয়নে রাশানরা নিশ্চয় ৭০০ মিলিয়ন ডলার দেবে না।

নিক্সন : আমাদের একটা কঠিন খেলা খেলা উচিত। আমি মনে করি একটা আগ্রাসী দেশকে অর্থ সহায়তা দেয়া মার্কিন জনগণ সমর্থন করবে না।

কিসিঞ্জার : ভাবুন তো, বিষয়টি কত খারাপ। ওরা আমাদের টাকায় জাতিসংঘে আমাদেরই নাস্তানাবুদ করছে। আচ্ছা, বলুন তো এই বেজন্মারা (ভারতীয়রা) কখনো আমাদের সমর্থন করেছে?

নিক্সন : কখনো নয়।

কিসিঞ্জার : তারা যদি রাশিয়ার তাঁবেদারই হবে, তাহলে রাশানদেরই উচিত বছরে এক বিলিয়ন ডলার তাদের পেছনে খরচ করা। আমরা বাধা দেব না।

নিক্সন : আমরা ভারতকে ১০ বিলিয়ন ডলারের সহায়তা দিয়েছি। এখন যুদ্ধ বন্ধ না করা পর্যন্ত সব সাহায্য বন্ধ করে দেব।

এদিন ওয়াশিংটন স্পেশাল গ্রুপের ২৮ মিনিটের বৈঠকে জাতিসংঘে মার্কিন অবস্থান সম্পর্কে কৌশল নির্ধারণ করা হয়। বলা হয়, আমরা সাধারণভাবে রাজনৈতিক সমঝোতার কথা বলব। কিন্তু মুজিবের মুক্তির বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো বাক্যের অন্তর্ভুক্তিতে রাজি হব না। এটা ছিল কিসিঞ্জারের মন্ত্রণা। বৈঠকে তিনি প্রশ্ন করেন, পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানিরা আর কতক্ষণ টিকবে। অ্যাডমিরাল জুম ওয়াল্ট বলেন, আর বেশি দিন নয়। তাদের হাতে এক বা দুই সপ্তাহের রসদ রয়েছে। ভারত কিছু জায়গা দখল করতে পারে, কিন্তু পুরোটা নয়। আর সোভিয়েতরা সম্ভবত বিসাকের নৌঘাঁটি স্থায়ীভাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে ভারতকে প্রদত্ত সাহায্যের প্রতিশ্রুতির পরিবর্তন ঘটাবে। এদিন দুপুর সোয়া ১২টায় ফ্লোরিডায় অবস্থানরত নিক্সনের সঙ্গে ওয়াশিংটন থেকে ফের কথা বলেন কিসিঞ্জার। কিসিঞ্জার বলেন, নিরাপত্তা পরিষদে ভারতীয় ও সোভিয়েতরা বিলম্ব ঘটাচ্ছে। যাতে প্রস্তাব পাস না হয়। কিন্তু এই আলোচনাতেও ভারতকে ঘায়েল করতে কিসিঞ্জার সাহায্য বন্ধেরই পরামর্শ দেন। কিসিঞ্জার আরো বলেন, বাঙালিরা যদি মনে করে থাকে পাকিস্তান নিষ্ঠুর, তাহলে তারা যেন ভারতীয় খবরদারির জন্য অপেক্ষমাণ থাকে। ভারত বাঙালি মুসলমানদের বর্তমানের তুলনায় অধিকতর সংকীর্ণ বৃত্তে ঠেলে দেবে। আর এসব কারণেই ভারত ছয় মাসের মধ্যে আহতের মতো দৌড়াবে না।

আজ থেকেই পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধ চিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স আইসল্যান্ড সফর স্থগিত রাখেন। কোসিগিনও তার বিদেশ সফরে পরিবর্তন ঘটান। তিনি আজ কোপেনহেগেনে বলেন, একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ থেকে দুই দেশকে বিরত রাখতে তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন। যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট টিটো ইন্দিরা ও ইয়াহিয়ার কাছে দুটো জরুরি তারবার্তা পাঠান। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাডওয়ার্ড হিথ উভয় দেশের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখেন।

সোভিয়েত দূতের বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী

৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১। ওয়াশিংটন সময় বিকেল ৪টা। স্থান হোয়াইট হাউসের ম্যাপরুম। ড. হেনরি কিসিঞ্জার ও যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত সোভিয়েত মিনিস্টার কাউন্সিলর ইউরি এম ভরনস্তব মুখোমুখি। কিসিঞ্জারই বৈঠকের উদ্যোক্তা। 'আমি ভরনস্তবকে বললাম, প্রেসিডেন্ট আমাকে জানিয়েছেন, মি. ব্রেজনেভকে তিনি কাল একটি চিঠি দেবেন। কিন্তু বিষয়টি এতই জরুরি যে, তিনি এর বিষয়বস্তু মৌখিকভাবে আজই আমাকে জানিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। মূল কথা হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট এটা বুঝতে অপারগ যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় আগ্রাসনকে উৎসাহিত করে আবার কোন মুখে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বৃহত্তর সম্পর্ক রক্ষার ইচ্ছা প্রকাশ করছে। সোভিয়েত মধ্যপ্রাচ্যের জন্য নিরাপত্তা রক্ষাকবচ এবং মিসরের শার্ম আল-শেখে নিরাপত্তা পরিষদের উপস্থিতি আশা করে। তাহলে কোন যুক্তিতে তারা একই সময়ে নিরাপত্তা পরিষদকে নপুংসকে পরিণত করতে বেপরোয়া।

এর আগে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের লেখা চিঠির বরাতে কিসিঞ্জার বলেন, তিনি তো রাজনৈতিক সমঝোতা প্রশ্নে বিরাট গুরুত্বারোপ করেছিলেন। এ ব্যাপারে আপনাদের সর্বশেষ মনোভাব কী। যুদ্ধবিরতি ও সেনা প্রত্যাহার প্রস্তাব কার্যকর হলেই যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক সমঝোতা প্রশ্নে সোভিয়েতের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করবে। কিসিঞ্জার রাজনৈতিক সমঝোতা বলতে পূর্ববাংলার বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসনকেই যে বুঝিয়েছেন, তাও তিনি গোপন রাখেননি।

কিন্তু এ দিন সুনির্দিষ্টভাবে বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী করেন সোভিয়েত দূত। তিনি বলেন, 'ইন এ উইক দি হোল ম্যাটার উইল বি ওভার' অর্থাৎ এক সপ্তাহে পুরো বিষয়ের পরিসমাপ্তি ঘটবে। জবাবে কিসিঞ্জার যে মন্তব্য করেন, তার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য রয়েছে কি না তা ভাবনা উদ্রেকের জন্য যথেষ্ট মনে হতে পারে। এ সময়ে তার যে মন্তব্য তা পরে নিক্সনও পুনর্ব্যক্ত করেন। কিসিঞ্জার বলেন, 'এক সপ্তাহে এর শেষ হবে না। এটা নির্ভর করছে কীভাবে ঘটনাবলির পরিণতি ঘটে তার ওপর।' জবাবে ভরনস্তব : 'তিনি এ কথা অনতিবিলম্বে মস্কোকে জানিয়ে দেবেন।'

এই বৈঠকের পরপরই কিসিঞ্জার টেলিফোনে ভরনস্তবকে জানিয়ে দেন, প্রেসিডেন্ট নিক্সন দক্ষিণ এশিয়ার সংকটকে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত সম্পর্কের এক বিভাজক রেখা হিসেবে দেখছেন। কিসিঞ্জার বলেন, আমি এইমাত্রই প্রেসিডেন্টকে আপনার সঙ্গে

আলোচনার বিষয় অবহিত করেছি। এবং প্রেসিডেন্ট মস্কোর কাছে এটা স্পষ্ট করেছেন যে, 'এক সপ্তাহ বা অনুরূপ সময়ে এটা শেষ হতে পারে। কিন্তু বর্তমানের ধারা (বাংলাদেশের স্বাধীনতা) অব্যাহত থাকলে, আমাদের দিক থেকে এর কিন্তু অবসান ঘটবে না।' (টেলিফোন সংলাপের ট্রান্সক্রিপশন, ডিসেম্বর ৫, বিকেল ৪টা ৫৫ মিনিট, লাইব্রেরি অব কংগ্রেস, পাণ্ডুলিপি বিভাগ, কিসিঞ্জার পেপার্স, বক্স ৩৭০)। কিসিঞ্জার তার স্মৃতিকথা 'হোয়াইট হাউস ইয়ার্সে' (পৃষ্ঠা- ৯০০) লিখেছেন, একাত্তরের ওই ঘটনাবহুল পর্বের বেশ কিছুটা সময় তৎকালীন সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত আনাতলি দবরিনিন মস্কোতে ছিলেন। আর সেই সুবাদেই ভরনস্তবের সঙ্গে তার সংলাপ চলে। ভরনস্তব যে কোনো বার্তা গ্রহণ ও তা হস্তান্তরে এখতিয়ার প্রাপ্ত ছিলেন। কিন্তু সমঝোতার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন না।

ভরনস্তব ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেলের মর্যাদায় কমনওয়েলথ অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস সিআইএসের জন্য বিশেষ দূত নিযুক্ত হন। তিনি এর আগে যুক্তরাষ্ট্রে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত (১৯৯০-৯৪), উপ-প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদায় জাতিসংঘে রাশিয়ার স্থায়ী প্রতিনিধি (১৯৮৬-৯০) ও '৯১-তে রুশ প্রেসিডেন্টের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৮-১৯৮৩ সালে তিনি ছিলেন ভারতে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত।

এদিন কিসিঞ্জার ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্সের টেলিফোন সংলাপে এটা স্পষ্ট হয় যে, বাংলাদেশ সংকটে চীন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে দূরে থাকতে চাইছে। উদ্বিগ্ন কিসিঞ্জারের মন্তব্য : গতকাল দুপুরে একটি ঘটনা ঘটে গেছে। আমরা কিছুদিন আগে চীনাদের বলেছিলাম, নিউইয়র্কে আমাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হোক। তারা এখন বলছে, এটা তারা চায় না। রজার্স কিসিঞ্জারকে ধারণা দেন, পূর্ব ও পশ্চিম ফ্রন্টে যুদ্ধ পরিস্থিতির যে বিবরণ গণমাধ্যমে ছাপা হচ্ছে তা কিছুটা হলেও অতিরঞ্জিত। রজার্স গতকাল নিরাপত্তা পরিষদে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তবে তার মনে প্রশ্ন, আমরা এখন কী করব? দীর্ঘ মেয়াদে আমরা কি সর্বাত্মকভাবে মোকাবিলা বা অবিকল চীনের অবস্থান নিতে চাই? নাকি এই দুই অবস্থার মাঝামাঝি থাকব? এ মুহূর্তে আমরা মনে হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছি। কিসিঞ্জার বলেন, আমাদের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে বলতে গেলে চীনের দিকেই দুই-তৃতীয়াংশ এগিয়ে আছি বলাই ভালো। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, একটি দেশ ভেঙে দিতে সোভিয়েত-ভারতীয়দের নগ্ন খেলার আমরা প্রত্যক্ষদর্শী। লক্ষণীয়, রজার্স কিসিঞ্জারকে বোঝাতে চান যে, প্রেসিডেন্টের উচিত হবে সতর্কতার সঙ্গে এখন থেকে প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলা। কারণ এটা এমন এক ইস্যু, যা চলতে থাকলে একটি অধিকতর শান্তিপূর্ণ বিশ্বে আমাদের মর্যাদা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আমি মনে করি প্রেসিডেন্টের এখন সম্পৃক্ত হওয়া উচিত। নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনায় আমাদের ভরসা রাখতে হবে। কিসিঞ্জার তার এই যুক্তি নাকচ করে দেন। বলেন, প্রশ্নই আসে

না। তার যুক্তি, পাকিস্তান দুই টুকরো হলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্যান্য ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া পড়বে। রজার্স তাকে সতর্কতার সুরে বলেন, আমি আপনার এ কথা চ্যালেঞ্জ করছি না, তবে আমাদের কিন্তু অস্থিরতার সঙ্গে কিছু করা ঠিক হবে না। রজার্সের ইঙ্গিতটি কিসিঞ্জার ঠিকই বুঝতে পারেন। বলেন, এখনো পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট না ভেবেচিন্তে তেমন কোনো পদক্ষেপ কিন্তু নেননি।

নিক্সন ও কিসিঞ্জারের মধ্যকার এক টেলিসংলাপে এই ইঙ্গিত স্পষ্ট যে, *নিউইয়র্ক টাইমস* ও *ওয়াশিংটন পোস্টের* প্রথম পাতায় বাংলাদেশ পরিস্থিতির যে বয়ান আজ ছাপা হয় তাতে স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রভাব ছিল। কিসিঞ্জার ও নিক্সন দুজনেই সন্তোষ প্রকাশ করেন। কিসিঞ্জার নিক্সনকে বলেন, এই কভারেজে বৈরিতা ছড়িয়ে পড়ার জন্য ভারতকেই বেশি দায়ী করা হয়েছে। এবং তারা এ পর্যন্ত যেসব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে তার একটা তালিকাও ছাপা হয়েছে। উচ্ছ্বসিত কিসিঞ্জার বলেন, মি. প্রেসিডেন্ট এটা ঠিক তেমনই, যেমনটা আপনি দেখতে চেয়েছিলেন।

নিরাপত্তা পরিষদে আনা মার্কিন রেজুলেশনে যুদ্ধবিরতি ও উভয়পক্ষের সেনা প্রত্যাহারের কথা উল্লেখ করে কিসিঞ্জার নিক্সনকে জানান, রাশানদের প্রস্তাবে পাকিস্তানের কাঁধে দোষ চাপানো হয়েছে। আহ্বান জানানো হয়েছে একটি রাজনৈতিক সমঝোতায়। ১১-২ ভোটে প্রস্তাবের নিষ্পত্তি ঘটেছে। ভেটো দিয়েছে রাশিয়া। রুশ প্রস্তাবে তারা ছাড়া ভোট দিয়েছে শুধু পোল্যান্ড। ব্রিটেন ও ফ্রান্স বিরত থাকে। চীন ভোটে অংশ নেয়নি। কিসিঞ্জার ব্রিটেনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বলেন, বড় ভুল হয়েছে। কমোন মার্কেটে ওদের ঢুকতে দেয়া উচিত হয়নি।

আজ সকালে সোভিয়েত বার্তা সংস্থা তাসের মাধ্যমে রাশানরা কার্যত সম্ভাব্য চীনা হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। দুই নেতা একমত হন যে, 'রুশ-ভারতের ক্ষমতার খেলায় চীন এবং কিছুটা আমরা অবমাননার শিকার হচ্ছি'। কিসিঞ্জার নিক্সনের কাছে রজার্সের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেন। বলেন, স্টেট ডিপার্টমেন্ট সর্বদাই মুজিবের মুক্তির পক্ষে। আর এটা কার্যত রুশ অবস্থান। এ দিন দুই নেতার আলোচনায় সন্দেহাতীতভাবে স্টেট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে নিক্সন ও কিসিঞ্জারের মতপার্থক্য ফুটে ওঠে। যেমন নিক্সন জানতে চান, তারা কি এখনো মুজিব ইস্যু আঁকড়ে আছে? তারা কী চায়? আমাদের কী করা উচিত বলে তারা মনে করে? কিসিঞ্জার নিশ্চিত করেন, তারা আর কোনো সুপারিশই দিতে চাইছে না। তারা চাইছে আমরা যেন আমাদের অবস্থান রিভিউ করি। এবং আমাদের তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। কিসিঞ্জার নিজেদের অবস্থানের অসহায়ত্ব প্রকাশ করেন। 'আমরা আসলে ধরা পড়ে গেছি। আমরা হয়তো আরো কঠোর হতে পারতাম। কিন্তু আমাদের কোনো অভ্যন্তরীণ অবস্থান নেই। সে কারণে আমরা যা কিছুই বলেছি ও করেছি, কাজের কাজ কিছু হয়নি। শুধু বিড়ম্বনাই বেড়েছে। আর পাকিস্তানের বিভক্তি ত্বরান্বিত হয়েছে।'

কিসিঞ্জারের এ বক্তব্যের সঙ্গে নিক্সন একমত হন। কিসিঞ্জারের কথায় এটাও

পরিষ্কার হয় যে, পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন তাদের প্রেসটিজ ইস্যু হয়ে উঠেছিল। 'যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মিত্ররা পর্যবেক্ষণ করছেন। তারা দেখছেন, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে তারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হচ্ছেন। আমি বুঝতে পারি না, ভারতের দিকে এখন ঝুঁকে পড়ে এ অবস্থা থেকে কীভাবে আমাদের পরিত্রাণ মিলতে পারে। আমি স্বীকার করছি, আমাদের এখন ভেঙে পড়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আমরা সোভিয়েতদের শ্রদ্ধা হারাব, চীনও আমাদের অবজ্ঞা করবে, অন্যান্য দেশও যা বোঝার বুঝে নেবে।

বাংলাদেশের ক্ষতিপূরণ কাশ্মীর!

আজ ৬ ডিসেম্বর। ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। সম্প্রতি প্রকাশিত মার্কিন নথিপত্র অনুযায়ী এ ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় প্রেসিডেন্ট নিক্সন ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সংকল্প ব্যক্ত করেন। হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে সন্ধ্যা সোয়া ৬টায় নিক্সন ও কিসিঞ্জার একান্তে কথা বলেন। নিক্সনের আক্ষেপ গত নভেম্বরে ইন্দিরা যখন ওয়াশিংটনে এলেন, তখন তিনি কেন তার জন্য প্রস্তুত ব্রিফিংয়ের বাইরে কঠোর ভাষায় দুই কথা শুনিয়ে দেননি। ইন্দিরা যাতে তার সামরিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কোনো কিছু অজুহাত (অভ্যর্থনায় ত্রুটিজনিত) হিসেবে ব্যবহার করতে না পারেন, সেজন্য স্টেট ডিপার্টমেন্ট নিয়েছিল বাড়তি সতর্কতা। নিক্সনের মন্তব্য : 'এই মহিলা আমাদের শুষে নিয়েছে। কিন্তু তাকে এর মাশুল দিতে হবে। তিনি এর মাশুল দিতে যাচ্ছেন। আমি এখন এটা সাহায্য বন্ধের দিক থেকে বলছি। আমি কিন্তু এটা...'। এই পর্যায়ে নিক্সন ও কিসিঞ্জার উভয়ে একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। নিক্সনের বাক্য অসম্পূর্ণ থাকে। কিসিঞ্জার মত দেন, ডেমোক্রেটিক পার্টি তাদের প্রচারণায় ভারতকে ইস্যু করবে। নিক্সন : তারা সম্ভবত ভারতকে চিরকালের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের হাতছাড়া হওয়ার জন্য আমাদের দুষবে। কিন্তু ভারতকে চিরকালের জন্য হারালে, কার কী তেমন এসে যাবে। কিসিঞ্জার নিক্সনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বলেন, 'চুলোয় যাক। আমরা যদি কমিউনিস্ট চীনের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করি, তাহলে ভারতকে এখন থেকে এক বা দুই বছর, যখনই হোক না কেন, পৃষ্ঠদেশ দেখানো যাবেই।

লক্ষণীয়, ইসলামাবাদে চীনা রাষ্ট্রদূত পাকিস্তানের পররাষ্ট্রসচিব সুলতান হোসেন খানকে সামরিক হস্তক্ষেপে চীনের অপারগতা জানিয়ে দেয়ার পটভূমিতে নিক্সন বলছেন, আমি নিশ্চিত যে, চীন যদি তার সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করে, ভারতীয়রা তাহলে দারুণভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হবে। কিসিঞ্জার এ ক্ষেত্রে প্রতিকূল আবহাওয়ার কথা বললে নিক্সন বলেন, কোরীয় যুদ্ধের সময় দারুণ শীতেও চীনা সৈন্যরা কিন্তু ইয়ালু নদী অতিক্রম করেছে। এদিন কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে বেলা দেড়টা থেকে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিসিঞ্জার বলেন, কারো কারো ধারণা ভারতীয়রা সংযম দেখিয়েছে। কিন্তু এখন এটা পরিষ্কার যে, তারা তাদের সাধ্যমতো অগ্রসর হতে দেরি করেনি। বর্ষাকাল শেষ। চীন সীমান্তের গিরিপথ তুষারে

ঢাকা। বাংলাদেশের গেরিলারা এখন প্রশিক্ষিত। এবং ভারতীয়রা তাদের সৈন্য মোতায়েন নিশ্চিত করেছে। ইন্দিরার বিদেশ সফর শুরুর সঙ্গে এই প্রক্রিয়া চূড়ান্ত রূপ নেয়। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স, যার ভূমিকাকে নিক্সন ও কিসিঞ্জার 'ভারতঘেঁষা' হিসেবেই প্রতিপন্ন করেছেন, তিনি এদিনের বৈঠকে বলেন, এই সংঘাত কিছু সময় আগে নেয়া ভারতীয়দের সুচিন্তিত পরিকল্পনার অনিবার্য ফল। এদিনের আলোচনায় দক্ষিণ এশীয় সংকটের ঐতিহাসিক ভ্রান্তি প্রাধান্য পায়।

নিক্সন : ভারতকে আমরা ১০ বিলিয়ন ডলার সহায়তা দিয়েছি। কিন্তু তাদের ওপর আমাদের কোনো প্রভাব নেই। বরং এটা বলা চলে যে, পাকিস্তানকে সামরিক সহায়তা বন্ধ করে দিয়ে আমরা ভারসাম্য বিনষ্ট করেছি। এভাবে ভারতকে হামলা চালাতে আমরাই উৎসাহিত করেছি। এখন আমরা দেখছি পশ্চিম পাকিস্তানিরা ভারতীয়দের আক্রমণ করছে। এখন এই পদক্ষেপের জন্য তাদের অভিযুক্ত করার অর্থ হচ্ছে রাশিয়া আক্রমণের জন্য ফিনল্যান্ডকে দোষী করা।

উপ-প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্যাকার্ড এ সময় বলেন, আমরা যদি সামরিক ভারসাম্য রক্ষা করতাম, তাহলে শান্তির জন্য তা ভালো হতো।

নিক্সন : মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। আজ সকালে সিনেটর ম্যান্সফিল্ডকে আমি বলেছি, যুদ্ধের ফলাফলে যদি ভারসাম্য বিনষ্ট হয়, তাহলে দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন নীতি ব্যর্থ হবে।

কিসিঞ্জার : এটা আসলে গত সাত বছরে আমাদের অনুসৃত নীতির ব্যর্থতার ফল।

নিক্সন : 'আইয়ুব খানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াদা বরখেলাপ থেকেই আসলে পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের দূরত্বের সূত্রপাত।... আইজেনহাওয়ারের আমলে ওয়াশিংটন-পিণ্ডি ভারসাম্য বজায় ছিল। কিন্তু চীনাদের সঙ্গে তারা খেলতে গিয়ে এটা নষ্ট হয়।'

এদিন মার্কিন নীতিনির্ধারকরা আলোচনা করেন যে, হারানো পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধারে কাশ্মীর করতলগত করা হতে পারে তুরুপের তাস। নিক্সনের মন্তব্য, ভারত বহুকাল ধরে পাকিস্তানকে নাস্তানাবুদ করতে চেয়েছে। তবে তাদের স্বার্থ পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে কাশ্মীরই অধিক সম্পৃক্ত। এদিন বেলা ৯টা ৩৭ থেকে ১০টা ৪০ পর্যন্ত প্রতিরক্ষামন্ত্রী লেয়ার্ডের সভাপতিত্বে সশস্ত্রবাহিনীর নীতি পর্ষদের বৈঠক হয়। জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ড উল্লেখ করেন, 'পাকিস্তানিরা মনে করেছে, ভারতের কাছে পূর্ব পাকিস্তান হারানোর ক্ষতিপূরণ হিসেবে কাশ্মীর করায়ত্ত করা যথেষ্ট বলেই গণ্য হবে। লক্ষণীয়, এ তথ্যটি তিনি প্রথমে যে সূত্রের বরাতে উল্লেখ করেন তা গোপন রাখা হয়েছে। অ্যাডমিরাল জুমওয়াল্ট মত দেন, 'কাশ্মীর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর সে কারণেই কাশ্মীর কেড়ে নেয়া তাৎপর্য বহন করে। দেশভাগের সময় মহারাজা হিন্দু ছিলেন বলে এটি ভারতের ভাগে পড়ে।' জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ড বলেন, সাক্ষ্য-প্রমাণ কিন্তু এটাই নির্দেশ করছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে চাপ কমাতেই পাকিস্তান ৩

ডিসেম্বরে পশ্চিম ফ্রন্টে প্রিএম্পটিভ হামলা করে। কিন্তু প্রতিরক্ষামন্ত্রী গোয়েন্দা রিপোর্টের বরাতে পাকিস্তানের কাশ্মীর দখলের উদ্দেশ্যই সঠিক বলে মত দেন।

গত মে মাসে প্রকাশিত আরেকটি নথি হচ্ছে ওয়াশিংটন স্পেশাল গ্রুপের বৈঠকের ১২ পৃষ্ঠার বিবরণী। এই বৈঠকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু কথাবার্তা হয়। যেমন কিসিঞ্জার প্রশ্ন রাখেন, ভারত কি বাংলাদেশকে একটি সেনাবাহিনী ও স্বতন্ত্র পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণে অনুমতি দেবে? মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা জোসেফ সিসকো বলেন, আমি এমন আশঙ্কা উড়িয়ে দেব না। ভারতীয় সৈন্যরা বাংলাদেশে তাদের উপস্থিতি দীর্ঘ করতে পারে। ভ্যান হোলেন এ সময় মত দেন, দুই বা তিন সপ্তাহ পরই তারা একটি দখলদার হিন্দু সেনাবাহিনী হিসেবে চিত্রিত হতে পারে।

এ বৈঠক থেকেই সম্ভবত বহুল আলোচিত 'বটমলেস বাসকেট' কথাটির উৎপত্তি। বাংলাদেশে একটি দুর্ভিক্ষ আসন্ন কি না, এ প্রসঙ্গে স্টেট ডিপার্টমেন্টের অ্যালেক্স জনসন প্রথমে বলেন, তারা হবে একটি আন্তর্জাতিক বাস্কেট কেস। জবাবে কিসিঞ্জার বলেন, কিন্তু তাই বলে নিশ্চয় আমাদের 'বাসকেট কেস' নয়। পরবর্তীকালে কিসিঞ্জারের এক প্রকাশ্য মন্তব্যের সূত্রে 'বাস্কেট কেস' কথাটি বিকৃতভাবে 'বটমলেস বাস্কেট' হয়ে পরিচিতি পায়।

চীনা হুমকি ছিল কল্পনা?

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রসচিব সুলতান এম খান ৫-৭ ডিসেম্বরের ঘটনাবলি সম্পর্কে তার ডায়েরিতে লিখেন, পশ্চিম পাকিস্তান ফ্রন্টে পরিচালিত হামলা থেকে সুফল মেলেনি। চরমপন্থি নীতিনির্ধারকরা পড়েছেন মহা ফাঁপড়ে। তারা বিভ্রান্ত ও বিষণ্ন। প্রশ্ন তুলছেন, এখন কী হবে। এম এম আহমেদ, যিনি ইমার্জেন্সি কমিটির অন্যতম সদস্য, বললেন, জাতি সামর্থ্যের অভাব বুঝবে। কিন্তু তারা কখনোই উদ্যোগহীনতা ক্ষমা করবে না। এমন অনেকেরই মত, পরাজয় ও অন্যরূপ পরিণতি যা-ই ঘটুক না কেন, পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্ত জুড়ে শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হবে। এর সপক্ষে একটি বৈঠকও হলো। প্রেসিডেন্ট বললেন, মাঠ পর্যায়ের সামরিক অধিনায়করাই উপযুক্ত কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত। এক অপারেশনে সবকিছু বাজি ধরার কথা যারা বলে, তারা মাথামোটা ও গর্দভ।

সুলতানের বর্ণনায় চীনা হস্তক্ষেপের ব্যাপারে ইয়াহিয়ার বক্তব্য অবাক করার মতো। তবে কিসিঞ্জার ইতঃপূর্বে নিক্সনকে যে কথা লিখিতভাবে অবহিত করেছিলেন, তার সঙ্গে এ ভাষ্যের একটা মিল রয়েছে। কিসিঞ্জার নিক্সনকে জানান, চীন বলেছে পাকিস্তানই মনে করে চীনা সাহায্যের দরকার নেই। সুলতান খানের গ্রন্থে (মেমোরিজ অ্যান্ড রিফ্লেকশনস, দি লন্ডন সেন্টার ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, পৃষ্ঠা ৩৬৬-৩৬৭) লেখা আছে, ইয়াহিয়া বললেন, পাকিস্তান চীন ও রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হোক তা তিনি চাননি। *নিউজউইক*-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারেও তিনি বলেন, প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ ছাড়া আর সব উপায়ে চীন পাকিস্তানকে সাহায্য করবে এবং তারা তা করছেও। চীনা অবস্থান সম্পর্কে ভারতও মোটামুটি নিশ্চিত ছিল।

এ দিনে প্রেরিত সিআইএর এক তারবার্তা অনুযায়ী, ইন্দিরা বলেন, পাকিস্তানের প্রতি চীনের পক্ষপাত সন্দেহাতীত থাকলেও তিনি আশা করেন যে, চীন কোনো সংঘাতে নিজকে জড়াবে না। তবে সোভিয়েত ইন্দিরাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যে, চীন লাদাখ ও চুম্ব এলাকায় কার্যকর হস্তক্ষেপে সক্ষম। এবং তারা যদি তা করে, তাহলে রাশিয়ার প্রতিশ্রুতি হচ্ছে, তারা উপযুক্ত পাল্টা ব্যবস্থা নেবেই। লক্ষণীয়, ইন্দিরার এই মন্তব্য সিআইএ যে সূত্রে পেয়েছে, তা গত মে মাসেও যথারীতি গোপনই রাখা হয়েছে। ইন্দিরা সম্ভবত তার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের ব্রিফিং দিয়েছিলেন এবং সেই সূত্রেই সিআইএর কাছে খবর আসে। ওই বার্তায় বলা হয়, ইন্দিরা বলেন, এ মুহূর্তে

ভারতের তিনটি লক্ষ্য। যথাসম্ভব দ্রুত বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন, শুধুই কৌশলগত কারণে পাকিস্তান অধিকৃত আজাদ কাশ্মীরের দক্ষিণ অংশ সাময়িকভাবে ভারতভুক্তকরণ এবং চূড়ান্ত হচ্ছে পাকিস্তানি সামরিক শক্তি পুরোপুরি ধূলিসাৎ করে দেয়া। ভবিষ্যতে তারা যাতে ভারতকে আর চ্যালেঞ্জ করতে না পারে।

সুলতান লিখেছেন, পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনাটা সত্যই সামরিক দিক থেকে কতটা কার্যকর কিংবা 'নুরা কুস্তি' (একটি ভুয়া যুদ্ধ) ছিল, তা মূল্যায়ন করা যেতে পারে বিশিষ্ট ফরাসি সামরিক বিশ্লেষক জেনারেল বিআফরের মন্তব্যে। ন্যাটো বাহিনীর এই সাবেক ডেপুটি কমান্ডার ইন চিফকে আমরা আমন্ত্রণ জানাই। ৭ ডিসেম্বরে তিনি পাকিস্তানে পৌঁছে লাহোর থেকে চুম্ব পরিদর্শন করেন। তিনি সৈন্যদের শৃঙ্খলায় সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, মুশকিল হচ্ছে, তারা তো সবাই ব্রিটিশ ধাঁচে অন্ধ। এমনকি ব্রিটিশদের চেয়েও তারা বেশি ব্রিটিশ। তিনি বললেন, পাকিস্তানের মতো উন্নয়নশীল দেশের মিলিশিয়া বাহিনী থাকার বিকল্প নেই। স্থায়ী সেনাবাহিনী থাকবে একটি নিউক্লিয়াস হিসেবে, কিন্তু শুধু তারাই দেশ রক্ষার একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। তিনি সম্প্রতি রাশিয়া সফরকালে এ নিয়ে রুশ জেনারেলদের সঙ্গে কথা বলেছেন। 'রাশিয়ার বিরুদ্ধে চীনের বৃহত্তম শক্তিসাম্য হচ্ছে তার পিপলস মিলিশিয়া। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাঠানদের দমন করে তাদের ভূখণ্ড দখল করতে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ব্যর্থতা এ ক্ষেত্রে বড় নজির।'

সুলতান লিখেছেন, প্রেসিডেন্টের আত্মবিশ্বাস আজও গগনচুম্বী। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ক্রমেই নাজুক হচ্ছিল। সংকট বহুদিন ধরে ঘনীভূত হলেও আমরা যুদ্ধের জন্য ছিলাম সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। ৫ ডিসেম্বর আবিষ্কৃত হয় আমাদের তেলের মজুদ প্রায় নিঃশেষিত। করাচি বন্দর ভারতীয়দের দ্বারা অবরুদ্ধ। আমি যখন প্রেসিডেন্টকে বললাম, ভারতীয়রা যদি এখন করাচিতে ছত্রীসেনা নামায়, তাহলে আমাদের নৌবাহিনীর তেমন কিছু করার থাকবে কি? প্রেসিডেন্ট অসহায় ভঙ্গিতে আমার দিকে হাত তুললেন, 'আমি কী করতে পারি? আমি প্রতিটি স্থান রক্ষায় অপারগ।' অবাক হলাম। দেশের বৃহত্তম বন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ও সর্বাধিনায়ক একি বলছেন! বিমান হামলা থেকে রক্ষা পেতে তড়িঘড়ি ইয়াহিয়া তার বাগানেই একটি বাঙ্কার তৈরি করেন। তার বালির বস্তার ছাদের নিচে আমি দুবার তার সঙ্গে পররাষ্ট্রনীতি-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেছি!

এ দিনে ইয়াহিয়া নিক্সনের কাছে বার্তা প্রেরণের খসড়া নিয়ে আলোচনা করেন সুলতানের সঙ্গে। এই বার্তায় ফুটে ওঠে পূর্ব পাকিস্তানের পতন দরজায়। মার্কিন দলিল থেকে দেখা যাচ্ছে, এই বার্তায় ইয়াহিয়া নিক্সনকে বলেন, পূর্ব পাকিস্তান হাতছাড়া হওয়ার অর্থ হচ্ছে আসাম, বার্মা, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়া অঞ্চল সোভিয়েত কর্তৃত্বে চলে যাওয়া। সুতরাং ভারতকে ঠেকান।

১৯৭১ : আমেরিকার গোপন দলিল

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স আজ ভারতে তাদের দূতাবাসকে গতকাল ওয়াশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ঝায়ের সঙ্গে তার আলোচনার বিবরণ অবহিত করেন। এতে বলা হয়, মুজিব বা তার মনোনীত কোনো প্রতিনিধির সঙ্গে রাজনৈতিক সংলাপের গ্রহণযোগ্যতা ঝা নাকচ করেননি। বলেছেন, এ ক্ষেত্রে ভারতের সাড়া নেতিবাচক নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কে হবেন সেই প্রতিনিধি এবং তা গ্রহণযোগ্যই বা হবে কতটুকু।

নিক্সন-কিসিঞ্জারের 'ড্রেস রিহার্সাল'

আজ ৮ ডিসেম্বর। পাকিস্তানি সৈন্যদের অবস্থা ঢাকার তৎকালীন মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাডের কথায় দড়ির ফাঁস ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। নিক্সন-কিসিঞ্জার নিশ্চিত হন যে, আইন অনুযায়ী পাকিস্তানকে সমরাস্ত্র সরবরাহের পথ বন্ধ। তারা জানলেন, মিত্র পাকিস্তানের নিরাপত্তায় যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কোনো আইনগত রক্ষাকবচ নেই। প্রায় ডজন খানেক চুক্তি, সমঝোতা, প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি খুঁজে পাওয়া গেল বটে। কিন্তু সেখানে কোনো গোপন চুক্তির ইঙ্গিত নেই। সকাল ১১টা ১৩ মিনিট থেকে ১২টা ২ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হলো ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠক। সিদ্ধান্ত হলো সিআইএ পরিস্থিতির আন্তর্জাতিক তাৎপর্য মূল্যায়ন করবে। প্রতিরক্ষা দপ্তর কাশ্মীরে পাকিস্তানের সামরিক সামর্থ্য যাচাই করবে। পররাষ্ট্র দপ্তর পাকিস্তানকে সামরিক সরবরাহের বিকল্পগুলো খতিয়ে দেখবে।

জর্ডানের বাদশা হোসেনের কাছে ইয়াহিয়া অস্ত্র সরবরাহের অনুরোধ জানিয়ে বার্তা পাঠিয়েছিলেন। হোসেন অনুমতি চান যুক্তরাষ্ট্রের। কিন্তু মার্কিন আইন অনুযায়ী এই বিধানই বলবৎ ছিল, যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি যে দেশকে অস্ত্র দিতে অপারগ, সে দেশে তার অস্ত্র তৃতীয় দেশের মাধ্যমেও প্রেরণের সুযোগ রুদ্ধ। সে কারণেই বাদশা হোসেনকে যুক্তরাষ্ট্র অনুমতি দিতে পারেনি। ইরানের শাহের কাছ থেকেও সুখবর পায়নি ওয়াশিংটন। তেহরানে একজন ঊর্ধ্বতন মার্কিন কূটনীতিককে শাহ জানিয়ে দেন, ইন্দো-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তিকে তিনি ভয় পাচ্ছেন। এ কারণেই পাকিস্তানকে অস্ত্র দিয়ে তিনি সোভিয়েতের সঙ্গে যুদ্ধে জড়ানোর ঝুঁকি নিতে নারাজ। তবে শাহ এক বিকল্প প্রস্তাবে বলেন, সে ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র জর্ডানকে তাদের এফ-১০৪ যুদ্ধ বিমান পাঠাতে বলতে পারে। তখন শাহ দুই স্কোয়াড্রন ইরানি বিমান জর্ডানকে দেবে। জর্ডানের যুদ্ধবিমানগুলো আবার সম্ভাব্য ইসরায়েলি হুমকি মোকাবিলায় ছিল ভারসাম্যসূচক। জর্ডান তার যুদ্ধবিমান পাকিস্তানকে দিলে ইসরায়েল সুযোগ নিতে পারে। নিক্সন বললেন, আমরা সম্ভবত ইসরায়েলের কাছ থেকে এ ব্যাপারে একটা অঙ্গীকার আদায় করতে পারি। কিসিঞ্জার একমত হন। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী গোল্ডামায়ারের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলারও পরামর্শ দেন তিনি। বলেন, হেনরি, আপনি তাকে (গোল্ডামায়ার) বলবেন—এটা রুশ চক্রান্ত, তাহলেই কাজে দেবে! কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের আইনে এই বিকল্পও সমর্থন করেনি। নিক্সন ও কিসিঞ্জার এ নিয়ে আজ

কথাও বলেন এটর্নি জেনারেল মিশেলের সঙ্গে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক জনমত বাংলাদেশের যথেষ্ট অনুকূলে থাকায় তারা জাতিসংঘ কিংবা নিরাপত্তা পরিষদকে তাদের নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারেও অক্ষম থাকেন।

বিভিন্ন নথিপত্র থেকে এটা স্পষ্ট যে, এই দুই নেতাই জানতেন, তাদের পক্ষে পাকিস্তানের জন্য 'মুখের কথা' (লিপ সার্ভিস) ছাড়া সামরিকভাবে আর কিছুই করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই সরল সত্য তারা ইয়াহিয়াকে কখনো অবহিত করেছেন বলে জানা যায় না। এমনকি এই সীমাবদ্ধতার কথা তারা নিজেদের একান্ত সংলাপেও কদাচিত উল্লেখ করেন।

নিক্সন ও কিসিঞ্জার আজ দিনভর আলোচনা করেন, রুশ-ভারতকে দমাতে আর কী পদক্ষেপ নেয়া যায়। কিসিঞ্জার আক্ষেপ করেন, গোড়াতেই ভারতকে দারুণভাবে ভয় দেখানো উচিত ছিল। ওই সময় মধ্যপ্রাচ্য সংকট নিরসনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি কিছুটা নির্ভরশীল হতে উৎসাহী ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। দুই দেশের শীর্ষ বৈঠকের একটি দিনক্ষণও ছিল আসন্ন। কিসিঞ্জার চাইলেন এ দুটো ইস্যুতে সোভিয়েতকে চাপে রাখতে। আজ নিক্সনের একটি জিজ্ঞাসা–এখন তাহলে আমরা কী করব? কিসিঞ্জারের উত্তর–আমাদের দুটো বিকল্প। যতদূর সম্ভব পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর হামলা থেকে ভারতকে বিরত রাখতে তাকে ভয় দেখানো। আর দ্বিতীয়ত, রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটা কড়া হুঁশিয়ারি দেয়া। তবে সামরিকভাবে আমাদের এখনো একটা আশা। ভারতকে এটা বোঝানো যে, পরিস্থিতি কিন্তু খারাপের দিকে যাচ্ছে। আর রাশানদের বলা, তোমাদের কিন্তু চড়া মূল্য দিতে হবে। এই বাক্য শেষে কিসিঞ্জারই আবার বলেন, কিন্তু মি. প্রেসিডেন্ট, এতে কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। ছয় বছর ধরে সামরিক ভারসাম্যহীনতা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গড়িয়েছে। এটা রাতারাতি পূরণ করার নয়। প্রেসিডেন্ট জনসন এ জন্য প্রধানত দায়ী। তা ছাড়া আমলাতন্ত্রও কম দায়ী নয়। আমরা তো জানতাম না '৭১-এ যুদ্ধ হবে। কিন্তু দেখুন তো, ইয়াহিয়াকে দেয়া আপনার অস্ত্র সহায়তার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় বছর পার হলো।

দুই নেতার এদিনের সংলাপে পরিষ্কার যে, তারা রাশিয়া ও ভারতকে স্রেফ ভয় দেখানো এবং চীন, জর্ডান ও ইরানকে উৎসাহিত করতেই বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। কিসিঞ্জার স্বীকার করেন, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে হস্তক্ষেপ করার কার্যকর হাতিয়ার নেই। নিক্সন বলেন, আমরা তো চীনা সাহায্য ছাড়া এমন কিছু করতে পারি না। এরপর দুজনেই বুদ্ধি আঁটেন চীনাদের কাছে বার্তা পাঠাতে। চীন যেন সীমান্তে শক্তি বৃদ্ধি করে ভারতকে ভয় দেখাতে সচেষ্ট হয়। তারা দুজনেই বলেন, আমরা যদি ঝুঁকি নিয়ে জর্ডানকে যুদ্ধবিমান পাঠাতে বলি, তাহলে আমরা চীনাদেরও খবরটা দিতে পারি। এবং বলতে পারি, তোমরা যদি সত্যিই পাকিস্তানের জন্য কিছু একটা করতে চাও, তাহলে এখনই উপযুক্ত সময়।

নিক্সন একমত হন : আমরা এটাই করব। কথা শেষ না হতেই কিসিঞ্জার মন্তব্য করেন, 'মি. প্রেসিডেন্ট আমার অবশ্য আপনাকে হুঁশিয়ার করে দেয়া উচিত যে, আমাদের এই ধাপ্পা যদি ধরা পড়ে, তাহলে কিন্তু আমরা বিপদে পড়ব।'

নিক্সন ও কিসিঞ্জার উভয়ে জর্ডানের যুদ্ধবিমান প্রেরণ, চীনের সেনা মোতায়েন ও বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠানোর সম্ভাব্য উদ্যোগকে 'ড্রেস রিহার্সেল' বা যুদ্ধ নাটকের মহড়া হিসেবে বর্ণনা করেছেন। প্রাপ্ত নথিপত্র অনুযায়ী, এ রকমের প্রতারণাপূর্ণ সামরিক কৌশলের অংশ হিসেবে বঙ্গোপসাগরে নৌবহর প্রেরণের ধারণাটি প্রথম এবং আজই কিসিঞ্জারের জবানীতে এসেছে।

পাক অখণ্ডতা রক্ষায় রাশিয়ার ৪ শর্ত

হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ নীরবে আত্মসমর্পণের সানাই বেজে ওঠে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আজ গভর্নর মালিকের কাছে এ মর্মে বার্তা পাঠান যে, আপনাদের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার অনুমতি দিলাম। যে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন তাতেই আমার সম্মতি থাকবে। জেনারেল নিয়াজিকেও আমি সে কথা জানিয়ে দিয়েছি। কিসিঞ্জার নিক্সনকে জানিয়ে দেন, ভারতীয়রা এখন ঢাকা থেকে মাত্র ২২ মাইল দূরে। তাদের শুধু একটি বড় নদী পার হতে হবে।

ইয়াহিয়া আত্মসমর্পণে মনস্থির করার পাশাপাশি রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানে তার সৈন্যদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য তার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কিন্তু তিনি এটা বলেছেন, তার সৈন্যরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়ে যাবে। স্বপক্ষত্যাগের কিছু ঘটনা ঘটেছে তবে তা ব্যাপকভিত্তিক নয়। সেনাশৃঙ্খলাও ভেঙে পড়েনি। দিল্লি সফররত মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী 'ব্যক্তিগতভাবে' এই সুপারিশ রাখেন যে, ভারত পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যসহ পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের রক্ষায় অধিকতর কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তবে সে জন্য পাকিস্তান সরকারকে বাংলাদেশের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। আজ নিক্সনকে দেয়া কিসিঞ্জারের স্মারকে দেখা যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সদস্যদের ঢাকা থেকে নিরাপদে সরিয়ে নিতে জাতিসংঘ মহাসচিব উ থান্ট উভয় পক্ষের কাছে জোরালো আবেদন জানিয়েছেন। বিদেশীদের সরিয়ে নিতে ২৪ ঘণ্টার জন্য যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেন তিনি। ভারত সাড়া দেয়নি। তারা বলেছে, এর আগে একই উদ্দেশ্যে দুটি যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব ভেস্তে যায়। ঢাকায় দুটি 'নিরাপদ নিরপেক্ষ এলাকা' সৃষ্টির প্রস্তাব দিয়েছিল জাতিসংঘ ও রেডক্রস। এই নিরপেক্ষ এলাকায় মার্কিন কূটনীতিকরাও ঠাঁই পাবেন। কারণ বাংলাদেশ দায়িত্বভার গ্রহণের পর তারা কূটনৈতিক অধিকার হারাবেন। উপরন্তু গেরিলাদের কাছ থেকে তারা বৈরী আচরণের আশঙ্কা করছেন। কিসিঞ্জার নিক্সনকে এই তথ্যও দেন যে, যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি অন্যদের, বিশেষ করে ভুট্টোর কাঁধে চাপানোর জন্য ইয়াহিয়া বাঙালি নূরুল আমীনকে প্রধানমন্ত্রী ও ভুট্টোকে উপপ্রধানমন্ত্রী করে বেসামরিক সরকার গঠন করেছেন।

আজ সকাল ১০টা ৯ মিনিট থেকে ১১টা পর্যন্ত চলে ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠক। এতে সিদ্ধান্ত হয়, জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ পূর্ব পাকিস্তান

থেকে আমেরিকানদের সরিয়ে আনতে জরুরিভিত্তিতে একটি কেরিয়ার টাস্কফোর্স (সপ্তম নৌবহর) মোতায়েনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে। দুপুরের মধ্যে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এ ব্যাপারে তাদের মত দেবে। কিসিঞ্জার এই বৈঠকের শুরুতেই মন্তব্য করেন, প্রেসিডেন্ট ভারতের ব্যাখ্যায় আমেরিকান কর্মকর্তাদের দৃশ্যত সম্মতি দেখে অবাক হয়েছেন। ব্যাখ্যাটি হচ্ছে, ভারত তো শুধু দেশের ৬০ শতাংশ বিচ্ছিন্ন করেছে। কিন্তু সে ভূখণ্ড তারা করতলগতও করেনি। এতেই বোঝা যায়, ভারতের পক্ষে মার্কিন কর্মকর্তারা কীভাবে ঝুঁকে আছেন। কিসিঞ্জার স্পষ্ট করেন, ভারত যা বলেছে তা আমাদের অবস্থান নয়। প্রেসিডেন্ট চাইছেন এ প্রসঙ্গে ভারতের মনে কোনো ভুল ধারণা তৈরি না হোক। প্রেসিডেন্ট এটা আজকের মধ্যে শুধরে নিতে বলেছেন। অ্যাডমিরাল মুরার বৈঠকে উল্লেখ করেন, ভারতীয়রা এখন তাদের ডিভিশনগুলো পশ্চিম ফ্রন্টে নিয়ে আসবে। সম্ভবত ছয় ডিভিশনের মধ্যে চারটিই এখন পূর্ব পাকিস্তানে। তাদের পশ্চিম ফ্রন্টে আনতে এক থেকে তিন সপ্তাহ সময় লাগবে। অবশ্য এটা নির্ভর করছে আকাশপথে তারা কতটা সৈন্য আনে তার ওপর। যুদ্ধ যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে ফলাফল কিন্তু পাকিস্তানের জন্য অবশ্যম্ভাবী। এরপর কিসিঞ্জার বলেন, সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানে ভারতীয় আক্রমণ আমাদের প্রতিহত করতে হবে। যদিও পরিণতি হয়তো পূর্ব পাকিস্তানের মতোই ঘটবে। আর ভারতীয়রা তখন খণ্ডিত পাকিস্তানকে পূর্বে ভুটান ও পশ্চিমে নেপালের মতো নিয়ন্ত্রণ করবে।

নিক্সন ও কিসিঞ্জার এদিন দুপুর ১২টা ৪৪ মিনিটে হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে আরেক দফা বৈঠকে বসেন। পাকিস্তান বিভক্তির আশু ফলাফল কী হতে পারে, কিসিঞ্জার তা ব্যাখ্যা করেন প্রেসিডেন্টের কাছে। বলেন, আমাদের এক মিত্রের এই দশা মধ্যপ্রাচ্য, ইরান ও ইন্দোনেশিয়াকে দারুণভাবে বিচলিত করবে। কিন্তু এই পর্যায়ে আমাদের পক্ষে তো আর কোনো ভালো সমঝোতার উপায় নেই। রাশিয়া যদি নিষ্ঠুর উপসংহার টানতে চায়, তাহলে আমরা হেরে যাব। কিসিঞ্জার অবশ্য উল্লেখ করেন যে, ব্রেজনেভ তার চিঠিতে যা উল্লেখ করেছেন, তা মেনে নিলে একটা আপোস হয়তো এখনো সম্ভব। সোভিয়েত শর্ত চারটি : মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুর নিষ্পত্তি, একটি ইউরোপীয় নিরাপত্তা সম্মেলন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ও মস্কো-ওয়াশিংটন একটি শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠান। কিসিঞ্জার একইসঙ্গে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনকে একটি অভিন্ন অবস্থানে ঠেলে দেয়ার বিপদ সম্পর্কেও রাশিয়া সচেতন। সুতরাং 'আমরা একেবারেই সম্পদশূন্য' নই।

দুই নেতাই বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর প্রেরণের নানামুখী সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে মতবিনিময় করেন। পাকিস্তানকে আগ্রাসন থেকে রক্ষায় ওয়াশিংটন-পিন্ডির কোনো গোপন চুক্তি নেই জেনেও কিসিঞ্জার নিক্সনকে পরামর্শ দেন, আমরা এ মুহূর্তে দুটো কাজ করতে পারি। প্রথমত, সংবাদপত্র বা অন্য কোনো উপায়ে রুশদের কাছে এটা ফাঁস করে দেব যে, ভারতের আগ্রাসন থেকে পাকিস্তানকে রক্ষায় কেনেডির সঙ্গে

আইয়ুব খানের গোপন চুক্তি রয়েছে। দ্বিতীয়ত, বঙ্গোপসাগরে আমরা নৌবহর নিয়ে যাব। অজুহাত দেখাব, ঢাকার মার্কিন নাগরিকদের সরিয়ে আনতেই এই উদ্যোগ। নিক্সন বলেন, চীনা দৃষ্টিকোণ থেকে আমি নৌবহর মোতায়েনের পক্ষে। কিন্তু জনমতের কী হবে। টেলিভিশন ও সংবাদপত্র বিষয়টিকে কীভাবে নেবে। আচ্ছা, শুধু আমাদের নাগরিকদের আনতেই কি নৌবহর সেখানে যেতে পারে না? কিসিঞ্জারের স্বগতোক্তি : কিন্তু যুদ্ধবিমানগুলো আমরা কাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করব? আমরা কি নিজেরাই নিজেদের পথ রুদ্ধ করছি? নিক্সন বলেন, তাহলে ওখানে নৌবহর নিয়ে লাভটা কী হবে? কিসিঞ্জারের জবাব, এটা হবে একটা প্রতীকী পদক্ষেপ। লোকে ভাববে এরপর আরো কিছু নিশ্চয় আসবে।

ব্রেজনেভের চিঠিতে অখণ্ড পাকিস্তানের ইঙ্গিত!

আজ ১০ ডিসেম্বর। একাত্তরের এদিন সংক্রান্ত সম্প্রতি প্রকাশিত বিভিন্ন মার্কিন নথিপত্র থেকে এটা স্পষ্ট যে, বৃহৎ শক্তি বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এ পর্যায়ে এসে পূর্ব পাকিস্তানের হাল ছেড়ে দেয় পুরোপুরি। সপ্তম নৌবহর প্রেরণসহ অন্যান্য তৎপরতা দৃশ্যত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রতীয়মান হলেও এসবের চরম লক্ষ্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষা। কিন্তু তাও পাকিস্তানের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার কোনো পবিত্র উদ্দেশ্যে নয়। বিষয়টি ছিল কৌশলগত। সপ্তম নৌবহর যখন বঙ্গোপসাগরে রওনা দেয় তখন পূর্ব পাকিস্তানে আত্মসমর্পণের তোড়জোর শুরু হয়ে গেছে। জাতিসংঘে জেনারেল রাও ফরমান আলীর আত্মসমর্পণের বার্তাও পৌঁছে গেছে। সে কারণে এমনও ধারণা করা যেতে পারে যে, পাকিস্তানের মিত্র মুসলিম ও আরব দেশগুলোও ১০ ডিসেম্বর এসে অস্ত্র পাঠাতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে মূলত পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষায়। নিক্সন ও কিসিঞ্জার ডিসেম্বরের এই লগ্নে বাংলাদেশের বাস্তবতা উপলব্ধি করেন। কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রকাশ্যে পাকিস্তানের অখণ্ডতার সপক্ষে কথা বলেন। এটা ছিল কৌশলগত।

তারা সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী ব্রেজনেভের সঙ্গেও আলোচনা অব্যাহত রাখেন। ভাবেন, যদি তার মনের নাগাল মেলে। 'পশ্চিম পাকিস্তানকে ভারত দখল করে নেবে না'–দিল্লির এই আশ্বাস সম্পর্কে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র ভরসা পাচ্ছিল না।

আজ নিউইয়র্কে কিসিঞ্জার জাতিসংঘে চীনের স্থায়ী প্রতিনিধি হুয়াং হুয়ার সঙ্গে প্রায় ২ ঘণ্টার এক বৈঠকে সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। কিসিঞ্জার তাকে জানান, ৬ ডিসেম্বরে লেখা কিসিঞ্জারের চিঠির জবাব গতকাল সকালেই পাওয়া গেল। 'একটি রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য পাকিস্তান সরকার ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে সংলাপ শুরু হওয়া দরকার।' ব্রেজনেভের এ কথার অর্থ পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখা সাপেক্ষে কি না তা নিয়ে কিসিঞ্জার-হুয়াং হোয়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন। ব্রেজনেভ লিখেছেন, 'সঙ্গতকারণেই এই সমঝোতা শুরু হওয়া উচিত যেখানে তা ভেঙে যায়।' কিসিঞ্জার ব্যাখ্যা দেন, তার মানে হচ্ছে সংলাপের ভিত্তি হবে অবিভক্ত পাকিস্তান। দোভাষী তাং এ সময় একাধিকবার কিসিঞ্জারের কাছ থেকে বিষয়টি বুঝে নেন। কিসিঞ্জার এই চিঠি লাভ করেন ওয়াশিংটনে সোভিয়েত মিনিস্টার কাউন্সিলর ইউরি ভরোনৎসোভের কাছ থেকে। কিসিঞ্জার বলেন, আমি তাকে বললাম, ২৫ মার্চে

পাকিস্তান তো অবিভক্ত ছিল। তিনি আমার সঙ্গে একমত হন। গতকাল আমরা জানলাম, সোভিয়েত কৃষিমন্ত্রী মাৎসকেভিচ ওয়াশিংটনে আসছেন। তিনি ব্রেজনেভের বন্ধু। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে চান। কিসিঞ্জার বলেন, ভরোনৎসোভের সঙ্গে ১৫ মিনিটের আলোচনায় আমি প্রেসিডেন্টের একটি বিবৃতি পড়ে শোনাই। এতে প্রেসিডেন্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে হামলা চালানো হলে রুশ-মার্কিন বিরোধ অনিবার্য হয়ে পড়বে। আজ ব্রেজনেভের কাছে প্রেরিত জবাবে বলা হয়েছে, 'পূর্ব পাকিস্তানের পাক সামরিক অধিনায়ক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছেন। এখন যদি পশ্চিম পাকিস্তানেও যুদ্ধবিরতি কার্যকর না হয়, তহালে আমরা ধরে নেব, ভারতীয় আগ্রাসন এখন সমগ্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে। এবং তা এমন এক দেশের বিরুদ্ধে, যাদের নিরাপত্তা দিতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।'

নিক্সনের এই চিঠি বিশ্লেষণে এমন ইঙ্গিত মেলে যে, পূর্ব পাকিস্তান নয়, এখন ভারত পশ্চিমের দিকে হাত বাড়ানোর ফলে তারা বেশি শঙ্কিত। লক্ষণীয়, এর আগে যুক্তরাষ্ট্র চুক্তিগত কোনো বাধ্যবাধকতার কথা এভাবে রুশ নেতাদের কাছে উল্লেখ করেননি।

আমরা জর্ডান, ইরান, সৌদি আরব ও তুরস্ককে বলেছি ভিন্ন চ্যানেলে পাকিস্তানকে অস্ত্র দিতে। তাদের বলেছি, তোমরা অস্ত্র দিলে আমাদের কিন্তু প্রতিবাদ করতে হবে। কিন্তু এটা হবে লোক দেখানো। আমরা কিন্তু উঁচু গলায় সোচ্চার হব না। আজ জর্ডানের চারটি বিমান রওনা দেবে। সপ্তাহান্তে আরো ২২টি যাবে। অদূরভবিষ্যতে তুরস্ক দেবে ছয়টি বিমান। উপরন্তু আমাদের বেশকিছু রণতরী পশ্চিম প্যাসিফিক থেকে ভারত মহাসগরের দিকে যাত্রা শুরু করছে। চারটি ডেস্ট্রয়ার ও একটি ট্যাঙ্কারসহ একটি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার এবং একটি হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার ও দুটো ডেস্ট্রয়ার। মার্কিন নৌ সমরসজ্জার কাছে সোভিয়েত শক্তি যে কত নগণ্য তাও কিসিঞ্জার পুনঃপুন উল্লেখ করেন। পূর্ব পাকিস্তানে পাক সামরিক শক্তি ধূলিসাৎ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে বড়জোর দুই সপ্তাহের জ্বালানি রয়েছে বলে কিসিঞ্জার উল্লেখ করেন।

কিসিঞ্জার চীনা প্রতিনিধিদের এ সময় ম্যাপ দিয়ে দেখিয়ে অধিকতর আস্থা অর্জনের চেষ্টা করেন। তবে চীনা রাষ্ট্রদূত কোনো উৎসাহ প্রকাশ করেননি। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তান ভারত দখল করে নিলেও তারা সামরিকভাবে আদৌ জড়াবে কি না সে ব্যাপারে কোনো আভাস দেননি। তবে পশ্চিম ফ্রন্টে ভারতের আগ্রাসনকে তিনি চীনকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে 'মাঞ্চুকো'র সঙ্গে তুলনা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় চীনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ভূখণ্ড মাঞ্চুকো জাপানি সহায়তায় নামমাত্র স্বাধীনতা লাভ করে। এটি টিকে থাকে ১৯৩১ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত।

মার্কিন নথি অনুযায়ী একটি গোপন সূত্রমতে (নাম প্রকাশ করা হয়নি। তবে

অনুমান করা চলে ইন্দিরার ঘনিষ্ঠ কোনো সূত্রে সিআইএ ইন্দিরার কিচেন কেবিনেটের খবর পেত।), চীন ঢাকার পতনের আগমুহূর্তে সামরিক হস্তক্ষেপ করতে পারে–এ ধরনের একটি উক্তি করেছেন ইন্দিরা। এদিকে ইয়াহিয়া আজ পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে ধরা গলায় বলছেন, দেখুন, ভারত যা চাইছে, ঠিক তাই পূরণ করছে রাশিয়া। কিন্তু ফারল্যান্ড তাকে নতুন কিছুই জানাতে পারেননি। জাতিসংঘে পাক স্থায়ী প্রতিনিধি ইকবাল আখুন্দ লিখেছেন, আমি আজ কেনেডি এয়ারপোর্টে জানলাম, 'জেনারেল রাও ফরমান আলীর যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব পেয়েছে জাতিসংঘ। এই বার্তার মূল কথা, তারা আত্মসমর্পণে প্রস্তুত। একটু আগে নিউইয়র্কে পৌছে ভুট্টো এ কথা জেনে রীতিমতো হতবাক।' হামুদুর রহমানের রিপোর্ট মতে, এই বার্তায় আত্মসমর্পণ না বলে 'যুদ্ধবিরতি' এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলা হয়। এতে বলা হয়, বাঙালিরা তাদের ভূখণ্ডে আর এক মুহূর্তের জন্যও ভারতীয় সৈন্য দেখতে চায় না।

মার্কিন ও সোভিয়েত নৌবহরের সমরসজ্জা

কিসিঞ্জার ১১ ডিসেম্বর নিক্সনকে এক স্মারকে জানিয়েছেন, অসমর্থিত সূত্রে এমন খবরও পাওয়া গেছে যে, সোভিয়েতের ভূমধ্যসাগরীয় নৌবহরকে ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের দিকে রওনা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যদিও এটা সত্য যে, আফ্রিকার উপকূল থেকে এই নৌবহরের যাত্রার জন্য কিছুটা সময় লেগে যাবে। ভূমি থেকে ভূমিতে উৎক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত সোভিয়েত রণতরী ভারত মহাসাগরে অবস্থানরত স্কোয়াড্রনকেও যুক্ত করতে পারে। একটি গাইডেড-মিসাইল, লাইট ক্রুজার, একটি ডিজেলচালিত ক্রুজ মিসাইল সাবমেরিন ও একটি তেলবাহী জাহাজ গতকাল সুসিমা প্রণালী দিয়ে জাপান সাগর ত্যাগ করেছে। এর গন্তব্য সম্ভবত ভারত মহাসাগর। ক্রুজার ও সাবমেরিন যৌথভাবে বিশটি এসএস-এনএস ক্রুজ মিসাইল বহন করছে। এ ছাড়া তিনটি স্পেস সাপোর্ট জাহাজসহ ষোলটি সোভিয়েত নৌ ইউনিট বর্তমানে ভারত মহাসাগর এলাকায় মোতায়েন রয়েছে। যোগাযোগ নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত গোয়েন্দা তথ্যের ইঙ্গিত হচ্ছে, বেশিরভাগ সোভিয়েত জাহাজ শ্রীলঙ্কা ও সোকোত্রার কাছাকাছি। যদিও আরব সাগরে একটি 'স্পেস-রিলেটেড ইউনিট' হয়তো ব্রিটিশ নৌবহরের গতিবিধি লক্ষ্য করছে। তবে এটা লক্ষণীয় যে, ষোলটি জাহাজের মধ্যে অর্ধেকেরও কম সমরসজ্জায় সজ্জিত। নিক্সন নিজ হাতে এই দলিলে নোট লিখেছেন, 'কে (কিসিঞ্জার), এসব কি পাল্টা-ব্যবস্থার লক্ষণ?'

নিক্সন ও কিসিঞ্জার নিজেদের সামরিক ক্ষমতা অনুশীলনের চিন্তা বাদ দিয়ে আজ চীনের আশায় প্রহর গোনেন। আজ বেলা ৩টায় নিক্সন ও কিসিঞ্জারের আলোচনায় এই বাস্তবতাই ফুটে ওঠে। কিন্তু আজই তারা জানতে পারেন চীন তাদের সন্দেহের চোখে দেখছে।

কিসিঞ্জার : আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে, চীনারা কিছু একটা করতে যাচ্ছে এবং আমরা শিগগিরই তা দেখব। আমার ভুলও হতে পারে। কারণ এ বিষয়ে আমার কাছে সুনির্দিষ্ট কোনো গোয়েন্দা তথ্য নেই।

নিক্সন : কিন্তু তারা যে কিছু একটা করছে তার তো কোনো আলামত দেখছি না।

কিসিঞ্জার : তারা তাদের মাউন্টেন ডিভিশনকে নির্দেশ দিয়েছে।

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় মেরিল্যান্ডের ক্যাম্প ডেভিডে অবস্থানরত নিক্সনের সঙ্গে ওয়াশিংটন থেকে পুনরায় কথা বলেন কিসিঞ্জার। তিনি প্রেসিডেন্টকে জানান, রাশিয়ার

কাছ থেকে কোনো সাড়া নেই। ভুট্টো আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। কিন্তু আমি তা নাকচ করে দিয়েছি। চীনারা তাকে বলেছে, তারা কিছু করতে চায় বটে, কিন্তু আমাদের নিয়ে তাদের মনে সন্দেহ ঢুকেছে। কারণ আমরা বলতে শুরু করেছিলাম এটা এক আগ্রাসন। কিন্তু পরে তা প্রত্যাহার করেছি। তার পরে বলেছি 'এটা যথার্থ ছিল না'। কিন্তু পরে সে অবস্থান থেকেও সরে এসে ঘোষণা দিয়েছি 'কঠোর নিরপেক্ষতা' বজায় রাখার। এখন রুশরা যদি চীনাদের চাপ দেয়, তাহলে আমরা কী করব, সে বিষয়ে তারা আমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি চাইছে। কিসিঞ্জার এ পর্যায়ে বলেন, আপনি বুঝতেই পারেন, আমি ভুট্টোকে সাহায্য করতে পারিনি। ভুট্টোর মতে, চীনারা বলেছে রুশরা বিশ্বের বৃহত্তম কাপুরুষ।

এদিন সাতটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে সোভিয়েত মিনিস্টার কাউন্সেলর ইউরি ভরন্‌ৎসোভ টেলিফোনে কথা বলেন কিসিঞ্জারের সঙ্গে। কিসিঞ্জার জানতে পারেন যে, সোভিয়েত উপ-পরাষ্ট্রমন্ত্রী ভাসিলি কুজনেৎসভ এক মিশনে দিল্লি যাচ্ছেন। দুজনের কয়েক মিনিটের আলোচনার ট্রান্সক্রিপশন থেকে দেখা যাচ্ছে, কিসিঞ্জারের সঙ্গে ভরন্‌ৎসোভের এদিনের আলোচনা ছিল হেঁয়ালিপূর্ণ। তিনি কুজনেৎসভের ভারত সফর সম্পর্কে বলেন, 'আমার এটা বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে, আমরা যা নিয়ে আলোচনা (যুদ্ধবিরতি ও রাজনৈতিক সমঝোতা) করেছি নিশ্চয় এই মিশনের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকবে। কিন্তু সরকারিভাবে আমি আপনাকে কিছুই বলতে পারছি না।' গত মে মাসে মার্কিন গোপন দলিল প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সম্পাদক প্যানেল ফুটনোটে এ সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, আজ রাত পৌনে ৯টায় কিসিঞ্জার নিক্সনকে ওই সোভিয়েত উদ্যোগের কথা উৎসাহের সঙ্গে জানান। কিন্তু নিক্সন ছিলেন সংশয়গ্রস্ত।

নিউইয়র্কে অবস্থানরত ভুট্টোর সঙ্গে কিসিঞ্জার ওয়াশিংটন থেকে টেলিফোনে কথা বলেন। কিসিঞ্জার শুরুতেই অভিমানের সুরে বলেন, মি. ভুট্টো, আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলেছি এবং এ বিষয়ে আমাদের অবস্থান হচ্ছে : প্রথমত, আমরা এ পর্যন্ত যা কিছু করেছি, তার আলোকে এটা নিরঙ্কুশভাবে আবশ্যক যে, আমরা যে পর্যাপ্ত কিছু করিনি, তা আমরা চীনা অভিযোগের নিরিখে ব্যাখ্যা করতে চাই না। কারণ অভিযোগের ধরন যদি এই হয়, তাহলে কেন আমরা কিছু করতে যাব। আমি বলতে চাইছি, আমরা আমাদের জনমতের বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়ে আছি। আমরা আমাদের সমগ্র আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছি। ভুট্টো এ সময় বলেন, আমি পুরোপুরি বুঝতে পারছি। কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে কিসিঞ্জার তাকে বলতে থাকেন, আগামীকাল সকালের মধ্যে সোভিয়েতের কাছ থেকে আমরা যদি কিছু শুনতে না পাই তাহলে কঠোর বিবৃতি নিয়ে আমরা নিরাপত্তা পরিষদে যাব। বলব, এখন যুদ্ধ অব্যাহত রাখার অর্থ হচ্ছে এটা আগ্রাসনের এক নগ্ন দৃষ্টান্ত। এ ছাড়া আমরা 'পাবলিক স্টেটমেন্ট'ও দেব। আর সে ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান নিয়ে আর সন্দেহ থাকবে না।

সম্ভবত পূর্বাংশের স্বাধীনতার অনিবার্যতার দিকে ইঙ্গিত করে কিসিঞ্জার বলেন,

যা ঘটেছে তাতে আমাদের হৃদয় ভেঙে গেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের করণীয় হচ্ছে আপনাদের অস্তিত্ব টেকানো। কিসিঞ্জারের এই বক্তব্যে এটা স্পষ্ট যে, এই সময়ে বাংলাদেশের চিন্তা বাদ দিয়ে তারা আসলে বিশ্বের মানচিত্র থেকে পশ্চিম পাকিস্তান/পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাম-নিশানা মুছে যাওয়ার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন ছিলেন।

কিসিঞ্জার ভুট্টোকে বারবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি চীনা অবিশ্বাস নিয়ে খোঁটা দিলে ভুট্টো বলেন, আশা করি আপনি ভুল বুঝবেন না। আমরা চীনাদের বলেছি, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আমরা সন্তুষ্ট। কিসিঞ্জার তাকে বলেন, যা হোক চীনাদের এখন এটা বোঝান যে, আমাদের সঙ্গে শক্তিশালী সমর্থক রয়েছে। আগামীকাল রাতের মধ্যে সপ্তম নৌবহর মালাক্কা প্রণালী অতিক্রম করবে।

বাংলাদেশ জবরদখলে চীনকে অনুরোধ

জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি ইকবাল আখুন্দ লিখেছেন, পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের অবস্থার ঘণ্টায় ঘণ্টায় অবনতি ঘটছিল। ১২ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ভুট্টো নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের অবস্থান তুলে ধরেন। তার দুই ঘণ্টার বক্তব্যে সতর্কতার সঙ্গে সামরিক শাসকদের অবস্থান থেকে নিজেকে দূরে রাখেন। পাকিস্তান মিশনের একজন কর্মকর্তা ভারতীয় কূটনীতিকের একটি মন্তব্য শুনে ফেলেন। এ কূটনীতিক রুশ কর্মকর্তাকে বলছিলেন, মঙ্গল বা বুধবার পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনা ঝুলিয়ে রাখতে। কারণ এর মধ্যেই ঢাকা ভারতের করায়ত্ত হবে। সোভিয়েতরা কালক্ষেপণের কৌশল নিয়েছিলেন। জেকব মালিক রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তিকে 'আমাদের চোখের আপেল ... লেনিনের স্বপ্ন' ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করেন।

গত মে মাসে প্রকাশিত মার্কিন গোপন নথি পর্যালোচনায় এটা স্পষ্ট যে, রুশ উপপ্রধানমন্ত্রী কুজনেৎসোভের দিল্লি মিশন ছিল ওই চুক্তির আওতায়, কিসিঞ্জারকে যা বুঝতে দেননি সোভিয়েত মিনিস্টার কাউন্সিলর ইউরি ভরোনৎসোভ। দেখা যাচ্ছে চীনের সম্ভাব্য সামরিক হস্তক্ষেপ নিয়ে ওয়াশিংটন ও পিন্ডিতে এক ধরনের ধূম্রজাল তৈরি হয়। পাক পররাষ্ট্র সচিব সুলতান এম খান (মেমোরিজ অ্যান্ড রিফ্লেকশনস, পৃ-৩৭৮-৭৯) লিখেছেন, এদিনে আমি চীনা রাষ্ট্রদূতকে ডেকে আনলাম। আগের দিন তার সঙ্গে প্রেসিডেন্টের আলোচনার সূত্রে জানতে চাইলাম, বেইজিংয়ের কাছ থেকে কোনো খবর পেয়েছেন কি না? সুলতানের বর্ণনায়, ইয়াহিয়া কার্যত এটাই তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানকে রাশিয়ার পরিবর্তে চীন নিয়ে নিলেই তিনি খুশি! আমি চীনা রাষ্ট্রদূতকে বললাম– মার্কিন উদ্যোগে ভরসা নেই। আপনারা কার্যকরভাবে হস্তক্ষেপ না করলে পূর্ব পাকিস্তানকে আর রক্ষা করা সম্ভব হবে না। 'আমি যদিও জানতাম, চীনা হস্তক্ষেপের আশা বাস্তবসম্মত নয়, তার পরও রাষ্ট্রদূত দিনের শেষভাগে আমার কাছে ফের এলেন। বললেন, চীন পাকিস্তানকে নৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে সমর্থন দিয়ে যাবে। কিন্তু সামরিক হস্তক্ষেপের ব্যাপারে তার সাধ্য সীমিত। পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক হস্তক্ষেপ এখন জরুরি। কিন্তু তিব্বতের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই জটিল। গিরিপথ তুষার আবৃত। সে কারণে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে চীনাদের কয়েক সপ্তাহ লেগে যাবে। দয়া করে আমাদের ওপর বেশি আশা করবেন না। সপ্তম নৌবহর আসছে, এতে নিশ্চয় কাজ হবে!'

চীনা রাষ্ট্রদূত যখন এসব কথাবার্তা বলছেন, তখন ওয়াশিংটনে কিসিঞ্জার নিক্সনকে দেয়া এক স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেন, ইয়াহিয়া তার নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন, ইসলামাবাদে চীনা রাষ্ট্রদূত তাকে এ মর্মে আশ্বস্ত করেছেন যে, ৭২ ঘন্টার মধ্যে চীনা সেনাবাহিনী নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে হস্তক্ষেপ করছে। কিসিঞ্জার অবশ্য সিআইএ ও ডিআইএর বরাতে তথ্য দেন, তিব্বতে চীনাদের কোনো অস্বাভাবিক তৎপরতার খবর তারা পাননি।

এদিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত পক্ষে শ্বাসরুদ্ধকর আলোচনা চলে। আজই প্রথম হটলাইনে দুই পক্ষের মধ্যে ঘড়ি ধরে মতবিনিময় চলে। রাশিয়ার কাছ থেকে নিক্সন-কিসিঞ্জারের শুধু যেন একটি বিষয়ই নিশ্চিত হওয়ার ছিল। এ দুজন দিনভর বলা চলে টান টান উত্তেজনায় ছিলেন। কিসিঞ্জার রাশিয়াকে ভয় দেখাতে কেনেডি সম্পাদিত 'গোপন চুক্তির' কপি ভরোনৎসোভকে দেখান। এবং জানিয়ে দেন যুক্তরাষ্ট্র প্রয়োজনে চীনের সমর্থনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নেবে। ভরোনৎসোভ অবশ্য কিসিঞ্জারকে দিনের শুরুতেই জানিয়ে দেন, মিসেস গান্ধীর কাছ থেকে তারা আশ্বাস পেয়েছেন যে, ভারত পশ্চিম পাকিস্তানে হামলা চালাবে না। কিন্তু এটা ছিল তাদের 'অন্তর্বর্তীকালীন' জবাব। তাই এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না নিক্সন-কিসিঞ্জার। তারা চেয়েছিলেন পাকা কথা। কিসিঞ্জার মনে করেছেন, সোভিয়েতরা এই ইস্যুতে আর যাই হোক যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে জড়াবে না। তবে কিসিঞ্জারের ভয় ছিল অন্যত্র। তার ভাষায় 'মি. প্রেসিডেন্ট, আমার ভুল হতে পারে কিন্তু কমিউনিস্টরা সাধারণত সমঝোতার প্রক্রিয়াকে সুরাহার কাজে নয়, প্যাঁচ লাগাতেই ব্যবহার করে।'

সকাল ১০টা ৪৫ মিনিট। ভরোনৎসোভ জেনারেল হেগের কাছে ইংরেজিতে হাতে লেখা একটি নোট নিয়ে এসেছেন। তার অনুরোধ এটা নিক্সনকে পৌঁছে দিতে হবে। এর ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে ব্রেজনেভের সঙ্গে নিক্সনের হটলাইন স্থাপন হওয়ায় অনুমিত হয় বার্তাটি এসেছে ব্রেজনেভের কাছ থেকে। এতে বলা হয়েছে, নিক্সন তার চিঠিতে যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন, সে সম্পর্কে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ প্রথমবারের মতো ভারত সরকার ও ব্যক্তিগতভাবে মিসেস গান্ধীর সঙ্গে কথা বলেছেন। এতে নিশ্চিত জবাব মিলেছে, পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হামলায় ভারতের কোনো লক্ষ্য নেই। এতেও যুক্তরাষ্ট্রের অস্বস্তি কাটেনি। এর কারণ হতে পারে এই যে, নিউইয়র্কে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং তার তিন সহকর্মী কাউল, ঝা ও সেনের উপস্থিতিতে রাষ্ট্রদূত বুশকে (সিনিয়র) বলেছেন, বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতিদানের অর্থ হচ্ছে ভারতের যে কোনো ভূখণ্ডগত উদ্দেশ্য নেই তা স্পষ্ট করা। দ্বিতীয়ত, ভারত বিশ্বাস করে যে, সেখানে বহু ধরনের বিরোধপূর্ণ শক্তির খেলা শুরু হয়েছে। ক্ষমতার শূন্যতা যাতে সৃষ্টি না হতে পারে সেজন্য উদার, নির্বাচিত ও গণতান্ত্রিক গ্রুপকে তারা সমর্থন দিয়েছে। বুশের বর্ণনায়, মুক্তিবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যেও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে বলে তাদের দাবি।

বুশ এক তারবার্তায় স্টেট ডিপার্টমেন্টকে জানান, 'পশ্চিম পাকিস্তানে ভারতের ভূখণ্ডগত কোনো টার্গেট নেই।' তবে এই প্রতিশ্রুতি ভারত রক্ষা করতে অপারগ থাকবে, যদি পাকিস্তান পশ্চিম ফ্রন্টে যুদ্ধ অব্যাহত রাখে। যদি তারা পূর্ব পাকিস্তান হারানোর ক্ষতিপূরণ উসুল করতে চায়। আমাদের প্রশ্নের জবাবে ভারতীয় প্রতিনিধি দল কিন্তু আজাদ কাশ্মীর প্রশ্নে দ্ব্যর্থহীন প্রতিশ্রুতি দেয়নি। ৯ ডিসেম্বরে ঝা বলেছেন, ভারত মনে করে কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ভারত যখন তার ভূখণ্ডগত ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করে, তখন তা কিন্তু আজাদ কাশ্মীরকে স্পর্শ করে না। স্টেট ডিপার্টমেন্টের আরউইন অবশ্য এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে ঝাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কাশ্মীরে সীমান্ত রেখা পরিবর্তনের কোনো চেষ্টা ওয়াশিংটন বরদাশত করবে না।

সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিট। জেনারেল হেগের সঙ্গে ভরোনৎসোভের টেলিসংলাপ। যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েতের কাছ থেকে তার প্রস্তাবের অনুকূলে সাড়া পেতে অধিকতর আগ্রহী। আর সে কারণেই সপ্তম নৌবহরের অগ্রযাত্রা বিলম্বিত করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্তত ২৪ ঘণ্টার জন্য। ভরোনৎসোভ এটা জেনে সন্তোষ প্রকাশ করেন। বলেন, ধন্যবাদ জেনারেল। আমরা এ সময়ে সুফল পেতে পারি।

এদিন বেলা সোয়া ১১টায় ওয়াশিংটন স্পেশাল গ্রুপের বৈঠকে অ্যাডমিরাল মুরার তথ্য দেন, সপ্তম নৌবহরকে মালাক্কা প্রণালী (মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া যেখানে পৃথক হয়েছে) দিয়ে ভারত মহাসাগরে পৌছানোর পরিকল্পনা রয়েছে। সপ্তম নৌবহরে অবস্থানরত সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানে ১৬ ডিসেম্বর সকালে পৌছবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এদিন বেলা পৌনে ১২টায় ও সাড়ে ১২টায় কিসিঞ্জার ও ভরোনৎসোভের মধ্যে দুই দফা টেলিসংলাপ চলে। কিসিঞ্জার বলেন, প্রেসিডেন্টের মনোভাব হচ্ছে আমরা এমনভাবে এই সংকট মোকাবিলা করব, যাতে কারো জয় বা পরাজয় না ঘটে। এবং আমরা প্রকাশ্যে কারো মর্যাদাহানি করা থেকেও বিরত থাকব।

মস্কোর জবাবের অপেক্ষায় ওয়াশিংটন

আজ ১৩ ডিসেম্বর। স্নায়ুযুদ্ধ-যুগের দুই পরাশক্তি বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রশ্নে এক বিরল গোপন আলোচনায় যোগ দিয়ে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছে। ওয়াশিংটন নিশ্চিত হতে চাইছে, বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়তো অবশ্যম্ভাবী। তারা এটুকু মানতে রাজি কিন্তু ভারতকে কোনো অবস্থাতেই পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর হামলা চালাতে দেয়া যাবে না। আজাদ কাশ্মীর দখলের কোনো আশা থাকলে তা তাদের ত্যাগ করতে হবে। ভারত যদিও বলেছে, পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের কোনো ভূখণ্ডগত উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু তাতে ভরসা পাননি নিক্সন ও কিসিঞ্জার। আর সে কারণে মস্কোর সঙ্গে মধ্য ডিসেম্বরের এই দিনগুলোয় ওয়াশিংটনের হটলাইন সক্রিয়। ওয়াশিংটনের কাছে গোপন সূত্রে এমন একটি খবর ছিল, যাতে ভারতের একজন দায়িত্বশীল রাজনীতিক বলেছেন, কাশ্মীর করায়ত্তের এই সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না। দেখা যাচ্ছে, মস্কোর সঙ্গে হটলাইন স্থাপনের কারণেই সপ্তম নৌবহরের অগ্রযাত্রা শ্লথ করা হয়। দুই পরাশক্তিই ভিন্ন স্বার্থ খুঁজে পায়, তারা পাক-ভারত ইস্যুতে আর যা-ই হোক, যুদ্ধে জড়াবে না।

প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক সহকারী হেনরি কিসিঞ্জার আজ প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক উপসহকারী জেনারেল হেগের কাছে এজোর্স দ্বীপ থেকে প্রেরিত এক তারবার্তায় পাক-ভারত সংকট সম্পর্কে তার সর্বশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেন। তিনি আজ স্পষ্টই জানিয়ে দেন, যা কিছুই ঘটুক না কেন, সপ্তম নৌবহরকে অবশ্যই ভারত মহাসাগরে পৌঁছাতে হবে। কিন্তু তাই বলে তাকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত নেয়ার দরকার নেই। কিসিঞ্জার প্রশ্ন রাখেন–সপ্তম নৌবহরকে আমরা এক দিনের জন্য কি সিঙ্গাপুরে রাখতে পারি? তিনি বিষয়টি নিয়ে নিক্সন, রজার্স ও কোনালির সঙ্গে আলোচনার পরামর্শ দেন। কিসিঞ্জার আরো উল্লেখ করেন যে, আমার সুপারিশ হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদে যদি অচলাবস্থা অব্যাহত থাকে অথবা সোভিয়েতরা আবারও ভেটো দেয়, তাহলেও আমাদের উচিত হবে যুদ্ধবিরতি ও পরে সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্তাব সমর্থন করা। এমনকি সোভিয়েতের কাছ থেকে কোনো সাড়াশব্দ না পেলেও এটাই হবে আমাদের অবস্থান। পাক পররাষ্ট্রসচিব সুলতান লিখেছেন, 'আজ যুক্তরাষ্ট্র অবিলম্বে বৈরিতা বন্ধ এবং ভারত ও পাকিস্তানি সৈন্যদের পরস্পরের ভূখণ্ড ছেড়ে যাওয়া সংক্রান্ত এক প্রস্তাব উত্থাপন করে। এ প্রস্তাবে

জাতিসংঘ সনদে বর্ণিত নীতিমালার আওতায় উদ্বাস্তুদের স্বেচ্ছাপ্রত্যাবাসন-সংক্রান্ত শর্তও জুড়ে দেয়া হয়। এই প্রস্তাবেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দেয়।' আসলে উভয় পক্ষই এভাবে চাইছিলেন কালক্ষেপণ।

নিক্সন প্রশাসন আজও সোভিয়েতের কাছ থেকে প্রত্যাশিত জবাব পায়নি। তবে মস্কো থেকে নিক্সনের কাছে এই বার্তা পৌছায় যে, 'আমাদের মধ্যে যে গোপন মতবিনিময় চলছে, তার ভিত্তিতে আমরা আপনাকে এটা জানাচ্ছি যে, ভারতের সঙ্গে পুরো বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি। আমাদের এই প্রচেষ্টার ফলাফল কোনো বিলম্ব ছাড়াই আপনাকে অবহিত করব।' এই বার্তার সঙ্গে যুক্ত থাকা একটি হাতে লেখা নোট থেকে ইঙ্গিত মিলছে যে, বার্তাটি এদিন ভোর ৫টায় ওয়াশিংটনে পৌছায়। হটলাইনে আসা এই বার্তাটি কিসিঞ্জারের কাছে পাঠানো হয় ৭টা ৩৭ মিনিটে। এ সম্পর্কে হেগের মন্তব্য : 'সন্দেহ নেই আমরা এখনো পর্যন্ত 'না ঘরকা না ঘাটকা' অবস্থায়।

যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব জাতিসংঘের মাধ্যমে কীভাবে কার্যকর হবে, তা নিয়ে ইয়াহিয়া ও নিক্সনের নীতিনির্ধারকরা ব্যস্ত ছিলেন। বিকেল ৪টা ৭ মিনিটে পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডের কাছে হেগ এক ব্যাকচ্যানেল বার্তায় জানান, 'সোভিয়েতের সঙ্গে একটা আপোস ফর্মূলায় পৌছাতে ভুট্টো নিউইর্য়কে রাষ্ট্রদূত বুশের সঙ্গে কথা বলেছেন। এতে আমাদের আনীত নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবে সংশোধনের সুপারিশ করা হয়েছে। পাকিস্তান সরকারের প্রতি একটি রাজনৈতিক সমাধানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হচ্ছে। এই সমঝোতায় অবিভক্ত পাকিস্তানের মধ্যে থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছার আশু স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে হবে।'

জেনারেল হেগ ১৩ ডিসেম্বরে এসে ভুট্টোর অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রস্তাবের নাজুক দিক সম্পর্কে ফারল্যান্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হেগ লিখেছেন, 'এই পর্যায়ে এমন প্রস্তাব উত্থাপন আমাদের অবস্থানকে দ্রুত জলাঞ্জলি দিতে পারে। সোভিয়েতরা অবিভক্ত পাকিস্তান কথাটিতে ভেটো দেবে এবং তার পরিণতিতে সৃষ্টি হবে অচলাবস্থা। রাজনৈতিক প্রশ্নে বিতর্ক শুরু করলে তা অনতিবিলম্বে যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনাকে পৌছে দেবে শূন্যের কোঠায়।' হেগ ফারল্যান্ডকে দ্রুত জানাতে বলেন যে, ভুট্টোর এই প্রস্তাবে ইসলামাবাদের নীতি প্রতিফলিত হয়েছে কি না? যদি তা-ই হয়ে থাকে, তাহলে তার ভিত্তি কী? যোশেফ ফারল্যান্ড বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন পাক পররাষ্ট্রসচিব সুলতান খানের সঙ্গে। তিনি তাকে নিশ্চিত করেন যে, ভুট্টোর ওই উদ্যোগে ইয়াহিয়ার অনুমোদন রয়েছে।

ওদিকে জাতিসংঘের কাছে জেনারেল রাও ফরমান আলীর ইতঃপূর্বের 'আত্মসমর্পণ' বার্তা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে পাকিস্তানে নিযুক্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত উদ্যোগ নেন। সুলতান খান তার 'মেমোরিজ অ্যান্ড রিফ্লেকশন্সে' লিখেছেন, যুদ্ধবিরতির জন্য রাও ফরমান আলীর প্রস্তাবে সরকারের সায় রয়েছে কি

না–সোভিয়েত দূতের এই প্রশ্নের জবাবে আমি বললাম, জেনারেল ফরমান আলী তার অধিকারের সীমা অতিক্রম করেছেন। ঢাকার জাতিসংঘ প্রতিনিধি ও জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে তার ওই বার্তা পাঠানো ঠিক হয়নি।

এদিকে কিসিঞ্জার নিক্সনকে দেয়া এক স্মারকে আজ জানিয়েছেন, রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড জানিয়েছেন যে ইসলামাবাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপদ এলাকায় থাকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর ও জাতিসংঘের দুটি বিমান ভারতীয় হামলায় ধ্বংস হয়ে গেছে। বিমান দুটি পাকিস্তানি বিমান থেকে পৃথক এলাকায় রাখা ছিল। আমাদের প্রতিরক্ষা প্রতিনিধি ইতোমধ্যেই নিশ্চিত যে, ভারত দুটি বিমানই পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করে। এ ঘটনার পরপরই পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ঝা-কে তলব করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো জবাব দেয়নি। ঝা যুক্তি দিয়েছেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে নিরপেক্ষ কোনো দেশের সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এটা শনাক্তকরণ সমস্যার কারণে দুর্ঘটনাবশত ঘটেছে বলে ঝা উল্লেখ করেন। রজার্স অবশ্য ঝাকে বলেছেন, জাতিসংঘের বিমানটির রঙ ছিল সাদা। সুতরাং ভুলবশত এটা ঘটেছে, তা বিশ্বাস করা কঠিন। কিসিঞ্জার নিক্সনকে জানান, আমি এ ব্যাপারে আর কোনো পদক্ষেপ না নিতে বলেছি।

'বাংলা দেশ' এড়াতে কিসিঞ্জারের কৌশল

আজ ১৪ ডিসেম্বর। সোভিয়েতের পক্ষ থেকে আজ নিক্সনের কাছে চূড়ান্ত বার্তা এল। নিশ্চয়তা দেয়া হলো, পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, সৈন্য প্রত্যাহার ও উদ্বাস্তু প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করলে ভারত যুদ্ধবিরতি ও তার সৈন্য প্রত্যাহার করে নেবে। পশ্চিম পাকিস্তানে তার কোনো অভিসন্ধি নেই।

বার্তায় বলা হলো, মি. প্রেসিডেন্ট, আমরা আমাদের গোপন চ্যানেলে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অব্যাহত রাখব। জেনারেল হেগ এজোর্সে অবস্থানরত কিসিঞ্জারের কাছে বার্তা পাঠালেন, ঢাকার কনসাল জেনারেল স্পিভাক আজ এক টেলিগ্রামে জানিয়েছেন, গভর্নর মালিক ও জেনারেল ফরমান আলী এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক পরিস্থিতি নিয়ে আর আশাবাদের কিছু নেই। এখন পাইকারি হত্যা বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া দরকার। স্পিভাক মত দিলেন, 'যা করার দ্রুত করতে হবে, নইলে ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে পারে।' স্পিভাক আরো জানালেন, ফারল্যান্ড ইসলামাবাদে চূড়ান্ত আপোস প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত। যদিও তিনি ওয়াশিংটনকে এখনো কিছু জানাননি। হেগ উল্লেখ করেন, সোভিয়েতরা তাদের চূড়ান্ত জবাব দিতে লম্বা সময় নেয় পূর্ব পাকিস্তানে পাক সৈন্যদের ভেঙে পড়া প্রত্যক্ষ করতে। যদিও তারা তাদের বার্তায় বাংলাদেশ সরকার বা বাংলাদেশের স্বাধীনতা কথাটি উল্লেখ করেনি কিন্তু তারা যেসব শর্ত বেঁধে দিয়েছে, তার অর্থ প্রকারান্তরে তাই দাঁড়ায়। ইউরি ভরোনৎসোভ আপনার সঙ্গে আলোচনায় 'ওয়ান-পাকিস্তান' প্রসঙ্গে যা উল্লেখ করেছিলেন, তার কিন্তু কোনো উল্লেখ তাদের এই আনুষ্ঠানিক জবাবে নেই। আমরা এখন যা মোটামুটি নিশ্চিত ধরে নিতে পারি তা হলো, আমরা এমন ব্যবস্থা নিতে পারি, যা পশ্চিম পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখবে। কিন্তু এটা প্রশ্নাতীত যে, পূর্ব পাকিস্তান প্রশ্নে পাকিস্তান ও চীনের কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধানের বিষয়টি কিন্তু অনিশ্চিত থাকছে। এদিনই আরেক তারবার্তায় হেগ কিসিঞ্জারের কাছে সপ্তম নৌবহরকে ফিরিয়ে আনতে পরামর্শ চান। গতকাল এজোর্সে কিসিঞ্জার এক টেলিগ্রামে পাকিস্তানি দূত রাজার কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি বার্তার বিষয়বস্তু জানতে পারেন। এতে বলা হয়, সপ্তম নৌবহরের উপস্থিতি বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরে (ভারতীয় নৌবাহিনীর আক্রমণ থেকে) পাকিস্তানকে রক্ষা করতে পারে। ইয়াহিয়া আজ এক চিঠিতে নিক্সনকে বলেন, সপ্তম নৌবহরকে আমাদের উপকূলে (করাচিতে) শুধু

পৌঁছালেই হবে না, ভারতের আক্রমণ থেকে বাঁচতেও এখন একে কাজে লাগানোর বিকল্প নেই। এ থেকেও একটা ধারণা মেলে যে, সপ্তম নৌবহরের উপস্থিতি পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষার কাজেও ব্যবহৃত হয়েছিল।

ইয়াহিয়া ১৪ ডিসেম্বরে এসেও হাল ছাড়েননি। আবেগের সঙ্গে তিনি নিক্সনকে লিখেছেন, এখন তো সবটাই স্পষ্ট। পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের সামরিক বিজয়ের জন্যই রাশানরা কালক্ষেপণ করেছিল। আর এখন তাদের সমঝোতার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাংলাদেশ দখলের পরে পশ্চিম পাকিস্তান জবরদখলে তারা তাদের পেশিশক্তি ব্যবহার করবে। রাশিয়ার ভূমিকা উন্মোচিত এবং ভারত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এখন আপনি পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় উচিত পদক্ষেপ নিলে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ তা গ্রহণ করবে। নিয়াজিকে হাল ছেড়ে দেয়ার অনুমতি দিয়ে এই চিঠিতে তিনি পাকিস্তানের অখণ্ডতাকে প্রাধান্য দেন। ফারল্যান্ড কিসিঞ্জারকে এক ব্যাকচ্যানেল বার্তায় জানান, আজ দুপুরে ইয়াহিয়ার সঙ্গে সাক্ষাতের পর ইয়াহিয়া আমাকে টেলিফোন করেন। বলেন, যে কোনোভাবেই হোক অনতিবিলম্বে আমাকে কুড়িটি বি-৫৭ বিমান দিন।

এদিকে ঢাকার কনসাল জেনারেল আজ এক টেলিগ্রামে জানান, জেনারেল নিয়াজি আজ বিকেল ৫টা ২০ মিনিটে জরুরিভিত্তিতে তার দপ্তরে দেখা করতে বললেন। আমি গিয়ে দেখলাম নিয়াজি ও ফরমান আলী বসে আছেন। নিয়াজি বললেন, আমরা অযথা রক্তপাত বন্ধ করতে চাই। যদিও আমার সৈন্যরা এখনো ভালো অবস্থায় আছে। এ মুহূর্তে তারা বিপদাপন্ন নয়। সামান্য আলোচনার পরে দুজনে সই করে আমাকে একটি চিঠি দিলেন। এতে শর্তসাপেক্ষে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। নিয়াজি ও ফরমান আলী 'আত্মসমর্পণ' কথাটি এড়ানোর ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। লক্ষণীয়, নিয়াজির এই চিঠিতে যুদ্ধবিরতির শর্তে '৭১-এর মার্চ থেকে প্রশাসনকে সহযোগিতাকারী অর্থাৎ রাজাকারদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা না গ্রহণের কথা বলা হয়।

নিয়াজি দাবি করেন, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে। স্পিভাক লিখেছেন, যখন আমি তাকে নির্দিষ্টভাবে প্রশ্ন করলাম, এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট বা ইসলামাবাদে অন্য কারো কাছ থেকে অনুমোদনের প্রয়োজন আছে কি না তখন তিনি নির্দিষ্টভাবে বলেন, না। ফারল্যান্ড এদিনই পাক পররাষ্ট্র সচিব সুলতান খানের মাধ্যমে নিশ্চিত হন যে, নিয়াজির ওইরূপ ক্ষমতা অনুশীলনে ইয়াহিয়ার সায় রয়েছে। ইয়াহিয়া এই প্রস্তাব দিল্লি ও ভুট্টোর কাছে পৌঁছাতেও অনুমতি দিয়েছেন। ভুট্টো অথবা জাতিসংঘ মহাসচিবকে দিয়ে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিংকে অবহিত করতে বলা হয়। কিন্তু ভুট্টো তাতে রাজি হননি। ইয়াহিয়া ভারতকে প্রস্তাবটি জানাতে চাইছেন–যুক্তরাষ্ট্র বিষয়টি পুনর্নিশ্চিত হয়ে জাতিসংঘে তাদের মিশনকে ভারতীয় প্রতিনিধি দলকে অবহিত করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু শর্ত জুড়ে দেয়, ভারতকে এটা

বলতে হবে যে, এই বার্তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষ। তার কোনো ভূমিকা নেই।

গভর্নর মালিক গতকাল ইয়াহিয়ার কাছে এক বার্তায় উল্লেখ করেন, তার কাছে খবর রয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক ও বেসামরিক নির্বিশেষে সব পশ্চিম পাকিস্তানিকে ভারতীয় সেনাবাহিনী হত্যা করবে। ফারল্যান্ড আজ এক টেলিগ্রামে স্টেট ডিপার্টমেন্টকে এ তথ্য দিয়ে বলেন, মালিক ও তার মন্ত্রিসভা প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দিয়েছেন পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা বন্ধে যে কোনো শর্তে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব কবুল করে নিতে।

কিসিঞ্জার হেগের ওই টেলিগ্রামের জবাবে জানান, আমাদের উচিত হবে যত দ্রুত সম্ভব যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা। সবচেয়ে ভালো হয় ব্রিটিশ প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারলে। মনে রাখতে হবে প্রস্তাব এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে 'বাংলা দেশ' কিংবা পূর্ব পাকিস্তানের উল্লেখ ছাড়াই একটা কৃত্রিম রাজনৈতিক ফর্মূলার কথা বলা থাকে। স্পিভাকও যেন 'বাংলা দেশ' থেকে নিজকে দূরে সরিয়ে রাখেন। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলেকজান্ডার হেগ (জুনিয়র) আজ দুপুর ১২টা ২২ মিনিটে সোভিয়েত মিনিস্টার ভরোনৎসোভকে তলব করেন। হেগ বলেন, আপনাদের বার্তা পরীক্ষা করে আমরা দেখলাম, এটা অনির্দিষ্ট ও অসম্পূর্ণ। এমনকি সবচেয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ, পশ্চিম পাকিস্তানি ভূখণ্ড দখলে ভারতের পরিকল্পনা নেই–এ কথা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়নি। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ঝা ভারত মহাসাগরে সপ্তম নৌবহর মোতায়েনে সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিসকোর সঙ্গে দেখা করে আজ উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

সন্ধ্যা ৬টায় কিসিঞ্জার, ভরোনৎসোভ ও হেগ ওয়াশিংটনে বৈঠকে মিলিত হন। কিসিঞ্জার বলেন, যুক্তরাষ্ট্র জানে পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে থাকবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে এ ধরনের একটি পরিবর্তন যুক্তরাষ্ট্র কবুল করতে পারে না। তা ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু জিইয়ে রেখে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কেন বাংলাদেশের মতো ইস্যুতে তাদের সম্পর্ক নষ্ট করতে যাবে। এদিকে রজার্স ফারল্যান্ডকে এক টেলিগ্রামে জানান, বাংলাদেশ কিংবা ভারতীয় সৈন্যরা ঢাকা দখল করে নিলে আপনি কিন্তু তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে বিরত থাকবেন।

পশতুন সীমান্তেও আক্রমণ!

আজ ১৫ ডিসেম্বর। জেনারেল মানেকশ নিয়াজিকে দিল্লিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ কিটিংয়ের মাধ্যমে নিয়াজির কাছে পৌঁছে দিলেন 'আত্মসমর্পণের' ৬ শর্ত। এটা মানা না হলে ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সময় সকাল ৯টায় সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করতে কোনো বিকল্প থাকবে না। এই বার্তায় দুপক্ষের মধ্যে সরাসরি সংলাপের জন্য আজই রেডিও লিংক চালু করার কথা বলা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে যখন আত্মসমর্পণের এ প্রক্রিয়া চলছে, ওয়াশিংটনে তখন নিক্সন ও কিসিঞ্জার উদ্বেগের সঙ্গে সর্বশেষ পরিস্থিতির চুলচেরা বিশ্লেষণ করছেন। ওভাল অফিসে নিক্সন কিসিঞ্জারের সঙ্গে দেখা করেন। 'সোভিয়েতরা নিশ্চয়তা দিয়েছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর হামলা হবে না।' নিক্সন প্রশ্ন রাখেন, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েতের এই প্রকাশ্য সমঝোতায় চীনের প্রতিক্রিয়া কি? জবাবে কিসিঞ্জার বলেন, যদি পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষা করা যায়, তাহলে চীনারা তো আহ্লাদে আটখানা হবে। কিসিঞ্জার নিক্সনকে এটাও জানান যে, আমি ভরোনৎসভকে বলেছি, দেখ আমার সঙ্গে আইনি প্যাঁচ খেলবে না। নির্দিষ্ট করে বলতে হবে, কোনো বিরোধপূর্ণ ভূখণ্ড অর্থাৎ আজাদ কাশ্মীর গ্রাস করা যাবে না। আগের সীমান্ত রেখাই অপরিবর্তিত রাখতে হবে। ভরোনৎসভ নিশ্চয়তা দিয়েছেন। হ্যাঁ, তারই রক্ষাকবচ দিচ্ছি।

দুই নেতার সংলাপ বৃত্তান্তে এটা স্পষ্ট ফুটে ওঠে যে, এদিন তারা পূর্ব পাকিস্তান হারানো নিয়ে কোনো বেদনা নয়; বরং আজাদ কাশ্মীরসহ পশ্চিম পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করতে পারায় নিজেদের ধন্য মনে করেছেন। কিসিঞ্জার উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলেন, মি. প্রেসিডেন্ট, এটা একটা নিরঙ্কুশ অলৌকিক ঘটনা। আমি এ পর্যন্ত যত গোয়েন্দা রিপোর্ট পড়েছি, তাতে সন্দেহাতীতভাবে এই উপসংহারই টানা হয় যে, ভারতের কৌশল ছিল পশ্চিম পাকিস্তানকে নাস্তানাবুদ করা। কিসিঞ্জার আজ নিক্সনকে দেয়া এক স্মারকে গোপন সূত্রের বরাতে উল্লেখ করেন, কাশ্মীরে উভয়পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। অন্যদিকে ঢাকার কয়েক মাইলের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যরা পৌঁছে গেছে। লক্ষণীয়, এদিন এক গোপন সূত্রের (ডিক্লাসিফাই করা হয়নি) বরাতে কিসিঞ্জার জানাচ্ছেন, চীন পশ্চিম পাকিস্তানকে সম্ভবত কিছু মিগ-১৯ দিচ্ছে। জাতিসংঘে পাকিস্তানি প্রতিনিধি বলেছেন, '১৫ ডিসেম্বর চীন একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পদক্ষেপ নেবে।' কিন্তু আমাদের সূত্র বলেছে, এর কোনো লক্ষণ নেই। কিসিঞ্জারের ভাষ্যে দেখা যাচ্ছে, 'মধ্যপ্রাচ্য কিংবা কোনো মুসলিম দেশ থেকেই পাকিস্তান সামরিক সাহায্য পায়নি।

নভেম্বরের শেষাশেষি থেকে বহু রিপোর্ট মিলেছে যে, এসব দেশ পাকিস্তানকে

সামরিক সহায়তা দিচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে তুরস্ক, জর্ডান, সৌদি আরব, লিবিয়া ও মিসর। কিন্তু কোনো রিপোর্ট থেকেই এটা নিশ্চিত হওয়া যায়নি যে, খুচরা যন্ত্রাংশ বলুন কিংবা যুদ্ধ বিমান–কেউ কিছু আদৌ দিয়েছে। আমাদের সপ্তম নৌবহর মালাক্কা প্রণালী অতিক্রম করছে এবং তা ১৫ ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় বঙ্গোসাগরের কাছাকাছি পৌঁছবে। গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে, পাকিস্তানকে সামরিক সহায়তা দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। কিটিং জানিয়েছেন, এসব খবরে ভারতে তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে মার্কিন স্থাপনা ও নাগরিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।' কিসিঞ্জারের বর্ণনা অনুযায়ী ব্রিটেনও ওই এলাকায় কিছু রণতরী মোতায়েনে উদ্যোগী হয়েছে। তাদের একটি কমান্ডো ক্যারিয়ার ও একটি ফ্রিগেট শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ উপকূলে রয়েছে। সোভিয়েত টাস্ক ফোর্স (একটি গাইডেড মিসাইল ক্রুজার, একটি অয়েল ট্যাঙ্কার ও একটি ডিজেলচালিত সাবমেরিন সমন্বয়ে গঠিত।) দক্ষিণ চীন সমুদ্র থেকে ক্রমেই ভারত মহাসাগরের দিকে ধেয়ে আসছে। তাদের বর্তমান গতি অব্যাহত থাকলে ওই এলাকায় তারা তিন দিনের মধ্যে পৌঁছবে। অবশ্য ভারত মহাসাগরে আগে থেকেই ১২টি সোভিয়েত জাহাজ রয়েছে। তবে তাদের কোনোটিই পাক-ভারত সংঘাতে নিজেদের জড়াতে কোনো ইঙ্গিত দিচ্ছে না।

কিসিঞ্জার আজ ওয়াশিংটনে বেলা সাড়ে ১১টায় কোসিগিনকে লেখা যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত একটি খসড়া চিঠি ভরোনৎসভকে হস্তান্তর করেন। কিসিঞ্জার এ সময় যুদ্ধ বন্ধে জাতিসংঘে ব্রিটিশ প্রস্তাব সমর্থনে আগ্রহ ব্যক্ত করলে ভরোনৎসভ বলেন, না, আমরা কিন্তু পোলিশ প্রস্তাবের পক্ষে। অন্যান্য দলিল থেকে দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান জাতিসংঘে প্রস্তাবের সম্ভাব্য বাক্য গঠন নিয়ে যথেষ্ট সংবেদনশীলতা দেখায়। তাদের ভীতি ছিল একটাই–এ ধরনের প্রস্তাব থেকে কোনোভাবে যেন আজাদ কাশ্মীরসহ পশ্চিম পাকিস্তানের অখণ্ডতার বিষয়ে কোনো গলদ সৃষ্টি না হয়। ভরোনৎসভ তাই এদিন মরিয়া হয়ে বলেন, 'তারা কাশ্মীরসহ পশ্চিম পাকিস্তানের নিশ্চয়তা দিচ্ছে। কিন্তু প্রকাশ্যে তারা এটা বলছেন না এই বিবেচনায় যে, ভারত বিব্রত হবে। ভরোনৎসভের কথায় ভারত তো আমাদের তাঁবেদার রাষ্ট্র নয়।' নিক্সন কোসিগিনকে লেখা চিঠির শুরুতেই বলেন, পূর্ব পাকিস্তান এক পরিণতি পাচ্ছে। এখন আমাদের পশ্চিম ফ্রন্টে যুদ্ধ থামাতে হবে। কেউ যাতে কারো ভূখণ্ড দখল করতে না পারে, পরাশক্তি হিসেবে তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে।

ফারল্যান্ড এক ব্যাক চ্যানেল বার্তায় কিসিঞ্জারকে জানান, পররাষ্ট্রসচিব সুলতান খান আজ আমাকে ডেকে বললেন, পাকিস্তানি গোয়েন্দারা খবর দিয়েছেন যে, ভারতীয়রা পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রবল লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আফগান সীমান্ত (সম্ভবত পশতুন সীমান্ত এলাকা) থেকে নাশকতামূলক তৎপরতা চালাতে উসকানি দিচ্ছে। এখন পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি জাতি হিসেবে টিকিয়ে রাখতে হলে অবিলম্বে অতিরিক্ত যুদ্ধবিমান দিতে হবে। বর্তমানে আমাদের যে মিগ-১৯ ও এফ-১০৪ রয়েছে, তা দিয়ে সম্ভাব্য ভারতীয় হামলা প্রতিরোধ করা যাবে না। নিক্সনকে

লেখা ইন্দিরা গান্ধীর একটি চিঠি রাষ্ট্রদূত ঝা আজ স্টেট ডিপার্টমেন্টে পৌঁছে দেন। আবেগ দিয়ে লেখা এ চিঠিতে ইন্দিরা প্রশ্ন রাখেন, মি. প্রেসিডেন্ট, আমি আমার সর্বতো বিশ্বস্ততা দিয়ে এই প্রশ্ন রাখছি যে, একমাত্র ব্যক্তি শেখ মুজিবের মুক্তি অথবা তার সঙ্গে গোপন সমঝোতা নিশ্চিত করা কি একটি যুদ্ধ পরিচালনার চেয়ে অধিকতর বিপর্যয়কর বলে গণ্য হতো?...

"২৪ বছর ধরে ভারতের বিরুদ্ধে পরিচালিত পাকিস্তানের সর্বাত্মক 'হেট ক্যাম্পেন' থেকে পাকিস্তানকে নিবৃত্ত হতে হবে। আমার পিতা এবং আমি ২৪ বছর ধরে পাকিস্তানের সঙ্গে অ-আগ্রাসন চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছি। কিন্তু প্রতিবারই তারা নাকচ করে দিয়েছে।"

আজ বিকেল ৫টা ৫৫ মিনিটে নিক্সন ও কিসিঞ্জারের মধ্যে শেষ দফা (প্রাপ্ত দলিল অনুযায়ী) টেলিসংলাপ চলে। এবং বিস্ময়কর হলো, এত কিছুর পরও তাদের মন থেকে এই দ্বন্দ্ব ঘোচেনি যে, রুশ-ভারত অক্ষ শক্তি পশ্চিম পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখবে। কিসিঞ্জার বলেন, ভারতকে বিশ্বাস করা যায় না। তারা এখন চাইছে বাংলাদেশের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ফর্মূলা জাতিসংঘকে দিয়ে অনুমোদন করতে। এর অর্থ হচ্ছে, আগ্রাসনে জাতিসংঘকে পার্টি করা। সোভিয়েতরা একটু আগে বলেছে, তারা ব্রিটিশ প্রস্তাবে ভেটো দেবে। লক্ষণীয়, ব্রিটেন বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকলেও শেষ পর্যায়ে এসে যুক্তরাষ্ট্রের মন রক্ষার একটা চেষ্টা চালায়। পাকিস্তানের জাতিসংঘ স্থায়ী প্রতিনিধি ইকবাল আখুন্দ লিখেছেন, ১৫ ডিসেম্বর পোলিশ প্রস্তাব যখন টেবিলে এল, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। নিরাপত্তা পরিষদের লাউঞ্জে মার্কিন প্রতিনিধি দলের চার্লি নাস আমাকে বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষাই এখন সমস্যা।

পাক পররাষ্ট্রসচিব সুলতান খান লিখেছেন, ১৫ ডিসেম্বর মধ্যরাতে দুবার ফারল্যান্ড আমার সঙ্গে বৈঠক করেন। প্রথমবার তিনি নিয়াজি ও ফরমান আলীর স্বাক্ষরিত চিঠির সত্যতা যাচাই এবং পরে নিয়াজিকে লেখা ভারতীয় সেনাপ্রধানের বার্তা নিয়ে হাজির হন। এ বার্তায় তিনি 'বাংলাদেশে আমার কাছে আত্মসমর্পণকারীদের' নিরাপত্তাদানে অঙ্গীকার করেন। সুলতানের মতে, নিয়াজি আসলে একটি যুদ্ধবিরতি ও তার সৈন্যদের 'রিগ্রুপিং' এর প্রস্তাব দেন। কিন্তু ভারতীয় সেনাপ্রধান একে নিরঙ্কুশ আত্মসমর্পণে পরিণত করেন। এর মধ্য দিয়ে ভারত শুধু সামরিক বিজয় অর্জন করেনি, ব্রিটিশদের ভারতে পৌঁছার আগে যে মুসলমানরা শত শত বছর ধরে উপমহাদেশ শাসন করেছে, সেই মুসলমানদের বিরুদ্ধেও ভারত নিশ্চিত করতে পারল এক মনস্তাত্ত্বিক বিজয়। তার কথায়, 'পাকিস্তানের জন্য এই বৃহত্তম ট্র্যাজেডি নিশ্চিত হয় পূর্ব পাকিস্তানকে ২৪ বছর ধরে বঞ্চনা ও দুঃশাসনের ধারাবাহিকতায়। মনে রাখতে হবে, ভারতের তৎপরতা ছিল এক নগ্ন আগ্রাসন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ রাজি না থাকলে এটা করার সাহস তারা পেত না।' ভারত ১৫ ডিসেম্বর রাত ৮টায় পশ্চিম ফ্রন্টে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেয়।

সোভিয়েতের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের কৃতজ্ঞতা

আজ ১৬ ডিসেম্বর। বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে হেনরি কিসিঞ্জার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নয়, 'চীনের জন্য অবিশ্বাস্য বিপর্যয়' হিসেবে বর্ণনা করেন। '৭১ এর এ দিনে ওয়াশিংটন সময় সকাল সাড়ে ৯টায় নিক্সন ও কিসিঞ্জারের টেলি সংলাপের ট্রান্সক্রিপশন থেকে দেখা যাচ্ছে, যখন ঢাকায় আত্মসমর্পণের তোড়জোড় চলছে, তখনো তারা পশ্চিম পাকিস্তানের অখণ্ডতা নিয়ে উদ্বিগ্ন। নিক্সন বলছেন, ভারত যদি তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখে, তাহলে আমরা এমনকি দিল্লির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্নের সিদ্ধান্ত নেব। আপনি কি একমত নন হেনরি? 'আমি একমত। ইতোমধ্যেই একটি শক্তিশালী বিজয় বিবৃতি ঘোষিত হয়েছে। এবং তা চীনাদের জন্য এক অবিশ্বাস্য অভিঘাত। এর কোনোটিতেই অবশ্য আমাদের কিছু যায় আসে না, কিন্তু তারা নিশ্চয়ই তাদের অপদস্থ করেছে।' কিসিঞ্জার এই প্রথম নিক্সনকে জানালেন, জর্ডান ১৭টি প্লেন পাঠিয়েছে। দুই নেতাই পশ্চিম পাকিস্তান প্রশ্নে রাশিয়ার মনোভাবে সংশয়গ্রস্ত থেকেই খুঁটিনাটি আলোচনা করেন। পশ্চিম পাকিস্তান প্রশ্নে কোনো হুমকি দেখা দিলে যুক্তরাষ্ট্র সম্ভাব্য কী ব্যবস্থা নিতে পারে তা নিয়ে তারা মতবিনিময় করেন। নিক্সনের মন্তব্য : 'মধ্যপ্রাচ্যের আলোচনা বন্ধ করে দিন, ইসরায়েলকে তুলে দিন অস্ত্র। ভেঙে দিন সল্ট আলোচনা। এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পরিষদ প্রকাশ্যে এর ভয়ঙ্কর দিক সম্পর্কে বিবৃতি দিক। আমি প্রয়োজনে আরো বহুদূর যাব। বাণিজ্যসংক্রান্ত আলোচনা আমরা বন্ধ করে দেব। এবং আনাতলি দোবরিনিনের সঙ্গেও যে কোনো পরিস্থিতিতে কথা বলা বন্ধ করে দিতে হবে।' পশ্চিম পাকিস্তানে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব কার্যকর না হলে নিক্সন নির্দেশ দেন বাজেট থেকে প্রদেয় ভারতের কাছ থেকে সব সাহায্য কেড়ে নিতে। নিক্সন ১ ঘণ্টার মধ্যে ভারতকে কী কী উপায়ে শায়েস্তা করা যায় তা জানাতে নির্দেশ দেন। কিসিঞ্জারের সঙ্গে এই সংলাপ শেষের অল্প পরেই ১০টা ৪০ মিনিটে কিসিঞ্জার নিক্সনকে জানান, ভারত একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে পশ্চিম ফ্রন্টে। কিসিঞ্জার ভারতের ওপর এ লক্ষ্য অর্জনে যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করায় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আজ নিক্সনকে দেয়া কিসিঞ্জারের এক স্মারকে তথ্য দেন, গত ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত পশ্চিম ফ্রন্টে ভারতের পাক ভূখণ্ড ছিনিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টাকে সোভিয়েতরা দৃশ্যত উৎসাহিত যেমন করেনি, তেমনি গুরুত্বের সঙ্গে নিরুৎসাহিতও করেনি। এক

আলোচনায় (সূত্র ডিক্লাসিফাই করা হয়নি) সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত পেগভ কথিতমতে বলেছেন, পাকিস্তানের যুদ্ধযন্ত্র ইতোমধ্যেই ধ্বংস হয়ে গেছে। পশ্চিম ফ্রন্টে ভারতীয় হামলার দরকার ছিল না। কিন্তু তারপরও রুশ পরামর্শ উপেক্ষা করে ভারত যদি পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করে নিতে চায়, তাহলে এটা যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে সম্পূর্ণ করতে হবে। এবং সে ক্ষেত্রে সোভিয়েতরা 'হস্তক্ষেপ করবে না'। পেগভ এবং অন্য আরেক রুশ কূটনীতিক একই দিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা চীনের সম্ভাব্য সামরিক হস্তক্ষেপ নিয়ে কথা বলেছেন। পেগভ বলেছেন, সোভিয়েত নৌবহরও ভারত মহাসাগরে রয়েছে। এবং তারা সপ্তম নৌবহরকে হস্তক্ষেপ করতে দেবে না। চীনারা যদি লাদাখে আক্রমণ করে, তাহলে 'সোভিয়েতরা চীনা প্রদেশ সিনকিয়াংয়ে পাল্টা হামলা চালাবে। এই দলিল থেকে আরেকটি ইঙ্গিত মিলছে যে, সোভিয়েতরা ভারতের স্বপক্ষে সর্বাত্মক অবস্থান গ্রহণ করলেও তারা পাকিস্তানের সঙ্গে অবশিষ্ট সম্পর্ক নস্যাৎ করতে চায়নি। সোভিয়েত উপ-প্রধানমন্ত্রী কুজনেৎসোভ আলোচনাকালে (কার সঙ্গে তা ডিক্লাসিফাই করা হয়নি) বলেছেন, অন্তত ঢাকার পতন এবং পাক সেনাবাহিনীর কবল থেকে দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তারা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে না। কারণ ইসলামাবাদের সঙ্গে তাদের যতটুকু সখ্য রয়েছে, তা তারা বজায় রাখতে চায়। এ কারণেই ভারতের প্রস্তাব অনুযায়ী সোভিয়েত বাংলাদেশের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি সইয়ে রাজি হয়নি। এই দলিলে আরো তথ্য দেয়া হয়েছে, সিকিম সীমান্তে ভারতীয় সৈন্যদের অনুপ্রবেশের (শত্রুপক্ষের অবস্থান জানতে) প্রতিবাদে চীন শক্তিশালী প্রতিবাদ জানিয়েছে। চীন এই তৎপরতাকে 'ভয়ঙ্কর অনুপ্রবেশ' এবং তা 'অবিলম্বে বন্ধের' দাবি জানায়। কিসিঞ্জার মন্তব্য করেন, এটা সম্ভবত একটা অজুহাত। এর মাধ্যমে চীন ভারত সীমান্তে সীমিত সামরিক অভিযান বাজায় রাখবে। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পশ্চিম পাকিস্তানের ফ্রন্ট থেকে ভারতের মনোযোগ সরিয়ে রাখা। কিসিঞ্জার জানান, আমাদের সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরের কাছে শ্রীলঙ্কার পূর্বে অবস্থান করছে। এদিন নয়াদিল্লিতে স্থানীয় সময় দুপুর আড়াইটায় ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় ঘোষণা করেন, জেনারেল নিয়াজি ঢাকায় ১ ঘণ্টা আগে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেছেন। ভারত পূর্ব ও পশ্চিম ফ্রন্টে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে। এবং ভারতের কোনো ভূখণ্ডগত অভিসন্ধি নেই। কিন্তু মার্কিন নথি থেকে দেখা যাচ্ছে, পাক রাষ্ট্রদূত এক ব্যাকচ্যানেল বার্তায় কিসিঞ্জারকে জানান, ব্রিটিশদের কাছ থেকে আমি এইমাত্র খবর পেয়েছি, ভারত তাদের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মাত্র ২৪ ঘণ্টার জন্য কার্যকর রাখবে। আমি আরো জানতে পেরেছি, সোভিয়েতরা নিরাপত্তা পরিষদে এমন এক প্রস্তাব আনতে যাচ্ছে যা বাড়তি বিতর্কের জন্ম দেবে। সুতরাং ইয়াহিয়ার উচিত হবে কালবিলম্ব না করে দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মেনে নেয়া। সে ক্ষেত্রে পশ্চিম ফ্রন্টে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে ভারত পাকিস্তানকে দায়ী করতে পারবে না। এদিন ভরোনৎসোভ সোভিয়েতের খসড়া প্রস্তাব কিসিঞ্জারকে পড়ে শোনান। নিক্সন একমত হন এ প্রস্তাব আগের চেয়ে উন্নত। কিন্তু এখনো সমর্থনযোগ্য নয়।

জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি ইকবাল আখুন্দ লিখেছেন, অবজারভার পত্রিকার ১৯ ডিসেম্বর সংখ্যায় গেভিন ইয়ং লিখেছেন, ইয়াহিয়া নিয়াজিকে আশ্বস্ত করেছিলেন, আমেরিকান ও চীনা হস্তক্ষেপ আসন্ন।

হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টে আপোস ও প্রকৃত আত্মসমর্পণ শীর্ষক পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, ভারতীয় দল আত্মসমর্পণের জন্য যে দলিলটি নিয়ে এলেন তাতে বলা হলো ভারতীয় ও বাংলাদেশের যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে কেউ কেউ আপত্তি তুললেন। বাংলাদেশের কাছে আত্মসমর্পণের কথাটিতে বাদ সাধলেন। কিন্তু ব্যাখ্যা দেয়া হলো এই আত্মসমর্পণ আসলে ভারতের কাছে। বাংলাদেশের উল্লেখ শুধুই আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। নিয়াজি ও তার চিফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বকর সিদ্দিকি আপত্তি করেননি। বরং এটাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তারা একটি যুক্তি দেখাতে চেয়েছেন। আর তা হলো, তারা এই ভেবে শঙ্কিত ছিলেন যে পশ্চিম পাকিস্তানি ও তাদের অনুগতদের যদি মুক্তিবাহিনীর হাতে তুলে দেয়া হয়, তাহলে রক্তপাত অনিবার্য হতে পারে। কমিশন বলেছে, আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি এই ভীতি যথার্থ ছিল না। কমিশনের বর্ণনায় একজন প্রত্যক্ষদর্শীও কথিত ভীতির সত্যতা কবুল করেননি। জেনারেল জেকব পাইপ টানতে টানতে বলেছেন, এই খসড়া দিল্লি থেকে এসেছে। কোনো সংশোধন ছাড়াই এটি সই করতে হবে। কমিশন পক্ষপাত দেখিয়েছে এই অভিযোগের প্রতি : 'নিয়াজি ও বকরের সঙ্গে ভারতীয়দের গোপন সমঝোতা হয়। তাদের পরে বিশেষ আতিথ্য দিতে দেখা গেছে। অরোরাকে অভ্যর্থনা জানাতে নিয়াজির এয়ারপোর্ট গমন ছিল বাহুল্য!'

রিচার্ড সিশন ও লিও ই. রোজ মন্তব্য করেছেন, আত্মসমর্পণের শর্তাবলি প্রণয়নের উদ্যোক্তা ছিলেন জেনারেল মানেকশ। ১৬ ডিসেম্বর এই দলিলটি জেনারেল জেকব হস্তান্তর করেন নিয়াজির কাছে।

ডকুমেন্টস্ ও আলোকচিত্র

নিক্সনের হাতে লেখা মন্তব্য সম্বলিত কিসিঞ্জারের স্মারক
২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

MEMORANDUM

THE WHITE HOUSE

WASHINGTON

THE PRESIDENT HAS SEEN...

INFORMATION
25916

~~SECRET/EXDIS~~

February 22, 1971

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT

FROM: Henry A. Kissinger

SUBJECT: Situation in Pakistan

The chances seem to be increasing that we might before long be faced with an internal crisis in Pakistan that could over time have far-reaching implications for our interests in South Asia. I have ordered some contingency planning and want to describe the situation as it now stands.

The immediate potential for trouble arises from the hard negotiations that are about to begin over writing a new constitution for Pakistan. As you know, the main issue is the power relationship between East and West Pakistan.

The dominant political leaders in East (Mujibur Rahman) and West (Zulfikar Bhutto) Pakistan have failed so far to forge even the beginning of an informal consensus on the new constitution. President Yahya remains committed to turning his military government over to the civilian politicians, but maintains that he will not preside over the splitting of Pakistan.

The constituent assembly is now scheduled to meet March 3, after which it will have 120 days to draft a constitution subject to the President's approval. The odds, however, seem to be increasing against the constituent assembly's being able to come up with a constitution acceptable to each of the major parties--Rahman, Bhutto and Yahya. Rahman is now planning to stick with his demands for the virtual autonomy of East Pakistan and if he does not get his way--which is very likely--to declare East Pakistan's independence. This may be a negotiating ploy on his part, but strong and growing provincial nationalism limits Rahman's flexibility and he has considerable organizational momentum behind his maximum demands. Further evidence of his intentions can be seen in recent approaches he has made to U.S.

~~SECRET/EXDIS~~

and other diplomats to play a peacemaking role to avoid an East-West civil war if he does not get his way and makes a unilateral declaration of independence.

The highly uncertain internal situation in Pakistan has forced us to walk a very narrow tightrope. We are not the controlling factor by any means, but our influence and support is sought by the major political leaders. We do have some important interests, and our posture at this juncture is critical to how these interests will be protected in the future.

The U.S. position has been that we support the unity of Pakistan. This has not been gratuitous. Some Pakistani politicians have charged -- for their own purposes -- that the U.S. is plotting East Pakistani secession, and we have taken the obvious position in denying these charges. Thus, our Counsul General in Dacca has urged Rahman to seek a constitutional decision and has scrupulously avoided any implication of U.S. intervention if Rahman opts out of a unified Pakistan.

good

However, we could before long be faced with a declaration of East Pakistani independence. Although there is a large negotiating element in current threats of secession, we may face that situation. That raises the issue of whether or not we should be adopting a more neutral stance toward Rahman, who is basically friendly toward the U.S., as a hedge against the day when we might have to deal with an independent East Pakistan. A realistic assessment would seem to recognize that there is very little material left in the fabric of the unity of Pakistan. This would argue for adjusting our posture, but against that is the fact that the division of Pakistan would not serve U.S. interests.

At a minimum, it would seem imperative that, in the face of the growing possibility that East and West Pakistan will split, we draw together our contingency planning on how best to protect U.S. interests. In the context of a larger study of South Asia policy already underway, I have ordered a special contingency plan so that we will have something on hand if we need it.

not yet - Correct - but not any position which encourages secession

086

ব্লাডের ঐতিহাসিক টেলিগ্রাম : ২৮ মার্চ ১৯৭১

POL 23-9 PAK

EXDIS EXDIS EXDIS EXDIS EXDIS

Department of State **TELEGRAM**

CONFIDENTIAL 206

PAGE 01 DACCA 00959 280718Z

21
ACTION SS-45

INFO OCT-01 SSO-00 CCO-00 NSCE-00 /046 W
021278

O P 280540Z MAR 71
FM AMCONSUL DACCA
TO SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 2989
AMEMBASSY ISLAMABAD
INFO AMCONSUL KARACHI PRIORITY
AMCONSUL LAHORE
AMEMBASSY LONDON
AMCONSUL CALCUTTA
AMEMBASSY BANGKOK
AMEMBASSY NEW DELHI
CINCSTRIKE
CINCPAC
MAC

C O N F I D E N T I A L DACCA 0959
EXDIS
SUBJECT: SELECTIVE GENOCIDE

1. HERE IN DACCA WE ARE MUTE AND HORRIFIED WITNESSES TO A REIGN OF TERROR BY THE PAK MILITARY. EVIDENCE CONTINUES TO MOUNT THAT THE MLA AUTHORITIES HAVE A LIST OF AWAMI LEAGUE SUPPORTERS WHOM THEY ARE SYSTEMATICALLY ELIMINATING BY SEEKING THEM OUT IN THEIR HOMES AND SHOOTING THEM DOWN.

2. AMONG THOSE MARKED FOR EXTINCTION IN ADDITION TO A-L HIERARCHY, ARE STUDENT LEADERS AND UNIVERSITY FACULTY. IN THIS SECOND CATEGORY WE HAVE REPORTS THAT FAZLUR RAHMAN, HEAD OF APPLIED PHYSICS DEPARTMENT, PROFESSOR DEV, HEAD OF PHILOSOPHY DEPARTMENT AND A HINDU, M. ABEDIN, HEAD OF DEPARTMENT OF HISTORY, HAVE BEEN KILLED. RAZZAK OF POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT IS RUMORED DEAD. ALSO ON LIST ARE BULK OF MNA'S ELECT AND NUMBER OF MPA'S.

3. MOREOVER, WITH SUPPORT OF PAK MILITARY, NON-BENGALI MUSLIMS ARE SYSTEMATICALLY ATTACKING POOR PEOPLE'S QUARTERS AND MURDERING BENGALIS AND HINDUS. STREETS

NOT TO BE REPRODUCED WITHOUT THE AUTHORIZATION OF THE EXECUTIVE SECRETARY

EXDIS EXDIS EXDIS EXDIS EXDIS

Department of State **TELEGRAM**

CONFIDENTIAL

PAGE 02 DACCA 00959 280718Z

OF DACCA ARE AFLOOD WITH MINGUS AND OTHERS SEEKING TO GET OUT OF DACCA. MANY BENGALIS HAVE SOUGHT REFUGE IN HOMES OF AMERICANS, MOST OF WHOM ARE EXTENDING SHELTER.

4. TIGHTNING OF CURFEW TODAY !!T IS BEING REIMPOSED AT NOON! SEEMS DESIGNED TO FACILITATE PAK MILITARY SEARCH AND DESTROY OPERATIONS. THERE IS NO RPT NO RESISTANCE BEING OFFERED IN DACCA TO MILITARY.

5. FULL HORROR OF PAK MILITARY ATROCITIES WILL COME TO LIGHT SOONER OR LATER. I, THEREFORE, QUESTION CONTINUED ADVISABILITY OF PRESENT USG POSTURE OF PRETENDING TO BELIEVE GOP FALSE ASSERTIONS AND DENYING, FOR UNDERSTOOD REASONS, THAT THIS OFFICE IS COMMUNICATING DETAILED ACCOUNT OF EVENTS IN EAST PAKISTAN. WE SHOULD BE EXPRESSING OUR SHOCK, AT LEAST PRIVATELY TO GOP, AT THIS WAVE OF TERROR DIRECTED AGAINST THEIR OWN COUNTRYMEN BY PAK MILITARY. I, OF COURSE, WOULD HAVE TO BE IDENTIFIED AS SOURCE OF INFORMATION AND PRESUMABLY GOP WOULD ASK ME TO LEAVE. I DO NOT BELIEVE SAFETY OF AMERICAN COMMUNITY WOULD BE THREATENED AS A CONSEQUENCE, BUT OUR COMMUNICATION CAPABILITY WOULD BE COMPROMISED. GP-3.
BLOOD

NOTE BY OC/T: EXDIS CAPTION ADDED PER S/S-O, MR. NADZO, 3/28/71.

REPRODUCED WITHOUT THE AUTHORIZATION OF THE EXECUTIVE SECRETARY
CONFIDENTIAL

ঢাকায় মার্কিণ কূটনৈতিক ও কর্মকর্তাদের ভিন্নমত : ৬ এপ্রিল ১৯৭১

37

POL 1 PAK-US

Department of State **TELEGRAM**

DACCA 1138
4-6-71

CONFIDENTIAL 084

PAGE 01 DACCA 01138 061008Z

21
ACTION NEA-08

INFO OCT-01 SS-20 AID-12 USIE-00 NSC-10 NSCE-00 CIAE-00
INR-07 SSO-00 NSA-01 RSC-01 /060 W
092431

P 060730Z APR 71
FM AMCONSUL DACCA
TO SECSTATE WASHDC PRIORITY 3124
AMEMBASSY ISLAMABAD
INFO AMCONSUL KARACHI
AMCONSUL LAHORE

C O N F I D E N T I A L DACCA 1138
LIMDIS
SUBJ: DISSENT FROM U.S. POLICY TOWARD EAST PAKISTAN

JOINT STATE/AID/USIS MESSAGE

1. AWARE OF THE TASK FORCE PROPOSALS ON "OPENESS" IN THE FOREIGN SERVICE, AND WITH THE CONVICTION THAT U.S. POLICY RELATED TO RECENT DEVELOPMENTS IN EAST PAKISTAN SERVES NEITHER OUR MORAL INTERESTS BROADLY DEFINED NOR OUR NATIONAL INTERESTS NARROWLY DEFINED, NUMEROUS OFFICERS OF AMCONGEN DACCA, USAID DACCA AND USIS DACCA CONSIDER IT THEIR DUTY TO REGISTER STRONG DISSENT WITH FUNDAMENTAL ASPECTS OF THIS POLICY. OUR GOVERNMENT HAS FAILED TO DENOUNCE THE SUPPRESSION OF DEMOCRACY. OUR GOVERNMENT HAS FAILED TO DENOUNCE ATROCITIES. OUR GOVERNMENT HAS FAILED TO TAKE FORCEFUL MEASURES TO PROTECT ITS CITIZENS WHILE AT THE SAME TIME BENDING OVER BACKWARDS TO PLACATE THE WEST PAK DOMINATED GOVERNMENT AND TO LESSEN LIKELY AND DERSERVEDLY NEGATIVE INTERNATIONAL PUBLIC RELATIONS IMPACT AGAINST THEM. OUR GOVERNMENT HAS EVIDENCED WHAT MANY WILL CONSIDER MORAL BANKRUPTCY, IRONICALLY AT A TIME WHEN THE USSR SENT PRESIDENT YAHYA A MESSAGE DEFENDING DEMOCRACY, CONDEMNING ARREST OF LEADER OF DEMOCRATICALLY ELECTED MAJORITY PARTY (INCIDENTALLY PRO-WEST) AND CALLING FOR END TO REPRESSIVE MEASURES AND BLOODSHED. IN OUR MOST RECENT POLICY PAPER FOR PAKISTAN, OUR INTERESTS IN PAKISTAN WERE DEFINED AS PRIMARILY HUMANI-

(1)

CONFIDENTIAL

Department of State **TELEGRAM**

CONFIDENTIAL

PAGE 02 DACCA 01138 061008Z

TARIAN, RATHER THAN STRATEGIC. BUT WE HAVE CHOSEN NOT TO INTERVENE, EVEN MORALLY, ON THE GROUNDS THAT THE AWAMI CONFLICT, IN WHICH UNFORTUNATELY THE OVERWORKED TERM GENOCIDE IS APPLICABLE, IS PURELY INTERNAL MATTER OF A SOVERIGN STATE. PRIVATE AMERICANS HAVE EXPRESSED DISGUST. WE, AS PROFESSIONAL PUBLIC SERVANTS EXPRESS OUR DISSENT WITH CURRENT POLICY AND FERVENTLY HOPE THAT OUR TRUE AND LASTING INTERESTS HERE CAN BE DEFINED AND OUR POLICIES REDIRECTED IN ORDER TO SALVAGE OUR NATION'S POSITION AS A MORAL LEADER OF THE FREE WORLD.

2. OUR SPECIFIC AREAS OF DISSENT, AS WELL AS OUR POLICY PROPOSALS, WILL FOLLOW BY SEPTEL.

3. SIGNED.
BRIAN BELL
ROBERT L. BOURQUEIN
W. SCOTT BUTCHER
ERIC GRIFFEL
ZACHARY M. HAHN
JAKE HARSHBARGER
ROBERT A. JACKSON
LAWRENCE KOEGEL
JOSEPH A. MALPELE
WILLARD D. MCCLEARY
DEGAIX MYERS
JOHN L. NEGVIG
WILLIAM GRANT PARR
ROBERT CARCE
RICHARD L. SIMPSON
ROBERT C. SIMPSON
RICHARD E. SUTTOR
WAYNE A. SWEDENBURG
RICHARD L. WILSON
SHANNON W. WILSON

4. I SUPPORT THE RIGHT OF THE ABOVE NAMED OFFICERS TO VOICE THEIR DISSENT, BECAUSE THEY ATTACH URGENCY TO THEIR EXPRESSION OF DISSENT AND BECAUSE WE ARE WITHOUT ANY MEANS OF COMMUNICATION OTHER THAN TELEGRAPHIC, I AUTHORIZE THE USE OF A TELEGRAM FOR THIS PURPOSE.

CONFIDENTIAL

000

Department of State **TELEGRAM**

CONFIDENTIAL

PAGE 03 DACCA 01138 061008Z

5. I BELIEVE THE VIEWS OF THESE OFFICERS, WHO ARE AMONG THE FINEST US OFFICIALS IN EAST PAKISTAN, ARE ECHOED BY THE VAST MAJORITY OF THE AMERICAN COMMUNITY, BOTH OFFICIAL AND UNOFFICIAL. I ALSO SUBSCRIBE TO THESE VIEWS BUT I DO NOT THINK IT APPROPRIATE FOR ME TO SIGN THEIR STATEMENT AS LONG AS I AM PRINCIPAL OFFICER AT THIS POST.

6. MY SUPPORT OF THEIR STAND TAKES ON ANOTHER DIMENSION AS I HOPE TO DEVELOP IN FURTHER REPORTING. I BELIEVE THE MOST LIKELY EVENTUAL OUTCOME OF THE STRUGGLE UNDERWAY IN EAST PAKISTAN IS A BENGALI VICTORY AND THE CONSEQUENT ESTABLISHMENT OF AN INDEPENDENT BANGLA DESH. AT THE MOMENT WE POSSESS THE GOOD WILL OF THE AWAMI LEAGUE. WE WOULD BE FOOLISH TO FORFEIT THIS ASSET BY PURSUING A RIGID POLICY OF ONE-SIDED SUPPORT TO THE LIKELY LOSER.

GP-3.

BLOOD

NOTE BY OC/T: LIMDIS CAPTION ADDED PER S/S-O, MR. PASSAGE, 4/6/71.

CONFIDENTIAL

37

DEPARTMENT OF STATE

Washington, D.C. 20520

RSR FILES

Attention Mrs Mullett

Keep this paper together.

CONFIDENTIAL

7105326

April 6, 1971

CRAIG BAXTER ET AL

The Honorable
William P. Rogers
Secretary of State
Washington, D. C.

Dear Mr. Secretary:

The undersigned officers, all of whom have specialized in South Asian affairs for the major portion of their service, wish to associate themselves with the views expressed in Dacca 1138 (copy attached) and to urge that the United States Government take immediate steps to meet the objections raised in paragraph one of the telegram.

Sincerely yours,

Craig Baxter NEA/PAF

A. Peter Burleigh NEA/INC

Townsend S. Swayze AID/NESA

Joel M. Woldman NEA/PAF

Anthony C. E. Quainton NEA/INC

Howard B. Schaffer NEA/EX

Douglas M. Cochran INR/RNA

CONFIDENTIAL

POL 1 PAK-US

(2)

MICROFILMED
BY S/S: CMC

002

John Eaves, Jr. NEA/P

Robert A. Flaten, NEA/PAF

নিক্সনের হাতে লেখা নির্দেশ : ২৮ এপ্রিল ১৯৭১

MEMORANDUM

THE WHITE HOUSE

WASHINGTON

ACTION
27870

April 28, 1971

SECRET

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT

FROM: Henry A. Kissinger K

SUBJECT: Policy Options Toward Pakistan

I do not normally bother you with tactical judgments. But in the case of the present situation in Pakistan, policy depends on the posture adopted toward several major problems. The purpose of this memo is to seek your guidance on the general direction we should be following.

The Situation

Three weeks after the West Pakistani military crackdown, these three judgments seem to characterize the situation we must deal with:

—The West Pakistani military seem likely to regain physical control of the main towns and connecting arteries. The resistance is too poorly organized and equipped to prevent that now.

--Physical control does not guarantee restoration of essential services like food distribution and normal economic life because that requires Bengali cooperation which may be withheld.

—Suppression of the resistance, even if achieved soon, will leave widespread discontent and hatred in East Pakistan, with all that implies for the possibility of effective cooperation between the populace and the military, for eventual emergence of an organized resistance movement and for the unity of Pakistan.

--Tension between India and Pakistan is at its highest since 1965, and there is danger of a new conflict if the present situation drags on.

Those judgments suggest that there will probably be an interim period, perhaps of some length, in which (a) the West Pakistanis attempt to re-establish effective administration but (b) even they may recognize the need to move toward greater East Pakistani autonomy in order to draw the necessary Bengali cooperation.

SECRET

What we seem to face, therefore, is a period of transition to greater East Pakistani autonomy and, perhaps, eventual independence. How prolonged and how violent this period is will depend heavily on the judgments made in East and West Pakistan.

—In the East, leaders of the resistance will be faced with the problem of weighing the political disadvantages of cooperating with a West Pakistani administration against the need to restore essential services, especially food distribution. Without that restoration, large-scale starvation seems unavoidable.

—The West Pakistanis, on their part, face serious financial difficulties within the next several months. They have told us that unless they receive emergency foreign exchange help they will have to default on outstanding external loan repayments and restrict imports to the point of stagnating the economy and possibly bringing on a financial crash. It may well be that, as these costs become apparent to a wider group in West Pakistan, the pressure on President Yahya to let East Pakistan go will mount.

Outside actors will also play roles of varying significance:

--India will be the most important. By training and equipping a relatively small Bengali resistance force, India can help keep active resistance alive and increase the chances of a prolonged guerrilla war. From all indications, the Indians intend to follow such a course. They could also make it difficult for Yahya to negotiate a political transition in East Pakistan by recognizing a Bengali government. They seem more cautious on this.

—The US will be an important factor from outside the area: (a) We still have influence in West Pakistan and remain important to India. (b) US economic support--multiplied by US leadership in the World Bank consortium of aid donors--remains crucial to West Pakistan. Neither Moscow nor Peking can duplicate this assistance. (c) Our military supply, while relatively small and unlikely to affect the outcome of the fighting, is an important symbolic element in our posture.

--The USSR is concerned that instability will work to China's advantage and has shown perhaps more inclination in recent years than the US toward trying to settle disputes in the subcontinent. In the short run, Soviet interests seem to parallel our own, although they would certainly like to use this situation to undercut our position in India.

--Communist China could (a) be West Pakistan's main ally in threatening India with diversionary military moves and (b) eventually enter the contest with India for control of the East Pakistani resistance movement. For the moment, the Chinese seem to have cast their lot with the West Pakistanis.

The Options

The options are most clearly understood in terms of decisions on our ongoing programs. There are three, each described in terms of concrete actions that would be taken:

Option 1 would be essentially a posture of supporting whatever political and military program President Yahya chooses to pursue in the East. Specifically:

--On economic assistance, we would support debt relief and go on with our full development aid program as soon as the West Pakistanis could assure us that the money would go for development purposes, not to financing the war effort. We would not concern ourselves that most of the aid would go to the West.

--On food assistance, we would proceed with all shipments at the request of the government and state no conditions about how they distribute or withhold food from specific areas in East Pakistan.

--On military assistance, we would allow all shipments but ammunition to proceed. We would delay ammunition without taking any formal action.

Option 2 would be to try to maintain a posture of genuine neutrality. Specifically:

--On economic assistance, we would delay all further aid until the IMF and World Bank were satisfied that Pakistan has a satisfactory development plan revised to take account of the recent disruption in economic activity and to assure equitable allocation of resources between East and West Pakistan.

--On food assistance, instead of deferring to the West Pakistani government on distribution, we would insist before resuming shipments on assurance that food would be distributed equitably throughout East Pakistan, in the cyclone disaster area and in the countryside as well as in the army-controlled towns.

--On military assistance, we would have to defer all deliveries of ammunition, death-dealing equipment and spare parts for it. Non-lethal equipment and spares might continue.

Option 3 would be to make a serious effort to help Yahya end the war and establish an arrangement that could be transitional to East Pakistani autonomy. Such an effort would have to carry with it the understood possibility that, if the political effort broke down, US aid might have to be reduced by virtue of our being unable to operate in the East. But our approach for the time being would be to support emergency help for the Pakistani economy to tide them over while we work with them in restructuring their development program in both West and East. We would not withhold aid now for the sake of applying pressure. We would face that question only after giving the West Pakistanis every chance to negotiate a settlement in the face of the costs of not doing so. Specifically:

--On economic assistance, we would state our willingness to help in the context of a West Pakistani effort to negotiate a viable settlement. We would have to point out that it will be beyond US--or World Bank or IMF--financial capacity to help Pakistan if the situation drags on and Pakistan faces a financial crisis. We would also have to point out that US assistance legislation requires that economic aid be reduced to the extent that there is a possibility of its diversion to military purposes. We would back World Bank and IMF efforts to provide short-term emergency assistance while helping West Pakistan to reshape the rationale for the development lending program--but with the intent of providing a framework to move ahead, not of

seeking a facade for cutting aid. To justify this approach, Yahya would have to produce an administration in East Pakistan that would have enough Bengali acceptance to win popular cooperation in restoring essential services and preventing a further constitutional crisis soon. In the meantime, we would continue to process any loans whose development purposes have not been disrupted by the war.

—On food assistance, we would allow shipments to resume as soon as food could be unloaded and move into the distribution system. We would not stipulate destination, except perhaps for that amount committed to the cyclone disaster area. It would be implicit in our overall approach, however, that our objective would be the broad distribution that would come with restoring essential services.

—On military assistance, we would take a line similar to that on economic aid. In practical terms, this would amount to allowing enough shipments of non-lethal spares and equipment to continue to avoid giving Yahya the impression we are cutting off military assistance but holding shipment of more controversial items in order not to provoke the Congress to force cutting off all aid.

Comment on the Options. My own recommendation is to try to work within the range described by Option 3 above.

—Option 1 would have the advantage of preserving our relationship with West Pakistan. It would have the disadvantage of encouraging the West Pakistanis in actions that would drag out the present situation and increase the political and economic costs to them and to us.

--Option 2 would have the advantage of creating a posture that would be publicly defensible. The disadvantage would be that the necessary cutback in military and economic assistance would tend to favor East Pakistan. We would be doing enough to disrupt our relationship with West Pakistan but not enough to help the East or promote a political settlement.

—Option 3 would have the advantage of making the most of the relationship with Yahya while engaging in a serious effort to move the situation toward conditions less damaging to US and Pakistani

interests. Its disadvantage is that it might lead to a situation in which progress toward a political settlement had broken down, the US had alienated itself from the 600 million people in India and East Pakistan and the US was unable to influence the West Pakistani government to make the concessions necessary for a political settlement.

If I may have your guidance on the general approach you wish taken, I shall calibrate our posture accordingly on other decisions as they come up.

Prefer Option 1--unqualified backing for West Pakistan _____

Prefer Option 2--neutrality which in effect leans toward the East _____

Prefer Option 3--an effort to help Yahya achieve a negotiated settlement _____

To all hands
Don't squeeze
Yaya at this
time
RN

ইয়াহিয়াকে নিক্সনের হাতে লেখা চিঠি : ৭ আগস্ট ১৯৭১

Winston:

Original of attached hand-written Presidential letter to Yahya was given to Ambassador Farland for hand-delivery on 8/10/71. One copy was furnished to Marge Acker for the President's files. The balance of the copies (too many, I'm sure) are attached for the special files.

Lora -- 8/11/71

THE WHITE HOUSE
WASHINGTON

August 7, 1971

Dear Mr. President -

I have already expressed my official appreciation for your assistance in arranging our contacts with the People's Republic of China -

Through this personal note I want you to know that without your personal assistance this profound breakthrough in relations between the USA and the PRC would never have been accomplished.

I wish you would extend my personal thanks to

you Barbara in Washington and to your associate in Pakistan for their efficiency and discretion in handling the very sensitive arrangements.

Those who want a more peaceful world in the generation to come will forever be in your debt.

Dr Kissinger joins me in expressing our sincere gratitude for the historic role you played during this very difficult period.

Sincerely,

Richard Nixon

THE WHITE HOUSE

The President of Pakistan

Personal

আলমগির রহমানের প্রস্তাব : ৩ অক্টোবর ১৯৭১

EXDIS EXDIS EXDIS EXDIS EXDIS

32

POL PAK

Department of State **TELEGRAM**

~~SECRET~~ 936

PAGE 01 DACCA 00697 101343Z

45
ACTION SS-45

INFO OCT-01 SSO-00 NSCE-00 CCO-00 /046 W
---------- 062616

O P 101205Z MAR 71
FM AMCONSUL DACCA
TO SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 2847
AMEMBASSY ISLAMABAD
INFO RUM
SKYAMEMBASSY BANGKOK PRIORITY 434
AMEMBASSY LONDON
AMCONSUL KARACHI
AMCONSUL LAHORE
AMEMBASSY NEW DELHI

~~S E C R E T~~ DACCA 697

~~EXDIS~~

BANGKOK FOR AMBASSADOR FARLAND

SUBJECT: PAK POLITICAL CRISIS

REF: ISLAMABAD 1975, 1976

Pol Pak

1) ALAMGIR RAHMAN (PROTECT) CAME TO SEE ME THIS MORNING WITH WHAT HE SAID WAS MESSAGE FROM MUJIB. ACCORDING ALAMGIR, MUJIB HAD WANTED YAHYA TO COME TO DACCA FOR TALKS AND WAS GREATLY RELIEVED AT NEWS THAT YAHYA WAS IN FACT COMING. MUJIB WANTED VERY MUCH TO WORK OUT WITH YAHYA SOME POLITICAL SETTLEMENT THAT WOULD AVOID BLOODSHED, SATISFY BENGALI ASPIRATIONS, AND PRESERVE SOME VESTIGE OF LINK WITH PAKISTAN. ALAMGIR OPINED THAT IT IS NOW TOO LATE TO TALK IN TERMS OF SIX-POINT CONSTITUTION BUT PERHAPS SOME SOLUTION CAN BE FOUND ALONG LINES OF CONFEDERATION, WITH SEPARATE CONSTITUTIONS FOR EAST AND WEST PAKISTAN, AND ONE ARMY AND ONE FOREIGN MINISTRY.

2) MUJIB'S QUESTION, SAID ALAMGIR, WAS "DOES THE UNITED STATES WANT TO SEE MILITARY CONFRONTATION WITH

NOT TO BE REPRODUCED WITHOUT THE AUTHORIZATION OF THE EXECUTIVE SECRETARY

~~SECRET~~

(1)

45 Dacca 697 3-10-71

EXDIS EXDIS EXDIS EXDIS EXDIS

Department of State **TELEGRAM**

SECRET

PAGE 02 DACCA 00697 181343Z

THE PROSPECT OF EVENTUAL COMMUNIST DOMINATION OF BENGAL OR WOULD IT PREFER A POLITICAL SOLUTION TO THE CURRENT CRISIS?" I TOLD ALAMGIR THAT MUJIB'S QUESTION, PUT THAT WAY, WAS EASY TO ANSWER. WE NATURALLY HOPED FOR A PEACEFUL POLITICAL SOLUTION IN LIEU OF BLOODSHED. WE WERE GRATIFIED TO LEARN THAT MUJIB IS ALSO THINKING IN THESE TERMS, AND WE INTERPRET YAHYA'S WILLINGNESS TO COME TO DACCA AS EVIDENCE HE TOO IS DESIROUS OF ACHIEVING A PEACEFUL SOLUTION. WE HOPE BOTH SIDES WOULD APPROACH TALKS IN SPIRIT OF COMPROMISE.

3) ALAMGIR THEN SAID MUJIB WANTED TO KNOW IF UNITED STATES WOULD BE WILLING TO INDICATE TO YAHYA OUR HOPES FOR POLITICAL SOLUTION TO CURRENT CRISIS. I SAID I DID NOT KNOW IF THIS THOUGHT HAD BEEN CONVEYED TO YAHYA IN ISLAMABAD BUT I WOULD UNDERTAKE TO SUGGEST TO CHARGE THAT, IF APPROPRIATE OCCASION PRESENTED ITSELF BEFORE YAHYA'S DEPARTURE, HE MIGHT NOTE TO YAHYA OUR HOPES FOR POLITICAL SOLUTION TO PROBLEMS FACING PAKISTAN.

4) COMMENT: I RECOGNIZED, OF COURSE, THAT EXPRESSION OF HOPE FOR "POLITICAL SOLUTION" AS DISTINCT FROM "PEACEFUL" SOLUTION CARRIES IMPLICATION THAT WE WOULD NOT BE HAPPY ABOUT MILITARY REPRESSION AS MLA SOLUTION TO CRISIS. NONETHELESS, GIVEN URGENCY OF SITUATION I WOULD HOPE WE COULD BE SOMEWHAT MORE POSITIVE IN THIS REGARD.

5) OUR ANALYSIS OF PROSPECTS FOR POLITICAL COMPROMISE SOLUTION WILL FOLLOW BY SEPTEL. GPL3.
BLOOD

NOT TO BE REPRODUCED WITHOUT THE AUTHORIZATION OF THE EXECUTIVE SECRETARY

SECRET

MEMORANDUM

NATIONAL SECURITY COUNCIL

INFORMATION
15 November 1971

SECRET/EYES ONLY

MEMORANDUM FOR: GENERAL HAIG

FROM: ADMIRAL MELANDER

SUBJECT: Pakistan/India Contingency Planning

Prior to the 12 November WSAG meeting on the Pakistan-India Situation, HAK was advised that General Ryan, the Acting Chairman, might bring up a CINCPAC proposal to ready a WESTPAC attack carrier task group for Indian Ocean operations to dissuade "third party" involvement.

The matter was not broached during the WSAG meeting. The JCS considered the matter Saturday morning and have advised CINCPAC in the attached that his concept is approved for planning purposes only and, should the situation deteriorate, that he may place a carrier task group on 48 hours readiness for such deployment.

Copy to:
Colonel Kennedy
Hal Saunders

SECRET/EYES ONLY

RE RUEKJCS #1181 3171558
ZNY AAAAA
O 1315542 NOV 71 ZFF4
FM JCS
TO CINCPAC
ZEN/INFO CJCS
BT
S E C R E T NOFORN SPECAT EXCLUSIVE 7115

FOR ADM MCCAIN INFO ADM MOORER FROM GEN RYAN

ACJCS SENDS

DELIVER DURING WAKING HOURS ONLY

SUBJ: PAKISTAN/INDIA SITUATION (U)

REF: CJCS 120925Z NOV 71

1. (S) REF FORWARDED CINCPAC RECOMMENDATION FOR CONTINGENCY DESIGNATION OF ONE WESTPAC CVA TASK GROUP FOR DEPLOYMENT TO INDIAN OCEAN ON 48 HOURS NOTICE IF DIRECTED.

2. (S) YOUR DISCUSSION OF THE FACTORS ASSOCIATED WITH THE POSSIBLE USE OF A CARRIER TASK GROUP IN THE INDIAN OCEAN ARE APPRECIATED AND THIS COURSE OF ACTION WILL BE FULLY CONSIDERED, TOGETHER WITH OTHER OPTIONS, AS THE SITUATION DEVELOPS FURTHER. IN THE MEANWHILE, IF YOUR ANALYSIS OF CURRENT OR FUTURE DEVELOPMENTS CAUSE YOU TO CONSIDER IT PRUDENT TO DESIGNATE A CVA TASK GROUP FOR

DEPARTMENT OF DEFENSE
NATIONAL MILITARY COMMAND CENTER
MESSAGE CENTER

S E C R E T 7115

SUCH DEPLOYMENT WITHIN 48 HOURS. NO OBJECTIONS ARE IMPOSED FROM HERE; HOWEVER, YOU SHOULD CONSIDER THE OVERALL CONCEPT CONTAINED IN THE REFERENCE AS APPROVED FOR PLANNING PURPOSES ONLY.

WARM REGARDS

CF-1

BT
#1121
ANNOTES
ETR
STAMP THIS MSG SPECAT-EXCLUSIVE
LIMIT DIST TO 1 COPY BY NAME EXCEPT CJCS 6 COPIES
DELIVER IN SEALED ENVELOPE
NUMBER COPIES

বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে সিআইএ : ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

SANITIZED COPY

~~TOP SECRET~~ [redacted]
~~NO FOREIGN DISSEM~~/BACKGROUND USE ONLY
NO DISSEM ABROAD/~~CONTROLLED DISSEM~~

EO 12958 3.4(b)(1)-25Yrs (E)

SC No. 7941/71

APPROVED FOR RELEASE DATE: AUG 2001

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY
Directorate of Intelligence
16 December 1971

INTELLIGENCE MEMORANDUM

India-Pakistan Situation Report
(As of 1600 EST)

Bangla Desh--The New Government Takes Shape

1. An official spokesman in New Delhi said today that the new civil administration in Bangla Desh is expected to take over tomorrow, and Indian Defense Secretary Lall has announced that four members of the Bengali government flew to Dacca today to form a transitional government. Lall further asserted that the question of repatriation of West Pakistani soldiers who have become prisoners of war would be negotiated between India and Pakistan "at such a time when the aggression against us stops."

2. [redacted] EO 12958 3.4(b)(1)-25Yrs EO 12958 3.4(b)(1)-25Yrs (E) report, the Indian Government will insist that Bangla Desh have a nationally based government rather than one like the present provisional government, which is dominated by the Awami League. The Awami League has been resisting, but Prime Minister Gandhi reportedly has come to an agreement with the nine-man Consultative Committee which includes pro-Moscow Communists and was formed several months ago. According to the agreement, the Consultative Committee will form the nucleus of the new Bengali government. What would happen to the present members of the government is unclear.

3. The Indian Army will not withdraw from East Bengal until it is satisfied that the Mukti Bahini does not constitute a threat to the new

~~NO FOREIGN DISSEM~~/BACKGROUND USE ONLY
NO DISSEM ABROAD/~~CONTROLLED DISSEM~~

SANITIZED COPY

DECLASSIFIED
E.O. 12958, Sect. 3.6
NLN 00-027 #, 3.4(b)(1)(6)
By [illegible] NARA, Date 3-13-02
(5 pages)

EO 12958 3.4(b)(1)>25Yrs
(C)

regime's stability. To this end, the army has been instructed to isolate extreme radical elements within the irregular forces. It is likely that only the former police units will be allowed to continue their security roles; the frontier guards and the Bengali Rifles will be disbanded. Indian leaders hope that policing activities by the Indian Army will be kept to a minimum.

4. Press reports also say that Indian forces will remain in East Bengal for an indefinite period of time. It will reportedly be the responsibility of the Unified Indian Bengali Command to repair the "damage caused by the Pakistani occupation forces." An Indian Government spokesman has described the duties of the Unified Command as the restoration of normalcy, the rehabilitation of public utilities, and the repatriation of the refugees.

Cease-fire Arrangements

5. The New Delhi domestic press describes the terms of the Pakistani surrender as follows: 1) all Pakistani armed forces in the eastern wing are to surrender to Lieutenant General Aurora, the Indian commander-in-chief of the Indian and Bangla Desh forces; 2) the surrender shall include all Pakistanis in land, naval, and paramilitary forces; 3) these forces will lay down their arms where they are currently located and surrender to the nearest regular troops; 4) the Pakistani Eastern Command will then be under the orders of General Aurora, whose decisions will be final regarding interpretation of the terms of surrender.

6. Aurora gave assurances that all surrendering personnel will be treated with dignity and guaranteed the safety of all those who surrender to him. He also undertook to offer protection to all foreign nationals, ethnic minorities, and people of West Pakistani origin.

EO 12958 3.4(b)(1)>25Yrs
(C)

096

7. On the morning of 16 December Bangla Desh government representatives handed Major General Jacob, chief-of-staff for the Indian Army's Eastern Command, the following suggestions for conditions to be imposed upon the Pakistani Government: 1) Sheik Mujib should be returned safely to Bangla Desh; 2) Bengalis living in West Pakistan should be permitted to return safely to Bangla Desh; 3) Bengali members of the Pakistan Armed Forces in West Pakistan should be permitted to return safely to Bangla Desh, and the Pakistan Army in East Bengal should surrender its weapons and equipment to the joint Indian-Bengali military command; and 4) Pakistan Prime Minister designate Nurul Amin and other Bengali "quislings" should be repatriated to Bangla Desh to stand trial. According [redacted] of the above information, the Indian Government also plans to demand compensation from Pakistan for Indian military personnel losses during the hostilities as well as for military equipment damaged or destroyed.

EO 12958 3.4(b)(1)>25Yrs (C)

8. [redacted] that due to the rout of the army in East Pakistan, Pakistani army officers are agitated against President Yahya. They apparently blame him for refusing to allow them to take the initiative in the west with heavy armor. They seem to be accusing him of waiting for an anticipated Communist Chinese intervention and of having an exaggerated fear of some type of Soviet intervention.

EO 12958 3.4(b)(1)>25Yrs (C)

Military Aid to Pakistan

9. [redacted] Jordan will supply Pakistan with 18,000 rounds of 20 mm ammunition. [redacted] indicated that the ammunition will be flown in Jordanian planes to Dhahran, Saudi Arabia where Saudi C-130s will pick it up for delivery to Pakistan. [redacted] that since 5 December, the Saudis have sent several C-130s to Jordan to transport spare parts and small ammunition to Pakistan; the Saudis requested that the Jordanians themselves fly the latest shipment as far as Dhahran.

EO 12958 3.4(b)(1)>25Yrs (C)

The Military Situation

10. The military situation has not changed substantially in the last few hours. In the west the Pakistanis continue their build-up of forces south of Lahore. [redacted] The battle for the Pakistani town of Shakargarh, in the Punjab, which is shaping up as one of the biggest of the brief war, continues with heavy fighting reported by each side. There are no reports of major action on any other sector of the border.

EO 12958 3.4(b)(1)>25Yrs (C)

Indian Policy and Pronouncements

11. On 13 December the [redacted] that while India was not prepared to give up its claim to Azad Kashmir, it would not use force to exercise its rights. [redacted] official, the Soviets were told roughly the same thing by Indian special representative, D. P. Dhar, who saw Kosygin on 14 December.

EO 12958 3.4(b)(1)>25Yrs (C)

12. India has categorically rejected the Chinese accusation that Indian armed forces crossed the China-Sikkim border and intruded into Chinese territory for reconnaissance.

13. Demonstrations against US policy in the Indo-Pakistani conflict are continuing at various points in India. Slogan-shouting, petition-bearing groups visited the US Embassy in New Delhi and the consulates in Bombay, Madras, and Calcutta today. Although Bombay reported a growing anti-American trend yesterday, today Calcutta reports that the demonstrators have been fewer in number, possibly because they have been distracted by the events surrounding the various cease-fire proposals.

EO 12958 3.4(b)(1)>25Yrs
(C)

West Pakistani Allegations of Soviet Involvement

14. West Pakistani officials apparently have been ordered to spread the word that Soviet military personnel were militarily involved in the Indian war against Pakistan. There is still no evidence to support the Pakistani allegations.

15. The charges have been repeated by Pakistani representatives in Ankara, Rangoon, Paris, Bonn, London, Rome, and Madrid. The Pakistani attache in Paris claimed that Pakistani air force officers had sighted an SA-3 missile and implied that it had been fired by a Soviet. There is no evidence, however, that Soviet SA-3 missiles have been delivered to India.

* * * * *

16. The UN Security Council has resumed formal debate on the South Asian situation, but there is no late word from the US mission on the status of the six draft resolutions under consideration. A possible clue to how the remainder of this session will go may have been provided by Indian Foreign Minister Singh in his speech a few hours ago. He pleaded that the Council take no action on "troop withdrawals and other problems" until a cease-fire is fully in effect. A simple cease-fire text, which the Indians now say they could accept as an interim measure, has not yet been drafted.

শেখ মুজিবুর রহমান

ইন্দিরা গান্ধী

ইয়াহিয়া খান

রিচার্ড নিক্সন

লিওনিদ ব্রেজনেভ

জুলফিকার আলী ভুট্টো

এডওয়ার্ড হিথ

কেনেথ কিটিং

যোসেফ ফারল্যান্ড

স্যার অ্যালিকম

টেড হিথ

উইলিয়াম পি রজার্স

রিচার্ড হেলমস

কুজনেৎসোভ

জে বি কোনালি

ইন্দিরা গান্ধী ও রিচার্ড নিক্সন

লিওনিদ ব্রেজনেভ ও রিচার্ড নিক্সন

মার্কিন সপ্তম নৌবহর

একাত্তরের গণহত্যা